সীরাত বিশ্বকোষ

একাদশ খণ্ড

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
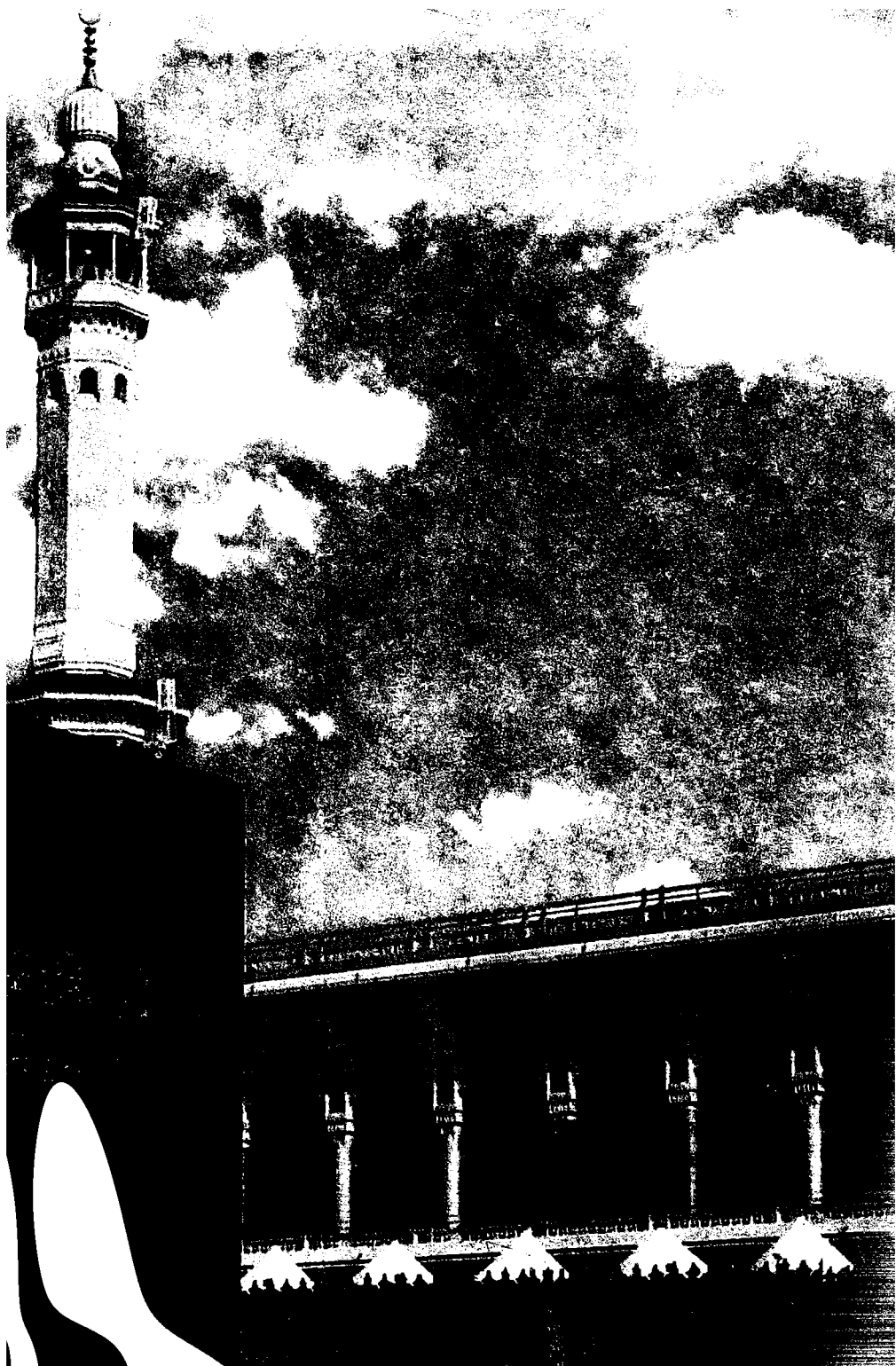
موسوعة سير الانبياء

باللغة البنغالية

المجلد الحادى عشر

সীরাত বিশ্বকোষ

(একাদশ খণ্ড)

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত বিশ্বকোষ (একাদশ খণ্ড)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬০
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
প্রকল্পের আওতায় রচিত ও প্রকাশিত

প্রকাশকাল
জুমাদাল-উলা ১৪২৬
আষাঢ় ১৪১২
জুন ২০০৫

ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৪৭
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৩৭২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.২৪
ISBN : ৯৮৪-০৬-১০৫১-১
Classification No. : ২৯৭.২৪০৩

বিষয় ঃ জীবন-চরিত
আম্বিয়া (আ) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৫১৯০২

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩৫০.০০

SIRAT BISHWAKOSH ঃ The Encyclopaedia of Sirah in Bangali, 11th vol. edited by The Board of Editors and Published by A.S.M. Omar Ali on behalf of Islamic Foundation Bangladesh under the Encyclopaedia of Sirat Project. Phone : 9551902 June 2005

web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail L info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 350.00; US$: 15.00

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ্ উদ্দীন	সভাপতি
মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী	সদস্য
ডঃ মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক	,,
ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন	,,
মাওলানা ইমদাদুল হক	,,
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	সদস্য সচিব

লেখকবৃন্দ

- মাসঊদুল করীম
- মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান
- মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
- মোহাম্মদ তালেব আলী
- মোঃ আমিনুল ইসলাম
- মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান
- আহমাদ হোসাইন
- মুহাম্মদ আবদুল মালেক
- ডঃ আবদুল জলীল
- মুহাম্মদ মূসা
- মুহাম্মদ আবদুর রব মিয়া
- মুহাম্মদ জাবির হোসাইন
- মোঃ ফজলুর রহমান চৌধুরী

আমাদের কথা

আলহামদু লিল্লাহ ! যাঁহার অসীম রহমত ও তৌফীকে সীরাত বিশ্বকোষ ১১শ খণ্ড আজ আমরা পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছি সেই মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি, বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও শান্তির জন্যই যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে তাহাদের পদস্খলন ও অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিয়া উভয় জগতের শান্তি ও কল্যাণের সাথে পরিচালিত করিবার জন্য যুগে যুগে তাঁহারই মনোনীত একদল আদর্শবান, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন যাঁহারা নবী-রাসূল নামে খ্যাত ও পরিচিত। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান তথা তাঁহাদের আনীত শিক্ষামালার পরিপূর্ণ স্ফূরণ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের জীবন ও কর্মে।

হযরত রাসূলে কারীম (স) শেষ নবী। তাঁহার পর আর নবী বা রাসূল আগমন করিবেন না। তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম আদর্শরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

তাই অধঃপতিত ও পথভ্রষ্ট মানুষের সঠিক পথ, শান্তির পথ প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। আর সেইজন্য প্রয়োজন তাঁহার জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই আমাদের এই পদক্ষেপ। পূর্বে প্রকাশিত ১০টি খণ্ডের মধ্যে প্রথম ৩টি খণ্ড ছিল হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত প্রেরিত নবী-রাসূলগণের জীবন সম্পর্কিত। ৪র্থ খণ্ড হইতে শুরু হয় সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন-চরিত। ৮ম ও ৯ম খণ্ড ছিল ড. মোহর আলীকৃত 'Siratunnabi and the Orientalist' শীর্ষক গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থখানি ছিল মূলত প্রাচ্যবিদদের রচিত গ্রন্থাবলীতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিষ্কুলষ চরিত্রে কালিমা লেপনের যে ঘৃণ্য প্রয়াস চালানো হইয়াছিল তাহার সমুচিত জবাব। বর্তমান ১২শ খণ্ডটি রাসূল (স) জীবনেরই ধারাবাহিকতা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২২ (বাইশ) খণ্ডে প্রকাশিতব্য যে সীরাত বিশ্বকোষ প্রকল্প হাতে নিয়াছে উহার ১০ (দশ) খণ্ডই এই মহামানবের জীবন-চরিত সম্পর্কিত। বর্তমান খণ্ডটি সীরাত বিশ্বকোষের ১১শ খণ্ড হইলেও হযরত রাসূলে কারীম (স)-এর জীবন-চরিতের ৬ষ্ঠ খণ্ড। এই খণ্ডে তাঁহার মোহনীয় ও অপরূপ চরিত্র মাধুরীর বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার জীবন ও কর্মের উপর আরও ৪ (চার) টি খণ্ড ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনীর উপর আরও

দশটি খণ্ড প্রণয়নের পরিকল্পনা সামনে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এই মহতী প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আমরা আমাদের পাঠক সমীপে দু'আ ও মুনাজাতের অনুরোধ করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ ১০ম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ ছাড়াও যেসব ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি, নিবন্ধকার ও গবেষক নিরলস পরিশ্রম করিয়াছেন আমি তাহাদের সকলকে সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি। বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ ও সীরাত বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশে সহযোগিতা দানকারী অন্য সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সকল্যকে আহসানুল জাযা দান করুন।

বাংলা ভাষায় নবী-রাসূল ও সাহাবীগণের উপর সীরাত বিশ্বকোষ সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাতে কিছু ভুলত্রুটি থাকিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমরা এই ত্রুটি যথাসাধ্য দূর করিবার প্রয়াস অব্যাহত রাখিয়াছি। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ মেহেরবানী করিয়া সেইসব ত্রুটি নির্দেশ করিলে আগামী সংস্করণে সংশোধন করা হইবে। এতদ্ব্যতীত কোন মূল্যবান পরামর্শ পাইলে তাহার আলোকে পরবর্তী খণ্ডগুলি আরও সমৃদ্ধ করিতেও আমরা প্রয়াস পাইব ইনশাআল্লাহ! পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুলের জন্য জানাই আকুল মুনাজাত। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। বহু আকাঙ্ক্ষিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর ১১শ খণ্ডটিও প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে লক্ষ কোটি হাম্‌দ ও শোকর পেশ করিতেছি। অযূত সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুন নাবিয়্যীন, রাহমাতুল লিল-'আলামীন ও শাফী'উল মুযনিবীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যাঁহার সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছি এবং পৃথিবীর তাবৎ মানবমণ্ডলী পাইয়াছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শাশ্বত জীবনবোধ।

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-সহ অসংখ্য নবী-রাসূলকে অন্ধকারে নিমজ্জিত ও পথহারা মানব সমাজের পথ প্রদর্শনের জন্যই পৃথিবীর বুকে পাঠানো হইয়াছিল। আর এসকল নবী-রাসূলের উপর নাযিলকৃত সহীফা ও কিতাবসমূহের পর তাঁহাদের সীরাত তথা জীবন-চরিতকেই সমগ্র মানবমণ্ডলীর, বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর সামনে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দিগদর্শন হিসাবে পেশ করা হইয়াছে যাহাতে ইহার আলোকে পথ চলা উম্মাহর জন্য সহজ হয়।

আম্বিয়াকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাই 'আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি' (১০ ঃ ১৬) বলিয়া নিজের সমগ্র জীবনকেই হিদায়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে পেশ করিতে দেখি। অতঃপর কুরআনুল করীমও তাঁহার জীবনে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছে, "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে" (৩৩ ঃ ২১)।

অতএব উত্তম আদর্শের উজ্জ্বলতম নমুনা হিসাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সীরাত তথা জীবন-চরিতকে উম্মাহর পরবর্তী বংশধরদের সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য পূর্বসূরী সীরাত লেখকদের আদর্শ অনুসরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইহার প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় জীবনী বিশ্বকোষ নামে ২২ খণ্ডে সমাপ্য একটি বৃহৎ 'সীরাত বিশ্বকোষ' রচনা ও সংকলনের প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৯৬ সালের জুলাই হইতে এইসব কার্যক্রম শুরু হইবার কথা থাকিলেও ইসলামী বিশ্বকোষের অতিরিক্ত তিনটি খণ্ডের কাজ সম্পন্ন করিতে যাইয়া ২০০০ সালের পূর্বে ইহার প্রকৃত কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নাই। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীই বলিতে হইবে, কাজ শুরু করিবার পর হইতে অদ্যাবধি পর্যায়ক্রমে ইহার ১০টি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং এক্ষণে ইহার ১১শ খণ্ডটি পাঠকের হাতে। ইতোমধ্যে ১২শ খণ্ডটির কম্পোজও শুরু হইয়াছে। ত্রয়োদশ খণ্ডটির রচনা ও সম্পাদনার কাজ চলিতেছে। সত্বর ইহাও প্রকাশের লক্ষ্যে পাণ্ডুলিপি প্রেসে হস্তান্তর করা হইবে। আমরা এই পর্যায়ক্রমিক সাফল্য দানের জন্য জগতসমূহের মালিক

পরম করুণানিধান মহাপ্রভুর দরবারে পুনরুপি অবনত মস্তকে সিজদায়ে শোকর আদায় করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অনেকের নিকট নানাভাবে ঋণী। তন্মধ্যে সম্পাদনা পরিষদের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি অধ্যাপক আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীনসহ পরিষদের সদস্যবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যাঁহারা নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ইহার পিছনে নিরলস শ্রম দিয়া আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার নজীর রাখিয়াছেন। এতদসঙ্গে সীরাত বিশ্বকোষ-এর সম্মানিত লেখক ও গবেষকবৃন্দকেও তাঁহাদের নিরলস শ্রম ও মূল্যবান খিদমতের জন্য আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের এই অমূল্য খেদমতের জন্য জাতি যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহাদেরকে স্মরণ করিবে। সর্বোপরি মহাপ্রভুর দরবারে তাঁহারা ইহার জন্য অবশ্যই সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত হইবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অধিকাংশ কর্মকাণ্ডের রূপকার বর্তমান মহাপরিচালক, লেখক ও গবেষক জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম সাহেবকেও আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইসলামী বিশ্বকোষের সূচনায় ও সফল সমাপ্তিতে তাঁহার প্রবল আগ্রহ ও অব্যাহত তাকিদ আমাদেরকে বিপুলভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সীরাত বিশ্বকোষের প্রতিও তাঁহার আগ্রহ ও আকর্ষণ তেমনি সীমাহীন।

অতঃপর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সচিব, পরিচালক অর্থ ও হিসাব, পরিচালক প্রকাশনা, পরিচালক পরিকল্পনা ও লাইব্রেরিয়ানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সেই সঙ্গে প্রকল্পের গবেষণা কর্মকর্তা ও প্রকাশনা কর্মকর্তাসহ আমার সকল সহকর্মী এবং ইহার কম্পোজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সকলকে তাহাদের নিরন্তর শ্রম ও সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। আল্লাহ্ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন ও ইহার উত্তম জাযা দিন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে আমাদের বিনীত আরয, সীরাত বিশ্বকোষের কোথাও কোন ভুল পরিলক্ষিত হইলে কিংবা কোনরূপ সীমাবদ্ধতা নজরে আসিলে তাহা আমাদের গোচরে আনিবেন এবং পরবর্তী সংস্করণ যাহাতে অধিকতর উন্নত, তথ্য সমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয় সেজন্য মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করিবেন। আমরা সকলের সহযোগিতা ও দো'আপ্রার্থী।

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ۰

আবু সাঈদ মুহম্মদ ওমর আলী

পরিচালক

সূচীপত্র

সীরাত বিশ্বকোষ

হযরত মুহাম্মাদ (স)

حضرت محمد صلى الله عليه وسلم

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۔

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ : ২১)।

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۔ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

"হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে" (৩৩ : ৪৫-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সেবামূলক কার্যক্রম

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সেরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন সকল উৎকৃষ্ট গুণে গুণান্বিত। তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। গোটা পৃথিবী যখন পাশবিকতা ও মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তখন তিনি দয়া, মমতা ও করুণার আলোসহ আবির্ভূত হন। জগদ্বাসীকে শিক্ষা দেন দয়া ও মমতাবোধ। তিনি আর্তমানবতার সেবার পয়গাম সকলের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। আপন কর্ম দ্বারাও মানবসেবার বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন তিনি বিশ্ববাসীর সম্মুখে।

জনসেবা বা মানবকল্যাণ বলিতে সাধারণত জনমানুষের দৈহিক বা আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করাকেই বুঝায়। ইহার পরিধি অতি ব্যাপক। পীড়িতের চিকিৎসা, সেবা ও পরিচর্যা করা, ক্ষুধার্তকে আহার্য দান করা, পিপাসার্তকে পানি পান করানো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করা, কর্মহীন বেকারকে কর্মের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া, অভাবী মানুষকে আর্থিক সাহায্য করা, জনগণের চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট তৈয়ার করা, সেতু নির্মাণ করা, জনমানুষের জীবনমান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো ইত্যাদি জনহিতকর সকল প্রকার কর্মই জনসেবার অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার প্রচারিত ওহী ভিত্তিক শিক্ষা ও বাণীতে এই জনসেবার ও মানবকল্যাণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলিয়া ধরিয়াছেন। ধর্ম, বর্ণ ও জাতীয়তার সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধে উঠিয়া তিনি সার্বজনীন জনসেবার মহান শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার এই জনসেবার আদর্শ কী পরিমাণ উদার ও সার্বজনীন ছিল, উহার কিছুটা অনুমান করা যায় তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাণী হইতে। তিনি বলেন ঃ

১. الخلق عيال الله احب الخلق الى الله من احسن الى عياله

"সকল সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবারভুক্ত। আল্লাহ্র নিকট সর্বপেক্ষা প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁহার পরিবারের সর্বাধিক উপকারে আসে" (বায়হাকীর বরাতে, মিশকাত, পৃ. ৪২৫)।

২. لا يرحم الله من لا يرحم الناس

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া ও মমতাবোধ রাখে না আল্লাহ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন না" (মিশকাত, পৃ. ৪২১)।

৩. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

"দয়াকারীদের প্রতি দয়াময় আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তাহা হইলে আকাশের অধিপতি (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন" (আবূ দাঊদ, আদাব, বাব. ৫৮, নং ৪৯৪১; তিরমিযী, বির, বাব ১৬, নং ১৯২৪; মিশকাত, পৃ. ৪২৩)।

৪. ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع الى جنبه

"সেই ব্যক্তি মু'মিন নহে যে উদর পূর্তি করিয়া আহার করে অথচ তাহার প্রতিবেশী তাহার পার্শ্বে অভুক্ত থাকে" (মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৪২৪)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই সকল বাণী হইতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, জনসেবা ও মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টিতে ধর্ম, বর্ণ ও জাতিভেদের কোন তারতম্য ছিল না। সকল বর্ণের, সকল শ্রেণীর আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করাই ছিল তাঁহার শিক্ষা। এই লক্ষ্যে তিনি সর্বপ্রথম সমাজে একজন মানুষের সহিত আরেকজন মানুষের মূল্যায়ন কি তাহা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী দৃষ্টান্তসহ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন ঃ

ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.

"মুমিনগণকে তুমি তাহাদের পারস্পরিক মায়া-মমতা ও সহমর্মিতায় এক দেহতুল্য দেখিতে পাইবে। দেহের কোন একটি অঙ্গ অসুস্থ হইয়া পড়িলে সমগ্র দেহই জ্বর ও বিনিদ্রায় স্বস্তিহীন হইয়া পড়ে" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আদাব, মিশকাত, পৃ. ৪২২)।

জনসেবা ও পরোপকারের চেতনা সমাজ জীবনের অন্যতম নৈতিক ভিত্তি। যে সমাজের মানুষের মধ্যে জনসেবা ও পরোপকারের মনোভাব থাকে, সেই সমাজ হয় প্রীতিপূর্ণ, সৌহার্দময় ও সুখী-সমৃদ্ধ। তাই রাসূলে কারীম (স) ইহার প্রতি গুরুত্বারোপ করিয়া বলেন ঃ

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

"মুসলমানগণ পরস্পর ভাই। সে তাহার উপর যুলুম করিবে না এবং তাহাকে শত্রুর হাতে অর্পণ করিবে না। যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয় মহান আল্লাহ তাহার প্রয়োজন পূরণ করিয়া দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের বিপদ দূর করে আল্লাহ তাহার বিপদ দূর করিবেন কিয়ামত দিবসে" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আদাব, মিশকাত, পৃ. ৪২২)।

একটি সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বাস করে। প্রত্যেকেই জীবনের কোন না কোন মুহূর্তে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। এই ক্ষেত্রে অপরের সেবা ও উপকারের খুবই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। রাসূলে করীম (স) এই পরিস্থিতিতে সমাজ সদস্যদের সেবায় আগাইয়া আসার জন্য উৎসাহ দিয়াছেন এইভাবে ঃ

والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه .

"বান্দা যতক্ষণ তাহার ভ্রাতার সাহায্য করিতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহও তাহার সহায়তা করেন" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আদাব)।

রাসূলে করীম (স)-এর নবুওয়াত-পূর্ব জনসেবা

রাসূলে করীম (স) নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব হইতেই মক্কার জনসমাজে একজন নিঃস্বার্থ জনসেবক হিসাবে ব্যাপক জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান হইয়া উঠেন। আরব গোত্রসমূহের মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া অব্যাহত যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি ও মারামারির প্রেক্ষাপটে কয়েকজন আরব নেতা যখন একটি জনসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক সংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখন তিনি এই সংঘ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। জনসেবামূলক এই সংঘটি ইতিহাসে "হিলফুল ফুযূল" নামে সুপ্রসিদ্ধ। জনসেবামূলক এই সংঘের কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক. দেশ হইতে অশান্তি দূর করা।

খ. বহিরাগতদের জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান।

গ. অসহায় নিঃস্বদের সাহায্য প্রদান।

ঘ. দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপর শক্তিমানদের যুলুম-নিপীড়ন প্রতিহত করা (ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৩৪-১৪০)।

প্রাক-নবূওয়াতকালে রাসূলে করীম (স)-এর জনসেবায় আত্মনিয়োগ ছিল সর্বজনবিদিত। একজন জনসেবক হিসাবে তিনি খ্যাতির চূড়ান্ত সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই দেখা যায়, যখন ওহীর সূচনা হইল আর তিনি কিছুটা ভীত ও উচ্ছসিত হইয়া গেলেন, তখন তাঁহার পত্নী উম্মতজননী হযরত খাদীজা (রা) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন এই বলিয়া ঃ

كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ·

"কখনও নহে! আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনও অপমানিত করিবেন না। কেননা নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখেন, অপরের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করেন, অতিথির সেবা করেন, দুর্যোগকালে সাহায্য-সহযোগিতা করেন" (সহীহুল বুখারী)।

নবূওয়াত-পরবর্তী জনসেবা

বিশ্ব মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শ রাসূলে করীম (স) ছিলেন জনসেবা ও মানব কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ। এই ময়দানে তাঁহার অবদান অনবদ্য। জনমানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসিতেন, সকল অবস্থায় তাহাদের পার্শ্বে থাকিতেন, সুখে-দুঃখে তাহাদের অংশীদার হইতেন, তাহাদেরকে আপন করিয়া লইতেন, উহার নজীর মানবেতিহাসে শুধু বিরলই নহে, বরং অনুপস্থিত। নবূওয়াত সূর্যের প্রভাত কাল হইতে সুদীর্ঘ তেইশটি বৎসর তিনি বিরামহীনভাবে মানব কল্যাণের কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জনসেবা ও সমাজকল্যাণ-মূলক কর্মের পরিধি অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য হিতকর এমন সকল প্রকার কর্মই এই সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলোচনার সুবিধার্থে রাসূলে কারীম (স)-এর জনসেবামূলক কর্ম অবদানসমূহকে কতিপয় উপ-শিরোনামের অধীনে পেশ করা হইল ঃ

১. দুস্থ-অসহায় মানুষের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।

২. দুস্থ-অভাবীদের খাদ্য-বস্ত্রের ব্যবস্থা।

৩. বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৫. জনমানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ।

৬. দুর্যোগকালীন সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান।

৭. জনসেবামূলক কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দান।

৮. দুস্থ ও অসহায়দের জন্য আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।

৯. কর্যে হাসানার প্রবর্তন।

১০. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ইয়াতীম, অসহায় ও বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধী প্রতিপালন।

১১. দুস্থ অসহায় ও গরীবদের সেবার জন্য জমি ও বাগান বরাদ্দ দান।

(এক) দুস্থ-অসহায় মানুষের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

আর্ত-পীড়িত মানুষের সেবার প্রতি রাসূলে কারীম (স) সবিশেষ গুরুত্বারোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, তোমরা রোগীর সেবা কর (বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৪৩)। সাহাবী বারাআ (রা) বলেন, আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল (স) সাতটি বিষয়ে বিশেষভাবে আদেশ করিয়াছেন। উহার মধ্যে একটি হইল, আমরা যেন রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করি (সহীহুল বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৪৩)। অসুস্থ ব্যক্তি যে-ই হউক, রাসূলে করীম (স) তাহার সেবায় আগাইয়া যাইতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি ধনী গরীব, মুসলিম-অমুসলিম, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। মদীনায় বসবাসকারী এক ইয়াহূদীর কিশোর ছেলের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া রাসূলে করীম (স) তাহার খোঁজ-খবর লওয়ার জন্য তাহাদের বাড়ীতে গমন করেন (রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ৩৮০-৩৮১)।

হযরত জাবির (রা) বলেন, একবার আমি ভীষণভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। তখন রাসূলে করীম (স) ও আবূ বকর (রা) পায়ে হাঁটিয়া আমার খোঁজ-খবর লওয়ার জন্য আসিলেন। তাঁহারা আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) উযূ করিয়া আমার শরীরে পানি ছিটাইয়া দিলে আমি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হই (সহীহুল বুখারী; ১খ., পৃ. ৩২)।

হযরত সা'দ (রা) বলেন, আমি মক্কায় ভীষণ অসুস্থ হইয়া পড়িলে রাসূলে কারীম (স) আমার রোগের খোঁজ-খবর নিলেন এবং আমার সেবা করেন (রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ৩৮১)।

অসুস্থের সেবাকে রাসূলে কারীম (স) মুমিনের অন্যতম দায়িত্বরূপে স্থির করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে একজন মানুষের অপর মানুষের নিকট সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার অধিকার ধর্মের পরিচয়ে নহে, মানুষ হওয়ার পরিচয়ে। আর্ত-পীড়িতের সেবায় রাসূলে কারীম (স)-এর অনুসৃত নীতিতে তাঁহার "রহমাতুল্লিল আলামীন" গুণেরই রূপায়ন পাওয়া যায়।

রাসূলে কারীম (স) যুদ্ধাহত মুজাহিদদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্য খন্দক যুদ্ধে নির্মিত মসজিদে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প বা হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন (সহীহুল বুখারী, বাবুল খিদমাতি ফিল-মাসাজিদি লিল-মারদা, ১খ., পৃ. ৬৬)। মদীনার সাধারণ জনতার জন্যও রাসূলে কারীম (স) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খন্দক যুদ্ধে নির্মিত মসজিদে তাঁবু খাটাইয়া দুইজন চিকিৎসক মদীনাবাসীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করিত। রাসূলে কারীম (স) তাহাদের ভাতা প্রদান করিতেন (সীরাত বিশ্বকোষ, ৫খ., পৃ. ৪৪৬)।

রাসূলে কারীম (স) যখন কাহারও অসুস্থতার সংবাদ শুনিতেন তখন তাহার খোঁজ-খবর লওয়ার জন্য তাহার বাড়ীতে গমন করিতেন। তিনি রোগীর কপালে হাত রাখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেন এবং তাহার জন্য দু'আ করিতেন। তিনি রোগীর পসন্দের খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাহা যোগান দানের চেষ্টা করিতেন (মিশকাত, পৃ. ১৩৮)।

(দুই) দুঃস্থ অভাবীদের খাদ্য-বস্ত্রের ব্যবস্থা

রাসূলে কারীম (স) মানুষকে সর্বাধিক ভালবাসিতেন। তিনি গোটা মানব সমাজকে পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা, দয়া-মায়া ও মমতার দিক হইতে একটি দেহের সমতুল্য বিবেচনা করিতেন। দেহের একটি অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হইলে যেমন গোটা দেহই অসুস্থ হইয়া পড়ে তদ্রূপ সমাজের একজন মানুষও যদি অভুক্ত থাকে, খাদ্য বস্ত্রের অভাবে ক্লিষ্ট হয় তাহা হইলে সে সমাজ সত্যিকার অর্থে মনুষ্য সমাজ হইতে পারে না।

রাসূলে কারীম (স)-এর এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মৌলিক বুনিয়াদ। তিনি তাঁহার এই অনুপম শিক্ষার উপর মদীনার সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ফলে মানব সেবায় মদীনার আনসার সাহাবীদের আত্মত্যাগ এখনও নজীরবিহীন ইতিহাস হইয়া রহিয়াছে। মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুসলিমগণ যখন হিজরত করিয়া মদীনায় গমন করেন, তখন মদীনার আনসারগণ সার্বিকভাবে মুহাজির ভাইদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থাপনার মহান খিদমত আঞ্জাম দেন। তাহাদের এই বিস্ময়কর ত্যাগের কথা আল-কুরআনে এইভাবে চিত্রিত হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

"আর তাহাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যাহারা (আনসারগণ) এই নগরীতে বসবাস করিয়াছে ও ঈমান আনিয়াছে তাহারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য তাহারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তাহারা

মুহাজিরদেরকে প্রধান্য দেয় নিজেদের উপর, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও। যাহারা কার্পণ্য হইতে নিজেদেরকে মুক্ত রাখিয়াছে তাহারাই সফলকাম" (৫৯ : ৯)।

রাসূলে কারীম (স) মসজিদে নববীর পার্শ্ববর্তী একটি স্থানে পরিজনহারা, সহায়-সম্বলহীন মানুষের পানাহার ও বসবাসের জন্য একটি ছাউনী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যাহা "সুফ্‌ফা" নামে খ্যাত। আশ্রয়হীন লোকজন এখানে আশ্রয় লইত। রাসূলুল্লাহ (স) নিজ তত্ত্বাবধানে তাহাদের সকলের খাদ্য-বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনের বন্দোবস্ত করিতেন। তিনি আশ্রিতদের স্মরণ করিতেন আদ'য়াফুল ইসলাম—ইসলামের মেহমান নামে। রাসূলে কারীম (স) এই আসহাবুস-সুফ্‌ফার সুখ-দুঃখের অংশীদার ছিলেন। তাহাদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়াপ্রবণ ও স্নেহশীল। নিজের ও নিজ পরিবারের চাহিদার উপর তিনি সর্বদা আসহাবুস-সুফ্‌ফাকে প্রাধান্য দিতেন।

একদা হযরত 'আলী ও ফাতিমা (রা) তাঁহার নিকট একটি বাঁদী চাহিলেন। তিনি উত্তরে আসহাবুস-সুফফার অন্নাভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বাদী দিতে অপারগতা প্রকাশ করিলেন (সীরাত বিশ্বকোষ, ৫খ., পৃ. ৪৮৫)।

রাসূলে কারীম (স) নিজ দস্তরখানে বসাইয়া সুফ্‌ফার আশ্রিতদের খাবার খাওয়াইতেন এবং বায়তুল মাল হইতেও তাহাদের যথাসম্ভব সহায়তা করিতেন। এই সুফফার আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিতদের সংখ্যা কখনও কখনও চারি শতাধিক পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইত (সীরাত বিশ্বকোষ, ৫খ., পৃ. ৪৮৩)।

রাসূলে কারীম (স) নিজ পরিবার ও গৃহবাসীদেরকেও এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, কোন অভাবগ্রস্ত লোক যেন নবীরগৃহ হইতে খালি হাতে ফিরিয়া না যায়। এমনকি আধা টুকরা খেজুর হইলেও যেন তাহাকে দেওয়া হয় (রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ২৫৯)।

রাসূলে কারীম (স)-এর আদর্শে যাকাত প্রবর্তনের মৌলিক উদ্দেশ্যও অভাবগ্রস্তদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সমস্যার সমাধান করা। তিনি বিত্তশালীদের নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিয়া বিত্তহীনদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন (দ্র. ৯ ১০৩)। জনসেবা ও মানব কল্যাণের জন্য তিনি বিত্তশালীদেরকে যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত দান-খয়রাতেরও নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক জনপদের বিত্তশালীদের উপর সেই অঞ্চলের নিঃস্ব অভাবীদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। যাহারা এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিবে তাহাদের প্রতি ইহ-পরকালীন শাস্তির হুঁশিয়ারিও উচ্চারিত হইয়াছে তাঁহার বাণীতে (দ্র. ৩ : ১৮০, ৯ : ৩৪-৩৫, ১০৭ : ১-৩)।

হযরত মিকদাদ (রা) বলেন, আমি এবং আমার দুইজন সাথী এত দরিদ্র ছিলাম যে, অভুক্ত থাকিতে থাকিতে আমাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গেল। আমাদের সাহায্যের জন্য অনেকের নিকট আবেদন করিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর আমরা রাসূলে কারীম (স)-এর খিদমতে হাজির হইলাম। তিনি আমাদের দুরাবস্থা দেখিয়া আমাদেরকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং তিনটি বকরী দেখাইয়া বলিলেন, এই তিনটি বকরী দোহন করিয়া তিনজনে পান করিতে থাক। এই তিনটি বকরির দুধ পান করিয়াই আমাদের তিনজনের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একবার একটি গোত্রের কিছু মুসাফির রাসূলে কারীম (স)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। তাহাদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। ছিন্ন-জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত লোকগুলি ছিল প্রায় অর্ধ-নগ্ন। কাহারও পায়ে জুতা ছিল না। চামড়ার সাথে লাগিয়া গিয়াছিল তাহাদের শরীরের হাড়-মাংস। তাহাদের এই করুণ অবস্থা দেখিয়া রাসূলে করীম (স)-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি অস্বাভাবিক উদ্বেগে কাতর হইয়া পড়িলেন। গৃহে তালাশ করিয়া কিছু না পাইয়া তিনি বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলিলেন। লোকজন সমবেত হইলে নামাযান্তে তিনি ভাষণ দিলেন এবং সকলকে এই দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য আহ্বান করিলেন। এইভাবে তিনি দুর্গত মানুষের খাদ্য-বস্ত্রের ব্যবস্থা করিলেন (হযরত মুহাম্মদ (স), জীবনী বিশ্বকোষ, পৃ. ৬০)।

(তিন) বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ

বেকার কর্মহীন জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান ও কর্ম যোগানের ক্ষেত্রেও রাসূলে কারীম (স) অনুপম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। অনাবিল দরদ লইয়া তিনি সমাজের ভিক্ষুক শ্রেণীকে ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া কর্মমুখী করার প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। প্রাক-নবূওয়াত কাল হইতেই তিনি এই ক্ষেত্রে অবদান রাখিতে শুরু করেন। তিনি সমাজের প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তিকে জীবিকা উপার্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দাতার হাত গ্রহীতার হাত হইতে উত্তম (রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ২৫২)।

একদা একজন বেকার কর্মহীন আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহর (স)-এর নিকট সাহায্য চাহিল। তখন তিনি তাহার একটি বস্তু নিলামে বিক্রয় করিয়া উহার দ্বারা উপার্জনের পরামর্শ দিলেন এবং তাহাকে বলিয়া দিলেন, তুমি ভিক্ষা করিয়া বেড়াও এবং কিয়ামত দিবসে অপমানিত হও উহার চাইতে ইহা অনেক ভাল (মিশকাত, পৃ. ১৬৩)। অপর বর্ণনায় আসিয়াছে, তিনি একটি কুড়াল কিনিয়া স্বয়ং উহাতে হাতল লাগাইয়া সাহাবীর হাতে তুলিয়া দেন এবং তাহাকে বলিয়া দেন, যাও, বন হইতে কাঠ সংগ্রহ কর এবং উহা বাজারে বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ কর। এইভাবে তিনি ঐ সাহাবীকে কেবল স্বাবলম্বী হওয়ার পথই দেখান নাই, তাহাকে মর্যাদার পথও দেখাইয়া দিয়াছেন। ভিক্ষুকের হাতকে তিনি কর্মীর হাতে পরিবর্তন করিয়াছেন (মিশকাত, পৃ. ১৬৩)।

রাসূলে কারীম (স) কর্মক্ষম মানুষকে কর্মের সুযোগ করিয়া দেওয়া, অনুরূপ কর্ম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে কোন শিল্পকর্মের প্রশিক্ষণ দেওয়াকে সাদাকারূপে বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি সাহাবীগণকে এই সেবায় আগাইয়া আসার আহ্বান জানাইয়াছেন (মিশকাত, পৃ. ১৬১)।

(চার) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

রাসূলে কারীম (স)-এর আবির্ভাবকালে আরব সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল চরম আকারে। অধিক সংখ্যক মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে ও দুঃখ-কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করিত। ইয়াহূদীরা উচ্চহারে সূদে অর্থকড়ি ধার দিত। তাহাদের অনুকরণে বিত্তশালী আরবদের

মধ্যেও সূদী কারবার শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল। সূদের নিষ্পেষণে অসহায় বিত্তহীন জনগোষ্ঠী এই পরিস্থিতিতে রাসূলে কারীম (স) মানব কল্যাণে অভাবী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে জনসমাজে সর্ববিধ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হয় এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুখী সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গরীব-দুঃখী, অভাবী জনগোষ্ঠীর সেবায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর কতক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ঃ

(ক) বিত্তশালীদের সম্পদে যাকাত প্রবর্তন।

(খ) যাকাত ছাড়াও অতিরিক্ত সাদাকা ও দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

(গ) বায়তুল মাল হইতে করযে হাসানা প্রদান।

(ঘ) বিত্তশালীদেরকে করযে হাসানা প্রদানে উৎসাহ দান।

(ঙ) সূদী কারবার নিষিদ্ধকরণ।

(চ) যাকাত ছাড়াও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর হইতে গরীব ও অভাবী জনগোষ্ঠীর জন্য অংশ নির্ধারণ।

(ছ) গরীব, নিরাশ্রয়, বেকার, বিকলাঙ্গ ও মুসাফির জনগণকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

(জ) ইয়াতীম ও পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের প্রতিপালন।

(ঝ) দরিদ্র মানুষের অভাব বিমোচনের জন্য রাসূলে কারীম (স) রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে দেশের নাগরিকদের জন্য নিম্নবর্ণিত সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা দান করিয়াছিলেন। যথা ঃ

১. প্রত্যেকের জন্য খাদ্য

২. বস্ত্র

৩. বাসস্থান

৪. চিকিৎসা সুবিধা ও

৫. বিবাহের ব্যবস্থা

ইহার ফলে ক্রমশ দারিদ্র্য দূরীভূত হইতে থাকে। পরবর্তী সময়ে খলীফা 'উমার ইব্ন আবদুল 'আযীযের সময়কালে যাকাত গ্রহণের মত কোন দরিদ্র লোক খুঁজিয়া পাওয়া কষ্টকর ছিল।

(ঞ) জনকল্যাণমুখী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন ঃ ইহার মধ্যে সূদী লেনদেন নিষিদ্ধকরণ, করযে হাসানাহ প্রবর্তন, যাকাত আবশ্যকীয়, তাকাফুল তথা পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতামূলক ইসলামী বীমা ব্যবস্থা চালুকরণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এই সবই মূলত গরীব শ্রেণীর কল্যাণে।

(পাঁচ) জনমানুষের জীবন-মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ

রাসূলে কারীম (স) জনমানুষের জীবন-মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়াছিলেন। যথা ঃ

(ক) রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ।

(খ) যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

(গ) গোসল করিয়া সুগন্ধি ব্যবহার পূর্বক জনসমাবেশে গমনের নির্দেশ।

(ঘ) কাঁচা পেয়াজ ও রসুন এবং এই জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু আহার পূর্বক জনসমাবেশে গমন নিষিদ্ধকরণ।

(ঙ) পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে গাছপালা রোপণে উৎসাহ প্রদান।

(চ) খাবার পানির সুবন্দোবস্ত করিতে উৎসাহ প্রদান।

একবার তাঁহার একজন সাহাবী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আম্মা ইন্তিকাল করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য আমি কী উত্তম দান-খয়রাত করিতে পারি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহার জন্য একটি কূপ খনন কর এবং পিপাসার্তকে পানি বিলাইয়া দাও।

(ছয়) দুর্যোগকালীন সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান

একটি সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বসবাস করে। প্রত্যেকেই জীবনের কোন না কোন মুহূর্তে নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়, দুর্যোগ ও বিপদাপদের ঝাপ্টায় আক্রান্ত হয়। এই সময়ে মানুষ অপরের সেবা ও সাহায্য-সহানুভূতির তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে। রাসূলে কারীম (স) মানুষের এইরূপ দুর্যোগ মুহূর্তে ধর্ম-বর্ণ ও জাতীয়তার উর্ধ্বে উঠিয়া সকলের সেবা ও সহযোগিতায় ঝাপাইয়া পড়িতেন। এমনকি শত্রুপক্ষের বিপদকালীন সময়েও তাহাদের প্রতি সেবা ও সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দিতেন। হিজরতের ৫ম বা ৬ষ্ঠ বৎসর মক্কায় চরমাকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মক্কার কুরায়শরা ছিল ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রাণের শত্রু। তাহাদের সহিত ইতোমধ্যে বদর, উহুদ ও খন্দকের মত ভয়াবহ তিনটি যুদ্ধও সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু মক্কাবাসিগণ যে কোন সুযোগে ইসলাম ও মদীনা রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার অপেক্ষায় দিনাতিপাত করিতেছিল। এহেন মুহূর্তে শত্রুর দুর্দশা দেখিয়া মানুষ যেখানে অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়ে, সেখানে রাসূলে কারীম (স) মক্কার দুর্ভিক্ষের সংবাদে খুবই মর্মাহত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত মক্কাবাসীদের জন্য পাঁচ শত দিরহামের ত্রাণ সাহায্য কুরায়শ সর্দার আবূ সুফ্য়ানের নিকট প্রেরণ করিলেন। তৎকালে ইহা একটি মোটা অংকের অর্থ হিসাবেই বিবেচিত ছিল। মক্কাবাসীর এই দুর্যোগে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করিয়া তিনি আবূ সুফ্য়ানের নিকট একটি পত্রও প্রেরণ করিলেন। উহাতে লিখিয়া দিলেন, 'এই মুদ্রাগুলি অসহায় গরীব মানুষের সাহায্যের জন্য প্রেরিত হইল' (ড. হামীদুল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা কৌশল শীর্ষক নিবন্ধ; সীরাত স্মারক, জাতীয় সীরাত কমিটি, ১৪২২ হি.)।

কাহারও কোন দুর্ঘটনা বা মসীবতের কথা শুনিলে রাসূলে কারীম (স) তাহার প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য তাহার আবাসস্থলে গমন করিতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি

মুসলিম-অমুসলিম শত্রু-মিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। কেহ ইন্তিকাল করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহার জানাযায় শরীক হইতেন এবং শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা দিতেন (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল জানাইয)।

(সাত) জনসেবামূলক কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দান

রাসূলে কারীম (স) জনসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সরাসরি অবতীর্ণ হইতেন। সাহাবাদের কোন কাজে তিনি স্বেচ্ছাশ্রমে নিজেকে নিয়োগ করিতে মোটেও সংকোচ বোধ করিতেন না। হিজরতের পর মসজিদে নববী নির্মাণকালে তিনি ইট তৈরীর কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং সাহাবীদের সহিত ইট বহন করেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৪২৭)।

একবার তিনি মসজিদের দেওয়ালে থু থু দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি স্বহস্তে উহা পরিষ্কার করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের কাহারও এইভাবে থু থু ফেলা উচিৎ নহে (সহীহুল বুখারী, ১খ., পৃ. ২২৭)।

মদীনার সমাজে কাহারও কোন সমস্যা দেখা দিলে তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তাহাদের সমস্যার কথা জানাইত। রাসূলে কারীম (স) যথাসাধ্য তাহাদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করিতেন। এই কাজটি তিনি নিজে করিতেন। একবার হযরত জাবির (রা) তাঁহার ঋণের সমস্যা রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করিলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিলেন (সহীহুল বুখারী, কিতাবুস সালাত)।

এক সফরে সাহাবীগণ একটি বকরী যবেহ করেন এবং রান্নাবান্নার কাজ পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করিয়া লন। রাসূলে কারীম (স) বলিলেন, বন হইতে কাঠ আমি আনিব। তাঁহারা বলিলেন; ইহা হইতেই পারে না। আপনি আরাম করুন, আমরা সকল ব্যবস্থা করিতেছি। কিন্তু তিনি তাহাদের আবদার রাখিলেন না।

একদা সালাত আদায়ের জামা'আত প্রস্তুত ছিল। ইত্যবসরে এক বেদুঈন আসিয়া তাঁহার জামার আঁচল ধরিয়া বলিতে লাগিল, আমার সামান্য কাজ বাকী রহিয়া গিয়াছে। এমন না হউক যে, আমি তাহা ভুলিয়া যাই, তাই প্রথমে আপনি তাহা করিয়া দিন। রাসূলে কারীম (স) বিনা দ্বিধায় তাহার সহিত চলিয়া গেলেন এবং প্রথমে তাহার কাজ করিয়া দিলেন, অতঃপর সালাত আদায় করিলেন।

রাসূল কারীম (স)-এর সাহাবী হযরত খাব্বাব (রা) কোন এক যুদ্ধে গিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে তিনি ব্যতীত কোন পুরুষ ছিল না। অথচ মহিলাগণ দুধ দোহনও করিতে পারিতেছিল না। এমতাবস্থায় খাব্বাব (রা) ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিদিন তাঁহার গৃহে যাইতেন এবং তাঁহার পরিবারের জন্য দুধ দোহন করিয়া দিয়া আসিতেন। মোটকথা জনসেবা ও মানবকল্যাণের মহান আদর্শ রাসূলে কারীম (স) জনগণের কল্যাণে স্বেচ্ছাশ্রমে অবতীর্ণ হইতেন এবং সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করিতেন। তিনি স্বচ্ছন্দে অন্যের কাজ করিয়া দিতেন।

(আট) দুঃস্থ অসহায়দের জন্য আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা

রাসূলে কারীম (স) মদীনায় হিজরত করার পর মসজিদে নববীর পার্শ্বে দুঃস্থ-অসহায়দের জন্য একটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। যাহাদের বাসস্থান ছিল না, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-উপার্জনের উপায় ছিল না, তাহারা এইখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির নিকট দেহ আবৃত করিবার জন্য দুই টুকরা কাপড়ও ছিল না। রাসূলে কারীম (স) নিজ উদ্যোগে তাহাদের লালন-পালন করিতেন- সাধ্যমত তাহাদের অন্ন ও বস্ত্রের যোগান দিতেন এবং নিজ দস্তরখানে বসাইয়া তাহাদের খাবার খাওয়াইতেন। তিনি এই আশ্রয়কেন্দ্র দেখাশুনার জন্য হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে দায়িত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। গনীমত ও অন্যান্য খাত হইতে অর্জিত অর্থের একটি অংশ তিনি এই কেন্দ্রবাসীর কল্যাণে ব্যয় করিতেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৪৬২)। তিনি মসজিদে নববীর পার্শ্বে অসহায় নারীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন (সহীহুল বুখারী, মানাকিবুল আনসার)।

(নয়) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ইয়াতীম, অসহায় ও বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধী প্রতিপালন

সমাজে এমন কিছু লোক রহিয়াছে যাহারা শারীরিকভাবে অক্ষম, পঙ্গু, বৃদ্ধ, ইয়াতীম, নাবালক। তাহারা কাজ করিতে পারে না, উপার্জনের শক্তি রাখে না। রাসূলে কারীম (স) তাঁহার জনসেবা কর্মসূচীর আওতায় এই শ্রেণীর মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পুনর্বাসন ও প্রতিপালনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় আয় হইতে সাহায্যের ব্যাপারে ঘোষণা করিলেন, "যদি কেহ সম্পদ রাখিয়া মারা যায়, তবে তাহা তাহার উত্তরাধিকারীর। আর যদি কেহ সহায়হীন ইয়াতীম ও বিধবা রাখিয়া যায়, তবে তাহার ব্যবস্থাপনাকারী আমি (অর্থাৎ সরকার)" (তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২৯)।

(দশ) কর্যে হাসানার প্রবর্তন

রাসূলে কারীম (স) সমাজের দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠীর সেবায় তাহাদের আর্থিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে কর্যে হাসানা কর্মসূচী প্রবর্তন করেন। সরকারী ব্যবস্থার অতিরিক্ত তাঁহার নিজ উদ্যোগে সমাজের ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গকেও তিনি এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করেন। তাঁহার মতে গরীব-দুঃখীদের পক্ষে কর্যে হাসানাপ্রাপ্তি কেবল দাবিই নহে, বরং ইহা ধনী ও বিত্তশালীদের উপর তাহাদের একটি অধিকার। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ .

"আর তাহাদের (বিত্তশালীদের) ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের অধিকার" (৫১ ঃ ১৯)

আল-কুরআনে কর্যে হাসানা প্রদানে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً.

"এমন কে আছে যে আল্লাহ্কে ঋণ দিবে উত্তম ঋণ? অতঃপর আল্লাহ তাহা বহু গুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন" (২ ঃ ২৪৫)?

ঋণ পরিশোধের দ্রুত চেষ্টা করা ঋণ গ্রহীতার জন্য অবশ্য কর্তব্য। তবে একান্ত অপারগতায় কোন ঋণগ্রহীতা অভাবী যদি ঋণ পরিশোধে অবকাশ চায় তবে তাহাকে অবকাশ দেওয়ার জন্যও রাসূলে কারীম (স) বিত্তশালীদেরকে উৎসাহিত করিয়াছেন (তিরমিযী, ১খ., পৃ. ২৪৪)।

(এগার) দুস্থ অসহায় ও গরীবদের সেবার জন্য জমি ও বাগান বরাদ্দকরণ দান

রাসূলে কারীম (স) গরীব-দুঃখী ও অসহায়দের আর্থিক সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে তাহাদের জন্য জায়গা-জমি ও বাগান বরাদ্দ করেন। খায়বারের নিকটবর্তী ফাদাক অঞ্চল বিজিত হইলে রাসূলে কারীম (স) ফাদাকের ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। অতঃপর তিনি ইহার আমদানী নিজের কাজে এবং বনূ হাশিমের ইয়াতীম, বিধবা ও মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য বরাদ্দ করেন (ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৩৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম; (২) ইমাম বুখারী, সহীহুল বুখারী, আসাহহুল মাতাবি', দিল্লী, তা.বি.; (৩) ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী তা. বি.; (৪) ইমাম তিরমিযী, আল-জামি, দিল্লী, তা. বি.; (৫) আল-বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, কায়রো; (৬) আল্লামা ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুস্তাফা, আশরাফী বুক ডিপো, দিল্লী; (৭) ওয়ালিয়্যুদ্দীন তাবরীযি, মিশকাতুল মাসাবীহ, ইমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা, তা. বি.; (৮) সীরাত বিশ্বকোষ, ই.ফা.বা., ৪খ., ৫খ., ৬খ. ও ৭খ.।

মাস্‌উদুল করীম

পরিবার-পরিজনদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ভালবাসা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুসতাফা (স)-এর পারিবারিক জীবন ছিল খুবই শান্তিময় ও ভারসাম্যপূর্ণ। পরিবার-পরিজনদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল অত্যন্ত সুগভীর। তাঁহার প্রথম স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর সঙ্গে তাঁহার ভালবাসা ছিল সীমাহীন। তাঁহাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় নবী করীম (স)-এর বয়স ছিল পঁচিশ এবং হযরত খাদীজা (রা)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর। বিবাহের পর হযরত খাদীজা (রা) পঁচিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ্ (স) আর কোন বিবাহ করেন নাই। তাঁহাদের দুইজনের মধ্যকার ভালবাসার গভীরতা এত বেশী ছিল যে, হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের পর বাড়িতে যখনই কোন পশু যবেহ করা হইত তখনই রাসূলুল্লাহ্ (স) খুঁজিয়া খুঁজিয়া হযরত খাদীজা (রা)-র বান্ধবিগণের বাড়িতে হাদিয়াস্বরূপ সেই গোশতের অংশ পাঠাইতেন (সহীহ মুসলিম-৭খ., পৃ. ১৩৪)।

হযরত খাদীজা (রা)-র ইন্তিকালের পর তাঁহার বোন 'হালা' নবী করীম (স)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিয়া নিয়মানুযায়ী গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে খাদীজা (রা)-এর কণ্ঠস্বরের এত মিল ছিল যে, নবী করীম (স)-এর কানে সেই স্বর পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে হযরত খাদীজা (রা)-এর স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হয়ত হালা হইবে।" ঐ সময় উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, 'আপনার কী হইয়াছে? একজন বৃদ্ধা, তাও আবার মৃতা, তাঁহার কথা সব সময় আপনার মনে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁহার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করিয়াছেন"। সহীহ বুখারীতে এই পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইসতী'আব-এ বর্ণিত আছে যে, ইহার উত্তরে নবী করীম (স) বলিলেন, "কখনও না, হে 'আইশা! যখন মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল তখন খাদীজাই আমাকে সত্যবাদী বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল; মানুষ যখন কাফির ছিল তখন খাদীজাই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। যখন আমার কোন সাহায্যকারী ছিল না তখন খাদীজাই আমাকে সাহায্য করিয়াছিল" (আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ৩৯৯)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও আমি হযরত খাদীজা (রা)-কে কখনও দেখি নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি আমার যতটুকু হিংসা হইত আর কাহারও প্রতি তাহা হইত না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (স) সর্বক্ষণ তাঁহার কথা আলোচনা করিতেন। হযরত 'আইশা (রা) আরও বলিয়াছেন, আমি একবার হযরত খাদীজা (রা) প্রসঙ্গ

লইয়া নবী করীম (স)-এর মনে কষ্ট দিয়াছিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলাই আমার অন্তরে তাহার প্রতি গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন (সহীহ মুসলিম, ফাযায়েলে খাদীজা, বরাতে আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ৩৯৯)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) কখনও একই রাত্রিতে সকল সহধর্মিনীর ঘরে যাতায়াত করিতেন। তিনি সহধর্মিনিগণের সঙ্গে অবস্থানের জন্য পালা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি রাত্রিসমূহ এবং খোরপোষ জীবন-সঙ্গিনিগণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহার মনের টান সকলের প্রতি সমান ছিল এমন কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তাই তিনি সর্বদা বলিতেন, "হে আল্লাহ! আমার আয়ত্তাধীন যাহা আছে তাহাতে আমি সমতা রক্ষা করিয়াছি, আর আমার আয়ত্ত বহির্ভূত যাহা আছে তাহাতে তুমি আমাকে অভিযুক্ত করিও না" (আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৫৬৪)।

নবী করীম (স)-এর সঙ্গে উম্মাহাতুল মু'মিনীন বা তাঁহার সহধর্মিনিগণের আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ। তাঁহাদের সঙ্গে তিনি সদাসর্বদা মধুর আচরণ করিতেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর নিকট আনসার বালিকাদেরকে যাতায়াত করিতে দিতেন যাহাতে তাহারা তাঁহার সঙ্গে খেলা-ধুলা করিতে পারে। তাঁহার সহধর্মিনিগণ যখন কোন জিনিসপত্রের আকাঙ্ক্ষা করিতেন এবং তাহা যদি শরীয়তসম্মত হইত তবে তিনি যথাসাধ্য তাহা পূর্ণ করিতেন। হযরত 'আইশা (রা)-কে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি যখন পানি পান করিতেন তখন নবী করীম (স) পানপাত্রের ঐ স্থানে ওষ্ঠদ্বয় লাগাইতেন যেই স্থানে 'আইশা (রা)-এর ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ করিত। হযরত 'আইশা (রা) যদি কোন হাড় হইতে গোশত খসাইয়া খাইতেন, তবে তিনি সেই হাড়ের ঐ স্থানটি চুষিতেন, যেই স্থানে 'আইশা (রা)-এর মুখ লাগিত। তিনি অনেক সময় হযরত 'আইশা (রা)-এর কোলে তাঁহার মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করিতেন। তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া তিনি মাঝে মাঝে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করিতেন। কখনও বা হযরত 'আইশা (রা) ঋতুবতী অবস্থায় থাকিতেন, অথচ নবী করীম (স) তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া কুরআন করীম তিলাওয়াত করিতেন (আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৫৬৪-৬৫)।

একবার মসজিদে নববীতে কতিপয় হাবশী লাঠিয়াল লাঠিখেলা দেখাইতেছিল। নবী করীম (স) স্বয়ং হযরত 'আইশা (রা)-কে দীর্ঘক্ষণ সেই খেলা দেখান। তিনি নবী করীম (স)-এর কাঁধে তাঁহার চিবুক রাখিয়া উহা উপভোগ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অভ্যাস ছিল যে, প্রতিদিন আসরের নামায আদায় করার পর উম্মাহাতুল মুমিনীনের গৃহে যাইতেন এবং তাঁহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। তবে রাত্রিকালে সেই ঘরেই অবস্থান করিতেন যাহার ঘরে সেইদিন পালা নির্ধারিত থাকিত। হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাত্রির পালার ব্যাপারে তিনি কাহাকেও প্রাধান্য দিতেন না এবং কদাচিৎ সকলের গৃহে তাঁহার এক চক্কর ঘুরিয়া আসার ব্যতিক্রম হইত না (আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৫৬৫)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার সহধর্মিনিগণের মধ্যে রাত্রিযাপনের পালা বণ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) এই পালা বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

দৈহিক দিক হইতে অক্ষম ছিলেন বিধায় তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহার নিজের পালা হযরত 'আইশা (রা)-কে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনামতে হযরত 'আতা বলিয়াছেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা) এই পালায় শামিল ছিলেন না। কিন্তু কাযী আয়ায এবং ইমাম তাহাবীর মতে ইহা সঠিক নহে। আর ইহার কারণ হইতেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (স) কোন কারণে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হযরত 'আইশা (রা)-কে বলিলেন, আপনি যদি নবী করীম (স)-এর এই অসন্তুষ্টি নিবারণ করিয়া দিতে পারেন তবে আমার এইবারের পালা আমি স্বেচ্ছায় আপনাকে ছাড়িয়া দিব। হযরত 'আইশা (রা) তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কর্ম সম্পাদনের পর হযরত সাফিয়্যার পালার দিন তিনি নবী করীম (স)-এর পাশে গিয়া বসিলেন। নবী করীম (স) হযরত 'আইশা (রা)-এর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, হে 'আইশা! তুমি সরিয়া বস। কেননা আজ সাফিয়্যার পালা, তোমার নয়। এই কথা শুনিয়া হযরত 'আইশা (রা) বলিলেন, ইহা আল্লাহ্র দান, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহা দান করেন। এই ঘটনা হইতে হযরত 'আতা-এর ধারণা হইয়াছিল যে, হযরত সাফিয়্যা (রা) হয়ত বা তাঁহার পালা চিরতরে হযরত 'আইশা (রা)-কে দান করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাহা ঠিক নয়। কারণ তিনি কেবল একবারের পালাই তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৫৬৫)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) কিছুটা গরম তবিয়তের মহিলা ছিলেন। এইজন্য নবী করীম (স) একবার তাঁহাকে তালাক দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা হযরত উমার (রা)-এর মনোকষ্টের কথা বিবেচনা করিয়া নবী করীম (স) পরে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) নবী করীম (স)-এর সঙ্গে রাত্রি যাপনের পালা বণ্টনে শামিল ছিলেন না। তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহার পালা হযরত 'আইশা (রা)-কে দান করিয়াছিলেন। বিষয়টি লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, তাঁহার বয়সের আধিক্যের কারণে নবী করীম (স) তাঁহাকে তালাক দিয়াছিলেন এবং হযরত 'আইশা (রা) তাঁহাকে ফিরাইয়া আনার জন্য নবী করীম (স)-কে রাযী করাইয়াছিলেন। অথবা তিনি কেবল তালাক দেওয়ার ইচ্ছাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তালাক দেন নাই কিংবা তালাক দিবেন এইরূপ ধারণা করা হইয়াছিল। এই বিষয়ে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য রিওয়ায়াত হইতেছে, হযরত সাওদা (রা) মনে মনে আশংকা করিতেছিলেন যে, নবী করীম (স) তাঁহাকে তালাক দিবেন। তখন তিনি তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করিবেন না। আমি আমার পালা স্বেচ্ছায় হযরত 'আইশা (রা)-কে দান করিয়া দিতেছি। এই রিওয়ায়াতটি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে জামে তিরমিযীতে এবং হযরত 'আইশা (রা) সূত্রে সুনান আবূ দাঊদে বর্ণিত হইয়াছে (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৫৬৭)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার সহধর্মিনিগণের যাবতীয় অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁহাদের নিকট অবস্থানের পালা কঠোরভাবে অনুসরণ করিতেন। এমনকি অন্তিম রোগের সময় কঠিন পীড়ার যাতনা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব সেই নিয়ম তিনি কঠোরভাবে পালন করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন নিতান্তই দুর্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন যথারীতি সকল সহধর্মিনীর

নিকট হইতে অনুমতি লইয়া হযরত 'আইশা (রা)-এর গৃহে এক সোমবার হইতে পরবর্তী সোমবার পর্যন্ত অবস্থান করিয়া সেইখানেই ইন্তিকাল করেন (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৫৬৭)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তাহার স্ত্রীর সহিত উত্তম আচরণ করে এবং আমি আমার স্ত্রীদের সহিত সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণকারী (সুনান তিরমিযী, ৩খ., পৃ. ৩২২)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সঙ্গে নিজ স্ত্রীগণের প্রগাঢ় ভালবাসার ভিত্তি ছিল আল-কুরআনুল করীমের এই আয়াত ঃ তাহারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের অঙ্গাবরণস্বরূপ, আর তোমরা (স্বামীগণ) তাহাদের অঙ্গাবরণ" (২ ঃ ১৮৭)। নবী করীম (স) কুরআন হাকীমের এই নীতি দর্শনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আদর, সোহাগ, খোশালাপ, অনুরাগ, বিরাগ, তুষ্টকরণ, আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাঁহাদের পক্ষে বা বিরুদ্ধে মতামত গ্রহণ করা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় যাহা দাম্পত্য জীবনে সাধারণত সংঘটিত হইয়া থাকে, তিনি এই সকল বিষয়ে ছিলেন উত্তম আদর্শ (সহীহ মুসলিম, ৭খ, পৃ. ১৩৫)।

সন্তান-সন্ততির প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সীমাহীন ভালবাসা ও স্নেহ-মমতা ছিল। তৎকালে আরবের লোক সন্তানদের চুম্বন ও আদর-সোহাগ করাকে তাহাদের নেতৃত্ব ও পদমর্যাদার জন্য অশোভনীয় মনে করিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদের এই কুপ্রথার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি নিজ সন্তানদেরকে কোলে নিতেন, কখনও কাঁধে চড়াইতেন, সওয়ারীর উপর নিজের সাথে পশ্চাতে তাহাদেরকেও বসাইতেন, তাহাদের ললাট চুম্বন করিতেন এবং তাহাদের কল্যাণ ও বরকতের জন্য দু'আ করিতেন (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৪৪৩)।

নবী করীম (স) তাঁহার সন্তানদেরকে জান্নাতের পুষ্পস্তবক বলিতেন, তাহাদের দেহের ঘ্রাণ লইতেন এবং বক্ষদেশে জড়াইয়া ধরিতেন। আকরা ইব্ন হাবিস নামক জনৈক সরদার রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে একদিন শিশুদেরকে চুম্বন করিতে দেখিয়া বলিল, আমার দশটি সন্তান আছে, আজ পর্যন্ত তাহাদের একজনকেও চুম্বন করি নাই। ইহা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেন, যেই ব্যক্তি কাহারও প্রতি দয়া করে না, তাহার প্রতি দয়া করা হয় না (সহীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৮০৮; জামে তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ৩১৮)। আর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তর হইতে মায়া-মমতা উঠাইয়া নিয়া থাকেন তবে আমি কি করিতে পারি (সহীহ বুখারী, ৪খ., পৃ. ১১৪)?

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (স)-কে শেষ জীবনে একটি পুত্র সন্তান দান করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাহার নাম রাখেন ইবরাহীম। তাহাকে দুগ্ধপান করান জনৈক কর্মকার পত্নী উম্মু সায়ফ (উম্মু বুরদা বিনতুল মুনযির ঃ ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১৩১-৩৭; বরাতে হযরত রাসূল করীম (স), জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ২৬৮)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার স্নেহাস্পদ পুত্র ইব্রাহীমকে দেখিবার উদ্দেশ্যে মাঝে-মধ্যে উম্মু সায়ফের গৃহে গমন করিতেন এবং ধুম্র আচ্ছন্ন কুটিরে বসিয়া তাঁহার শিশুপুত্রকে আদর-সোহাগ করিতেন। শৈশবকালেই ইব্রাহীম (রা)-এর ইন্তিকাল হয়। তাহার ইন্তিকালে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অশ্রুবিগলিত চক্ষু দেখিয়া জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি

ক্রন্দন করিতেছেন! তিনি বলিলেন, ইহা তো স্নেহ-মমতার অভিব্যক্তি। আমি বিলাপ করিতে নিষেধ করি। অতঃপর তিনি তাহাকে দাফন করিবার সময় বলিয়াছিলেন, "হৃদয় ব্যথিত, চক্ষু অশ্রুবিগলিত। কিন্তু আমরা তাহাই বলি, যাহা আল্লাহ পছন্দ করেন। হে ইব্‌রাহীম! আমরা তোমার বিরহে মর্মাহত" (ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১৩৮-৩৯; বরাতে হযরত রাসূলে করীম (স) ঃ জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ২৬৮)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিলেন না। শুধু চারিজন দুহিতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিবাহের পরে তাঁহাদের ইন্তিকাল হয়। তিনি তাঁহাদেরকে এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। হযরত যয়নব (রা)-এর কন্যা উমামাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একবার উমামা তাঁহার কাঁধে সওয়ার ছিল। তিনি এই অবস্থায় সালাত আদায় করেন। যখন রুকূতে যাইতেন তখন নিচে নামাইয়া দিতেন, আবার যখন সিজদা করিতেন তখন তাঁহাকে উঠাইয়া লইতেন (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ১৪০)।

হযরত ফাতিমা (রা) ব্যতীত অন্য সকল দুহিতা নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশাতেই ইন্তিকাল করেন। তাঁহার সর্বকনিষ্ঠা ও সর্বশেষে ইন্তিকালকারী কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর প্রতি তাঁহার স্নেহ-ভালবাসার অন্ত ছিল না। তিনি তাঁহাকে নিজ কলিজার টুকরা বলিয়া উল্লেখ করিতেন (সহীহ বুখারী, ২খ, ৫২৬; জামে' তিরমিযী, ৫খ., পৃ. ৬৯৯)। নবী করীম (স) সফরে যাইবার প্রাক্কালে সর্বশেষে এবং প্রত্যাবর্তনের পর সর্বাগ্রে হযরত ফাতিমা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন (মুসনাদ আহমাদ, ৫খ., পৃ. ২৭৫)। হযরত ফাতিমা (রা) যখন নবী করীম (স)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিতেন তখন তিনি অগ্রসর হইয়া ফাতিমা (রা)-কে খোশআমদেদ জানাইতেন এবং তাঁহার হাতে স্নেহের চুম্বন করিয়া নিজ আসনে বসাইতেন (জামে' তিরমিযী, ৫খ., পৃ. ৭০০)।

হযরত ফাতিমা (রা)-এর পুত্রদ্বয় হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা)-কেও নবী করীম (স) অপরিসীম স্নেহ করিতেন, তাঁহাদেরকে কোলে বসাইতেন, চুম্বন করিতেন এবং দু'আ করিতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি যেমন তাহাদেরকে ভালবাসি, তুমিও অনুরূপ তাহাদেরকে ভালবাস (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৪৪৩)। একদিন জুমু'আর নামাযের খুৎবার প্রাক্কালে তাঁহারা উভয়ে দৌড়াইয়া মসজিদে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদেরকে দেখিয়া মিম্বর হইতে নিচে নামিয়া আসিয়া তাঁহাদের দুইজনকেই কোলে তুলিয়া নিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা যথার্থই বলিয়াছেন, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা (আল কুরআন, ৬৪ ঃ ১৫; সুনানে আবূ দাউদ, ১খ., পৃ. ৬৯৩-৯৪)।

নবী করীম (স) কখনও কখনও হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে চাদরে জড়াইয়া লইতেন, কখনও কোলে বহন করিতেন (জামে' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ৬৫২)। একবার নবী করীম (স) হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে কাঁধে বহন করিয়া বাহিরে আসিলে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, তোমরা কত ভাগ্যবান যে, অতি উৎকৃষ্ট সওয়ারী পাইয়াছ! নবী করীম (স) বলিলেন, আরোহীরাও তো কত উত্তম (জামে' তিরমিযী, ৫খ., পৃ. ৬৬)! নবী করীম (স) এক উরুতে হযরত হাসান (রা) এবং অন্য উরুতে হযরত উসামা (রা)-কে বসাইতেন। অতঃপর

তাঁহাদেরকে একত্র করিয়া বলিতেন, আয় আল্লাহ! আমি তাহাদেরকে যেই রকম স্নেহ করি, তুমিও সেই রকম স্নেহ কর (সহীহ্ বুখারী, ৪খ., পৃ. ২২৫)।

নবী করীম (স) একবার এক যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, হযরত ফাতিমা (রা) তাঁহার দুই শিশুপুত্র হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর হাতে রৌপ্যের কঙ্কন পরাইয়াছেন এবং ঘরের দরজায় রঙিন পর্দা ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। ইহা দেখিয়া নবী করীম (স) অসন্তুষ্ট হইলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করিলেন না। তিনি বিষয়টি আঁচ করিতে পারিয়া সন্তানদের হাত হইতে কঙ্কন খুলিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহানবী (স)-এর নিকট আসিলেন। অতঃপর মহানবী (স) সেই কঙ্কন বাজারে পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, এইগুলি বিক্রয় করিয়া হাতীর দাঁতের কঙ্কন আনিয়া দাও (আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ৩৯৪)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা)-এর স্বামী বদরের যুদ্ধে যখন বন্দী হইয়া আসিলেন তখন তাহার মুক্তিপণ দেওয়ার মত কোন সম্পদ তাহার হাতে ছিল না। এই সংবাদ পাইয়া হযরত যয়নব (রা) তাঁহার গলার হার খুলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। এই হারটি হযরত খাদীজা (রা) তাঁহার কন্যাকে বিবাহের সময় উপহার দিয়াছিলেন। প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা)-এর স্মৃতি বিজড়িত হারখানার উপর দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী করীম (স)-এর পবিত্র নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি আর্দ্রকণ্ঠে সাহাবীগণকে বলিলেন, যদি তোমরা হারখানা যয়নবকে ফিরাইয়া দাও তবে ভাল হয়। সাহাবীগণ অত্যন্ত আনন্দ মনে হারখানা হযরত যয়নব (রা)-এর নিকট ফেরৎ পঠাইয়া দিলেন (আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ৩৯৬)।

একদিন নবী করীম (স) দাওয়াত খাইতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি হযরত হুসায়ন (রা)-কে খেলায় রত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন; এই অবস্থায় শিশু হুসায়ন (রা) লুকোচুরি খেলার মত কাছে আসিয়া আবার দূরে চলিয়া গেলেন। অতঃপর নবী করীম (স) হাত বাড়াইয়া তাহার কাঁধ এবং চিবুক ধরিয়া ফেলিলেন এবং দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ হুসায়ন আমার এবং আমি হুসায়নের। অনেক সময় নবী করীম (স) তাঁহার মুখ হুসায়নের মুখে লাগাইয়া আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলিতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তাঁহাকে ভালবাসি, তুমিও তাহাদেরকে ভালোবাসিও এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসে তাহাদেরকেও তুমি ভালবাস (আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ৩৯৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার চাচা আবূ তালিবের খান্দানের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি তাঁহার যেই ভালবাসা এবং অনুগ্রহ ছিল উহা তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় রাখিয়াছিলেন। হযরত আলী (রা)-এর জননী হযরত ফাতিমা বিন্ত আসাদ (রা) ইন্তিকাল করিলে নবী করীম (স) স্বীয় জামা খুলিয়া তাঁহাকে পরিধান করান এবং কিছুক্ষণ কবরে অবস্থান করেন। তিনি হযরত আলী (রা)-কে স্বীয় খান্দানের একজন সদস্য করিয়া লইয়াছিলেন। হযরত উম্মু হানী (রা) ও তাঁহার জননীর গৃহে তিনি প্রায়ই গমন করিতেন এবং সেইখানে বিশ্রাম করিতেন। এক

বর্ণনামতে, মি'রাজের রাত্রিতেও তিনি সেইখানে বিশ্রাম করিতেছিলেন। একবার হযরত উম্মু হানী (রা) তাঁহার নিকট আসিলে তিনি 'মারহাবা' বলিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছিলেন (সহীহ বুখারী, ৪খ., পৃ. ১৫৪)।

হযরত জাফর ইব্ন আবী তালিব (রা) কয়েক বৎসর আবিসিনিয়ায় অবস্থানের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) খায়বারের যুদ্ধ হইতে ফিরিতেছিলেন। জা'ফর (রা)-কে দেখিয়া তিনি এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন যে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না খায়বার বিজয়ে অধিক আনন্দিত হইয়াছি, নাকি জা'ফরের প্রত্যাবর্তনে! একবার জা'ফর (রা) সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে আলিংগন করেন এবং তাঁহার ললাটে চুম্বন করেন (সুনান আবূ দাউদ, ৫খ., পৃ. ৩৯২)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার চাচাত ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেন, হে আল্লাহ! তাঁহাকে দীনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান কর (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৪৪৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় দুগ্ধ সম্পর্কীয় মাতা-পিতাকে আপন পিতা-মাতার মত যত্ন করিতেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি যখন যি'ইররানা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দুধপিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বীয় চাদর বিছাইয়া সেইখানে তাঁহাকে সসম্মানে বসাইলেন। সেখানে তাঁহার দুধমাতা (কিংবা অনুরূপ অন্য কোন মহিলা) আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকেও চাদরের অপর কিনারায় বসাইলেন। অতঃপর তাঁহার দুধভাই আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ আসিলে তিনি উঠিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং নিজের স্থানে তাঁহাকে বসাইলেন (সুনান আবূ দাউদ, ৫খ., পৃ. ৩৫৪)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-কুরআনুল করীম; (২) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-জামি'উস-সাহীহ আল-বুখারী, লইডেন (তা. বি.); (৩) মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম কুশায়রী নীশাপুরী, আস-সাহীহ, কায়রো ১৩৩০ হি.; (৪) আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, জামি'উত-তিরমিযী, বুলাক ১২৯১ হি.; (৫) আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশ'আছ সিজিস্তানী, সুনান আবূ দাউদ, দিল্লী ১৩৮৩ হি.; (৬) মাওলানা হাকীম আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস-সিয়ার, মাক্তাবা তাওফিকীয়া; (৭) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নবী, বঙ্গানুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান; (৮) ইসলামী বিশ্বকোষ (সম্পাদনা পরিষদ), হযরত রাসূলে করীম (স) জীবন ও শিক্ষা।

মুফাজ্জল হুসাইন খান

আত্মীয়তা রক্ষায় হযরত মুহাম্মাদ (স)

মানুষে মানুষে ভালবাসা, আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতাবোধ ও পরস্পরের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা একটি সুস্থ, সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ নির্মাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পারস্পরিক দয়িত্ববোধ ও সৌহার্দবিহীন সমাজ নিস্প্রাণ ও রূঢ়। এইরূপ সমাজ শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে বৈষয়িক উন্নতি ও প্রগতির অনন্ত নীলিমায় পৌছাইতে সক্ষম হইলেও তাহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কত যে বেদনাময় ও আনন্দশূন্য হইতে পারে তাহা কোন সচেতন হৃদয়বান ব্যক্তিকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। পৃথিবী জুড়িয়া একটি সুস্থ-সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ও অঙ্গীকারে মানুষ যেমন আদিকাল হইতে কোন ত্রুটি করে নাই, তেমনি বর্তমানেও উহার চেষ্টা-প্রয়াসের শেষ নাই। কিন্তু নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) এই ক্ষেত্রে যেই সাফল্যময় বৈপ্লবিক অবদান রাখিয়াছেন, উহার নজীর আর একটিও নাই।

একটি সুস্থ-সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মাদ (স) যে সকল নিয়ম-নীতি ও বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন, উহার মধ্যে আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ভালবাসা, সম্প্রীতি, তাহাদের যাবতীয় বৈষয়িক ও পরলৌকিক অধিকার আদায় এবং আত্মীয়তার বন্ধনের সযত্ন সংরক্ষণ অন্যতম। এই ক্ষেত্রে তাঁহার এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীদের মাঝে পার্থক্য এই যে, দর্শন উপস্থাপন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বরং মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথাকে নিজের আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিয়া অনুপম আদর্শ হিসাবে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থিত করিয়াছেন। হাদীছ, সীরাত ও অন্যান্য ইসলামী মৌলিক গ্রন্থাদিতে উহার অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে।

আত্মীয়তা রক্ষার অর্থ

আত্মীয়তা রক্ষার অর্থ হইল, আত্মীয়-স্বজনদের যেই সমস্ত হক ও অধিকার রহিয়াছে, তাহা যথাযথ আদায় করা, যথাসাধ্য আত্মীয়-স্বজনদের সর্বপ্রকার কল্যাণ ও উপকার সাধনের চেষ্টা করা এবং যাবতীয় অনিষ্ট, উৎপীড়ন ও যাতনা হইতে তাহাদেরকে মুক্ত রাখিবার প্রচেষ্টা চালানো।

আল্লামা ইব্ন আবী জামরাহ (র) বলেন, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও ঘনিষ্ঠকরণ কয়েক ধরনের হইতে পারে ঃ (১) আত্মীয়-স্বজনদের আর্থিক প্রয়োজন মিটানো; (২) তাহাদের যে কোন সমস্যার সমাধানে আগাইয়া আসা; (৩) তাহাদের যে কোন ক্ষতি ও অনিষ্ট প্রতিহত করা; (৪) তাহাদের সহিত হাসিমুখে অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হওয়া; (৫) তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের সর্ব প্রকার কল্যাণ কামনা করিয়া দু'আ করা; (৬) তাহাদেরকে সদুপদেশ দেওয়া, ধর্ম-কর্মে উৎসাহিত করা।

শর‘ঈ দৃষ্টিতে আত্মীয়তা রক্ষার গুরুত্ব

ইমাম কুরতুবী (র) লিখিয়াছেন ঃ

اتفقت الملّة على ان صلة الرحم واجبة وان قطعها حرمة ۰

"গোটা উম্মত একমত যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজিব, ইহা ছিন্ন করা হারাম" (কুরতুবী, ৫খ., পৃ. ৬)।

আল্লামা কাযী ‘ইয়ায (র) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠাচরণ ওয়াজিব। ইহার পরিপন্থী যে কোন কাজ ও আচরণ কবীরা গুনাহ। তিনি আরও বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কয়েকটি স্তর রহিয়াছে। উহার সর্বনিম্ন স্তর হইল তাহাদের সহিত উঠাবসা ও মেলামেশা ত্যাগ না করা। তাহাদের সহিত অন্তুতপক্ষে কথাবার্তা এমনকি দেখা-সাক্ষাতে সালামের মাধ্যমে হইলেও সদ্ভাব বজায় রাখা (মিরকাত, শরহে মিশকাত, ৯খ., পৃ. ১৯৬, শু‘আবুল ঈমান, টীকা, পৃ. ১১৩)।

হযরত কুলায়ব ইব্ন মানফা‘আ (র) বলেন, আমার আব্বা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য কে ? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার পিতা-মাতা, তোমার ভাই-বোন এবং এতদসঙ্গে তোমার সেই গোলাম যে তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। অতঃপর মহানবী (স) বলিলেন, حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُوْلَةٌ "এইসব হইতেছে ওয়াজিব, অবশ্য পালনীয় হক এবং নিকটাত্মীয়দের সহিত ঘনিষ্ঠাচরণ অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে" (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৩৩)।

আল-কুরআনে আত্মীয়তার গুরুত্ব

আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۰

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে" (৪ ঃ ৩৬)।

উক্ত আয়াতে আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সদ্ব্যবহারের তাকীদ দেওয়া হইয়াছে এবং সদ্ব্যবহার প্রাপ্তি তাহাদের মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ.

"লোকে কি ব্যয় করিবে সে সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করিবে তাহা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য" (২ ঃ ২১৫)।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَائِى ذِى الْقُرْبٰى.

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন" (১৬ ঃ ৯০)।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"অতএব আত্মীয়-স্বজনকে তাহার প্রাপ্য দিও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাহাদের জন্য ইহা শ্রেয় এবং তাহারাই সফলকাম" (৩০ ঃ ৩৮)।

উপরে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, আত্মীয়-স্বজনদের আর্থিক সহযোগিতা করা, তাহাদের অর্থ-সংকট ও অসচ্ছলতা দূরীকরণে আগাইয়া আসা এবং তাহাদের জন্য উদার হস্তে ব্যয় করা আত্মীয়তার সম্পর্কের অন্যতম হক।

মৃত আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মীরাছের অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকা আত্মীয়তার অন্যতম হক। ইহাতে প্রত্যেক আত্মীয়ের শরীয়ত স্বীকৃত হক অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে। নারী হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন অজুহাতে মীরাছের অধিকার হইতে কোন আত্মীয়কে বঞ্চিত রাখা যাইবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا.

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হউক অথবা বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ" (৪ ঃ ৭)।

আল-কুরআনে আত্মীয়তা প্রসঙ্গ

রাসূলে কারীম (স) তাঁহার অসংখ্য বাণীতে আত্মীয়তা রক্ষার ফযীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য, তাহাদের নানাবিধ অধিকার যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠজনের বিভিন্ন দিক ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

১. হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন ঃ

اسرع الخير ثوابا البر والصلة و اسرع الشر عقوبة البغى وقطيعة الرحم.

"শীঘ্র প্রতিদান পাওয়ার মত পুণ্য হইল আনুগত্য ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এবং শীঘ্রতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইল বিদ্রোহ ও আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ" (মুসতাদরাক হাকেম)।

২. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, হে মুসলিমগণ! আল্লাহকে ভয় কর, আত্মীয়তা রক্ষা কর। কেননা আত্মীয়তা রক্ষার ছওয়াবের চাইতে দ্রুততম ছওয়াব প্রাপ্তির আর কোন আমল নাই। তোমরা বিদ্রোহ হইতে সতর্ক থাক, কেননা বিদ্রোহের শাস্তি শীঘ্রই কার্যকর হয়। তোমরা মাতা-পিতার প্রতি অসদাচরণ হইতে সাবধান হও। জানিয়া রাখ, জান্নাতর সুঘ্রাণ হাজার বৎসরের দূরত্ব হইতেও অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু উহা হইতেও বঞ্চিত থাকিবে যাহারা মাতা-পিতার সহিত অসদাচরণকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং অহংকারবশত গোড়ালীর নিচে ঝুলাইয়া কাপড় পরিধানকারী। অথচ শ্রেষ্ঠত্ব তো একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্যই উপযুক্ত (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২২৫)।

৩. হযরত উকবা ইব্ন আমের (র) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছে আত্মীয়তার সম্পর্কের সুষ্ঠু লালন ও সংরক্ষণকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তিনি বলেন, একদা আমি মহানবী (স)-এর হাত ধরিয়া বলিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কি তাহা আমাকে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

يا عقبة صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك.

"হে উকবা! যে তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তাহার সহিত সম্পর্ক বহাল রাখিবে, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাহাকে দান করিবে এবং যে তোমার প্রতি অবিচার করে তুমি তাহাকে মার্জনা করিবে" (মুসতাদরাক হাকেম ৪খ., পৃ. ১৬২)।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করিলেন, তখন রাহিম (رحم = আত্মীয়তার বন্ধন) উঠিয়া দাঁড়াইল। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে বল? সে নিবেদন করিল, আমাকে ছিন্ন করণ হইতে আপনার আশ্রয় চাহিতেছি। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সহিত যে ব্যক্তি সম্পর্ক রক্ষা করিবে আমি তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিব, আর যে ব্যক্তি তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, আমি তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিব? রাহিম বলিল, হাঁ। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এই হাদীছটিতে মূলত আল-কুরআনের এই আয়াতটির মর্মই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ .

"তবে কি তোমরা আধিপত্য লাভ করিলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিবে" (৪৭ ঃ ২২; দ্র. বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৮৫)।

৫. আত্মীয়তা রক্ষার ফলে মানুষের তওবা কবুল হয়। একদা এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি মারাত্মক অপরাধ করিয়াছি। আমার কি তওবার সুযোগ আছে? মহানবী (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাতা জীবিত আছে কি? সাহাবী বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি খালা আছে? সাহাবী বলিলেন, হাঁ। মহানবী (স) বলিলেন, তাহার সহিত সদাচারণ কর, তাহার সেবা-যত্ন কর" (তিরমিযী, ২খ., পৃ. ১২)।

৬. হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম (স) বলিয়াছেন ঃ

الرحم شجنة من الله من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله ·

"রাহিম (আত্মীয়তার বন্ধন) আল্লাহ্‌র নামেরই একটি শাখাবিশেষ। যে উহাকে রক্ষা করিবে আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করিবেন। আর যে উহাকে ছিন্ন করিবে, আল্লাহ তাহাকে ছিন্ন করিবেন" (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৩৬, ৩৯)।

৭. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে (হাদীছে কুদসী) বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আত্মীয়তার বন্ধনকে (রাহিম) সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমার নাম রহমান হইতে উহার নাম নির্গত করিয়াছি। সুতরাং যে উহাকে রক্ষা করিবে, আমি তাহাকে রক্ষা করিব, আর যে উহাকে ছিন্ন করিবে, আমি তাহাকে আমার রহমত হইতে দূরে সরাইয়া দিব (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৩৫)।

৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) বলেন, নবী করীম (স) মদীনায় আগমনের প্রায় সাথেসাথেই আমি তাঁহার খেদমতে হাযির হইলাম। সর্বপ্রথম আমার কর্ণে তাঁহার যে কথাটি প্রবেশ করিল, তাহা হইল ঃ

يايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس ينام فادخلوا الجنة بسلام ·

"হে লোকসকল! তোমরা পরস্পর সালামের আদান-প্রদানের প্রচলন কর, খাদ্যদান কর, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, রাত্রিতে তোমরা সালাত আদায় কর যখন লোকজন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করিবে" (তিরমিযী, ২খ., পৃ. ১০২)।

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অন্তরে ভালবাসা ও অনুরাগ পোষণ করা আত্মীয়তার অন্যতম হক। রাসূলে কারীম (স) তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের প্রতি কী পরিমাণ স্নেহ ও ভালবাসা রাখিতেন তাহা নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান করা যায়।

১. রাসূলে কারীম (স)-এর চাচা এবং তাঁহার দুধভাই হযরত হামযা (রা) উহুদের যুদ্ধে নিমর্মভাবে শাহাদাত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার শাহাদাতের সংবাদ পাইলেন। তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত ও চরমভাবে আহত। তৎক্ষণাত তিনি চাচার লাশের তালাশে বাহির হইয়া গেলেন। দীর্ঘ সময় অনুসন্ধানের পর তিনি দেখিতে পাইলেন, হযরত হামযা (রা)-এর দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া

পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার কর্ণ ও নাসিকা কর্তিত, পেট বিদীর্ণ। কুরায়শ রমণী হিন্দ তাঁহার কলিজা বাহির করিয়া চর্বণ করিয়াছে। চাচার লাশ দেখিয়া মহানবী (স)-এর দুই চোখ হইতে অশ্রুধারা বহিয়া গেল; তাঁহার হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অতিশয় ব্যথিত হইয়া মহানবী (স) বলিলেন, আহ্! তোমার মত নৃশংসভাবে আর কেহই নিহত হয় নাই। অতঃপর নিজের চাদর দ্বারা চাচার লাশ ঢাকিয়া দিলেন এবং লাশকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার উপর আল্লাহ্র রহমতের ধারা বর্ষিত হউক। তুমি ছিলে নেক কাজের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি খুবই আন্তরিক।"

উহুদ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর শহীদদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা এবং আত্মীয়-স্বজন আপনজনকে হারানোর বেদনায় মাতম করিতেছিলেন। তাহাদের ক্রন্দন শুনিয়া মহানবী (স)-এর হৃদয় বেদনায় ভরিয়া গেল। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, সকলের জন্য কাঁদিবার লোক আছে, কিন্তু হামযার জন্য কাঁদিবার কেহ নাই। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করা নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

হযরত হামযা (রা)-এর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (স) কী নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন উহার আরও কিছুটা অনুমান করা যায় মক্কা বিজয়ের পরবর্তী একটি ঘটনা হইতে। হযরত হামযাকে হত্যাকারী হাবশী গোলাম ওয়াহশী মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পর মুসলমান হয়। মহানবী (স) ওয়াহশীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি আমার সামনে আসিও না। তোমাকে দেখিলে আমার চাচা হামযার কথা মনে পড়ে, তখন আমি বিচলিত হইয়া পড়ি" (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৯৯)।

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কন্যা ফাতিমার সন্তান হযরত হাসানকে চুমা দিতেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৮৭)। হযরত ইব্ন উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিয়াছি যে, তিনি আদর করিয়া বলিতেন, হাসান-হুসায়ন হইল আমার দুনিয়ার দুইটি ফুল (বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৮২) মহানবী (স)-এর ভৃত্য হযরত যায়দ ইব্ন হারিছার ছেলে উসামা ইব্ন যায়দ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাঁহার এক রানের উপর এবং হাসানকে অপর রানের উপর বসাইতেন এবং আমাদের উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেনঃ হে আল্লাহ! এই দুইজনকে যাবতীয় অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর। কেননা আমি তাহাদেরকে ভালবাসি (বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৮৮)।

৩. রাসূলে কারীম (স) তাঁহার সন্তান-সন্ততিকে আদর করিয়া চুমা দিতে দিতে গলাগলি করিতেন। তাহাদের ঘ্রাণ লইতেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৮৬)। রাসূলুল্লাহ (স) -এর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রা)-এর মৃত্যুর সময় তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বলিলেন, ইহা কি? আপনি কাঁদিতেছেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহা অন্তরের স্নেহ-মমতা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,

ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى به ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون۔

"চক্ষু অবশ্যই অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, অন্তরও ব্যথায় পূর্ণ হইয়াছে। তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক বাক্য ছাড়া অন্য কিছু আমরা বলিতে পারি না। হে ইবরাহীম! তোমার বিরহে আমরা দুঃখিত" (বুখারী, ১খ., পৃ. ১৭৪)।

৪. একবার মহানবী (স) যয়নব (রা)-এর শিশু কন্যার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলেন। তাঁহার সাথে কতিপয় সাহাবীও গেলেন। তিনি দেখিলেন, শিশু কন্যাটি মরণাপন্ন। রাসূলুল্লাহ (স) শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। শিশুটির তখন মুমূর্ষু অবস্থা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত চলিতেছিল। মহানবী (স)-এর দুই চোখ জুড়িয়া অশ্রু বহিতে শুরু করিল। হযরত সা'দ (রা) তাঁহার খেদমতে আরয করিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, ইহা রহমত। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার যে বান্দার দিলে বর্ষণ করিতে চাহেন, অকাতরে বর্ষণ করেন। আসলে আল্লাহ তাঁহার সদয় ও মমতাশীল বান্দাদের অন্তরেই ইহা বর্ষণ করিয়া থাকেন (বুখারী, ১খ., পৃ. ১৭১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা যয়নব অষ্টম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার লাশ যখন কবরের পার্শ্বে দাফনের জন্য রাখা হইল তখন মহানবী (স)-এর দুই নয়ন অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া গেল (সীরাতুন-নবী, ১খ., পৃ. ৫৪৬)।

৫. রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাতো ভাই হযরত জা'ফার (রা) এবং পালক পুত্র হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) তাঁহার বিশেষ প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। মূতার যুদ্ধে তাঁহারা উভয়ে শহীদ হন। তাঁহাদের শাহাদাতের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তাঁহার দুই নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১১)।

৬. রাসূলে কারীম (সা) তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অত্যন্ত সদাচারী ও ভালবাসাপ্রবণ ছিলেন। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাঁহার এই ঘনিষ্ঠতা ও ভালবাসা কত যে গভীর ও সুবিদিত ছিল উহার বিবরণ পাওয়া যায় হযরত খাদীজা (রা)-এর সেই সান্ত্বনা বাক্যে যাহা তিনি ওহীর সূচনা ক্ষণে ভীতসন্ত্রস্ত স্বামী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার এইরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই। কেননা ঃ

انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم و تقرى الضيف وتعين على نوائب الحق.

"কেননা আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদাচরণ করিয়া থাকেন, পরের দুঃখভার বহন করিয়া থাকেন, আপনি দুঃস্থজনের সেবা করিয়া থাকেন, আপনি অতিথি আপ্যায়ন করিয়া থাকেন, আপনি নিঃস্ব-অসহায় ও বিপন্নদের সাহায্য করিয়া থাকেন (বুখারী, ১খ., পৃ. ২)।

রাসূলে কারীম (স) তাঁহার অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিও অত্যন্ত সদাচারী ছিলেন। তাঁহার আদর্শ মোতাবেক মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজন যদি অমুসলিমও হয়, তথাপি তাহাদের সহিত আত্মীয়তাসুলভ ঘনিষ্ঠ আচরণ করিতে হইবে, সাধ্যমত তাহাদের সেবা-যত্ন করিতে হইবে, তাহাদের পার্থিব হকসমূহ আদায়ে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। হাঁ, দীনের বিপক্ষে তাহাদের কোন কামনা-বাসনা পূরণ করা যাইবে না।

হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) বলেন, আমি রাসূলে কারীম (স)-কে আস্তে নহে বরং আওয়াজ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, অমুক বংশের লোকদের সহিত আমার কোন বন্ধুত্ব নাই। আমার বন্ধু তো হইতেছেন মহান আল্লাহ এবং নেককার মু'মিনগণ। হ্যাঁ, তাহাদের সহিত আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রহিয়াছে। আমি তাহাদের সহিত আত্মীয়তার সদ্ভাব রক্ষা করিয়া যাইব (বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৮৬)। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন, নবী কারীম (স)-এর যমানায় আমার অমুসলিম মাতা আমার নিকট আসিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি কি তাহার সহিত রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ন্যায় সদাচরণ করিতে পারিব? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত ইব্ন 'উয়ায়না (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহারই সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

لاَ يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْآ اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ .

"আল্লাহ তোমাদেরকে এমন লোকদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে এবং ন্যায়ানুগ আচরণ করিতে নিষেধ করেন নাই যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করে নাই। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন" (৬০ ঃ ৮-৯; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ৩১৫)।

অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সদ্ব্যবহার ও ভদ্রোচিত আচরণের কিছু দৃষ্টান্ত

১. রাসূলে কারীম (স) তাঁহার শৈশবে মাতৃদুগ্ধ পানকালে ছুওয়ায়বা নাম্নী এক মহিলার দুধ পান করিয়াছিলেন। উক্ত মহিলা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবূ লাহাবের দাসী। এই ছুওয়ায়বা মুসলমান হন নাই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) আজীবন তাহার প্রতি দুগ্ধপানজনিত আত্মীয়তার সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায়ই তাহার নিকট বস্ত্রাদি ও অন্যান্য সামগ্রী উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করিতেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৭৬৪; আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৬; ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৬৭)।

২. আওতাসের যুদ্ধে মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুধমাতা হযরত হালীমা সা'দিয়ার গোত্র বানূ সা'দের বজাদ নামক এক ব্যক্তিকে স্বপরিবারে বন্দী করিল। বন্দী পরিবারের এক বৃদ্ধা বলিল, আমি তোমাদের পয়গাম্বরের ভগিনী। তোমরা আমাকে বন্দী করিতেছ কেন? বৃদ্ধার এই বক্তব্য শুনিয়া মুসলমানগণ তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির করিলেন। বৃদ্ধা স্বীয় পিঠ খুলিয়া একটি দাগ দেখাইয়া বলিল, এই যে দেখুন! আপনি শৈশবে আমার পিঠে কামড় দিয়াছিলেন। আমি আপনার ভগিনী, হালিমার কন্যা শায়মা। মহানবী (স) দেখিলেন, শৈশবে তিনি যাহার কোলে চড়িয়া বেড়াইতেন, এই বৃদ্ধা সত্য সত্যই সেই শায়মা। শ্রদ্ধেয়া দুধ-ভগ্নির পরিচয় পাইয়া মমতাবশে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাত বসিবার জন্য তাঁহার চাদর বিছাইয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহাকে

উপঢৌকনস্বরূপ কয়েকটি উট ও দাস-দাসী প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে আমার বাড়িতে চলুন। আমি সসম্মানে আপনার খেদমত করিব। আর যদি আপনি নিজ বাড়িতে যাইতে চাহেন তবে আমি আপনাকে সেখানেই পৌঁছাইয়া দিব। তিনি নিজ বাড়িতে ফিরিয়া যাওয়ার মত প্রকাশ করিলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত তাঁহার নিজ বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিলেন (ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ৬৮৯)।

৩. রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুধমাতা হযরত হালীমা সা'দিয়া (রা)-এর গোত্র বানূ সা'দ বস্তুত আরবের ঐতিহাসিক হাওয়াযিন সম্প্রদায়ের একটি শাখা। হাওয়াযিনের যুদ্ধে এই সম্প্রদায়ের প্রায় ছয় হাজার নারী, পুরষ ও শিশু মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। যথারীতি বন্দীদেরকে মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। ইহার প্রায় দুই সপ্তাহ পর যুহায়র ইব্ন সুরাদের নেতৃত্বে সা'দ গোত্রের বারজন লোকের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (স)-এর খিদমতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিনিধি দলটিতে তাঁহার দুধচাচা আবূ বরকানও ছিলেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে সকল বন্দীর মুক্তি দাবি করিল। দলপতি যুহায়র বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাওয়াযিন গোত্র আজ মহাবিপদে আছে। আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। দয়া করিয়া আমাদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-কন্যাদেরকে আমাদের নিকট ফেরত দিন। এই বন্দীদের মধ্যে আপনার ফুফু, খালা এবং এমন অনেক মহিলাও আছেন যাহারা শৈশবে আপনাকে কোলে লইয়া আদর চুম্বন করিয়াছেন। আত্মীয়তার এই পরিচয় শুনিয়া রাসূলে কারীম (স)-এর মন বিগলিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'দেখ, গনীমত কেবল আমার নহে, ইহা মুজাহিদদের প্রাপ্য। তবে যে সমস্ত বন্দী আমার ও আমার বংশ বানূ আবদুল মুত্তালিব-এর প্রাপ্য, তাহাদেরকে আমি মুক্তি দিলাম। আর অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তির জন্য আমি মুসলমানদের নিকট সুপারিশ করিব।'

যুহরের নামাযের সময় মহানবী (স) সাহাবীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মুসলিমগণ! আমার ও আমার বংশ বানূ আবদুল মুত্তালিবের সকল বন্দীকে আমি মুক্ত করিয়া দিলাম। আর সকল মুসলমানের নিকট আমি তাহাদের প্রাপ্য নিজ নিজ বন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘোষণা শুনিয়া সকল আনসার ও মুহাজির একবাক্যে তাহাদের প্রাপ্ত সকল বন্দীকে মুক্তির ঘোষণা দিলেন। মহানবী (স) তাঁহাদের এই কুরবানীর জন্য খুশী হইয়া ঘোষণা করিলেন, "ইহার পর যখনই কোন যুদ্ধ-বন্দী আমার হাতে আসিবে, আমি সর্বপ্রথম তোমাদেরকে একটির বিনিময়ে চারটি বন্দী দান করিব। আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে রাসূলে কারীম (স) তাহাদের ছয় হাজার বন্দীকে মুক্তি দিয়াছিলেন। অথচ তাহারা ছিল অমুসলিম এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহত্ত্ব ও উদারতা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতিনিধি দলের সকলেই মুসলমান হইয়া গেলেন (ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৪৮৯; যাদুল-মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৪৭৫)

৪. বনূ মুস্তালিকের সহিত কুরায়শদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে রাসূলে কারীম (স)-এর সহিতও তাহাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। পঞ্চম হিজরীতে কুরায়শদের প্ররোচনায় বানূ মুস্তালিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মহানবী (স) এই

সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদের প্রতিরোধের জন্য একদল সৈন্যসহ বানূ মুস্তালিকের আবাসিক এলাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। প্রায় ছয় শত নারী, শিশু ও পুরুষ মুসলমানদের নিকট বন্দী হইল। যুদ্ধের পর মদীনায় ফিরিয়া বন্দীদেরকে যথারীতি মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোমল হৃদয় আত্মীয়-গোত্রকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। বন্দীদের মধ্যে মুস্তালিক গোত্রের সর্দার হারিছের কন্যা বাররাও ছিলেন। তিনি হযরত ছাবিত ইব্ন কায়সের ভাগে পড়িলে মহানবী (স) ছাবিতের নিকট হইতে তাহাকে চড়ামূল্যে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দিলেন। বাররা ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া জুওয়ায়রিয়া রাখিলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। মদীনায় যখন প্রচারিত হইল যে, রাসূলুল্লাহ (স) হারিছের কন্যা জুওয়ায়রিয়াকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন মুসলমানগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এখন তো জুওয়ায়রিয়া উম্মুল মু'মিনীন-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। ফলে মুস্তালিক গোত্র হইল রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্বশুরকুল। কাজেই তাহাদেরকে গোলাম-বাঁদী বানাইয়া রাখা আমাদের জন্য কিছুতেই শোভা পায় না। এই আলোচনার পর কালবিলম্ব না করিয়া মুসলমানগণ মুস্তালিক গোত্রের সকল বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলেন, গোত্রের আটককৃত সমস্ত সম্পদ ফেরত দিলেন এবং তাহাদেরকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করিলেন। বন্দীগণ মুসলমানদের আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়া অভিভূত হইল এবং সকলেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল (ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ২৮৯-২৯০)

৫. বদরের যুদ্ধে যে সমস্ত কাফির ও মুশরিক মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই মহানবীর নিজ বংশীয় আত্মীয়-স্বজন অথবা কোন না কোন মুহাজির সাহাবীর ঘনিষ্ঠ ছিল। রাসূলে কারীম (স) মদীনায় পৌঁছিয়া বন্দীদেরকে সেবাযত্ন করিবার জন্য সাহাবায়ে কিরামের মাঝে বণ্টন করিয়া দিলেন এবং যত্নের সহিত তাহাদের মেহমানদারী করিতে আদেশ দিলেন। মদীনায় তখন অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান ছিল। তথাপি সাহাবীগণ তাহাদের পরম শত্রু আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যেই সদাচার ও আদর্শ ব্যবহার দেখাইলেন ইতিহাসে উহার নজীর বিরল। হযরত মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-এর ভাই আবূ আযীয বলেন, আমি যেই সাহাবীর গৃহে বন্দী ছিলাম তাহারা সকাল-বিকাল আহারের জন্য আমাকে রুটি দিতেন আর তাঁহারা শুধু খেজুর খাইয়া থাকিতেন। আমি লজ্জিত হইয়া অনেক সময় খেজুর খাওয়ার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাঁহারা রুটি গ্রহণ করিতেন না বরং আমাকেই রুটি খাইতে বাধ্য করিতেন (ইব্ন কাছীর, আসা-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৪৭৫)।

৬. বদরের বন্দীদের মধ্যে হযরত যয়নব (রা)-র স্বামী আবুল আসও ছিল। সে তখনও মুশরিক ছিল। বন্দীদের ব্যাপারে সকলের পরামর্শে রাসূলে কারীম (স) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদেরকে মুক্ত করা হইবে। কিন্তু আবুল-আসের মুক্তিপণ আদায়ের সামর্থ ছিল না। অগত্যা তাহার স্ত্রী হযরত যয়নব (রা) তাহাকে মুক্ত করার জন্য নিজের গলার হার রাসূলে কারীম (স)-এর দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। এই হারটি তাঁহার বিবাহের সময় হযরত খাদীজা (রা) তাঁহাকে উপহার দিয়া ছিলেন। রাসূলে কারীম (স)-এর খিদমতে হারখানা

পেশ করা হইলে তাঁহার অন্তর স্নেহ-মমতায় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি সাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা যদি সকলে সম্মত হও তবে যয়নবের এই হারখানা যয়নবকে ফেরত দিতে পার এবং দরিদ্র আবুল আসকে বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করিয়া দিতে পার। সাহাবীগণ (রা) সকলেই ইহাতে একমত হইলেন (ইব্ন হিশাম, আসা-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৬৫১)।

৭. বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাসূলে কারীম (স)-এর চাচা হযরত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। তিনি তখনও মুশরিক ছিলেন। যখন তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনা হইল তখন হইতেই তাঁহার মমতায় রাসূল কারীম (স)-এর মন অস্থির হইয়া উঠিল। একদিন রাত্রিকালে আব্বাস তাঁহার আঁটানো বাঁধনের যন্ত্রণায় কাতরাইতেছিলেন। তাঁহার এই অবস্থা উপলব্ধি করিতে পরিয়া রাসূলুল্লাহ(সা)-এর নিদ্রা আসিতেছিল না। তিনিও অস্থির হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক ছটফট করিতেছিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া জনৈক সাহাবী আব্বাসের বাঁধন ঢিলা করিয়া দিলেন। যেহেতু আত্মীয়তার কারণে সম-অপরাধীদের শাস্তি কমাইয়া দেওয়া ইসলামের বিধান বহির্ভূত, এইজন্য মহানবী (স) বলিলেন, তোমরা সকল বন্দীর বাঁধনই ঢিলা করিয়া দাও (সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ৩৩৩)।

৮. রাসূলে কারীম (স) ধর্ম ও বর্ণের ভেদাভেদ না করিয়া সকল আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার ও ঘনিষ্ঠ আচরণ করিতেন এবং তাঁহার অনুসারীদেরকে ইহার নির্দেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার এই সময়ে অন্যতম শত্রু কুরায়শ সরদার আবূ সুফ্য়ানের মুখে ইহার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ৭ম হিজরীতে তিনি রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস-এর দরবারে বক্তৃতা করেন। পারস্য-সম্রাট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মুহাম্মাদ তোমাদেরকে কি শিক্ষা দেন? আবূ সুফয়ান বলিলেন, তিনি আমাদের শিক্ষা দেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। কাহাকেও তাঁহার সমকক্ষ মনে করিও না। তোমরা নামায পড়, সত্য কথা বল, চরিত্রবান হও এবং সদ্ব্যবহার দ্বারা আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় রাখ (বুখারী, ১খ., পৃ. ৪)।

আত্মীয়-স্বজন যদি অন্যায়-অবিচার এবং যুলুমও করে, তথাপি তাহাদের সহিত রাসূলে করীম (স) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ভদ্রোচিত আচরণ করিতেন। তিনি বলিতেনঃ

ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها.

"প্রতিদানে আত্মীয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণকারী প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নহে; বরং প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হইতেছে ঐ ব্যক্তি যাহাকে ছিন্ন করিয়া দিলেও এবং দূরে ঠেলিয়া দিলেও সে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৮৬)।

হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন, একদা মহানবী (স) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে উবাদা! আমি তোমাকে এমন একটি বিষয় বলিয়া দিব কি যাহা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করিবে? আমি বলিলাম, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! তিনি বলিলেন, যে তোমার সহিত অসদারচণ করিবে, তুমি তাহার প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবে। যে তোমার প্রতি অবিচার করিবে, তুমি তাহাকে মার্জনা করিবে। যে তোমাকে বঞ্চিত করিবে, তুমি তাহাকে দান করিবে (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৩৩)।

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন তাঁহাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া তাঁহাদের হাতে বন্দী হইত, তাহাদেরকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার জন্য মহানবী (স) সাহাবাগণকে উদ্বুদ্ধ করিতেন।

হযরত আনাস (রা) বলেন, মদীনায় আনসারদের মধ্যে খেজুর সম্পদে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবূ তালহা (রা)। মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তাঁহার 'বিরে হা' নামক একটি বাগান ছিল। বাগানে একটি মিঠা পানির কূপও ছিল। বাগানটি ছিল হযরত আবূ তালহার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। মহানবী (সা) কখনও কখনও বাগানে যাইতেন এবং এখানকার মিঠা পানি পান করিতেন। যখন কুরআন শরীফে আয়াত নাযিল হইল ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ـ

"কস্মিন কালেও তোমরা কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু হইতে ব্যয় না কর" (৩ ঃ ৯২) তখন এই আয়াত শুনিয়া হযরত আবূ তালহা মহানবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন প্রিয় বস্তু দান করিতে। 'বিরে হা' বাগানটি আমার সবচেয়ে প্রিয়। কাজেই আমি উহা আল্লাহর পথে সাদাকা করিতে চাই। অতএব আপনি আমার এই বাগান গ্রহণ করুন এবং আপনার যেইভাবে খুশী খরচ করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ ইহা তো তোমার বড় লাভজনক সম্পদ। তুমি যাহা করিয়াছ তাহা আমি শুনিয়াছি। আমার পরামর্শ এই যে, তুমি উহা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও। আবূ তালহা বলিলেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন আমি তাহাই করিব। অতঃপর তিনি বাগানটি তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৫৪)।

একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা) তাঁহার একটি বাঁদীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। পরে নবী কারীম (স)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, তুমি যদি বাঁদীটি তোমার মামাকে দিয়া দিতে তাহা হইলে অধিক পুণ্য লাভ করিতে পারিতে (মিশকাত, পৃ. ১৭১)।

এই হাদীছে লক্ষণীয় যে, ইসলামে দাস-দাসী আযাদ করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে এবং ইহাকে অতীব পুণ্যের কাজ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনকে উপহার-উপঢৌকন প্রদানকে উহার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক নেকীর কাজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আত্মীয়তা সম্পর্ক সুদৃঢ় করার কত যে গুরুত্ব ছিল উহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

রাসূলে কারীম (স) আত্মীয়-স্বজনের সহিত আর্থিক সহযোগিতাকে সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠতম অনুদান বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, চারটি দীনারের একটি তুমি কোন নিঃস্বকে দান করিয়াছ, একটি দ্বারা গোলাম আযাদ করিয়াছ, একটি আল্লাহর পথে তথা জিহাদে দান করিয়াছ এবং একটি তুমি তোমার আপনজনদের জন্য-খরচ করিয়াছ। তন্মধ্যে যেই দীনারটি তুমি তোমার আপনজনদের জন্য খরচ করিয়াছ উহাই সর্বোত্তম (মুসলিম, ১খ., পৃ. ৩২২)। হযরত ছাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, সর্বোত্তম দীনার হইতেছে উহা যাহা কোন ব্যক্তি তাহার আপনজনদের জন্য ব্যয় করিয়া থাকে (মুসলিম, ১খ., পৃ. ৩২২)।

আর্থিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিকটাত্মীয় দূরাত্মীয়ের চেয়ে অগ্রাধিকার পাইবে। হযরত ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি যাহা তাহার নিজের জন্য ও নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য পুণ্য লাভের আশায় ব্যয় করিবে, সে তাহার প্রতিটি দানের জন্যই আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাইবে। সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে ব্যয় করা আরম্ভ করিবে, অতঃপর অবশিষ্ট থাকিলে পরবর্তী ঘনিষ্ঠজনকে প্রদান করিবে, তৎপর অবশিষ্ট থাকিলে হস্ত আরও সম্প্রসারিত করিবে (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৩৮)।

রাসূলে কারীম (স) মাঝে মাঝে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের সহিত সৌজন্য-মূলক সাক্ষাত করিতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী কারীম (স) ছিলেন তাঁহার পরিবার ও আপনজনের প্রতি সর্বাধিক দয়া ও ভালবাসাপ্রবণ। তাঁহার এক পুত্র হযরত ইবরাহীম মদীনার এক প্রান্তে এমন এক মহিলার দুগ্ধপোষ্য ছিলেন যাহার স্বামী ছিল কর্মকার। আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে প্রায়ই সেখানে যাইতাম। সেই মহিলার ঘরটি ধোঁয়া দ্বারা সব সময় পূর্ণ থাকিত। মহানবী (স) তাঁহার পুত্রকে চুম্বন করিতেন, নাক লাগাইয়া আদর করিতেন (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১৩৭)।

রাসূলে কারীম (সা)-এর নয়জন স্ত্রী একই সময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের মধ্যে দিন ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি তিনি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের সকলের সহিত সৌজন্য সাক্ষাতের উদ্দেশে তাঁহাদের সকলের বাসগৃহে পৃথক পৃথকভাবে গমন করিতেন। তিনি এই সৌজন্য সাক্ষাতে প্রত্যেকের নিকট কিছু সময় অবস্থান করিতেন এবং তাঁহাদের খোঁজ-খবর লইতেন (আবূ দাঊদ, পৃ. ২৯০)।

রাসূলে কারীম (স) তাঁহার সাহাবীগণকেও তাঁহাদের নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের সহিত সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হইবার জন্য একাধিক হাদীছে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। তিনি সাহাবী হযরত আবূ রুযায়ন (রা)-কে বলেন, হে আবূ রুযায়ন। তুমি জান কি, যখন কোন ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশে ঘর হইতে বাহির হয় তখন সত্তরজন ফেরেশতা তাহাকে অভ্যর্থনা প্রদান করেন এবং তাহার জন্য দু'আ করেন? ফেরেশতাগণ বলেন, হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা তোমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখিতেছে, তুমিও তাহার সহিত তোমার সম্পর্ক অটুট রাখ। হে আবূ রুযায়ন! তুমি নিজেকে এই আমলের উপর যথাসম্ভব বহাল রাখ (মিশকাত, পৃ. ৪২৭)।

অপর একটি হাদীছে মহানবী (স) ইরশাদ করেন ঃ এক ব্যক্তি তাহার এক ভাইয়ের সহিত সাক্ষাত করার উদ্দেশে গ্রামে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পথে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করিলেন। ফেরেশতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? সেই ব্যক্তি বলিল, ঐ গ্রামে আমার একজন ভাই আছেন, তাহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশে যাইতেছি। ফেরেশতা বলিলেন ঃ আপনার উপর তাহার কি এমন কোন অবদান আছে যাহার জন্য আপনি যাইতেছেন? সেই ব্যক্তি বলিল, না, আমি তাহাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসি। ফেরেশতা তখন স্বীয় পরিচয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি। আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিতেছেন যে, তিনি আপনাকে

ঠিক সেইরূপ ভালবাসিবেন যেইরূপ আপনি ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসিয়াছেন (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১২৮)।

অপর একটি হাদীছে আসিয়াছে, আল্লাহ তা'আলা সাক্ষাৎকারীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, তুমি তোমার স্থান জান্নাতে নির্ধারণ করিয়া লইয়াছ (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১২৬-১২৭)।

সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে একটি হইল, কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহাকে দেখিতে যাওয়া। রাসূলে কারীম (স) তাঁহার অসুস্থ আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে যাইতেন। একবার তাঁহার এক কন্যার মুমূর্ষু অবস্থার সংবাদ শুনিয়া তিনি বেশ কয়েকজন সাহাবীসহ কন্যার বাড়িতে গমন করেন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-ও তাঁহার সাথে ছিলেন। মহানবী (স) মুমূর্ষু শিশুটিকে তুলিয়া কোলে নেন। তাহার বুকে তখন পুরাতন মশকের আওয়াযের মত ধুক ধুক আওয়ায হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর চক্ষু যুগল অশ্রু সজল হইয়া উঠিল। হযরত সা'দ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি? আল্লাহর রাসূল হইয়াও আপনি কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি তাহার প্রতি মমতাপরবশ হইয়া কাঁদিতেছি। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের মধ্যে দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারীদের প্রতি দয়া করেন (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১৭৮-১৭৯)।

মহানবী (স)-এর নিকট কোন আত্মীয়ের অসুস্থতার সংবাদ পৌছিলে তাহার খোঁজ-খবর লওয়ার জন্য মাঝে মাঝে পরিবারস্থ আপনজনদেরকেও পাঠাইতেন। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, তাঁহার মদীনায় আগমনের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত বেলাল (রা)-এর জ্বর হইল। আমি তাঁহার নির্দেশে তাঁহাদের খোঁজ-খবর লইবার জন্য তাঁহাদের বাড়িতে গমন করিলাম এবং তাঁহাদের অসুস্থতার খোঁজ-খবর লইয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং তাঁহাকে অবহিত করিলাম (আল-আদাবুল মুফরাদ, সংক্ষেপিত, পৃ. ১৮৪)।

রাসূলে কারীম (স) অসুস্থ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর রাখিবার জন্য সর্বদা সাহাবায়ে কিরামকে তাকীদ করিতেন। তিনি ইরশাদ করেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহা কি হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলিলেন, তাহা হইল—(১) যখন তুমি কোন মুসলমানের সাক্ষাত পাও তখন তাহাকে সালাম কর; (২) যখন কোন মুসলমান তোমাকে ডাকে তখন তুমি তাহার ডাকে সাড়া দাও; (৩) যখন সে তোমার নিকট পরামর্শ চাহে তখন তাহাকে সুপরামর্শ দিবে, (৪) যখন সে হাঁচি দেয় এবং আলহামদু লিল্লাহ বলে তখন তুমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বল; (৫) যখন সে অসুস্থ হইয়া পড়ে তখন তুমি তাহার খোঁজ-খবর লও এবং (৬) যখন তাহার মৃত্যু হয় তখন তাহার জানাযায় শরীক হও (সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ২১৩)।

আত্মীয়-স্বজনদের আগমনে, তাহাদের সাক্ষাতে ভালবাসা ও আনন্দ প্রকাশ করা এবং তাহাদেরকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানানো আত্মীয়তার হকসমূহের অন্যতম। রাসূলে কারীম (সা) তাঁহার আপনজনদের আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন এবং তাহাদেরকে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভ্যর্থনা জানাইতেন। তাঁহার মুবারক জীবনে ইহার অগণিত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যেমন—

১. হযরত 'আইশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হাঁটার পদ্ধতি ছিল মহানবী (স)-এর হাঁটার অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, মারহাবা, মারহাবা, কন্যা আমার! অতঃপর তাঁহাকে স্বীয় ডান পার্শ্বে অথবা বাম পার্শ্বে বসাইলেন (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৩৪৫)।

২. হযরত হালীমা সা'দিয়া (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুধমাতা। তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। নবূওয়াত প্রাপ্তির পর হযরত হালীমা একবার মক্কা শরীফে তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে আম্মাজান বলিয়া জড়াইয়া ধরিলেন (শারহুল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৬৬)।

৩. হযরত জা'ফার (রা) মহানবী (স)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাবশায় হিজরত করেন। খায়বার বিজয়ের পর মহানবী (স) যখন খায়বার প্রান্তর হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি লইতেছিলেন তখন তিনি হাবশা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত জা'ফারের সাক্ষাৎ পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ললাটে চুম্বন করিলেন। তিনি আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন, আমি জানি না, খায়বার বিজয়ে অধিক আনন্দিত হইলাম, না জা'ফারের আগমনে (যাদুল- মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৩৯)।

রাসূলে কারীম (স)-এর শুধু আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও তাহাদের হক আদায় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও তাহাদের আপনজন ও প্রতিবেশীদের প্রতিও সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

হযরত আনাস (রা) বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে কোথাও হইতে কোন হাদিয়া আসিত তখন তিনি প্রায়ই বলিতেন, অমুক মহিলাকে ইহা দিয়া আস। কেননা সে খাদীজার বান্ধবী ছিল। যাও, ইহা অমুক গোত্রের অমুক মহিলাকে পৌঁছাইয়া দাও। কেননা সে খাদীজাকে ভালবাসিত (আল-মুসতাদরাক, ৪খ., পৃ. ১৭৫)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, খাদীজার উপর আমার যতটা ঈর্ষা হইত ততটা ঈর্ষা আর কাহারও উপর হইত না, অথচ আমার বিবাহের তিন বৎসর পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। আমার ঈর্ষার কারণ এই যে, আমি নবী কারীম (স)-কে প্রায়শ তাঁহার কথা স্মরণ করিতে শুনিতাম। তিনি বলিতেন, আল্লাহ তাঁহাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন যে, তিনি যেন খাদীজাকে জান্নাতে একটি হীরা বা মোতির মহলের সুখবর প্রদান করেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) যখনই বকরী যবেহ করিতেন তখন উহার কিছু অংশ খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদেরকে হাদিয়া পাঠাইতেন। (বুখারী, ১খ., পৃ. ৫৩৮)।

হযরত আবূ বুরদা (রা) বলেন, আমি যখন মদীনায় আসিলাম তখন ইব্‌ন উমার (রা) আমার বাড়িতে আসিলেন। তিনি বলিলেন, জান কেন আমি তোমার বাড়িতে আসিয়াছি? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, কোন ব্যক্তি যদি

তাহার কবরস্থ পিতার সহিত উত্তম আচরণ করিতে মনস্থ করে তবে তাহার উচিৎ পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ করা। আবূ বুরদা! আমার পিতা ও তোমার পিতার মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব ছিল। আমি সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছি (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২২২)।

একদা জনৈক বেদুঈনের সহিত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-এর সাক্ষাৎ হইল। সেই বেদুঈনের পিতা ও তাঁহার পিতা হযরত উমার (রা)-এর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। হযরত ইব্ন উমার একটি গাধা এবং তাঁহার নিজ শিরস্ত্রাণ খুলিয়া বেদুঈনকে দান করিলেন। ইব্ন উমারের সফরসঙ্গী জনৈক ব্যক্তি বলিল, আরে ভাই! ইহাকে দুইটি দিরহাম দিলেই কি যথেষ্ট ছিল না? ইব্ন উমার বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, পিতার বন্ধুত্বকে অটুট রাখ, উহাকে ছিন্ন করিও না নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমার (ঈমানের) আলো নির্বাপিত করিয়া দিবেন (মুসলিম, ২খ., পৃ. ৩১৪)।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম, কবীরা গুনাহ। রাসূলে কারীম (স) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করিব না? সাহাবীগণ বলিলেন, হ্যাঁ অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র সহিত শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ করা। এই সময় তিনি হেলান দিয়া বসা ছিলেন। অতঃপর উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, শুনিয়া লও, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। এই কথাটি তিনি একাধারে বলিয়া যাইতেছিলেন (বুখারী, ১খ., পৃ. ৩৬২)। মহানবী (স) ইরশাদ করেন ঃ

تفتح ابواب الجنة ليوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيأ إلا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا ٠

"প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হয় এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মার্জনা করা হয় যে আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে মার্জনা করা হয় না যাহার অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের সহিত ঝগড়া-বিবাদ রহিয়াছে। তাহাদের দুইজনের সম্পর্কে বলা হয়, তাহাদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের ব্যাপার স্থগিত রাখ (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১৪৮)।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, তাবেয়ী হযরত আবূ আয়্যূব সুলায়মান বলেন, কোন এক বৃহস্পতিবার হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আমার বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা আসিলেন এবং বলিলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনকারীকে আমি ভালবাসি না, এমন কেহ এই মজলিসে থাকিলে সে যেন উঠিয়া যায়। তিনি তিনবার এই কথা বলিলেন। তখন এক যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার ফুফুর বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইল। যুবকটি তাহার এই ফুফুর সহিত দুই বৎসর যাবত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ফুফু তাহাকে দেখিয়া বলিল, ভ্রাতষ্পুত্র! তুমি হঠাৎ কি মনে করিয়া? যুবক বলিল, আমি হযরত আবূ হুরায়রাকে এমন এমন বলিতে শুনিয়াছি। ফুফু বলিল, আচ্ছা, তুমি পুনরায় আবূ হুরায়রার কাছে যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে, তিনি কি কারণে এরূপ বলিলেন? জবাবে আবূ হুরায়রা বলিলেন, আমি রাসূলে কারীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আদম সন্তানের আমলসমূহ প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত

রজনীতে আল্লাহর সমীপে পেশ করা হয়, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল গৃহীত হয় না (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২২৪)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন, আসমানের দরজাসমূহ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনকারীর সামনে বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার দু'আ কবুল হয় না (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৩৪)।

অপর একটি হাদীছে মহানবী (স) ইরশাদ করেন ঃ

لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع باثم او قطيعة رحم.

"বান্দার সকল দু'আই কবুল হয় যতক্ষণ না সে কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন দু'আ করে" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ৩৫২)।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা মার্জনা করেন না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, আজ শা'বানের পনরতম রজনী। এই রজনীতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দিয়া থাকেন কাল্‌ব গোত্রের মেষপালের পশমের সমপরিমাণ সংখ্যা। তবে এই রজনীতেও কতিপয় বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টি দেন না। যথা ঃ মুশরিক, হিংসুক, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, পায়ের গোছার নীচে কাপড় পরিধানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য ও মদ্যপ ব্যক্তি (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৩৩)।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধ এতই গুরুতর ও অমার্জনীয় পাপ যে, উহার শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই কার্যকর করিয়া থাকেন। রাসূলে কারীম (স) বলেন,

كل ذنوب يؤخرالله منها ماشاء الى يوم القيامة الا البغى وعقوق الوالدين اوقطيعة رحم يعجل لصاحبها فى الدنيا قبل الموت.

"যে কোন গুনাহের শাস্তি আল্লাহ যদি চাহেন কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করিয়া থাকেন। তবে বিদ্রোহ, মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার অপরাধ এমন পর্যায়ের যে, উহার শাস্তি আল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই কার্যকর করিয়া থাকেন" (ইবন কাছীর, তাফসীর, ৪খ., পৃ. ১৬১)।

রাসূলে কারীম (স) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর নানাবিধ পার্থিব শাস্তির কথা তাহার বাণীতে বিবৃত করিয়াছেন। এখানে কয়েকটি বাণী পেশ করা হইল ঃ

১. হযরত ইব্ন আবী আওফা (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আজ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কোন ব্যক্তি যেন আমাদের মজলিসে না বসে। কথা শ্রবণে জনৈক যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার খালার কাছে গেল। যুবকটির তাহার খালার সহিত কিছু মনোমালিন্য ছিল। সে তাহার খালার নিকট ক্ষমা চাহিল। খালা বলিল, রাসূলুল্লাহ (স) কেন এমন কথা বলিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিও। যুবক রাসূলুল্লাহ (স)- কে ইহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাবে বলিলেন,

ان الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم ·

"যে সম্প্রদায়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কোন ব্যক্তি থাকে তাহাদের উপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় না।"

এই হাদীছে রহমত নাযিল না হওয়ার অর্থ হইল অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া অর্থাৎ আত্মীয়তা ছিন্নকারীর কারণে যমিনে রহমতের বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায় (ফয়যুল কালাম, পৃ. ৪০৩)।

২. হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (স) বলিয়াছেন, এই উম্মতের একদল লোক খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ-স্ফূর্তির মধ্যে রাত্রিতে ঘুমাইতে যাইবে, কিন্তু প্রভাতে তাহাদের দেহাকৃতি বানর ও শূকরের রূপ ধারণ করিবে। ইহা হইবে তাহাদের মদ্যপান, রেশমী পোশাক পরিধান, গায়িকাদের প্রতি আসক্তি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধে (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৩৩)।

৩. রাসূলে কারীম (স) বলেন, আরশের একটি খুঁটিতে মোহর লটকানো আছে। যখন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয় অথবা কোন নাফরমানী করা হয় এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে দুঃসাহসিকতা প্রদর্শিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা সেই মোহর প্রেরণ করেন এবং অপরাধীর কলবের উপর মোহর মারিয়া দেন।

রাসূলে কারীম (স) বলেন ঃ

لا يدخل الجنة قاطعة ·

"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৮৫)।

১. আত্মীয়তা রক্ষায় জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পায়। রাসূলে কারীম (স) বলেন ঃ

من سره ان يبسط له فى رزقه وان ينسا له فى اثره فليصل رحمه ·

"যে ব্যক্তি চাহে যে, তাহার জীবিকা প্রশস্ত হউক এবং তাহার আয়ু বৃদ্ধি হউক, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদাচরণ করে" (বুখারী, ২খ, পৃ. ৮৮৫)।

২. আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ভাবের ফলে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। রাসূলে কারীম (স) বলেন, যে বক্তি তাহার প্রতিপালককে ভয় করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে তাহার আয়ু বৃদ্ধি করা হয়, তাহার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তাহার পরিবার-পরিজন তাহাকে ভালবাসে (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৩৭)।

৩. আত্মীয়তা রক্ষায় দু'আ কবুল হয়। রাসূলে কারীম (স) বলেন, তিন ব্যক্তি কোথাও যাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টিপাত হইলে তাহারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় লইল। তখন পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড গুহার মুখে আসিয়া পড়িল। ফলে গুহার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা ভিতরে আটকা পড়িয়া রহিল। অবশেষে তাহারা একজন অপরজনকে বলিতে লাগিল, তুমি খাস আল্লাহ্র উদ্দেশে যে সমস্ত নেক আমল করিয়াছ সে সমস্ত নেক আমলের উসীলায় আল্লাহর নিকট দু'আ কর। হয়ত আল্লাহ তা'আলা পাথরটি সরাইয়া দিতে পারেন।

তাহাদের একজন বলিল, হে আল্লাহ! তুমি জান, আমার মাতা-পিতা অতি বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েও ছিল। আমি তাহাদের জন্য পশু চরাইতাম। সন্ধ্যায় যখন ফিরিয়া আসিতাম ঐ পশুগুলি দোহন করিতাম এবং নিজের ছেলেমেয়েদের আগে মাতা-পিতাকে দুধ পান করিতে দিতাম। একদিন বনের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত আমি পশুগুলি চরাইতে লইয়া গেলাম। ফিরিয়া আসিতে আমার রাত্র হইয়া গেল। দেখিলাম, মাতা-পিতা দুইজনই ঘুমাইয়া আছেন। আমি যথারীতি দুধ দোহন করিলাম এবং দুধ লইয়া তাঁহাদের শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাঁহাদেরকে ঘুম হইতে জাগ্রত করাও ভাল মনে করিলাম না, আবার তাঁহাদের আগে ছেলেমেয়েদেরকে পান করাইতেও মন চাহিতেছিল না, অথচ ছেলেমেয়েরা আমার পায়ের কাছে আসিয়া কান্নাকাটি ও চেঁচামেচি করিতেছিল। ভোর পর্যন্ত আমার ও আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অবস্থা বিরাজ করিতেছিল। হে আল্লাহ! যদি আমি ইহা শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই পাথরটি সরাইয়া দাও যাহাতে আমরা আকাশ দেখিতে পাই। তখন আল্লাহ তা'আলা পাথরটি সামান্য সরাইয়া দিলেন, অবশেষে তাহারা আকাশ দেখিতে পাইল (বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৮৩)।

৪. আত্মীয়তা রক্ষার অন্যতম পার্থিব পুরস্কার এই যে, ইহার প্রতিদানে আত্মীয়তা রক্ষাকারীর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও তাহার সহিত সদাচরণ করে এবং তাহার প্রাপ্য হকসমূহ আদায় করে।

৫. আত্মীয়তা রক্ষার কল্যাণে পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। মহানবী (স) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন কোন কওমের আবাসনকে আবাদ রাখেন এবং তাহাদের ফল-ফসলাদির উৎপাদন বাড়াইয়া দেন, অথচ তিনি তাহাদের প্রতি তাহাদের দুনিয়াতে আগমন কাল হইতে এই পর্যন্ত একটি বারের জন্যও সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে তাকান নাই। কারণ তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষুব্ধ। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহা সম্ভব হইল কি করিয়া? তিনি বলিলেন, ইহা তাহাদের আত্মীয়তা রক্ষার কল্যাণে (আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২২৮)।

পার্থিব জগতে আত্মীয়তা রক্ষার প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা পরকালে জান্নাত দান করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন ঃ তিনটি জিনিস এমন যাহা কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে তাহার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সহজভাবে লইবেন এবং তাঁহার নিজ রহমতে তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহা কি হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বলিলেন, যে তোমাকে বঞ্চিত করিবে তুমি তাহাকে দান করিবে। যে তোমার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, তুমি তাহার সহিত তাহা যুক্ত রাখিবে বা সদাচরণ করিবে। যে তোমার প্রতি অবিচার করিবে তুমি তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবে। যদি তুমি ইহা করিতে পার তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৩১)।

যদি কখনও কোন কারণে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় তখন তাহা দ্রুত নিষ্পত্তি করিয়া লওয়া উভয় পক্ষেরই দায়িত্ব। যদি তাহারা নিজেরা ইহার নিষ্পত্তিতে সক্ষম না

হয় তখন সমাজের অন্যদেরও কর্তব্য হইয়া যায় দ্রুত তাহাদের মাঝে উহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া ও তাহাদের মধ্যে পুনঃ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেওয়া।

রাসূলে কারীম (স) আপনজনকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসিতেন। এতদ্সত্ত্বেও যখন কোন ন্যায়বিচার ও ইনসাফের প্রশ্ন আসিত, তখন তিনি কোন পক্ষপাতিত্ব করিতেন না বরং ন্যায় ও ইনসাফের স্বার্থে যদি একান্ত আপনজনের বিপক্ষেও তাহাকে রায় দিতে হইত, তিনি নিঃসংকোচে ও নির্দ্বিধায় তাহাই করিতেন। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে বদরের যুদ্ধবন্দীদের ইতিহাসে। বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আব্বাসও ছিলেন। সিদ্ধান্ত হইল যে, মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আনসার সাহাবীগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আব্বাস আমাদের ভাগিনা। আমরা তাহাকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করিয়া দিতে চাই। নবী কারীম (স) ইহাতে সম্মত হইলেন না। কারণ, বিচারের বেলায় ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেই সমান। তাহাদের ভাগিনা আর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাই ছিলেন হযরত আব্বাস। ইহা ছাড়া হযরত আব্বাস (রা) মক্কী জীবনে ইসলাম গ্রহণ না করিলেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তথাপি ন্যায় ও ইনসাফের প্রতীক হযরত মুহাম্মাদ (সা) বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করেন নাই (সীরাতুন-নবী, ১খ.,পৃ. ৩৩৩)।

ফুসায়লা নাম্নী জনৈক মহিলা বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি, আমি রাসূলে কারীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! অন্যায় কাজে নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনকে সাহায্য করা কি জাহিলী যুগের আসাবিয়্যাত তথা গোত্রপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত? নবী করীম (স) বলিলেন, হাঁ।

মক্কা বিজয়ের সময় মাখযূম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করিয়া ধরা পড়িল। ইসলামী বিধান অনুসারে তাহার হাত কাটার নির্দেশ জারী হইল। এই নির্দেশ শুনিয়া তাহার গোত্রের লোকেরা খুবই বিচলিত হইয়া পড়ল। তাহারা এই দণ্ড মওকুফের সুপারিশের জন্য হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করিল। তিনি তাহার কথায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, উসামা! তুমি আল্লাহর দণ্ডবিধানের বিরুদ্ধে সুপারিশ করিতে আসিয়াছ? হযরত উসামা ক্ষমা চাহিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) একটি সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে বক্তৃতা দানকালে বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করিলে তাহাকে কোন শাস্তি দেওয়া হইত না। পক্ষান্তরে কোন দুর্বল লোক চুরি করিলে তাহাকে যথারীতি শাস্তি দেওয়া হইত। এইজন্যই উক্ত জাতিসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, সেই আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি, আজ যদি মুহাম্মাদ (স)-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করিত তবে নিশ্চয় তাঁহার হাত কাটিয়া ফেলিতাম (বুখারী, ১খ., পৃ. ৫২৮; আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১৪৩)।

আত্মীয়-স্বজনদের যেমন বৈষয়িক অধিকার রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে তাহাদের ধর্মীয় অধিকার। আত্মীয়তা রক্ষায় উভয়বিধ অধিকার আদায়ের সবিশেষ তাকীদ রাসূলে কারীম (স) প্রদান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۔

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন হইতে রক্ষা কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর। উহাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ। তাহারা আল্লাহ যাহা আদেশ করেন তাহা অমান্য করে না এবং যাহা করিতে আদেশ করা হয় তাহারা তাহাই করে” (৬৬ ঃ ৬)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! নিজেদেরকে জাহান্নাম হইতে রক্ষার ব্যাপারটি তো কিছুটা বুঝিতে পারি। কিন্তু পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে জাহান্নাম হইতে রক্ষা করিবার উপায় কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহার উপায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তোমরা তাহাদেরকে সেই সমস্ত করিতে নিষেধ কর আর তোমাদেরকে যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন, তোমরা তাহাদেরকেও তাহা করিতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাহাদেরকে জাহান্নাম হইতে রক্ষা করিবে (তাফসীর রূহুল মা'আনী, ১৫খ., পৃ. ৩৫১)।

রাসূলে কারীম (স)-এর আদর্শে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফরয কর্মসমূহ ও হালাল-হারামের বিধান শিক্ষা দেওয়া এবং তাহা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি অধিক কষ্টে থাকিবে যাহার পরিবার-পরিজন ধর্মীয় কর্তব্য সম্পর্কে মূর্খ ও উদাসীন হইবে (তাফসীর রূহুল মা'আনী, ১৫খ., পৃ. ৩৫১)।

রাসূলে কারীম (স) তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের ধর্মীয় অধিকার আদায়ে এবং তাহাদের ধর্মীয় কর্তব্য পালনের ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। নবূওয়াত প্রাপ্তির প্রথমদিকে তাঁহাকে তাঁহার নিজ আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের মধ্যেই ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ “আপনি আপনার নিকটাত্মীয়-স্বজনদেরকে সতর্ক করুন” (২৬ ঃ ২১৪)।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সকল আত্মীয়-স্বজনকে একত্র করেন এবং তাহাদেরকে সত্যের পয়গাম শুনাইয়া দেন। তিনি তাঁহার নিকটাত্মীয় গোত্রগুলির নাম ডাকিয়া ডাকিয়া বলিলেন ঃ হে বনী কা'ব ইব্ন লুওয়াই! হেব্নী-আব্দ মানাফ! নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষার কর ইত্যাদি নতুবা আমি তোমাদেরকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিব না (মুসলিম, ১খ., পৃ. ১১৪)।

রাসূলে কারীম (স) তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের ধর্মীয় বিষয়ে কী পরিমাণ উদগ্রীব ছিলেন উহার আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁহার চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুর ঘটনা হইতে। আবূ তালিব আজীবন রাসূলের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি সর্বদা রাসূলের সহায়ক হইয়া কুরায়শদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার চাচার এই অবদানের প্রতিদান প্রদানে এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের ব্যাপারে সদা প্রস্তুত ও সচেতন থাকিতেন। তাঁহার অন্তরের একান্ত কামনা ছিল, তাঁহার চাচা ঈমান আনয়ন করুক

যাহাতে তিনি তাহার সকল অবদানের প্রতিদান ও তাহার সহিত তাঁহার আত্মীয়তার হক আদায় করিতে পারেন। যখন আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইল তখন মহানবী (স) তাহাকে বলিলেন, চাচাজান! মৃত্যুকালে একবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করুন, আমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আপনার ঈমান আনয়নের সাক্ষ্য দিব। তখন তাহার শিয়রে আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি বসা ছিল। তাহারা বলিল, আবূ তালিব! আপনি কি আপনার পিতা আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের ধর্ম গ্রহণ করিবেন? আবূ তালিব মৃত্যুশয্যা হইতে বলিলেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মাদর্শের উপর অটল থাকিয়াই মৃত্যুবরণ করিতেছি। অতঃপর আবূ তালিব বলিলেন, আমি কলেমা পাঠ করিতাম, কিন্তু এরূপ করিলে কুরায়শগণ বলিত, আবূ তালিব মৃত্যুভয়ে কলেমা পড়িয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষেধ না করিবেন সেই পর্যন্ত আমি আপনার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করিয়া যাইব (বুখারী, ১খ., পৃ. ৫৪৮)।

রাসূলে কারীম (সা) সর্বদা তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের জন্য দু'আ করিতেন এবং তাঁহার সাহাবাগণকেও তাঁহাদের নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের জন্য দু'আ করিতে উৎসাহ প্রদান করিতেন। মহানবী (স) বলেনঃ অনুপস্থিত কোন ভাইয়ের জন্য মুসলমানের দু'আ আল্লাহর দরবারে কবূল হইয়া থাকে। দু'আকারীর মাথার উপর একজন ফেরেশতা মোতায়েন থাকেন। যখনই সে তাহার মুসলমান ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন ঐ ফেরেশতা বলেন, আমীন! তোমার জন্যও ঐরূপ কল্যাণ হউক (মুসলিম, ২খ., পৃ. ৩৫১-৩৫২)।

একবার রাসূলে কারীম (স) তাঁহার চাচা হযরত আব্বাস (রা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূলের চাচা আব্বাস! আপনি আল্লাহ্‌র দরবারে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করুন (আল-আদাবুল মুফরাদ)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা করিতাম, আমার মাতা ইসলাম গ্রহণ করুন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন না। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার জন্য দু'আ করিতে অনুরোধ করিলাম। অতঃপর যখন আমি বাড়িতে ফিরিলাম, দেখি আমার আম্মা তাঁহার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ঘর হইতে বলিলেন, আবূ হুরায়রা! আমি মুসলমান হইয়াছি। আমি এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবগত করিলাম এবং বলিলাম, আমার ও আমার মাতার জন্য দু'আ করুন। তিনি তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ২৯-৩০)।

পবিত্র কুরআনে মু'মিনগণকে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের জন্য দু'আ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا .

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমনও স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যাহারা হইবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ বানাও" (২৫ ঃ ৭৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭, ৮৩, ১৭৭, ১৮০, ২১৫; সূরা আন-নিসা ঃ ১,৭, ৮, ৩৩, ৩৫, ১৩৫; সূরা আন 'আম ঃ ১৫২; সূরা আর-রা'দ ঃ ২১, ২৫; সূরা আন-নাহল ঃ ৯০; সূরা আল-ইসরা ঃ ২৬; আস-সুআরা ঃ ২১৪; সূরা ঃ ২৩, রূম ঃ ৩৮; নূর ঃ ২২; মুহাম্মাদ ঃ ২২, ২৩; ফাতির ঃ ১৮; তাহরীম ঃ ৬; বালাদ ঃ ১৪, ১৫; (২) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৫ খৃ., দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪খ., পৃ. ১৬০, ১৬১, ৯৯, ৩৫২, ৪৬৬; ১খ., পৃ. ৫৫, ৫৬, ১০৪, ১৮০, ১৮৪, ২২০, ৩৯৬, ৪০১, ৪৩২, ৪৩৭, ৫০৩; ৩খ., পৃ. ৩৫, ৩২৮. ২৫৯, ৪০৬, ৫১৩, ৫১৪; (৩) আল-আলূসী, রূহুল মাআনী, দারুল কুতুবিল ইলামিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৪ খৃ., সংশ্লিষ্ট সূরার আয়াতাংশের তাফসীরসমূহ; (৪) কুরতুবী, আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন, দারুল কিতাবিল আরাবী, সূরাতুন-নিসা, ৫খ., পৃ.৭; (৫) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, তা.বি., ১খ. ও ২খ., পৃষ্ঠা নং নিবন্ধ গর্ভে উক্ত; (৬) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, ইমদাদিয়া লাইবেরী ঢাকা, তা.বি., ১খ. ও ২খ., পৃষ্ঠা নং নিবন্ধ গর্ভে উক্ত; (৭) ইমাম তিরমিযী, আল-জামে', কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ, তা.বি., ২খ., বাবুল বিররি ওয়াসসিলাহ, পৃ. ১১; (৮) খতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ইমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা, তা.বি. বাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ, পৃ. ৪১৮-৪৩০; (৯) ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, আলামুল কুতুব, বৈরূত ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ১-১৫৩; (১০) আবূ দাঊদ, আস-সুনান, দারুল ইশাআত, কলিকাতা, তা.বি. কিতাবুল আদাব, পৃ. ৬৫৮; (১১) ইব্ন মাজা, আস-সুনান, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ, আবওয়াবুল আদাব, পৃ. ২৬৮ (১২) ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, দারুল ফিক্র, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ., কিতাবুল আদাব, ১২খ., পৃ. ৩-২৫৮; (১৩) হাফিজ মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১৯৯৬ খৃ., কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ, ৩খ., পৃ. ২১৫-২৬২; (১৪) হাকিম নিশাপুরী, আল-মুসতাদরাক, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, তা.বি., কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ, ৪খ., পৃ. ১৪৮; (১৫) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মিসর ১৯৫৫ খৃ., খণ্ড, পৃষ্ঠা ও নিবন্ধের মধ্যে দ্রষ্টব্য; (১৬) ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মিসর ১৯৬৪ খৃ., খণ্ড ও পৃষ্ঠা নং নিবন্ধের মধ্যে দ্রষ্টব্য; (১৭) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, রাবিতাতুল আলামিল-ইসলামী, মক্কা মুকাররামা ১৯৮০ খৃ., পৃষ্ঠা নং নিবন্ধে দ্রষ্টব্য; (১৮) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস-সিয়ার, কুতুবখানা রশীদিয়া, ঢাকা ১৯৯০ খৃ., পৃষ্ঠা নং নিবন্ধে দ্রষ্টব্য; (১৯) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মায়াদ, মাকাতাবাতুর রিসালা, বৈরূত ১৯৮৬ খৃ., খণ্ড ও পৃষ্ঠা নং নিবন্ধে দ্রষ্টব্য; (২০) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, লাইডেন, ১৯৫৫ খৃ., খণ্ড ও পৃষ্ঠা নং নিবন্ধে দ্রষ্টব্য; (২১) ইব্ন জারীর, তারীখুল, উমাম ওয়াল-মুলূক, দারুল মাআরিফ, মিসর, ১৯৬৭ খৃ., ৩খ., পৃ. ৭৯-৮১; (২২) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উফ, মাতবা'আ জামালিয়্যা, মিসর ১৯১৪ খৃ., ৭খ., পৃ. ১৭৮।

মাসঊদুল করীম

ইয়াতীমের প্রতি মহানবী (স)-এর দয়া

রাসূলে কারীম (স) ছিলেন সর্বপ্রকার প্রশংসনীয় মানবীয় গুণে গুণান্বিত, কামিল ইন্‌সান। তাঁহার চারিত্রিক মাধুর্য ছিল আল-কুরআনের নিখুঁত প্রতিকৃতি। একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চারিত্রিক মাধুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ তোমরা কি কুরআন পড় নাই ? অর্থাৎ আল-কুরআনই হইল তাঁহার চারিত্রিক পরিচয়। তিনি স্পষ্টত বলিয়াছেনও, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ "আল-কুরআনই ছিল তাঁহার চারিত্রিক মাধুর্যের প্রতিচ্ছবি" (ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৪খ., পৃ. ৩৬৩)।

সুতরাং আল-কুরআনে যাহা কিছু বর্ণিত উহার বাস্তব নমুনা রাসূলে কারীম (স)-এর জীবন চরিত। অতএব, ইয়াতীম পিতৃহীন অনাথ সম্পর্কে আল-কুরআনে যে সকল হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা রহিয়াছে রাসূলে কারীম (স) তাঁহার কর্ম, বক্তব্য ও সমাজ সংস্থাপনের মাধ্যমে উহার পূর্ণ বাস্তবায়ন করিয়াছিলেন। উপরন্তু বাল্যকালে তিনি ছিলেন ইয়াতীম-অসহায়। তাই দুঃখী, অনাথ শিশুদের দুঃখ-কষ্ট ও অসহায়ত্ব তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন, পবিত্র কুরআনে তাঁহার বাল্যকালের সেই স্মৃতি স্মরণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ .

"তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?

এই সকল কারণে ইয়াতীম শিশুদের প্রতি তাঁহার মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা ছিল সীমাহীন, অবারিত। তাহাদের সেবা-যত্ন, লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানে তিনি সচেতন ও সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সর্বদা ইয়াতীমের খোঁজ-খবর নিতেন, সাধ্যমত তাহাদের সাহায্য-সহযোগিতা করিতেন। তাহাদের জন্য অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিতেন। স্নেহ-মমতার পরশে তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেন। তাঁহার কোন সাহাবীর ইন্তিকাল হইলে তিনি তথায় গমন করিতেন এবং জানাযার প্রাক্কালে মৃত ব্যক্তির রাখিয়া যাওয়া ইয়াতীম অসহায় সন্তান-সন্ততির অভিভাবকত্ব গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করিতেন। এক কথায়, রাসূলে কারীম (স) ছিলেন ইয়াতীম ও পিতৃহীনদের শ্রেষ্ঠতম অভিভাবক। একবার এক ঈদের দিনের সকালে একটি শিশুকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া বাড়িতে লইয়া আসিলেন। কথাবার্তার পর তিনি জানিতে পারিলেন, শিশুটি ইয়াতীম। তখন তিনি শিশুটিকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন, আমিও ছোটবেলায় তোমার মত পিতৃহীন ইয়াতীম ছিলাম। তুমি

মোটেও মন খারাপ করিও না। শোন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, ফাতিমা তোমার বোন, আইশা তোমার মাতা এবং আমি তোমার পিতা? রাসূলে কারীম (স)-এর আদর পাইয়া ইয়াতীম শিশুটি তাহার সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল (হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, পৃ. ১৪২)।

ইয়াতীম অনাথদের অধিকার সম্পর্কে রাসূলে কারীম (স) সদা সতর্ক ছিলেন। কোথাও কাহারও দ্বারা ইয়াতীমের অধিকার খর্ব হওয়ার আশংকা দেখা দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ইয়াতীমের সাহায্যে আগাইয়া আসিতেন। একবার এক ইয়াতীম বালক রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া তাঁহাকে অবহিত করিল, তাহার পিতার যাবতীয় সম্পদ আবূ জাহ্লের নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে। কিন্তু আবূ জাহল এখন উহা ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করিতেছে। রাসূলে কারীম (স) এই অভিযোগ শুনিবা মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ইয়াতীম বালকটিকে সঙ্গে লইয়া আবূ জাহলের বাড়িতে গমন করিলেন। তিনি আবূ জাহলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এই বালকের পিতার গচ্ছিত রাখা সকল সম্পত্তি এই মুহূর্তে তাহার হাতে সমর্পণ করুন। এই ইয়াতীম অনাথ শিশুদের দুঃখ-যাতনা ও অভাব-অনটন কি আপনার অন্তরাত্মাকে নাড়া দেয় না? রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃঢ়তার সম্মুখে আবূ জাহল তৎক্ষণাৎ ইয়াতীম বালকের পিতার গচ্ছিত সকল সম্পদ ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল।

রাসূলে কারীম (স) তাঁহার সাহাবীগণকে ইয়াতীমদের প্রতি সদয়, সহানুভূতিশীল ও দায়িত্ববান হওয়ার জন্য তাকীদ দিতেন। হাদীছের গ্রন্থাবলীতে এই ব্যাপারে তাঁহার অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

ইয়াতীম শিশুদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূলে কারীম (স)-এর উপস্থাপিত বাণীসমূহ অত্যন্ত ন্যায়ানুগ। উহার বাস্তবায়নের ফলে তৎকালে ইয়াতীম শিশুগণ অভাবনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মধ্যে জীবন যাপনের সুযোগ পাইয়াছিল। লাঘব হইয়াছিল তাহাদের যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জীভূত দুঃখ-কষ্ট। এই পর্যায়ে আমরা ইয়াতীম-অনাথদের কল্যাণে রাসূলে কারীম (স)-এর গৃহীত ব্যবস্থাগুলি আলোচনার প্রয়াস পাইব।

১. ইয়াতীম শিশুদের সম্মানজনক জীবন যাপনের নিশ্চয়তা বিধান : রাসূলে কারীম (স) তাঁহার প্রচারিত বাণী ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে চির-অবহেলার শিকার ইয়াতীম-অনাথ শিশুদের সম্মানজনক জীবন যাপন নিশ্চিত করেন। তিনি ইয়াতীম শিশুদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে ঈমানের লক্ষণ বলিয়া চিহ্নিত করেন এবং তাহাদের অধিকারের প্রতি অসম্মান ও তাহাদের সহিত রূঢ় আচরণ করাকে বিধর্মীদের স্বভাবরূপে আখ্যায়িত করেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে :

كَلاَّ بَلْ لاَّ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ . وَلاَ تَحٰضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.

"না, কখনও নহে। বস্তুত তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং তোমরা অভাব-গ্রস্তদেরকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না" (৮৯ : ১৭-১৮)।

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ . وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ.

"তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ? সে তো সে-ই যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না" (১০৬ ঃ ১-৩)।

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.

"সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না" (৯৩ ঃ ৯)।

রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেন ঃ মুসলিমদের মধ্যে সেই গৃহটি সর্বোত্তম, যেইখানে একজন ইয়াতীম শিশু বাস করে, যাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়। আর মুসলিমদের মধ্যে সেই গৃহটি সর্বনিকৃষ্ট, যেইখানে একজন ইয়াতীম শিশু বাস করে, যাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয় (মিশকাত, ২খ., পৃ. ৪২৩)।

وَابْتَلُوا الْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .

২. **ইয়াতীম শিশুদের অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ** ঃ বর্বর যুগে ইয়াতীম শিশুদেরকে অর্থ-সম্পদ হইতে বঞ্চিত রাখা হইত। তাহাদের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং নানান অজুহাতে উহা গ্রাস করা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। রাসূলে কারীম (স) এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া ইয়াতীম শিশুদের অর্থ-সম্পদ সংরক্ষণের নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি এই বিধি-বিধান আরোপ করেন যে, ইয়াতীম শিশু বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তাহার সম্পদ সংরক্ষণ করিতে হইবে। তৎপর যখন বালেগ হইবে তখন তাহার সম্পদ তাহাকে সোপর্দ করিয়া দিবে। (দ্র. ৪ ঃ ৬)

নানান অজুহাত ও বাহানার মাধ্যমে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ গ্রাস করা নিষিদ্ধ করিয়া আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَآتُوا الْيَتَٰمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .

"তোমাদের খারাপ সম্পদের সহিত ইয়াতীমের ভাল সম্পদ অদল-বদল করিও না এবং ইয়াতীমের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সহিত সংমিশ্রণ করিও না। নিশ্চয় ইহা বড় মন্দ কাজ" (৪ ঃ ২)।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ‎.

"যাহারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা তো তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তাহারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিবে" (৪ ঃ ১০)।

ইয়াতীমের ধন-সম্পদ তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ব্যক্তি ইয়াতীমের সম্পদ হইতে তাহার পারিশ্রমিক বাবদ কিছু অর্থ গ্রহণ করিতে পারে, যদি সে তাহার প্রয়োজনীয় খরচ অন্য কোন উপায়ে সংস্থান করিতে সক্ষম না হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও তাহাকে অতিশয় সতর্কতা ও আমানতদারীর সহিত খরচ করিতে হইবে। ইয়াতীমের সম্পদ যথেচ্ছা ভোগ করার প্রবণতা নিষিদ্ধ করিয়া আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ‎.

"তোমরা ইয়াতীমদেরকে যাচাই করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহযোগ্য হয় এবং তাহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখিলে তাহাদের সম্পদ তাহাদেরকে ফিরাইয়া দিবে। তাহারা বড় হইয়া যাইবে বলিয়া অপচয় করিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না। যে অভাবমুক্ত, সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাহাদেরকে তাহাদের সম্পদ সমর্পণ করিবে তখন সাক্ষী রাখিও। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট" (৪ ঃ ৬)।

রাসূলে কারমি (স) ইয়াতীম শিশুদের সম্পদ আত্মসাতকারীদের প্রতি কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়াছেন এবং ইয়াতীম শিশুদের সম্পদ আত্মসাত করা উদরে আগুন পূর্তির সাথে তুলনা করিয়াছেন। আল-কুরআনে এই প্রসঙ্গে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ‎.

ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তীও হইবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরাপুরি দিবে। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য বলিবে স্বজনের সম্পর্কে হইলেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর" (৬ ঃ ৫২)।

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً

"ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করিও; নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে" (১৭ ঃ ৩৪)।

রাসূলে কারীম (স) ইয়াতীম শিশুর অভিভাবককে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহারা যেন ইয়াতীম শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে এবং তাহাদের মধ্যে যে পর্যন্ত না বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ ঘটে বা লক্ষ্য করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের সহায়-সম্পদ তাহাদের নিকট হস্তান্তর না করে। কারণ ইহার অন্যথা হইলে তাহাদের অর্থ-সম্পদ তাহারা সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইবে না। ফলে তাহা কুচক্রীদের দ্বারা গ্রাস হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। (দ্র. ৪ ঃ ৬ আয়াত)।

বর্বর যুগে সমাজপতিরা এবং আত্মীয়-স্বজন সুকৌশলে ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করার মানসে নানাবিধ অসাধু পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করিত। রাসূলে কারীম (স) নানা বিধি-বিধান ও নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে উহার মূলোৎপাটন করেন এবং ইয়াতীমের ধন-সম্পদ সংরক্ষণের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করেন।

ইয়াতীম কন্যার অধিকার

বর্বর যুগে ইয়াতীম কন্যাদের মানবাধিকার চরমভাবে হরণ করা হইত। ইয়াতীম কন্যা সুন্দরী হইলে অথবা তাহাদের কিছু ধন-সম্পদ থাকিলে অভিভাবকগণ নামমাত্র মহর উল্লেখ করিয়া তাহাদেরকে তাহাদের অসম্মতিতে জোরপূর্বক বিবাহ করিত অথবা নিজেদের সন্তান বা আত্মীয়ের সহিত বিবাহ দিত। ইহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য হইত কেবল ইয়াতীম কন্যার সম্পদ গ্রাস করা। রাসূলে কারীম (স) ইয়াতীম কন্যাদের প্রতি এই অবিচার ও যুলুমের মূলোৎপাটন করিয়া তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেন।

'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে ঠিক এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম কন্যা ছিল। লোকটির একটি বাগান ছিল। উক্ত বাগানে ইয়াতীম কন্যাটিরও অংশ ছিল। লোকটি মেয়েটির বাগানের অংশ গ্রাস করার হীন উদ্দেশ্যে মেয়েটিকে যবরদস্তি বিবাহ করিল। সে মেয়েটিকে তাহার বিবাহের মহর তো প্রদান করেই নাই, বরং তাহার বাগানের অংশটিও দখল করিয়া লইল। রাসূলে কারীম (স) বিষয়টি অবগত হইয়া এই সমস্ত কুট-কৌশল নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বিধান জারি করিলেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ.

"তোমরা যদি আশংকা কর, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চার" (৪ ঃ ৩)।

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِي يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِي لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ‏.

"এবং লোকে তোমাকে বিধান জিজ্ঞাসা করে নারীদের বিষয়ে। বল, আল্লাহ তোমাদেরকে তাহাদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানাইয়াছেন এবং ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে, যাহাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাহাদেরকে বিবাহ করিতে চাও এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে এবং ইয়াতীমদের প্রতি ন্যায়বিচার সম্পর্কের যাহা কিতাবে তোমাদেরকে শুনান হয়। তোমরা যাহা কিছু সৎকর্ম কর, আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত" (৪ ঃ ১২৭)।

উপরিউক্ত আয়াত দুইটিতে ইয়াতীম কন্যাদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকারের স্বীকৃতি এবং উহার সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে।

ইয়াতীম শিশুদের মানবীয় অধিকার সংরক্ষণ

রাসূলে কারীম (স)-এর দৃষ্টিতে মৌলিক মানবাধিকার তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রাপ্তিতে প্রত্যেক শিশুর যে অধিকার রহিয়াছে, একজন ইয়াতীম শিশুরও সেই সকল অধিকার রহিয়াছে; বরং তাহারা পিতৃহীন অনাথ বিধায় অধিকতর যত্ন ও সহানুভূতির অধিকার রাখে। তাঁহার বক্তব্যে এই কথা বারবার উচ্চারিত হইয়াছে যে, ইয়াতীমকে লালন- পালন এবং তাহার ব্যয়ভার বহন করাই তাহার প্রাপ্ত হক আদায়ের জন্য যথেষ্ট নহে বরং তাহাদেরকে আদর-স্নেহ এবং সম্মানও করিতে হইবে। এমনকি নিজেদের সন্তানের মুকাবিলায় ইয়াতীমকে কোন অংশে হেয় প্রতিপন্ন করা যাইবে না। তাহাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে ঠিক ততটুকু তৎপর থাকিতে হইবে নিজ সন্তানের জন্য যতটুকু করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ‏.

"তাহারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছাড়িয়া গেলে তাহারাও তাহাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইত" (৪ ঃ ৯)। অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের সন্তান অসহায় অবস্থায় পড়িলে তোমরা কেমন উদ্বিগ্ন হইতে, সেই কথা চিন্তা করিয়া তোমাদের তত্ত্বাবধানে পালিত ইয়াতীম শিশুদের প্রতি যত্নবান হও।

অসহায় ইয়াতীমদের লালন-পালন এবং তাহাদের সার্বিক অভিভাবকত্ব গ্রহণের জন্য রাসূলে কারীম (স) তাঁহার অনেক বাণীতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

১. "ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী ব্যক্তি যেন সর্বদা রোযা পালনকারী রোযাদার" (আত-তারগীব ওয়াত্-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৩৫)।

২. "যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্য হইতে কোন ইয়াতীমের দায়িত্বভার গ্রহণ করে এবং তাহাকে নিজের সহিত খাবার ও পানাহার করায় আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। হাঁ, যদি সে ক্ষমার অযোগ্য কোন পাপ না করিয়া থাকে" (মিশকাত, ২খ., পৃ. ৪২৩)।

৩. "আমি এবং ইয়াতীমের ভরণ-পোষণকারী জান্নাতে এই দুইটি আঙ্গুলের মত একত্রে অবস্থান করিব। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন" (আল-আদাবুল মুফরাদ, ১খ., পৃ. ১৩৮)।

৪. "যদি কেহ একটি ইয়াতীম শিশুর মাথায় হাত বুলায় এবং সে উহা কেবল মহান আল্লাহ্র জন্যই করিয়া থাকে তবে তাহার হাত শিশুর মাথার যতগুলি চুলের উপর পড়িবে, উহার প্রতিটির জন্য সে রহমত লাভ করিবে। আর কেহ যদি তাহার আশ্রিত ইয়াতীম বালক-বালিকার প্রতি সদয় আচরণ করে তবে সে এবং আমি জান্নাতে হাতের দুই আঙ্গুলের অনুরূপ নিকটবর্তী হইয়া অবস্থান করিব" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৩৭)।

৫. "একবার জনৈক ব্যক্তি তাহার অন্তরের কাঠিন্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি লোকটিকে বলিলেন, ইয়াতীমদের মাথায় হাত বুলাও এবং গরীবদেরকে খাবার দাও" (মিশকাত, ২খ., পৃ. ৪২৫)।

৬. "মহান আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তিকে আযাব দিবেন না যে ইয়াতীমকে দয়া করিয়াছে" (আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৩৭)।

৭. "ইয়াতীমের ফরিয়াদ হইতে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। ইয়াতীম গভীর রাতে তাহার অসহায়ত্বের জন্য কাঁদিয়া থাকে। মানুষ তখন নিশ্চিন্তে ঘুমায়" (আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৩৭)।

৮. "আমি এবং ঐ বিধবা নারী কিয়ামত দিবসে পরস্পর অতি নিকটে অবস্থান করিব যে ইয়াতীম শিশুদের লালন-পালনে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, অথচ সে ছিল রূপ-সৌন্দর্যে ও মান-মর্যাদায় সম্ভ্রান্তা" (মিশকাত ২খ., পৃ. ৪২৩)।

৯. "আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলিব। তখন একজন নারী আমার পশ্চাত অনুসরণ করিবে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কে তুমি? সে উত্তরে বলিবে, আমি একজন নারী। আমি আমার ইয়াতীম শিশুদের লালনের জন্য নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলাম" (আত-তারগাবী ওয়াত-তারহীব ৩খ., পৃ. ২৩৬)।

১০. "ইয়াতীমকে বঞ্চিত রাখিয়া যখন আহার করা হয়, শয়তান তখন সেখানে উপস্থিত হয়" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৩৬)।

ইয়াতীম শিশুদের পুনর্বাসনের স্থায়ী বন্দোবস্ত

রাসূলে কারীম (স) ইয়াতীম শিশুদের জীবন নির্বাহ এবং অর্থনৈতিক সমস্যার স্থায়ী ও সম্মানজনক সমাধান করিবার লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহার মধ্যেমে

তাহাদের সকল বিড়ম্বনার অবসান ঘটিয়াছিল এবং তাহাদের পুনর্বাসনের স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তিনি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার মধ্য দিয়া এই সমস্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহীত পুনর্বাসন কর্মসূচীগুলি ছিল ঃ

১. অভিভাবকহীন ইয়াতীম শিশুর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় লালন-পালনের ব্যবস্থা করা। মদীনায় হিজরতের পর যখন তিনি মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে বরিত হন তখন কোন সাহাবীর ইন্তিকাল হইলে তিনি সেখানে গমন করিতেন এবং জানাযার প্রাক্কালে মৃত ব্যক্তির রাখিয়া যাওয়া সন্তানের খোঁজখবর লইতেন। তিনি এই মর্মে ঘোষণা করিতেন, যে ব্যক্তি অসহায় সন্তান রাখিয়া গিয়াছে তাহাদের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান আমাদের উপর ন্যস্ত (মিশকাত, বুখারী, মুসলিমের বরাতে, ১খ., পৃ. ২৬৫)।

২. ইয়াতীমদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যেই আয়ের খাত ও ফাণ্ড প্রতিষ্ঠা করা। ইয়াতীমগণ যাহাতে সচ্ছল জীবন যাপন করিতে পারে সেই লক্ষ্যে তাহাদের আর্থিক সংগতি বিধানের জন্য রাসূলে কারীম (স) তাহাদের কল্যাণে কতিপয় আয়ের খাত নির্ধারণ করিয়া দেন। যথা ঃ

(ক) গনীমত ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ইয়াতীম-অনাথদের জন্য একটি অংশ সংরক্ষিত। যথা আল-কুরআনে বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ·

"আরও জানিয়া রাখ যে, যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ কর তাহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের" (৮ ঃ ৪১)।

(খ) ফায় ঃ যুদ্ধ ব্যতিরেকে অর্জিত শত্রু সম্পত্তিতে ইয়াতীমের জন্য একটি অংশ নির্ধারিত এবং সংরক্ষিত। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ·

"আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্‌র, তাঁহার রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের এবং ইয়াতীমদের, মিসকীনদের ও মুসাফিরদের" (৫৯ ঃ ৭)।

উল্লেখিত দুইটি খাত ছাড়াও অন্যান্য খাতগুলি যথা যাকাত, ফিতরা, সাদাকা, মান্নত, কাফ্ফারা ইত্যাদি খাতগুলিতেও ইয়াতীম পিতৃহীন শিশুদের অধিকার রহিয়াছে—যদি তাহারা অভাবগ্রস্ত হয়।

৩. **স্বতস্ফূর্ত দান ঃ** যে সকল খাতে আইনগত কারণে ইয়াতীম শিশুদের হক প্রাপ্তি নির্ধারিত নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে ইয়াতীম শিশুদেরকে স্বতস্ফূর্ত দান করিবার জন্য রাসূলে কারীম (স) উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। যথাঃ

(ক) বেহেশ্‌তবাসীদের সদগুণাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ‎·

"আর তাহারা আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে" (৭৬ ঃ ৮)।

(খ) নিকটাত্মীয় ইয়াতীম শিশুকে আহার্য দান করার কল্যাণ ও উপকারিতাকে ধর্মের ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ‎· فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ‎· يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ‎· اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ‎·

"আপনি জানেন কি ধর্মের ঘাঁটি কি? উহা হইল দাসমুক্তি, দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান, ইয়াতীম আত্মীয়কে, ধুলিধূসরিত মিসকীনকে" (৯০ ঃ ১২-১৬)।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, মাটি যেমন শত্রুর আক্রমণ ও কবল হইতে রক্ষা করে, তেমনিভাবে এই সমস্ত সৎকর্ম পরকালীন আযাব হইতে রক্ষার উপায়।

(গ) আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের নিকট ইয়াতীম শিশুদের সহিত ন্যায় ও সহানুভূতির আচরণ করার অঙ্গীকার লইয়াছিলেন (দ্র. ২ ঃ ৮৩)।

(ঘ) ইয়াতীমের কল্যাণে স্বতস্ফূর্তভাবে সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে আল-কুরআনে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ‎·

"তাহারা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যয় করিবে? বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করিবে তাহা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যাহা কিছু তোমরা কর না কেন, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবহিত।" (২ ঃ ২১৫)।

(ঙ) ইয়াতীমকে সাহায্য-সহযোগিতা করা একটি উল্লেখযোগ্য সৎকর্ম। ইরশাদ হইয়াছে ঃ "পূর্ব ও পশ্চিমদিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নাই, কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশ্‌তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহপ্রেমে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত মুসাফির, সাহায্য প্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করিলে, সালাত আদায় করিলে, যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা রক্ষা করিলে,

অর্থসংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা, যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী" (২ঃ১৭৭)।

সর্বদা ইয়াতীমের কল্যাণের প্রতি নযর রাখার নির্দেশ

ইয়াতীমের অভিভাবককে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন সর্বদা ইয়াতীমের কল্যাণের প্রতি নযর রাখিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করে। ইসলাম-পূর্ব যুগে ইয়াতীমের সম্পদকে যথেচ্ছা ব্যবহার করা হইত। এই অন্যায়ের মূলোৎপাটন করার জন্য রাসূলে কারীম (স) আল্লাহ্‌র এই বাণী শুনাইলেন ঃ "ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করা দোযখের অগ্নিশিখা নিজের উদরে ভর্তি করারই নামান্তর।"

এই বাণী শুনিয়া ইয়াতীমের অভিভাবকগণ এমন ভীত সতর্ক হইলেন যে, তাহারা ইয়াতীমের খাওয়া, রান্না-বান্না সব কিছুই পৃথক করিয়া দিলেন। ইহাতে ইয়াতীম শিশুদের চরম বিড়ম্বনা দেখা দিল। অতঃপর বিষয়টির প্রতি রাসূলে কারীম (স)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি আল্লাহ্‌র এই বাণী পড়িয়া শুনাইলেন যে, "ইয়াতীমদের সম্পদ খাওয়া নিষেধ করার উদ্দেশ্য হইল তাহাদের সম্পদ যেন নষ্ট না করা হয়। তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি খেয়াল রাখিয়া যেন তাহা খরচ করা হয়। সুতরাং ইয়াতীমদের খাবার ও অন্যান্য ব্যয় যৌথ রাখিলে যদি তাহাদের জন্য মঙ্গল হয় তবে তাহাই করিবে। কেননা তাহারা তো তোমাদের ধর্মীয় ভাই। আর যদি তাহাদের খাবার ও অন্যান্য ব্যয় ভিন্ন রাখিলে তাহাদের মঙ্গল হয় তবে তাহাও করিতে পার। মূল বিষয় হইল ইয়াতীমের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা জানেন কে মঙ্গলপ্রার্থী এবং কে অনিষ্টকারী। মহান আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে ইয়াতীমদের বিষয়ে আরও কঠিন বিধি-বিধান আরোপ করিয়া তোমাদেরকে কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়" (দ্র. ২ ঃ ২২০)।

ইয়াতীম শিশুর মীরাছ প্রাপ্তির ঘোষণা

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব-অনারব সকল জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যেই ইয়াতীম ছেলে-মেয়েকে মীরাছ তথা উত্তরাধিকারের সম্পত্তিতে অংশীদার মনে করা হইত না। বিশেষত ইয়াতীম নারী ছিল চরম যুলুমের শিকার। রাসূলে কারীম (স)-ই সর্বপ্রথম ইয়াতীম ছেলে-মেয়ের মীরাছী অধিকারের বিধান প্রবর্তন করেন এবং তাহা বাস্তবায়ন করেন। মদীনায় হিজরতের পরবর্তী সময়ে তিনি এই আইন কার্যকর করিয়াছিলেন।

উহুদের যুদ্ধে আওস ইব্‌ন ছাবিত (রা) নামক এক সাহাবী শহীদ হইলেন। তাঁহার দুইটি কন্যা সন্তান ও একটি পুত্র সন্তান ছিল। ইসলাম-পূর্ব রীতি অনুযায়ী আওস (রা)-এর ভ্রাতাগণ তাঁহার সমুদয় সম্পদ দখল করিয়া লইল। বিষয়টি রাসূলে কারীম (স)-এর অবগতিতে আসিলে তিনি আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ জারী করিলেন ঃ "পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র সন্তান, কন্যা সন্তান উভয়ের-ই হক রহিয়াছে, তাহা অল্প হউক বা বেশী হউক। এই হক সুনির্ধারিত" (দ্র.৪ ঃ ৭)। পরবর্তীতে এই হক ও অংশের পরিমাণও বর্ণনা করিয়া দেওয়া হয় (দ্র.৪ ঃ ১১)।

রাসূলে কারীম (স) বলেন, আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে দুই ধরনের অসহায়ের মাল সম্পর্কে সতর্ক থাকার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করিতেছি। একজন নারী, অপরজন ইয়াতীম (তাফসীরুল কু'রআনিল 'আযীম, ১খ., পৃ. ৪০৩)।

ইয়াতীমের হক বিনষ্টকারীর প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি

রাসূলে কারীম (স) ইয়াতীমের হক ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাহাদের হক বিনষ্টকারির প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়াছেন। ইয়াতীমের হক বিনষ্টকারীর ইহ-পরকালীন শাস্তি ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ পেশ করিয়া তিনি যালিমদেরকে তাহাদের যুলুম হইতে নিবৃত্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন ঃ ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী কিয়ামত দিবসে এমনভাবে উত্থিত হইবে যে, তাহার পেটের ভিতর হইতে আগুনের লেলিহান শিখা মুখ, নাক ও চক্ষু দিয়া বাহির হইতে থাকিবে (তাফসীরুল কু'রআনিল 'আযীম, ৯খ., পৃ. ৪০৩)।

সাহাবীদের মধ্যে রাসূলের শিক্ষার প্রভাব

ইয়াতীম পিতৃহীনদের প্রতি রাসূলে কারীম (স)-এর অপরিসীম দয়া ও তাহাদের অধিকারের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপের ফল এই হইয়াছিল যে, সাহাবীদের প্রতিটি গৃহ এক একটি ইয়াতীমখানায় পরিণত হইয়াছিল। স্বয়ং রাসূলের স্ত্রী 'আইশা (রা) মদীনার আনসার ও নিজ খান্দানের ইয়াতীম শিশুদেরকে তালাশ করিয়া নিজ গৃহে লালন-পালন করিতেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-এর রীতিমত এই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি কোন ইয়াতীমকে ছাড়া খাবার খাইতেন না (মাক'লাতে সীরাত, পৃ. ১৫৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, আল্-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ., ২য় সংস্করণ; (২) যাকিউদ্দীন আল-মুনযিরী, আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীব, দারুল কুতুব আল-'ইলামিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ., প্রথম সংস্করণ; (৩) খতীব আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আসাহহুল-মাত'াবি', দিল্লী, তা. বি.; (৪) ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, বাংলা সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯১ খৃ.; (৫) সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মাদ, তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬ খৃ., ২য় সংস্করণ; (৬) ড. মুহাম্মাদ আসিফ কিদওয়াই, মাক'লাতি সীরাত, মজলিসে তাহ্কীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লাখনৌ।

মাসউদুল করীম

প্রতিবেশীর প্রতি মহানবী (স)-এর বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ

হযরত মুহাম্মাদ (স) একজন বিনয়ী নম্র সদাচারী মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন দয়ালু মহামানব ছিলেন। হৃদয়ের বিশালতায় তাঁহার কোন তুলনা ছিল না। অপরিসীম দয়া ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতেন তিনি প্রত্যেক মানুষকে। শত্রুরাও তাঁহার দয়া-মায়া হইতে বঞ্চিত হয় নাই কখনও। যে সমস্ত লোক তাঁহাকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করিয়াছে, তাহার চলার পথে পাথর ও কাঁটা বিছাইয়া রাখিয়াছে এবং যাহারা তাঁহার রক্ত পানের জন্য সর্বদা ওঁৎ পাতিয়া থাকিয়াছে সেই শত্রুকুলকেও তিনি কখনও ঘৃণার চোখে দেখেন নাই বরং তাঁহার অবারিত করুণা ও দয়ায় তাহারা বারবার ধন্য হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মাকারিমে আখলাক ও খুলুকে 'আযীমের মূর্ত প্রতীক। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (৬৮ ঃ ৪)।

মহানবী (স) বলিয়াছেন ঃ

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

"মাকারিমে আখলাক তথা উন্নত চরিত্র মাধুরীর পূর্ণতা বিধানকল্পে আমি প্রেরিত হইয়াছি" (কানযুল উম্মাল, ২খ., পৃ. ৫; যুরকানী, শরহে মুওয়াত্তা, ৪খ., পৃ. ৯২)।

বস্তুত তাঁহার এই অনুপম ও অতুলনীয় আদর্শ ছিল সর্বজনব্যাপী। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী সাথী, পথচারী, অধিকারভুক্ত দাস-দাসী, এমন কি জীবজন্তুও বারংবার উহা লাভে ধন্য হইয়াছে। প্রতিবেশীর প্রতি মহানবী (স) বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করিয়াছেন এবং এই জাতীয় আচরণের জন্য সাহাবায়ে কিরাম ও মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়াছেন।

মূলত প্রতিবেশী শব্দের অর্থ হইল সন্নিহিত বা নিকটবর্তী স্থানে বসবাসকারী। প্রতিবেশীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকা এবং তাহাদের সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। কেননা প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে অধিক উপকারী। আত্মীয়-স্বজন তো সকলে কাছে থাকে না। প্রতিবেশীরাই বিপদে-আপদে প্রথমে আগাইয়া আসে। বিবাহ-শাদী ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে প্রতিবেশীর ভূমিকা থাকে উল্লেখযোগ্য। এই কারণে প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার বজায় রাখার জন্য আল-কুরআন ও হাদীছে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। হাদীছ শরীফে হক ও অধিকার অনুসারে প্রতিবেশীকে তিন শ্রেণীতে

বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ (১) যাহারা আত্মীয় নয় এবং মুসলমানও নয়; (২) যাহারা আত্মীয় নয় কিন্তু মুসলমান এবং (৩) যাহারা আত্মীয় ও মুসলমান (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, সূত্র মাআরিফুল কুরআন, ২খ., পৃ. ৪১২)।

উপরিউক্ত সকল প্রকার ও সকল পর্যায়ের প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচার বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাওরাত গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে, "তুমি তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, তুমি তোমার প্রতিবেশীর ঘরের লালসা করিবে না, এমনিভাবে তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রী, দাস-দাসী, গবাদি পশু, গাধা ইত্যাদি যাহা কিছু থাকে এইগুলির কোনটিরই লালসা করিবে না" (তাওরাত, যাত্রাপুস্তক, সূত্র সীরাতুন নবী, ৬খ., পৃ. ১৪৫)।

হযরত ঈসা (আ) বলিয়াছেন, তুমি নিজেকে যেরূপ ভালবাস প্রতিবেশীকেও অনুরূপ ভালবাসিবে (হুকূকুল ইবাদ আওসাফ আলী, পৃ. ১৩৫)।

প্রতিবেশী সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

"তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে" (৪ ঃ ৩৬)।

আল্লামা মাহমূদ আলূসী বাগদাদী (র) বলেন, وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى অর্থ নিকট প্রতিবেশী ও وَالْجَارِ الْجُنُبِ অর্থ দূর প্রতিবেশী। তবে উপরিউক্ত শব্দ দুইটির ভিন্ন মর্মও হইতে পারে। যেমন وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى অর্থ এমন প্রতিবেশী যাহার সহিত আত্মীয়তা ও দীনি সম্পর্কও রহিয়াছে। আর وَالْجَارِ الْجُنُبِ অর্থ এমন প্রতিবেশী যাহার সহিত প্রতিবেশী হওয়া ছাড়া আত্মীয়তা ও দীনি কোন সম্পর্ক নাই। যেমন কোন অমুসলিম ব্যক্তি। এমনিভাবে وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ অর্থ সফরসঙ্গী বা এমন লোকজন যাহারা কোন কারণে একত্র হইয়াছে। যেমন একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত সহপাঠী বা একই প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত সহকর্মী (রূহুল মা'আনী, ৩খ., পৃ. ২৮-২৯)।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশী, নিকটবর্তী হউক বা দূরবর্তী, স্থায়ী হউক বা অস্থায়ী, সফরসঙ্গী হউক বা প্রতিষ্ঠানের সাথী, মুসলমান হউক বা কাফির, সকলের সঙ্গে সদাচার বজায় রাখা ও সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য।

প্রতিবেশী হওয়ার সীমানা কতটুকু এই সম্পর্কে ইমাম কুরতবী (র) বলেন, এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আওযাঈ (র) বলেন, সন্নিহিত ও নিকটবর্তী

স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিগণই কেবল প্রতিবেশী নহে বরং নিজ বাড়ির আশেপাশে ডানে-বাঁয়ে, অগ্রে-পশ্চাতে বসবাসকারী চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত প্রতিবেশী হওয়ার সীমানা পরিব্যাপ্ত। বর্ণিত আছে, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) আমি এমন এক কওমের মহল্লায় আছি যাহারা আমার নিকটবর্তী প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) হযরত আবূ বক্র, উমার ও আলী (রা)-কে পাঠাইলেন যেন তাঁহারা মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া এই মর্মে ঘোষণা করেন, শুনিয়া রাখ! আশেপাশে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত প্রতিবেশী হওয়ার সীমানা পরিব্যাপ্ত। যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তাহার অনিষ্টকর আচরণ হইতে নিরাপদ থাকে না, সে জান্নাতে দাখিল হইতে পারিবে না। হযরত আলী (রা) বলেন, যেই পর্যন্ত আযানের আওয়াজ শোনা যায় ঐ পর্যন্ত লোকেরা (ঐ মসজিদের) প্রতিবেশী। কেহ কেহ বলেন, মসজিদের ইকামত যতটুকু পর্যন্ত পৌঁছে ঐ পর্যন্ত অধিবাসীরা ঐ মসজিদের প্রতিবেশী। আবার কেহ কেহ বলেন, যে সকল মানুষ একই মহল্লায় বা একই শহরে বাস করে তাহারা সকলেই একে অপরের প্রতিবেশী (আল-জামে' লিআহ্কামিল কুরআন, ৫খ., পৃ. ১২১)।

প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর রাখা এবং তাহাকে কষ্ট দেওয়া হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে হাদীছের বহু তাকীদ রহিয়াছে। হযরত 'আইশা ও ইব্ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে নবী করীম (স) বলেন,

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه ·

"হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশী সম্পর্কে তাকীদের সহিত আমাকে এত বেশী ওসিয়াত অর্থাৎ হুকুম করিতেছিলেন যে, আমার মনে হইতেছিল, তিনি তাহাকে ওয়ারিছ বানাইয়া দিবেন" (আস-সাহীহ আল-বুখারী, বাবুল উসাতি বিল-জার, পৃ. ৮৮৯)।

প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে হাদীছে বহু গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজন ও মালামালের কোন আশংকার কারণে প্রতিবেশীর জন্য নিজ বাড়ির দরজা বন্ধ করে রাখে সে মু'মিন নহে। আর যেই ব্যক্তির প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকে না সেও মু'মিন নহে। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

اتدرى ما حق الجار اذا استعانك أعنته واذا استقرضك اقرضته واذا افتقر عدت عليه واذا مرض حدثه واذا اصابه خير هنأته واذا اصابته مصيبة عزيته واذا مات اتبعت جنازته ولا تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح الا باذنه ولا تؤذى بقتار ريح قدرك الا ان تغرف له منها وان اشتريت فاكهة فاهد له فان لم تفعل فادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده (رواه الخرائطى من مكارم الاخلاق) ·

"প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তুমি কি জান? যদি সে তোমার নিকট সাহায্য চায় তবে তুমি তাহাকে সাহায্য করিবে। যদি তোমার কাছে ঋণ চায় তবে তাহাকে ঋণ প্রদান করিবে।

অভাবী হইলে তাহার অভাব দূর করিবে। অসুস্থ হইলে তাহার খোঁজ-খবর লইবে; তাহার কোন কল্যাণ হইলে তাহাকে মোবারকবাদ দিবে। সে বিপদে বা দুঃখে আক্রান্ত হইলে তাহার দুঃখে তুমিও দুঃখিত হইবে। সে মারা গেলে তাহার জানাযায় শরীক হইবে। প্রতিবেশীর অনুমতি ছাড়া তাহার বাড়ির সামনে উঁচু দেওয়াল দাঁড় করাইবে না। অন্যথা তাহার বাড়িতে বাতাস আসা বন্ধ হইয়া যাইবে। তোমার পাতিলের ধোঁয়া দ্বারা তাহাকে কষ্ট দিবে না, রান্না-বান্নার পর সেইখান থেকে তাহাকে কিছু দিবে। তুমি যদি ফল-মূল খরিদ কর তবে উহা হইতে ঐ ব্যক্তিকেও কিছু দিবে। প্রতিবেশীকে দেওয়া সম্ভব না হইলে ঐ ফল লইয়া ঘরে গোপনে প্রবেশ করিবে এবং তোমার সন্তানেরা যেন ঐ ফল-মূল লইয়া বাহিরে যাইতে না পারে। কেননা ইহাতে প্রতিবেশীর সন্তানেরা ক্রোধান্বিত হইবে" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৩৫৭)।

উপরিউক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হইতেছে যে, খানা-পিনার মধ্যে প্রতিবেশীকে শরীক রাখা বাঞ্ছনীয়। সম্ভব না হইলে তাহার সন্তানদেরকে কিছু দেওয়া চাই। কম পক্ষে একটু তরকারি দিয়া হইলেও তাহার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করা চাই। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন ঃ

يا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاكثر ماؤها وتعاهد جيرانك .

"হে আবূ যর! যখন তুমি তরকারি পাকাইবে তখন উহাতে কিছু পানি অতিরিক্ত দিবে। অতঃপর তুমি তোমার প্রতিবেশীর খবরাখবর নিবে অর্থাৎ উহা হইতে তাহাকে কিছু হাদিয়াস্বরূপ দিবে" (রিয়াদুস সালিহীন, বাবু হাক্কিল জার, পৃ. ১৪৯)।

অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة .

"হে মুসলিম নারিগণ! কোন প্রতিবেশী নারী যেন তাহার অপর প্রতিবেশী নারীকে (সামান্য কিছু দেওয়াকে) হেয় জ্ঞান না করে, উহা বকরীর পায়ের খুরই হউক না কেন" (আস-সাহীহ আল-বুখারী, পৃ. ৮৮৯)।

প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ .

"যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন তাহার প্রতিবেশীকে সম্মান করে" (আস-সাহীহ আল-বুখারী, পৃ. ৮৮৯)।

প্রতিবেশী কাফির বা অমুসলিম হইলেও তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাহাকে কিছু হাদিয়া দেওয়া জরুরী। হাদীছে আছে, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা)-এর একটি বকরী যবেহ করা হইয়াছিল। অতঃপর তিনি বাড়িতে আসিয়া তাঁহার গোলামকে বলিলেন ঃ

اهديت لجارنا اليهودى اهديت لجارنا اليهودى سمعت رسول الله ﷺ يقول ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت انه سيورثه ·

"তুমি আমাদের ইয়াহূদী প্রতিবেশীকে (ইহা হইতে কিছু) হাদিয়া দিয়াছ কি? তুমি আমাদের ইয়াহূদী প্রতিবেশীকে কিছু হাদিয়া দিয়াছ কি ? আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, জিবরাঈল (আ) আমাকে অবিরত প্রতিবেশী সম্পর্কে ওসিয়্যাত করিতে থাকেন। এমন কি আমার মনে হয়, সম্ভবত তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিছ বানাইয়া দিবেন" (আল- আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৩৭)।

প্রতিবেশীদের অধিকার নির্ধারিত হইবে দূরত্বের মাপকাঠি দ্বারা। হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। আমি তাহাদের কাহার নিকট হাদিয়া পাঠাইব? তিনি বলিলেন, যাহার দরজা (ঘর) তোমার বেশী নিকটবর্তী তাহার কাছে পাঠাইবে (আস-সাহীহ আল- বুখারী, পৃ. ৮৯০)।

প্রতিবেশীকে অভুক্ত রাখিয়া নিজে উদর পূর্তি করিয়া খাওয়া ঈমানের পরিপন্থী কাজ। নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع ·

"ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নহে যে তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ণ করিয়া খায়, অথচ তাহার প্রতিবেশী থাকে অভুক্ত অবস্থায়" (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৩৯)।

যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম আল্লাহর নিকটও সে উত্তম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره ·

"আল্লাহ তা'আলার নিকট সে-ই সর্বোত্তম সাথী যে তাহার সঙ্গীর নিকট সর্বোত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট সে-ই সর্বোত্তম প্রতিবেশী যে তাহার প্রতিবেশীর নিকট সর্বোত্তম" (জামি' তিরমিযী; সূত্র রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ১৫০)।

উত্তম প্রতিবেশী পাওয়া সৌভাগ্যের আলামত। নবী করীম (স) বলেন ঃ

من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنى ·

"মুসলিম ব্যক্তির জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হইল তিনটি ঃ (১) একটি প্রশস্ত বাড়ী; (২) নেককার প্রতিবেশী; (৩) দ্রুত গতিসম্পন্ন তেজস্বী একটি সওয়ারী (থাকা) (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৪০)।

রাসূলুল্লাহ (স) নেককার ও পুণ্যবান প্রতিবেশী প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বদা দু'আ করিতেন এবং নিকৃষ্ট প্রতিবেশী হইতে তিনি সর্বদা পানাহ চাহিতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (স) দু'আ করিবার সময় বলিতেন ঃ

اللهم انی اعوذ بك من جار السوء فی دار المقام فان جار الدنيا يتحول ·

"হে আল্লাহ! জান্নাতে মন্দ প্রতিবেশীর সঙ্গ হইতে আমি আপনার নিকট পানাহ চাই। কেননা দুনিয়ার প্রতিবেশী তো স্থানান্তরিতও হইয়া যাইতে পারে" (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৪০)।

হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنى واربع من الشقاء الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق ·

"চারটি জিনিস সৌভাগ্যের পরিচায়ক ঃ (১) নেককার স্ত্রী, (২) প্রশস্ত বাসস্থান, (৩) নেককার প্রতিবেশী ও (৪) তেজস্বী সওয়ারী। এমনিভাবে চারটি হইল দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক ঃ (১) অসৎ ও দুষ্ট প্রতিবেশী; (২) অবাধ্য স্ত্রী; (৩) অবাধ্য সওয়ারী ও (৪) সংকীর্ণ বাসস্থান" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৩৬৩)।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া কোন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য জায়েয নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ·

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে সে যেন তাহার মেহমানকে সমাদর করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন তাহার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে, অন্যথায় নীরব থাকে" (সহীহ আল-বুখারী, পৃ. ৮৮৯)।

যে ব্যক্তির অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে প্রকৃত ঈমানদার নহে। নবী করীম (স) বলেন ঃ

والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يارسول الله ﷺ قال الذى لا يامن جاره بوائقه ·

"আল্লাহ্র কসম! সেই ব্যক্তি মু'মিন নহে, আল্লাহ্র কসম! সেই লোক মু'মিন নহে, আল্লাহ্র কসম! সেই লোক মু'মিন নহে। জিজ্ঞাসা করা হইল, কে সেই লোক ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বলিলেন, যেই লোকের প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ নয়" (আস-সাহীহ আল-বুখারী, পৃ. ৮৮৯)। অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ·

"যে লোকের প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে না" (সহীহ মুসলিম, সূত্র আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৪২)।

ان الرجل لا يكون مؤمنا حتى يأمن جاره بوائقه يبيت حين يبيت وهو امن من شره فان المؤمن الذى نفسه فى غناء والناس منه فى راحة ·

"কোন ব্যক্তি মু'মিন হইবে না, যাবত না তাহার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকে। সে রাত্রি যাপন করে তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ অবস্থায়। কেননা প্রকৃত মু'মিন তো সেই যাহার নফস কল্যাণজনক কাজে নিয়োজিত থাকে এবং অপরাপর লোকজন থাকে তাহার পক্ষ হইতে শান্তি ও নিরাপদে" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৩৫৩)।

والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه ·

"সেই সত্তার কসম, যাঁহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ! কোন ব্যক্তি ঈমানদার হইবে না যাবত না সে নিজের জন্য যাহা পসন্দ করে, প্রতিবেশীর জন্যও তাহা পসন্দ করে" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৩৫৩)।

لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يامن جاره بوائقه ·

"মানুষের কলব ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তাহার ঈমান ঠিক হইবে না এবং যবান ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তাহার কলব ঠিক হইবে না। আর যে লোকের প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকে না সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না" (আত-তারগীব, প্রাগুক্ত)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) কর্তৃক এক হাদীছে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

المؤمن من امنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة عبد لا يامن جاره بوائقه ·

"প্রকৃত মু'মিন সেই ব্যক্তি যাহার অনিষ্ট হইতে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকে। প্রকৃত মুসলমান সেই যাহার যবান ও হাত হইতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি যে সর্বপ্রকার অকল্যাণ বর্জন করিয়াছে। আর যেই বান্দার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ নহে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে না" (আত-তারগীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪)।

হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

من اذى جاره فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله ومن حارب جاره قد حاربنى ومن حاربنى فقد حارب الله عز وجل ·

"যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল এবং যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দিল। এমনিভাবে যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীর সহিত সংঘাত করিল সে আমার সহিত লড়াই করিল। আর যেই ব্যক্তি আমার সহিত সংঘাত করিল সে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র সহিত সংঘাত করিল" (আত-তারগীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪)।

অন্য এক হাদীছে আছে, একদা রাসূলুল্লাহ (স) এক যুদ্ধের উদ্দেশে বাহির হওয়ার মনস্থ করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়াছে সে আজ আমাদের সহিত যুদ্ধে যাইতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিলেন, আজ আমি আমার প্রতিবেশীর দেয়ালের গোড়ায় পেশাব করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি আজ আমাদের সহিত যাইতে পারিবে না (আত-তারগীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জনৈক মহিলা সম্পর্কে বলা হয়, সে অনেক নামায পড়ে, প্রচুর দান করে এবং বহু রোযা রাখে غير انها تؤذى جيرانها بلسانها "কিন্তু সে যবান দ্বারা অর্থাৎ অশালীন কথাবার্তা দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেন, সে জাহান্নামী। অতঃপর সাহাবী পুনরায় আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জনৈক মহিলার ব্যাপারে বলা হয়, সে নামায-রোযা খুব বেশী পরিমাণে করে না। আর তাহার সাদাকার অবস্থাও এমন যে, এক টুকরা পনীর সাদাকা করে (অর্থাৎ নফল নামায, নফল রোযা ও নফল সাদাকার ক্ষেত্রে সে প্রথম মহিলা হইতে পিছনে) কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। নবী করীম (স) বলিলেন, এই মহিলা জান্নাতী (আত-তারগীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার এক প্রতিবেশী আছে, সে আমাকে সর্বদা কষ্ট দেয়। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি যাও এবং তোমার সামানগুলি রাস্তায় ফেলিয়া দাও। অতঃপর সে গিয়া তাহার সামানসমূহ রাস্তায় লইয়া আসিল। এই অবস্থা দেখিয়া লোকেরা সেইখানে জড় হইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার কি হইয়াছে? সে বলিল, আমার এক প্রতিবেশী আছে, সে আমাক সর্বদা কষ্ট দিত। বিষয়টি আমি নবী করীম (স)-এর নিকট আলোচনা করার পর তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি যাও এবং তোমার সামানগুলি রাস্তায় বাহির করিয়া লইয়া আস। তখন লোকেরা বলিতে লাগিল, اللهم العنه اللهم اخزه (হে আল্লাহ! তাহার প্রতি লানত বর্ষণ করুন এবং তাহাকে লাঞ্ছিত করুন)। এই সংবাদ ঐ ব্যক্তির নিকটে পৌঁছার পর সে ঐ নির্যাতিত ব্যক্তির কাছে আসিল এবং তাহাকে বলিল, তুমি তোমার বাড়িতে ফিরিয়া যাও। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আর তোমাকে কষ্ট দিব না (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৪২)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

ان الله عز وجل قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم وان الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدين الا من احب فمن اعطاه الدين فقد احبه والذى نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره

بوائقه قلت يا رسول الله وما بوائقه قال غشمه وظلمه ولا يكسب مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار ان الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيء بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبس .

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চরিত্রকে তোমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন, যেমনিভাবে তোমাদের রিযিক তোমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। যেই ব্যক্তি দুনিয়া চায় এবং যে চায় না উভয়কেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু দীনের বিষয়টি ইহা হইতে ব্যতিক্রম অর্থাৎ যেই ব্যক্তি দীন চায় কেবল তাহাকেই তিনি দীন দান করেন। আর আল্লাহ তা'আলা যাহাকে দীন দান করেন তিনি তাহাকে মহব্বতও করেন। যেই সত্তার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, হৃদয় ও যবান নিয়ন্ত্রিত ও সমর্পিত না হওয়া পর্যন্ত কোন বান্দা প্রকৃত মুসলমান হইতে পারিবে না। এমনিভাবে যদি কাহারও প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ না থাকে তবে সে প্রকৃত মু'মিন হইতে পারিবে না। রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন, অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! وما بوائقه (অনিষ্ট বলিয়া আপনি কি বুঝাইতে চাহিতেছেন)? তিনি বলিলেন, غشمه وظلمه অর্থাৎ প্রতিবেশীর প্রতি যুলুম করা, তাহার সহিত মূর্খতাসুলভ আচরণ করা, তাহাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হওয়া বা তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্র করা। কেহ যদি হারাম মাল উপার্জন করিয়া তাহা হইতে ব্যয় করে তবে ইহাতে বরকত হইবে না। এমনিভাবে এই জাতীয় মাল হইতে দান-সাদাকা করিলে তা গ্রহণযোগ্যও হইবে না। কেহ যদি এই জাতীয় মাল রাখিয়া মারা যায় তবে এই মাল তাহাকে জাহান্নামের পথে আগাইয়া দিবে। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দ দ্বারা নিশ্চিহ্ন করেন না, বরং মন্দকে নিশ্চিহ্ন করেন নেকী ও কল্যাণ দ্বারা। নিকৃষ্ট বস্তু নিকৃষ্ট বস্তুকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে না" (আত-তারগীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪)।

অপর এক বর্ণনায় আছে, একদা হযরত উমার (রা) দেখিলেন, জাবির (রা) গোশতের একটি টুকরা হাতে লইয়া বাড়ির দিকে যাইতেছেন। তখন তিনি তাঁহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তিনি বলিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! গোশত খাওয়ার জন্য মনে খুব আগ্রহ হইয়াছে, তাই এক দিরহামের বিনিময়ে এই গোশত খরীদ করিয়া আনিলাম। এই কথা শুনিয়া হযরত উমার (রা) বলিলেন, হে জাবির! প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের কথা ভুলিয়া কেবল নিজের পেটের চিন্তা করিতেছ? নিম্নোক্ত আয়াতটি কি মনে নাই?

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا .

"যেই দিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে, সেই দিন উহাদেরকে বলা হইবে, তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখসম্ভার পাইয়াছ এবং এইগুলি উপভোগও করিয়াছ" (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বাবু মা জা'আ ফী আকলিল-লাহ'ম)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, কে আছে যে আমার নিকট হইতে এই কথাগুলি লিখিয়া উহার উপর আমল করিবে অথবা তাহা শিক্ষা দিবে? এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রস্তুত আছি। তখন তিনি আমার হাত ধরিয়া গুণিয়া গুণিয়া পাঁচটি কথা আমাকে বলিলেন। কথাগুলি নিম্নরূপ ঃ

اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب .

"তুমি হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহা হইলে তুমি সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক ইবাদতকারী গণ্য হইবে। আল্লাহ তা'আলা তোমার ভাগ্যে যাহা রাখিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে, তাহা হইলে তুমি লোকজনের মধ্যে সর্বাধিক অমুখাপেক্ষী গণ্য হইবে। তুমি তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার করিবে, তাহা হইলে তুমি মু'মিন বলিয়া গণ্য হইবে। তুমি নিজের জন্য যাহা পসন্দ কর অপরাপর মানুষের জন্যও তাহা পসন্দ করিবে, তাহা হইলে তুমি মুসলিম বলিয়া গণ্য হইবে। আর তুমি অধিক পরিমাণে হাস্য-রসিকতা করিবে না। কেননা অধিক হাস্য-রসিকতা দিলকে মারিয়া ফেলে" (জামে তিরমিযী, ২খ., আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯)।

অতএব, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পদাংক অনুকরণ করত প্রতিবেশীর সহিত বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা সকলের জন্য অপরিহার্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ই. ফা. বা.; (২) মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস-সাহীহ, মুখতার এ্যান্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত ১৯৮৫ খৃ., ২খ.; (৩) ইমাম হাফিজ যাকীউদ্দীন আবদুল আযীম, আল-মুনযিরী (র), আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, বৈরূত, লেবানন ১৯৮৮ খৃ., ৩খ.; (৪) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, আল-মাকতাবাতুল আসারিয়্যা; (৫) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল-কুরতুবী, আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন ১৯৯৩ খৃ., ৫খ.; (৬) শিহাব উদ্দীন আস-সায়্যিদ মাহমূদ আলুসী আল-বাগদাদী, রূহুল-মা'আনী, মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান, ৫খ.; (৭) মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র), মা'আরিফুল কুরআন, ইদারাতুল মা'আরিফ, করাচী, পাকিস্তান ১৯৮২, ২খ.; (৮) কানযুল উম্মাল, ২খ.; (৯) যুরকানী, শরহে মুওয়াত্তা, ৪খ.; (১০) শিবলী নু'মানী (র) ও আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদবী (র), সীরাতুন নবী, দারুল ইশা'আত, উর্দুবাজার, পাকিস্তান, ১৯৮৫ খৃ.; (১১) শায়খ ইয়াহইয়া আন-নাবাবী (র), রিয়াদুস সালিহীন, ইদারায়ে ইশা'আতে দীনিয়াত, নিযামুদ্দীন, নয়া দিল্লী, ভারত; (১২) আওসাফ আলী, হুকূকুল 'ইবাদ, পাকিস্তান ১৯৮৪ খৃ.; (১৩) দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশ কাল ২০০০ খৃ.।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা

ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)। আঁধারে নিমজ্জিত, পংকিলতায় কলুষিত মানুষকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র করিয়াছিলেন। পৃথিবীর চরম সংকট মুহূর্তে তিনি আবির্ভূত হইয়া যখন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদাত্ত আহ্বান জানান, তখন কায়েমী স্বার্থবাদী, মিথ্যা ও অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক তাগূতী চক্র সর্বশক্তিসহ তাঁহার বিরোধিতা করে এবং তাঁহাকে সত্য ও ন্যায় হইতে বিচ্যুত করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু সকল প্রশংসনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতাদানকারী রাসূল কারীম (স) তাঁহার দৃঢ়তা ও অবিচলতা দ্বারা প্রতিহত করেন সকল ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল। ন্যায় ও সত্যের উপর তাঁহার নজীরবিহীন অবিচলতার প্রভাবে ধূলিসাৎ হইয়া যায় অন্যায় ও অসত্য, সর্বত্র উড্ডীন হয় সত্য ও ন্যায়ের চির উন্নত পতাকা। বিজয় হয় সত্যের, অপসৃত হয় মিথ্যা।

বস্তুত সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা ছিল রাসূল কারীম (স)-এর সুমহান নৈতিক গুণ-বৈশিষ্ট্য। ওহী নাযিলের প্রথম প্রহরেই তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন সর্বক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্যে অটল ও অবিচল থাকিতে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَاَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্ক কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ, পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া চল। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর" (৭৪ ঃ ১-৭)।

প্রথম প্রহরে নাযিলকৃত ওহীর সর্বশেষ নির্দেশের সারাংশ এই যে, সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম প্রচারের সুমহান কর্তব্য পালনে আপনার প্রতি যত অত্যাচার ও উৎপীড়নই হউক এবং আপনাকে যে কোন কঠোর অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীনই হইতে হউক, আপনি অবিচলিত চিত্তে আল্লাহ্‌র নামে ধৈর্য ধারণ করিবেন, তবুও সত্য এবং ন্যায়ের উপর অটল ও অনড় থাকিবেন। কোন প্রকার নমনীয়তা ও আপোষকামিতা যেন আপনাকে স্পর্শ করিতে না পারে। আরও দ্ব্যর্থহীন ও পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ হইল ঃ

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ. وَلاَ تَرْكَنُوْآ اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ.

"সুতরাং তুমি যেভাবে আদিষ্ট হইয়াছ তাহাতে স্থির থাক এবং তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারাও স্থির থাকুক, আর সীমালংঘন করিও না। তোমরা যাহা কর নিশ্চয় তিনি তাহার সম্যক দ্রষ্টা। যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তোমরা তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না; পড়িলে অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করিবে। এই অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হইবে না" (১১ ঃ ১১২-১১৩)।

রাসূল কারীম (স) ছিলেন কুরআনুল কারীমের বাস্তব ও জীবন্ত নমুনা। তাই সত্য ও ন্যায়ের উপর অটল-অবিচল থাকার সুনিপুণ অনুশীলন আমরা তাঁহার জীবনব্যাপী দেখিতে পাই।

সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম প্রচারে অবিচলতা

রাসূল কারীম (স) যখন মক্কা মুকাররামায় সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারকার্যে প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হইলেন তখন কুরায়শ সম্প্রদায়ের কিছু লোক ব্যতীত সকলেই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ শুরু করিল এবং তাঁহার প্রকাশ্য বিরোধিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। আবূ জাহ্ল, আবূ লাহাব, উতবা, শায়বা, আবূ সুফ্য়ান ছিল সত্যবিরোধীদের শীর্ষ নেতা। অপর দিকে রাসূল কারীম (স)-এর পিতৃব্য আবূ তালিব তাঁহাকে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন। গোটা কুরায়শ যখন তাঁহার বিরুদ্ধে ঐকমত্য পোষণ করিয়া শত্রুতা শুরু করিল তখনও আবূ তালিব তাঁহার সাহায্যে এবং রক্ষণাবেক্ষণে অটল থাকিলেন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২০১)।

কাফির-কুরায়শরা সাধারণ জনগোষ্ঠীকে রাসূল কারীম (স) হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার হীন উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্পর্কে অপমানজনক বিভিন্ন মন্তব্য করিল। তাহারা তাঁহাকে পাগল, জাদুকর, গণক, কবি ইত্যাদি বলিয়া আখ্যায়িত করিতে লাগিল (দ্র. ৫৩ ঃ ২; ৬৮ ঃ ২; ৮২ ঃ ২২; ৭ ঃ ১৮৪; ৩৬ ঃ ৬৯; ৬৯ ঃ ৪১-৪২)। কাফিরদের এই সকল অমূলক কথাবার্তা, মিথ্যা অপবাদ ও অন্যায় সমালোচনার কোন কিছুই রাসূল কারীম (স)-কে তাঁহার সত্য ও ন্যায়ের দাওয়াতী কর্মতৎপরতা হইতে বিন্দুমাত্র ফিরাইয়া রাখিতে সক্ষম হয় নাই। আপন আদর্শ ও নীতিতে অনড় ও অটল থাকিয়া অবিচলিত চিত্তে তিনি তাঁহার দা'ওয়াত অব্যাহত রাখিয়াছেন।

অবশেষে কাফিররা তাঁহার আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক পিতৃব্য আবূ তালিবের নিকট হাযির হইল। তাহারা বলিল, "আবূ তালিব! আপনি একজন প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ নেতা। আমাদের সকলের সম্মানিত ব্যক্তি। আমরা ইহার পূর্বেও আপনাকে কয়েকবার অনুরোধ করিয়াছি এবং এখন চূড়ান্ত অনুরোধ করিতেছি, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদকে ইসলাম প্রচার হইতে বিরত রাখুন, নিষেধ করুন। অন্যথা আল্লাহ্র শপথ! আমরা আর ধৈর্য ধরিব না। আমরা আপনাকে পরিষ্কার বলিতেছি, হয় আপনি তাহাকে এই প্রয়াস হইতে বিরত রাখিবেন, আর না হয় সে ধ্বংস হইবে, নতুবা আমরা ধ্বংস হইব।"

পিতৃব্য আবূ তালিবের পক্ষে একদিকে যেমন আপন জাতিগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা মানিয়া লওয়া কষ্টকর ছিল, তেমনিভাবে আপন ভ্রাতুষ্পুত্র রাসূল কারীম (স) হইতে নিজের

সাহায্য ও সমর্থনের হাত গুটাইয়া লইতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তিনি রাসূল কারীম (স)-কে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার জাতিগোষ্ঠী আমার কাছে আসিয়াছে। তাহারা এই কথা বলিতেছে। এখন তুমি আমার প্রতি একটু দয়া কর। আমার উপর এত বড় বোঝা চাপাইয়া দিও না যাহা আমি বহন করিতে পারিব না।" ইহা শ্রবণে রাসূল কারীম (স)-এর ধারণা হইল যে, পিতৃব্য আবূ তালিব সম্ভবত তাঁহার সাহায্য-সমর্থন পরিত্যাগ করিবেন অথবা শত্রুর হাতে তাঁহাকে সমর্পণ করিবেন। সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচলতার এই পরীক্ষা ছিল অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি পিতৃব্য আবূ তালিবকে সম্বোধন করিয়া জোরালো ভাষায় বলিলেন ঃ

والله لو وضعت الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى ماتركت هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته.

"আল্লাহ্র শপথ! যদি তাহারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও তুলিয়া দেয় আর ইহা চাহে যে, আমি এই কাজ ছাড়িয়া দেই, তবুও আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাজ ছাড়িব না যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করেন অথবা এই পথে আমি ধ্বংস হইয়া যাই" (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৬৮)।

রাসূল কারীম (স)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী, অন্তরের অটল ও অবিচল সংকল্প এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আবূ তালিব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুসিক্ত, আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ঃ

يا ابن اخى امض على امرك وافعل ما احببت فوالله لا اسلمك لشئ ابدا .

"হে ভ্রাতুষ্পুত্র আমার! তোমার প্রয়াস চালাইয়া যাও। তোমার যাহা পছন্দ তাহা নির্বিঘ্নে করিয়া যাও। আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনও তোমাকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করিব না" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৪৭)।

কাফিররা দীনে হক প্রচারের কারণে রাসূল কারীম (স)-কে অবর্ণনীয় নির্যাতন করিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে তাহারা নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। স্বয়ং রাসূল কারীম (স) বলেন ঃ

لقد اوذيت فى الله وما يوذى احد وأخفت فى الله وما يخاف احد .

"আল্লাহ্র রাহে সত্যের প্রচারে আমি যেইভাবে নিপীড়িত হইয়াছি, সেইরূপ আর কেহ হয় নাই এবং আমাকে যেইভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে, আর কাহাকেও তদ্রূপ করা হয় নাই" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৫২)।

প্রলোভনের মুখে দৃঢ়তা ও অবিচলতা

সত্য ও ন্যায়ের প্রচার হইতে রাসূল কারীম (স)-কে বিরত রাখার জন্য কাফিররা সম্ভাব্য সকল পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু কোন চেষ্টাই তাহাদের সফল হয় নাই। অবশেষে

তাহারা মনে করিল, ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পার্থিব ভোগ-বিলাসের লোভ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে মানুষ এত কষ্ট-নিপীড়ন সহ্য করিতে পারে না। অতএব তাহারা কুরায়শ নেতা ‘উতবাকে রাসূল কারীম (স)-এর নিকট প্রেরণ করিল। চতুর ‘উতবা তাঁহার খিদমতে হাযির হইয়া বলিল, আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা বলুন। আপনি নেতৃত্ব চাহিলে আমরা আপনাকে সারা আরবের নেতারূপে বরণ করিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি কোন উচ্চ বংশীয় সুন্দরী নারীর পাণি গ্রহণ করিতে চাহেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেও আমরা প্রস্তুত। অথবা যদি আপনি বিশাল ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতে চাহেন তবে তাহাও পরিষ্কার করিয়া বলুন। আমরা আপনার সকল দাবি ও চাহিদা পূরণে প্রস্তুত আছি, তবুও আপনাকে আমাদের ধর্মের বিপরীত প্রচারণা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

ভোগবাদী ও বস্তুবাদী ‘উতবা ভাবিয়াছিল, আমার এই প্রলোভন মুহাম্মাদ কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিবে না। কারণ ধন-দৌলত, প্রভাব, নেতৃত্ব ও রমণী আসক্তি প্রত্যেক ব্যক্তিরই কাম্য। এত বড় প্রলোভন কি কেহ ছাড়িতে পারে! কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের অবিচলতার প্রতীক রাসূল কারীম (স) ‘উতবার অনুরোধের উত্তরে কুরআনুল কারীমের নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করিলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ. اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ. قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

“বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই। আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। অতএব তোমরা তাঁহারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য—যাহারা যাকাত প্রদান করে না এবং উহারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। বল, তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতেছ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক” (৪১ ঃ ৬-৯; ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৯৩-২৯৪)। তিনি আরও বলিলেন ঃ

مابى ماتقولون ما جئتكم بماجئتكم به اطلبه اموالكم ولا اشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثنى اليكم رسولا وانزل على كتابا وامرنى ان اكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم فان تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والاخرة وان تردوه على اصبر لامر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم.

“তোমরা যাহা বলিয়াছ উহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি যাহা লইয়া আসিয়াছি উহার উদ্দেশ্য তোমাদের ধন-সম্পদ করায়ত্ব করা নহে এবং না তোমাদের মাঝে

শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করা; বরং আমাকে আল্লাহ তোমাদের প্রতি নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমার উপর কুরআন নাযিল করিয়াছেন যেন আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দেই এবং সতর্ক করি। তোমরা আরও শুনিয়া লও, আমি তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদেরকে সার্বিক কল্যাণের পথ নির্দেশ করিয়াছি। এখন তোমরা যদি আমার আনীত পয়গাম গ্রহণ কর, তবে ইহাতে তোমাদেরই কল্যাণ হইবে ইহ-পরকালে। আর তোমরা যদি তাহা প্রত্যাখ্যান কর, তবে আমি অবিচলিত চিত্তে আমার প্রয়াস অব্যাহত রাখিব যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তোমাদের ও আমার মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করেন" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৫৬)।

নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখে অবিচলতা

কাফির কুরায়শরা তাহাদের সর্বাবিধ কূটকৌশল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নানা প্রকার প্রলোভন দ্বারা যখন কোনভাবেই রাসূল কারীম (স)-কে বশীভূত করিতে পারিল না, তাহাদের সকল চেষ্টাই তাঁহার দৃঢ়তা ও অবিচলতার কাছে পরাজিত হইল, তখন তাহারা যুলুম-নির্যাতন ও নিপীড়নের পথ অবলম্বন করিল এবং তাঁহাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন ও নাজেহাল করিতে লাগিল। তিনি যখন সালাত আদায় করিতেন, তাঁহার উপর উষ্ট্রের নাড়িভুঁড়ি চাপাইয়া দিত। তাঁহার সম্পর্কে ঘৃণাত্মক অপপ্রচার ছড়াইতে লাগিল। কিন্তু রাসূল কারীম (স)-এর সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নজীরবিহীন দৃঢ়তা ও অবিচলতার কারণে তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ও সমস্ত ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইয়া গেল। কাফির কুরায়শরা রাগে, ক্ষোভে ও ঘৃণায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা এইবার রাসূল কারীম (স)-কে, তাঁহার সমর্থক মুমিনদেরকে ও তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল বানূ হাশিম ও বানূ আবদুল মুত্তালিবের আত্মীয়-স্বজনদেরকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হিজরী ৭ম সাল হইতে ৯ম হিজরীসহ দীর্ঘ তিন বৎসর কাল তাহারা ইহাদেরকে শি'ব আবী তালিব (আবূ তালিবের গিরিসঙ্কট)-এ অবরুদ্ধ ও বয়কট করিয়া রাখে। তাহারা ইহাদের সহিত সকল প্রকার লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক আচার-আচরণ ও চলাফেরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে পানীয় ও খাদ্য সংকটের কারণে শি'ব আবী তালিবে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহারা বৃক্ষ-পত্র খাইয়া জীবন নির্বাহ করেন। কিন্তু ধৈর্যের পাহাড় রাসূল কারীম (স) ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল এই যুলুম-নিপীড়ন ও অবরুদ্ধ জীবন অতিবাহিত হয়। সীরাতের কিতাবসমূহে এইসব অত্যাচার ও নিপীড়নের কথা ও কুরায়শদের নৃশংসতার ইতিহাস পাঠে একদিকে যেমন শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, অপর দিকে তেমনই রাসূল কারীম (স)-এর সত্য ও ন্যায়ে অসাধারণ ধৈর্য, অটলতা ও অবিচলতা দর্শনে অবাক হইয়া থাকিতে হয় (সহীহুল বুখারী, ১খ., পৃ. ২১৬; ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩৫০-৩৭৭)।

শোকে-দুঃখে অবিচলতা

রাসূল কারীম (স) শোকে-দুঃখে সকল পরিস্থিতিতেই ছিলেন ধৈর্য ও অবিচলতার প্রতীক। নবূওয়াতের ১০ম বৎসরটি ছিল তাঁহার জন্য অত্যন্ত শোকার্ত বৎসর। ইতিহাসে এই বৎসরটিকে

তাঁহার জীবনের "আমুল হুয্ন" বা শোকের বৎসর বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। কারণ এই বৎসর মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে তাহার পরম স্নেহপরায়ণ হিতৈষী ও আশ্রয়দাতা প্রিয় পিতৃব্য আবূ তালিব এবং সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী সহধর্মিণী প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা) ইন্তিকাল করেন। জীবনের প্রতিকূলতার নাযুক মুহূর্তে এই দুই প্রিয়তমকে হারানোর বেদনা ও শোক যে কত ভীষণ তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। কিন্তু ধৈর্য ও অবিচলতার নিদর্শন রাসূল কারীম (স) জীবনের এই কঠিন মুহূর্তেও তাঁহার সত্য ও ন্যায়ের প্রয়াসকে অবিচলিত চিত্তে অব্যাহত রাখিলেন। শোক তাঁহাকে কাতর করিয়াছে সত্য; কিন্তু তাঁহার অবিচলতায় বিন্দুমাত্র দুর্বলতা আনিতে পারে নাই। তিনি পূর্ণ উদ্যমে তাঁহার অভীষ্ট লক্ষ্যে অনড় থাকিয়া তাঁহার কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

কাফির কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই শোকের সময়টাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণে প্রয়াসী হইয়াছিল। তাহারা এই সময় তাহাদের নির্যাতন ও নিপীড়নের মাত্রা অনেক গুণ বাড়াইয়া দিয়াছিল। তাঁহার ঘরের দরজায় কাঁটা ও আবর্জনা ফেলিয়া রাখিত। তাঁহার শরীরে অপবিত্র ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু নিক্ষেপ করিত। তিনি রাস্তায় বাহির হইলে দুরাচাররা তাঁহার পিছনে পিছনে হৈ চৈ করিত, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত, পাথর-ঢিলা ও ধূলা-বালি ছুড়িয়া মারিত। প্রতি দিনই এইরূপ লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, তাঁহার পক্ষে মক্কায় অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি মক্কা ছাড়িয়া তাইফের উদ্দেশে রওয়ানা করিলেন; তথাপি সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে বিন্দুমাত্র নমনীয় ও আপোসকামী হন নাই (ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৪১৮)।

মৃত্যুর দুয়ারেও সত্যে অবিচলতা

সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম ইসলাম প্রচার হইতে রাসূল কারীম (স)-কে যখন নিরস্ত করিতে কুরায়শদের সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন তাহারা তাঁহাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করিল। কিন্তু তিনি সত্যের প্রচারে পূর্ববৎ অগ্রসর হইতেই থাকিলেন। জীবননাশের ভয়-ভীতিও তাঁহাকে অবদমিত করিতে পারিল না। অবশেষে তিনি ন্যায় ও সত্যকে সমুন্নত রাখিবার জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত করেন। তবুও ন্যায় ও সত্যের উপর দৃঢ়তা ও অবিচলতায় এক চুল পরিমাণও ছাড় দেন নাই (দ্র. ৮ ঃ ৩০; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ৫২)।

রাসূল কারীম (স) তাঁহার সাহাবায়ে কিরামকেও সত্য ও ন্যায়ে অবিচল থাকার শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাই দেখা যায়, হিজরত-পূর্ব ইসলাম গ্রহণকারী মক্কার মুসলিমগণের উপরই চরম নিপীড়ন ও অত্যাচারের খড়্গ পতিত হইয়াছে। তাঁহারাও সাধ্যমত সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকিবার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কাফিরদের নির্যাতন ও উৎপীড়নে কোন মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করিয়াছেন ইতিহাসের পাতায় এমন একটি নজীরও পাওয়া যাইবে না। ইহা কেবল পৃথিবীর বুকে ইসলামেরই ঐতিহ্য।

রাসূল কারীম (স) তাঁহার সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে সত্য ও ন্যায়ে অবিচলতার কিরূপ দীক্ষা দিয়াছিলেন তাহার একটি উদাহরণ চিন্তা করা যায় নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত হইতে। একদিন

হযরত খাব্বাব (রা) কুরায়শদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া রাসূল কারীম (স)-এর খিদমতে আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কাফিরদের জন্য বদ-দু'আ করুন। এই কথা শ্রবণে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের পূর্বে এমন লোকও অতীত হইয়াছেন যাহার মাথায় করাত রাখিয়া চিরিয়া ফেলা হইয়াছে, তথাপি তিনি নিজের কর্তব্য পালনে বিরত হন নাই। আল্লাহ তা'আলা এই কাজ (ইসলাম)-কে অবশ্যই পূর্ণ করিবেন, এমন একদিন আসিবে, একা একজন উষ্ট্রারোহী মহিলা সান'আ হইতে হাদারামাওত পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে এবং তাহার জন্য এক আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও ভয় থাকিবে না (সহীহুল বুখারী, ১খ., পৃ. ৫৪৩)।

রণাঙ্গনে অবিচলতা

সত্য ও ন্যায়ের উপর রাসূল কারীম (স)-এর দৃঢ়তা ও অবিচলতার বলিষ্ঠ উপস্থিতি আমরা দেখিতে পাই তাঁহার জীবদ্দশায় সংঘটিত সবকয়টি রণাঙ্গনে। সত্যের পথে কণ্টক দেখিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ বিরোধী। ভীরু হৃদয়ের মিনতি বা কাপুরুষতা তিনি পছন্দ করিতেন না। তাই প্রত্যেকটি রণাঙ্গনে তিনি ছিলেন অটল ও অবিচল। উহুদের যুদ্ধে তিনি সাহাবায়ে কিরামের সহিত পরামর্শ করিলেন, মদীনার অভ্যন্তরে থাকিয়া যুদ্ধ করা হইবে, নাকি নগর ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া শত্রুর মুকাবিলা করা হইবে? আলোচনা পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হইল, মদীনা হইতে বাহির হইয়া শত্রুর মুকাবিলা করা হইবে। রাসূল কারীম (স) যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতির জন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। এই সময় কয়েকজন সাহাবী আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রস্তাব ছিল মদীনা প্রাচীরের ভিতরে থাকিয়া শত্রুর মুকাবিলা করা। যদিও আপনি আমাদের প্রস্তাবে রায় দিয়েছেন। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার প্রস্তাবই কার্যকর হউক। আমরা মদীনার অভ্যন্তরে থাকিয়াই লড়াই করিব। রাসূল কারীম (স) বলিলেন, না তাহা হয় না। যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে তাহা খুলিয়া ফেলা নবীর জন্য সমীচীন নহে। এখন প্রস্তুত হও এবং আল্লাহ্র নামে অগ্রসর হও (সহীহুল বুখারী, ২খ., পৃ. ১০৯৫; ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৬৪-৬৬)।

ঐতিহাসিক হুনায়নের যুদ্ধের ঘটনা। মুসলিম সৈন্যদের কিছুটা অপ্রস্তুত ও সঙ্কট অবস্থায় কাফিররা অতর্কিত আক্রমণ করিয়া বসিলে প্রায় বার হাজার মুসলিম সৈন্যের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত সকলেই দিশাহারা হইয়া দিকবিদিক পলায়ন করিতে লাগিল। এমনকি রণাঙ্গন প্রায় মুসলিম সৈন্যশূন্য হইয়া গেল। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

فادبروا عنه حتى بقى وحده ·

"তাহারা তাঁহাকে রাখিয়া পশ্চাৎপদ হইল, এমনকি তিনি একাই অবশিষ্ট রহিলেন" (সহীহুল বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২১)।

বার হাজার যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিয়া পশ্চাৎপদ হওয়ার পর শুধু একা সহস্র শত্রুর বিরুদ্ধে অবিচলিত চিত্তে অটল থাকিয়া যুদ্ধে রত রহিয়াছে—পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সেনাপতির কথা কোথাও আছে কি? শুধু ইহাই নহে, নবী (স) তখন নির্ভিক চিত্তে বলিলেন ঃ

انا النبي لاكذب انا ابن عبد المطلب.

"আমি নবী, ইহা মিথ্যা নহে। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান" (সহীহুল বুখারী, ১খ., পৃ. ৪০১)

সিদ্ধান্তে অবিচলতা

কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করিবার পর উহাতে অটল ও অবিচল থাকা অত্যন্ত মহৎ গুণ। পরিস্থিতি ও পরিবেশ যতই প্রতিকূল হউক, সমালোচনা, আপত্তি, অভিযোগ যতই তীব্র হউক, সর্বাবস্থায় নিজ সিদ্ধান্তে অনড় ও অবিচল থাকিতেন রাসূলে কারীম (স)। ইহা ছিল পবিত্র কুরআনের নির্দেশের প্রতি তাঁহার পরিপূর্ণ আনুগত্য। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

"আপনি কাজ-কর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি কোন দৃঢ় সংকল্প করিলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন। আল্লাহ নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন" (৩ ঃ ১৫৯)।

রাসূল কারীম (স)-এর সিদ্ধান্তে অটল ও অবিচল থাকার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধিতে। মক্কার কুরায়শদের সহিত দীর্ঘ আলোচনার পর কয়েকটি সিদ্ধান্ত স্থির হইল, তন্মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত এই ছিল ঃ "যে সকল মুসলমান মক্কায় অবস্থান করিতেছে তাহাদের মধ্য হইতে কেহই মুসলমানদের সহিত মদীনায় যাইতে পারিবে না।" এই সিদ্ধান্ত স্থির হওয়ার পর মুহূর্তেই কুরায়শ প্রতিনিধি সুহায়লের পুত্র হযরত আবূ জান্দাল (রা) শৃংখল বেষ্টিত অবস্থায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে হাযির হইলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে সুহায়ল তাঁহাকে দীর্ঘকাল যাবৎ এইভাবে চরম নিপীড়ন করিতেছিল। আবূ জান্দাল (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মদীনায় যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু রাসূল কারীম (স) উভয় পক্ষের মধ্যে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের উপর অটল ও অবিচল রহিলেন। তিনি আবূ জান্দালের আবদার ফিরাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করিতে পারি না। তুমি মক্কায় ফিরিয়া যাও। মহান আল্লাহ অচিরেই তোমাদের জন্য মুক্তির রাস্তা খুলিবেন" (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮৩)।

বিচারকার্যে সত্য ও ন্যায়ে অবিচলতা

বিচারকার্যে রাসূল কারীম (স) ধর্ম, বর্ণ, বংশ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য সত্য ও ন্যায়ের ফায়সালা করিতেন। বিচারকার্যে সত্য ও ন্যায়ে অবিচলতা ছিল তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মদীনায় 'বিশর' নামক জনৈক মুসলিম ও এক ইয়াহূদীর মধ্যে এক খণ্ড জমি লইয়া বিরোধ ছিল। ইয়াহূদী বলিল, চল এই বিচারের ভার তোমাদের নবীর উপর অর্পণ করি। বিশ্‌র ছিল অন্যায় ও মিথ্যা দাবিদার। যেহেতু নবী কারীম (স) সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে ফায়সালা করিবেন, এমনকি তাহা ইয়াহূদীর পক্ষে গেলেও, তাই বিশ্‌র বলিল, না, তোমাদের নেতা কা'ব

ইব্ন আশরাফের নিকট বিচার লইয়া চল। কিন্তু ইয়াহূদী কোনভাবেই ইহাতে সম্মত হইল না। অবশেষে ইয়াহূদীর পীড়াপীড়িতে বিশর রাসূল কারীম (স)-এর সমীপে বিচার পেশ করিল। রাসূল কারীম (স) উভয়ের দাবি দাওয়া ও যুক্তি-প্রমাণ পর্যালোচনা করিয়া ইয়াহূদীর পক্ষে রায় প্রদান করিলেন (তাফসীরে জালালায়ন, ১খ., পৃ. ৭৯)। ইসলাম ও ইসলামের নবীর ঘৃণ্যতম শত্রু ইয়াহূদীর প্রতি অন্তরে পুঞ্জীভূত ঈমানী ক্ষোভ ও ঘৃণাবোধ তাঁহাকে সত্য ও ন্যায় হইতে বিচ্যুত করে নাই; বরং সাম্প্রদায়িকতা প্রীতির এই নাযুক মুহূর্তেও তিনি সত্য ও ন্যায়ের উপর অটল ও অবিচল রহিলেন। বস্তুত ইহা ছিল তাঁহার আল-কুরআনের নিম্নোক্ত নির্দেশের প্রতি সবিশেষ আনুগত্য ও বাস্তব আমল ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে। ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা সম্যক অবগত আছেন" (৫ ঃ ৮)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗآ اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহ্র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীনই হউক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও, তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার সম্যক খবর রাখেন" (৪ ঃ ১৩৫)।

একবার চুরির দায়ে এক সম্ভ্রান্ত কুরায়শ মহিলা দোষী সাব্যস্ত হয়। কিছু লোক কুরায়শ বংশের মর্যাদার কারণে তাহাকে শাস্তি হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করে। তাহারা রাসূল কারীম (স)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য তাঁহার অতি প্রিয়ভাজন হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে অনুরোধ করিল। তিনি রাসূল কারীম (স)-এর নিকট মহিলার শাস্তি মওকুফের জন্য আবেদন করিল। রাসূল কারীম (স) অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আল্লাহ্র দণ্ডবিধি মওকুফের সুপারিশ করিতেছ? এইজন্যই বনূ ইসরাঈল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাহারা দুর্বল গরীবদের বেলায় আইনের শাসন প্রয়োগ করিত, কিন্তু সবল ধনীদের রেহাই দিত" (সহীহুল বুখারী, ২খ., পৃ. ১০০৩)।

নীতি ও আদর্শে অবিচলতা

নীতি ও আদর্শের ব্যাপারে রাসূল কারীম (স) সদা আপোষহীন ও দৃঢ়পদ ছিলেন। এমনকি চরম শত্রুর ব্যাপারে বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি নীতি ভঙ্গ করিতেন না। রাসূল কারীম (স)-এর জীবদ্দশায় ইয়ামামার বনূ হানীফা গোত্রের জনৈক মুসায়লামা নবূওয়াতের মিথ্যা দাবি করে। হিজরী নবম সালে মুসায়লামার পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় রাসূল কারীম (স)-এর নিকট হাযির হইয়া বলিতে লাগিল, মুহাম্মাদ যদি তাঁহার পরে মুসায়লামাকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন তবে সে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইবে। মিথ্যা নবী দাবি করাই তো ছিল চরম ও অমার্জনীয় অপরাধ। তদুপরি রাসূল কারীম (স)-এর সম্মুখে হাযির হইয়া তাহা বলা তো ছিল আরও ক্ষমাহীন অপরাধ। এইরূপ অপরাধে তাহাদের মৃত্যুদণ্ড ছিল অনিবার্য। কিন্তু রাসূল কারীম (স)-এর আদর্শ ও নীতিতে রাষ্ট্রীয় বা গোত্রীয় প্রতিনিধিকে হত্যা করা নিষিদ্ধ, তাই তিনি এমন অসহ্যকর পরিস্থিতিতেও নিজেকে পূর্ণ সংযত ও নীতির উপর অটল ও অবিচল রাখিলেন। এই সময় তাঁহার হাতে খেজুর গাছের একটি ছড়ি ছিল। তিনি মুসায়লামা- প্রতিনিধিদের সম্বোধন করিয়া শুধু এতটুকু বলিলেন, "এই ছড়িটি চাহিলেও আমি তাহা তাহাকে দিব না। যদি সে আমার অনুসরণ না কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অচিরেই ধ্বংস করিবেন" (যাদুল মাআদ, ৩খ., পৃ. ৬১০)।

দশম হিজরীতে মুসায়লামা কায্যাব রাসূল কারীম (স)-এর নিকট একটি পত্র লিখে। পত্রের বক্তব্য ছিল এই ঃ

مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله اما بعد فان لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا لاينصفون والسلام عليك.

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুসায়লামার পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের নিকট। প্রকাশ থাকে যে, পৃথিবীর অর্ধাংশ আমাদের আর অর্ধাংশ কুরায়শদের। কিন্তু কুরায়শগণ ন্যায়বিচার করে না। আপনাকে সালাম" (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৬১১)।

ইবনুল যাওয়াহা ও ইব্‌ন উসাল নামক দুই ব্যক্তি এই পত্র লইয়া রাসূল কারীম (স)-এর নিকট আসিল। রাসূল কারীম (স) তাহাদেরকে বলিলেন, "তোমরা বল, لا اله الا الله محمد رسول الله ; তাহারা বলিল, لا اله الا الله مسيلمة رسول الله (নাউযুবিল্লাহ)। রাসূল কারীম (স) বলিলেন, "মুসায়লামা যাহা বলে, তোমরাও তাহাই বল" ? তাহারা বলিল, হাঁ। নীতি ও আদর্শে অবিচলতার প্রতীক রাসূল কারীম (স) বলিলেন, "যদি আইনানুযায়ী দূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ না হইত তবে নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে হত্যা করিতাম" (মুসনাদে আবূ দাঊদ, ১খ., পৃ. ২৩৮)। কিন্তু ইহার বিপরীতে দেখা গেল, রাসূল কারীম (স) মুসায়লামার পত্রের উত্তর লিখিয়া সাহাবী হযরত হাবীব ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ভণ্ড পাপিষ্ঠ মুসায়লামা রাসূল কারীম (স)-এর পত্রবাহক সাহাবীর হস্ত-পদ চতুষ্টয় কর্তন করিয়া তাঁহাকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া দিল (ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৯৫)।

নীতি ও আদর্শে রাসূল কারীম (স)-এর অটল ও অবিচলতার আরেকটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে বানূ জাযীমার অভিযানে। মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারের জন্য কয়েকটি ক্ষুদ্র কাফেলা রাসূল কারীম (স) মক্কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করেন। এই সময় হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে সাড়ে তিন শত সাহাবীর একটি কাফেলা বানূ জাযীমার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। তাঁহারা যখন এই গোত্রে পৌঁছিলেন তখন জাযীমাবাসী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ আমরা বেদীন হইয়াছি, আমরা বেদীন হইয়াছি। ইহার দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের পূর্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এই কথাটি সরাসরি না বলাতে হযরত খালিদ (রা) মনে করিলেন, তাহারা অমুসলিম, তিনি তাহাদের উপর আক্রমণ শুরু করিলেন। অথচ রাসূল কারীম (স) তাহাকে যুদ্ধের নির্দেশ দেন নাই, কেবল তাবলীগের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। যাহাই হউক এই যুদ্ধে বানূ জাযীমার কয়েকজন নিহত হইল, বাকী পুরুষগণ বন্দী হইল। পরের দিন সেনাপতি খালিদ (রা) প্রত্যেক মুজাহিদকে নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ অধীনস্ত বন্দীকে হত্যা কর। কয়েকজন সাহাবী তাহার এই নির্দেশ পালনে বিরত রহিলেন। তাহারা ঘটনার বিবরণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আলোচনা করিলে রাসূল কারীম (স) ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন ঃ

اللهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد .

"হে আল্লাহ! খালিদ যাহা করিয়াছে উহার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিতেছি না" (সহীহুল বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২২)।

হযরত খালিদ (রা)-এর কর্মকাণ্ড যদিও ভুলবশতই হইয়াছে, কিন্তু নীতি বহির্ভূত এই কর্মের কারণে রাসূল কারীম (স) চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দ্রুত নিহতদের জান-মালের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য হযরত আলী (রা)-কে বানূ জাযীমার নিকট প্রেরণ করিলেন। বানূ জাযীমার লোকজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়নীতি দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন (ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৪২৮-৪৩১)।

রাসূল কারীম (স) তাঁহার সাহাবীগণকে সত্য ও ন্যায়ে অবিচলতার শিক্ষা দিয়াছেন। একদা হযরত আবূ উমারা (রা)-কে তিনি বলেন ঃ قل امنت بالله ثم استقم "বল, আমি মহান আল্লাহতে ঈমান আনিলাম, অতঃপর অবিচল থাক" (সহীহ মুসলিম, ১খ., পৃ. ৪৮)।

তিনি মু'মিনদেরকে অবিচলতা ও দৃঢ়তার তাওফীক চাহিয়া এইভাবে মহান আল্লাহ্র সমীপে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের কদম অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর" (২ ঃ ২৫০)।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

"হে আমাদের রব! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের কদম সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর" (৩ ঃ ১৪৭)।

সত্য ও ন্যায়ে অবিচলিত ও দৃঢ়পদ থাকার এই শিক্ষা সাহাবায়ে কিরাম (রা) মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে কঠিন হইতে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও তাহারা সত্য ও ন্যায়ে ছিলেন অবিচল। মহান আল্লাহ তাঁহার এই অনুগ্রহের কথা এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.

"স্মরণ কর! তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সহিত আছি। সুতরাং তোমরা মুমিনদের অবিচলিত রাখ। আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব। সুতরাং তোমরা তাহাদের স্কন্ধে ও সর্বাংগে আঘাত কর" (৮ ঃ ১২)।

قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .

"বল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে রূহুল কুদুস (জিবরীল) সত্য কুরআন নাযিল করিয়াছে মু'মিনদের চিত্তকে অবিচলিত রাখার জন্য" (১৬ ঃ ১০২)।

সত্য ও ন্যায়ে অবিচলতা ও দৃঢ়তা মহান আল্লাহ্র মহৎ অনুগ্রহবিশেষ। রাসূল কারীম (স)-এর সত্য ও ন্যায়ে নজীরবিহীন অবিচলতা সেই ইলাহী অনুদানেরই একটি অংশ। কুরআনুল কারীমে তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি এই অমূল্য অনুদানের বারবার উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا.

"আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখিলে তুমি তাহাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িতে" (১৭ ঃ ৭৪)।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ .

"রাসূলদের ঐ সকল বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, যদ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি" (১১ ঃ ১২০)।

كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا .

"আমি ক্রমে ক্রমে কুরআন নাযিল করিয়াছি তোমার হৃদয়কে উহা দ্বারা দৃঢ় মযবূত করিবার জন্য এবং তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি" (২৫ ঃ ৩২)।

সত্য ও ন্যায়ে দৃঢ়পদ ও অবিচল থাকার তাওফীকপ্রাপ্তি নির্ভর করে মহান আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্য ও সহযোগিতার উপর।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ.

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করিবেন" (৪৭ ঃ ৭)।

রাসূল কারীম (স)-এর প্রচারিত ওহীতে সত্য ও ন্যায়ে অবিচল থাকার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে এবং উহার বিনিময়ে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ. اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا جَزَآءً ۢبِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"নিশ্চয় যাহারা বলে, আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর অটল থাকে, তাহাদের কোন ভয় নাই, তাহারা দুঃখিও হইবে না। ইহারাই জান্নাতী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। ইহা তাহাদের কর্মের পুরস্কার" (৪৬ ঃ ১৩-১৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) ইমাম বুখারী, সহীহুল বুখারী, মাকতাবা রহীমিয়া, দেওবন্দ ১৩৮৪ হি., ১ ও ২ খ.; (৩) ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী ১৩৭৬ হি., ১ ও ২ খ.; (৪) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মাতবা'আ মুস্তাফা আল-বাবিল হালাবী, মিসর ১৯৫৫ খৃ.; (৫) ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, মুআসসাসাহ আর-রিসালাহ, বৈরূত ১৯৮৬; (৬) শায়খ আহমাদ বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, মাতবা'আ আশ-শারফুল ইসলামিয়্যা, কায়রো ১৯৭৭ খৃ; (৭) আবূ দাঊদ তায়ালিসী, মুসনাদ, আল-মাতবা'আতুস-সালাফিয়্যা, মিসর ১৩৮৯ হি.; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল মা'রিফা, বৈরূত ১৯৯৮ খৃ.; (৯) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, মাতবা'আ ব্রিল, লিডেন ১৩২২ হি.; (১০) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও মুহাল্লী, তাফসীরে জালালায়ন, মাতবা'আ আসাহ্হুল মাতাবি, দিল্লী তা. বি.।

মাসউদুল করীম

অহংকার ও দাম্ভিকতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নীতি

আত্মার ব্যাধিসমূহের মধ্যে অহংকার (كبر) ও দাম্ভিকতা হইল এক মারাত্মক ও জঘন্য ধরনের ব্যাধি। অহংকারের অর্থ হইল নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় জ্ঞান করা এবং অন্যকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করা। বস্তুত অহংকারী ও দাম্ভিক মানুষকে আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন না। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا.

"নিশ্চয় আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক ও অহংকারীকে" (৪ ঃ ৩৬)।

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا.

"আর পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পসন্দ করেন না" (৩১ ঃ ১৮)।

'আল্লামা শিবলী নু'মানী ও মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বলেন, অহংকারের কুফল অনেক বেশী। অহংকারী শ্রেষ্ঠ মনে করে এই কারণে যে, সে সাধারণ মানুষের সহিত উঠা-বসা পানাহার ও কথাবার্তা বলাকে নিজের মর্যাদা হানিকর মনে করে। সর্বদা তাহার এই প্রত্যাশা থাকে যে, মানুষ তাহার সামনে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকুক। যখন সে মানুষের সহিত মিলিত হয় তখন কামনা করে যে, মানুষ তাহাকে অগ্রে সালাম করুক। পথ চলার সময় সে মানুষের আগে আগে চলিতে চায় এবং মজলিসে ও অনুষ্ঠানাদিতে সে সদর (সভাপতি) হওয়ার বাসনা পোষণ করে ইত্যাদি (সীরাতুন নবী, ৬খ., পৃ. ৩৫০)।

আল-মুরশিদুল আমীন গ্রন্থে ইমাম গাযালী (র) অহংকার ও দাম্ভিকতা সম্পর্কে বলেন, অহংকার মানসিক একটি অবস্থার নাম। মানুষের আমিত্ব হইতেই এই অহংকারের জন্ম। রাসূলুল্লাহ (স) অহংকারের সামান্যতম সংশ্রব হইতেও আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন। মহানবী (স) ছিলেন বিনয়ের মূর্ত প্রতীক। তিনি নিজে দাম্ভিক ছিলেন না এবং দাম্ভিকতাকে পসন্দও করিতেন না। খাওয়া-পরা, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা এবং আচার-আচরণ কোন কিছুতেই তিনি দাম্ভিকতা ও অহংকারকে প্রশ্রয় দিতেন না। দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় এরূপে বসিয়া তিনি কখনও আহার করিতেন না। হাদীছে আছে ঃ

ان رسول الله ﷺ قال لا آكل متكئا .

"রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি হেলান দিয়া আহার গ্রহণ করি না" (সুনান ইব্ন মাজা, কিতাবুল আত'ইমা, পৃ. ২৪২)।

অপর এক হাদীছে আছে ঃ

حدثنا عبد الله بن بسر قال اهديت للنبى ﷺ شاة فجثى رسول الله ﷺ على ركبتيه ياكل فقال اعرابى ما هذه الجلسة فقال ان الله جعلنى عبدا كريما ولم يجعلنى جبارا عنيدا.

'আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে একটি বকরী হাদিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) হাঁটু গাড়িয়া উপবিষ্ট হইয়া উহা ভক্ষণ করিতেছিলেন। এক বেদুঈন বলিল, ইহা আবার কোন ধরনের বসা! তিনি বলিলেন, "আল্লাহ আমাকে ভদ্র ও বিনীত বান্দা বানাইয়াছেন, অহংকারী ও দাম্ভিক বানান নাই" (সুনান ইব্ন মাজা, আত'ইমা, বাবুল আকলি মুত্তাকিয়ান, নং ৩২৬৩)।

হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বসিয়া বাম হাতে আহার করিতেছিল। ইহা দেখিয়া নবী কারীম (স) বলিলেন, ডান হাতে খাও। সে বলিল, আমি ডান হাতে খাইতে পারি না। নবী কারীম (স) বলিলেন, তোমার শক্তি না থাকুক। বস্তুত অহংকারই তাহাকে নবী কারীম (স)-এর কথা মান্য করা হইতে বিরত রাখিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর সে আর তাহার হাত মুখ পর্যন্ত উত্তোলন করিতে সক্ষম হয় নাই (রিয়াদুস সালিহীন, বাবু তাহরীমিল কিব্‌র, পৃ. ২৭০—সূত্র সহীহ্ মুসলিম)।

হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন, ইসলামে দীক্ষিত হইবার পর যখনই আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে উপস্থিত হইতাম তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানাইতেন। আমাকে গ্রহণ করিবার সময় সর্বদা আমি তাঁহার মুখে হাসি বিচ্ছুরিত দেখিতে পাইতাম। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মুহাম্মাদ (স) অপেক্ষা অধিক বিনয়ী মানুষ তাহার চোখে পড়ে নাই। যে কোন লোকের সাথে দেখা হইলে রাসূলুল্লাহ (স)-ই প্রথম সালাম জানাইতেন এবং লোকটির কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহা ছিল তাঁহার চিরাচরিত রীতি। কোন লোক একান্তে তাঁহার সহিত কথা বলিতে চাহিলে তাঁহার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং স্বেচ্ছায় সে প্রস্থান না করা পর্যন্ত তিনি তাহার দিক হইতে কখনও মুখ ফিরাইয়া লইতেন না। কাহারও সহিত করমর্দনের সময় তিনি নিজের হাত ছাড়াইতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না লোকটি তাহার হাত ছাড়াইয়া লইত। সাহাবীগণের সহিত উপবেশন কালে তিনি এমনভাবে বসিতেন যাহাতে তাঁহাকে তাঁহাদের একজন বলিয়া মনে হইত। কখনও তিনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোন উচ্চ আসন কিংবা উচ্চ স্থানে উপবেশন করিতেন না। বৈদেশিক প্রতিনিধিদলসহ বহু লোকজন মদীনায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। অনেক সময় দেখা যাইত, তিনি মসজিদে যখন তাঁহার সহচদের সহিত একত্রে বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিতেন তখন তাঁহার সাধারণ পোশাক এবং বসিবার ধরনের কারণে তাঁহাকে চিনিয়া লওয়া প্রায়শই তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

একবার আবিসিনিয়ার সম্রাটের কয়েকজন দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। তিনি তাহাদেরকে নিজস্ব অতিথি হিসাবে তাঁহার নিজের কাছে রাখেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের সেবা করেন, এমনকি তাঁহার কাছে অবস্থান কাল পর্যন্ত তাহাদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার আয়োজন করেন। নিজের হাতেই তিনি এইসব করেন। তাঁহার সহচরগণ অতিথিবর্গের সেবার দায়িত্ব তাহাদের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিলে তিনি জবাবে বলেন, ইহারা এক সময় আবিসিনিয়ায় আশ্রয়গ্রহণকারী তাঁহার বিপন্ন বন্ধুদের সেবা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বয়ং তাঁহাকেই ইহাদের আদর-আপ্যায়নের কর্তব্য পালন করিতে হইবে (হযরত মুহাম্মদ (সা) জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৪৯-৫০)।

রাসূলুল্লাহ (স) যে বিনয়ের পূর্ণ প্রতীক ছিলেন এবং তিনি যে অহংকার বর্জন করিয়া চলিতেন নিম্নোক্ত ঘটনা হইতেও তাহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (স) 'উকবা ইব্ন 'আমর (রা)-কে সঙ্গে লইয়া একটি সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন তখন উষ্ট্রের পৃষ্ঠে। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি 'উকবা (রা)-কে তাঁহার পালা হিসাবে জন্তুযানে আরোহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু 'উকবা (রা) ব্যাপারটিকে তাহার জন্য অসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। কারণ আল্লাহ্র রাসূল (স) পায়ে হাঁটিয়া চলিবেন, আর তিনি উটের পিঠে বসিয়া আরাম করিবেন, ইহা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) উটের পিঠ হইতে নামিলেন এবং 'উকবা (রা)-কে বাধ্য করিলেন তাঁহার জায়গায় আসন গ্রহণ করিতে (হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৫০)।

রাসূলুল্লাহ (স) নিজে অহংকার হইতে বাঁচিয়া থাকার পাশাপাশি মানুষকেও অহংকার হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য আদেশ করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে লোকদেরকে সতর্ক করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

لايدخل النار احد فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان ولا يدخل الجنة احد فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر.

"এমন কোন লোক জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না যাহার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে। এমন কোন ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করিবে না যাহার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকিবে" (সহীহ মুসলিম, ১খ., পৃ. ৬৫)।

لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبره فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.

"যাহার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। এক ব্যক্তি বলিল, প্রত্যেক ব্যক্তিই তো ইহা পসন্দ করে যে, তাহার কাপড় সুন্দর হউক এবং তাহার জুতা জোড়া সুন্দর হউক। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ নিজেও সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দও

করেন (অহংকার হইল দম্ভভরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান করা" (সহীহ মুসলিম, ১খ., পৃ. ৬৫)।

উপরিউক্ত হাদীছের দার্শনিক কারণ বিশ্লেষণ করত ইমাম গাযালী (র) বলিয়াছেন— মুসলমানদের সুনির্দিষ্ট যে আখলাক রহিয়াছে তাহা হইল জান্নাতের দরজা, কিন্তু অহংকার এই সকল দরজাকে বন্ধ করিয়ছ দেয়। এই কারণেই যাহার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে৮না (সীরাতনে নবী, ৬খ., পৃ. ৩৫১)।

নিজের নামের সহিত লম্বা লম্ব" লকব বা উপাধি যোগ করিয়া দেওয়া উচিত০নহে। কেননা এই সকল উপাধি যদি বাস্তবতার বিপরীত হয় তবে তাহা সর্বৈব মিথ্যা, আর যদি বাস্তবসম্মতও হয় তবুস্ক তাহা অহংকার ও দাম্ভিকতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। কতিপয় অনারব বাদশাহ অহংকারবশে নিজেদেরকে ملك الاملاك তথা শাহানশাহ্ বা রাজাবিধরাজ বলিয়া অভিহিত করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহা অপসন্দ করেন। তিনি বলেন —

ان اخنى الاسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الاملاك.

"আল্লাহ্র নিকট কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তির নাম সবচেয়ে ঘৃণিত যে তাহার নিজের নাম ধারণ করিয়াছে শাহানশাহ বা রাজাবিধরাজ" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৯১৬, আদাব, বাব আবগাদি'ল আসমা ইলাল্লাহ, নং ৬২০৫-৬; মুসলিম, আদাব, নং ২০, ২১; আবূ দাউদ, আদাব, বাব ৬২; তিরমিযী, আদাব, বাব ৬৫)।

বস্তুত অহংকার মানুষকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু বিনয় ও নম্রতা মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন ঃ

الا اخبركم باهل الجنة كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر

"আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী মানুষ সম্পর্কে অবহিত করিব না? তাহারা হইল ঐ সমস্ত লোক যাহারা দুর্বল ও অসহায় এবং যাহাদেরকে দুর্বল ও অসহায় মনে করা হয়। তাহারা যদি আল্লাহ্র নামে শপথ করে তবে তিনি তাহা নিশ্চয় পূর্ণ করিয়া দেন। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করিব না? তাহারা হইল রূঢ় স্বভাব ও কঠিন হৃদয়সম্পন্ন দাম্ভিক মানুষ" (মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৩৩)।

আল্লাহ তা'আলা অহংকারী ও দাম্ভিক মানুষের প্রতি রহমতের নজরে তাকাইবেন না এবং তাহাকে পরিশোধিতও করিবেন না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

ثلثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولايزكيهم وفى رواية ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر .

"তিন শ্রেণীর মানুষ এমন যাহাদের সহিত আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলিবেন না, তাহাদেরকে পবিত্র করিবেন না, অপর এক বর্ণনামতে তাহাদের প্রতি রহমতের নজরে

তাকাইবেন না এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তদ শাস্তি ঃ (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী; (২) মিথ্যাবাদী শাসক ও (৩) অভাবী অহংকারী” (মিশকাত, বাবুল গাদবি ওয়াল-কিব্‌র, পৃ. ৪৩৩)।

হাদীছে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

الكبرياء دراثى والعظمة ازارى فمن نازعنى واحدا منهما ادخلته النار ·

“অহংকার আমার চাদর এবং মহত্ত্ব আমার ভূষণ। কেহ যদি এই দুইটির কোন একটি লইয়া আমার সহিত টানাটানি করে তবে আমি তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব” (মিশকাত বাবুল গাদবি ওয়াল-কিব্‌র, পৃ. ৪৩৩)।

অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب فى الجبارين فيصيبه ما اصابهم ·

“কোন মানুষ এমনভাবে আত্মগর্বে লিপ্ত হয় যে, অবশেষে তাহার নাম উদ্ধত অহংকারীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হইয়া যায়। ফলে তাহার উপর ঐ আযাব আপতিত হয় যাহা তাহাদের (অহংকারীদের) উপর আপতিত হইয়া থাকে” (মিশকাত, বাবুল গাদবি ওয়াল-কিব্‌র, পৃ. ৪৩৩)।

কিয়ামতের দিন দাম্ভিক ও অহংকারী লোকদেরকে “বাওলাস” নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে এবং অপমান চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া লইবে। নবী করীম (স) বলেন—

يحشر المتكبرون امثال الذى يوم القيامة فى صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن فى جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الانيار يسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال ·

“কিয়ামতের দিন অহংকারী ও দাম্ভিক লোকদিগকে পিপীলিকার আকারে জড়ো করা হইবে এবং তাহাদের আকৃতি ও অবয়ব হইবে মানুষের ন্যায়। অপমান তাহাদেরকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া লইবে। 'বাওলাস' নামক জাহান্নামের দিকে তাহাদেরকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। আগুনের অগ্নিশিখা তাহাদেরকে আচ্ছাদিত করিবে। আর তাহাদেরকে পান করানো হইবে জাহান্নামীদের দেহ নিংড়ানো কদর্য পূঁজ রক্ত” (মিশকাত, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪)।

অহংকারী ব্যক্তি মানুষের কাছে তুচ্ছ, এমনকি কুকুর ও শূকর অপেক্ষা ঘৃণিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। হাদীছে আছে ঃ

عن عمر قال وهو على المنبر يايها الناس تواضعوا فانى سمعت رسول الله ﷺ يقول من تواضع لله رفعه الله فهو فى نفسه صغير وفى اعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو فى اعين الناس صغير وفى نفسه كبير حتى لهو اهون عليهم من كلب او خنزير ·

"হযরত 'উমার (রা) মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা বিনয়ী হও। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন। সে নিজের কাছে ছোট কিন্তু মানুষের চোখে বড় হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ তাহাকে হেয় করিয়া দেন। সে মানুষের নজরে তুচ্ছে পরিণত হয়, কিন্তু নিজের কাছে বড় মনে হয়। পরিশেষে সে মানুষের কাছে কুকুর কিংবা শূকর অপেক্ষা ঘৃণিত হয়" (মিশকাত, ১খ., পৃ. ৪৩৪)।

এক দীর্ঘ হাদীছে দাম্ভিকতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন, সেই বান্দাই সর্বাপেক্ষা মন্দ যে নিজেকে অন্যের চাইতে ভাল মনে করে ও আত্মগরিমায় লিপ্ত হয় এবং সুমহান পরাক্রমশালী সত্তার কথা ভুলিয়া যায়।........ সেই বান্দাই সর্বপেক্ষা মন্দ, যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং সীমালংঘন করে আর নিজেকে ও শেষ পরিণতিকে ভুলিয়া যায় (মিশকাত, ১খ., পৃ. ৪৩৪)।

উল্লেখ্য যে, অহংকার এবং দাম্ভিকতার কারণ অনেক। তবে মানুষ সাধারণত যেইসব কারণে অহংকার করে তাহা হইল বংশকুল, মাল-দৌলত, রূপ-সৌন্দর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, সন্তান- সন্তুতি ইত্যাদি। কুরআনে এই সবের হাকীকত এবং প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ পূর্বক এইগুলি হইতে দূরে থাকার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ (স) যেহেতু কুরআনেরই বাস্তব নমুনা ছিলেন তাই তিনি অহংকারের যাবতীয় উপকরণ হইতে বাঁচিয়া থাকিতেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও এইসব মন্দ স্বভাব হইতে বাঁচিয়া থাকার আদেশ করিতেন। সর্বোপরি কি কি কাজ করিলে অন্তর হইতে অহংকার দূরীভূত হইতে পারে সেই পথও তিনি বলিয়া দিয়াছেন। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের অহংকারের বিষয় ছিল বংশকুলের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। ইসলাম কৌলিণ্যের এই অহেতুক ধারণাকে ধূলিসাত করিয়া দিয়াছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে; পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন" (৪৯ ঃ ১৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণ করত বলেন, মানুষের উচিত নিজেদের মৃত পূর্বপরুষদেরকে লইয়া গর্ব করা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা। কেননা তাহারা তো জাহান্নামের কয়লা হইয়া গিয়াছে অথবা গোবরের কীট, যাহা নিজের মুখে নাপাক বস্তু বহন করিয়া চলে— তাহা অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা জাহিলী যুগের অহংকার এবং পিতৃপুরুষদের বিষয়ে গর্ব করাকে মিটাইয়া দিয়াছেন। এখন শুধু দুই শ্রেণীর মানুষ আছে— (১) পরহেযগার

মু'মিন, (২) গুনাহগার পাপী মানুষ। জানিয়া রাখিও, মানুষ সকলেই আদম সন্তান। আর আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী সূত্র আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৫৭৩-৫৭৪)।

পোশাক-পরিচ্ছদের কারণেও মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়। যেই পোশাক পরিধান করিলে অহংকার সৃষ্টি হয় তাহা বর্জন করার ব্যাপারে শারী'আতে তাকীদ করা হইয়াছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰبَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

"হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে" (৭ ঃ ২৬)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ

اياكم والكبر فان الكبر يكون فى الرجل وان عليه العباءة .

"সাবধান! তোমরা অহংকার হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। আবা (মূল্যবান পোশাক) পরিহিত অবস্থায়ও ব্যক্তির মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হইয়া থাকে" (তাবারানী, সূত্র আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৫৬১)।

এমনিভাবে যেই তরীকায় জামা-কাপড় পরিধান করিলে অহংকার সৃষ্টি হয় তাহাও শারী'আতে পরিত্যাজ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لاينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء .

"আল্লাহ সেই ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাইবেন না যে অহংকারের সহিত তাহার পরিধেয় টানিয়া হেঁচড়াইয়া চলে" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৬০)।

كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير اسراف ولا مخيلة .

"তোমরা খাও, পান কর, পরিধান কর এবং সাদাকা কর, তবে অপচয় করিও না এবং অহংকার প্রকাশ করিও না" (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৮৬০)।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স) অহংকার দূর করার আরও কিছু পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

ما استكبر من اكل معه خادمه وركب الحمار بالاسواق واعتقل الشاة فحلبها .

"যেই ব্যক্তির সহিত তাহার খাদেম আহার করে, যে গাধায় চড়িয়া বাজারে যায় এবং নিজ হাতে বকরী বাঁধিয়া উহার দুগ্ধ দোহন করে সে দাম্ভিক বা অহংকারী নয়" (আল- আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১৪৫)।

হযরত জুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলে যে, আমার মধ্যে অহংকার এবং দাম্ভিকতা আছে। অথচ আমি গাধায় আরোহণ করি, চাদর ব্যবহার করি এবং নিজ হাতে বকরীর দুগ্ধ দোহন করি। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এই কাজগুলি করিবে তাহার মধ্যে কোন অহংকার থাকিতে পারে না (তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২০)।

মোটকথা, অহংকার যেই কারণেই হউক ইহার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ। তাই রাসূলুল্লাহ (স) ইহা হইতে সর্বতোভাবে পরহেয করিয়া চলিয়াছেন এবং অন্যদেরকেও ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকার ব্যাপারে কঠিন ভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম; (২) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস-সাহীহ, মুখতার এ্যান্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত, প্রকাশকাল ১৯৮৫ খৃ.; (৩) ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (র), সহীহ মুসলিম, মাকতাবা আশরাফিয়া, দেওবন্দ, আশরাফী বুক ডিপো, সাহারানপুর, ইণ্ডিয়া, ১খ., পৃ. ৬৫; (৪) ইমাম আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত-তিরমিযী (র), জামি তিরমিযী, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ, ভারত ২খ.; (৫) ইমাম ইব্ন মাজা (র), সুনান ইব্ন মাজা, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ, ভারত; (৬) শায়খ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আল-খাতীব (র), মিশকাতুল মাসাবীহ, মি'রাজ বুক ডিপো, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত; (৭) হাফিজ মুহ্‌য়িদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা (র), রিয়াদুস সালিহীন, ইদারা ইশা'আতে দীনিয়াত, নয়া দিল্লী, ভারত, পৃ. ২৭০-২৭১; (৮) হাফিজ যাকীয়্যুদ্দীন আল-মুনযিরী (র), আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, দারুল ফিক্র, প্রকাশকাল ১৯৮৮ খৃ., ৩খ.; (৯) আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) ও আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদবী (র), সীরাতুন নবী (স), দারুল ইশা'আত, উর্দূ বাজার, করাচী, পাকিস্তান, প্রকাশকাল ১৯৮৫ খৃ., ৬খ.; (১০) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (র), আল-আদাবুল মুফরাদ, আল-মাকতাবাতুল আছারিয়্যা; (১১) মাওলানা আশিকে ইলাহী (র), যাদুত তালিবীন, আশরাফিয়া লাইব্রেরী, জামিয়া মার্কেট, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, পৃ.৭; (১২) ইমাম গাযালী (র), আল-মুরশিদুল আমীন, বাংলা সং., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ১৯৮৬ খৃ.; (১৩) আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ১৯৮৯ খৃ., পৃ. ৪৯-৫৯।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) বা লোক দেখানো মনোভাব

রিয়া (رياء) শব্দটির আভিধানিক অর্থ লোক দেখানো ভাব। শারী'আতের পরিভাষায় রিয়া বলা হয় ঃ

ترك الاخلاص فى العمل بملا حظة غير الله اوعمل الغير لاراءة الغير ٠

"মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কর্মে একনিষ্ঠতা (اخلاص) ত্যাগ করা অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশে সৎ কর্ম করা" (কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, পৃ. ৩১১)।

ইমাম গাযালী (র) বলেন, রিয়ার হাকীকত হইল ব্যক্তির কোন নেক আমল করার প্রাক্কালে এই উদ্দেশ্য পোষণ করা যে, লোকে তাহার আমল দেখুক এবং মানুষের মধ্যে তাহার সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রকাশিত হউক। এইরূপে চালচলনেও রিয়া প্রকাশিত হইতে পারে। যেমন মোটা মোটা কাপড় পরিধান করা; চেহারার রং ফ্যাকাশে করিয়া ফেলা, চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করিয়া রাখা, কথাবার্তা অস্পষ্ট স্বরে বলা অগ্রে, সালাম প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা; পথ চলার সময় মানুষের আগে আগে চলা, ধীরে ধীরে চলা, এলোমেলো চুল রাখা ইত্যাদি। এইগুলিও এক প্রকারের রিয়া। কাজেই মানুষের সামনে নিজের আভিজাত্য ও বড়ত্ব জাহির করার জন্য এবং লোক দেখানোর নিমিত্ত এইরূপ ভাব অবলম্বন করা হারাম।

অনুরূপভাবে আলিমদের অতিরঞ্জন করিয়া কথা বলা যাহাতে মানুষ তাহাদের ইলমের উপর আস্থাশীল হয়, তাহাও নিষিদ্ধ। অবশ্য কেহ যদি দীনী বিষয়কে ভালভাবে বুঝাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত এইরূপ করে তবে তাহা জায়েয।

এমনিভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রেও রিয়া হইতে পারে। যেমন কাহারও প্রকাশ্যে সালাত আদায় করার সময় দীর্ঘ রুকূ-সিজদা করা, যাহাতে মানুষ তাহাকে আবিদ ও পরহেযগার বলিয়া মনে করে। ইবাদতে রিয়ার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। যদি ইবাদত দ্বারা রিয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে এই ইবাদত অবশ্যই বাতিল গণ্য হইবে। যদি ইবাদতের নিয়তের সহিত রিয়াও যুক্ত থাকে এবং তাহাই অধিক হয় তবে ইহাতেও ইবাদত বিনষ্টের প্রবল আশংকা রহিয়াছে। যদি উভয়টিই সমান হয় তবে তদ্দ্বারা লাভ-ক্ষতি কোনটাই হইবে না, অবশ্য ইবাদতের প্রতিদানে কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হইবে। আর যদি ইবাদতের নিয়তের সহিত রিয়ার কিছুটা সংমিশ্রণ থাকিলেও ইবাদতের নিয়তই প্রবল থাকে তবে এই রিয়ার কারণে ইবাদতের মৌলিকত্বের কোন ক্ষতি হইবে না। অবশ্য ছওয়াব কম হওয়ার আশংকা রহিয়াছে এবং এই রিয়ার কারণে শাস্তি ভোগ করারও আশংকা রহিয়াছে।

স্মর্তব্য যে, রিয়া যদি মূল ঈমানের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া পড়ে, তবে ইহা মুনাফিকীরূপে গণ্য হইবে। জাহান্নামের অতল গহ্বর তাহার জন্য নির্ধারিত আছে। আর যদি দীনের মৌলিক

বিষয়াদি ও ফরযসমূহে রিয়া যুক্ত হয় তবে ইহাও গুরুতর অপরাধ। অবশ্য পূর্বোক্ত গুনাহের তুলনায় উহা একটু লঘু। আর যদি নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়া যুক্ত হয় তবে তাহাও পাপ বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু এই পাপ পূর্বোক্ত পাপের তুলনায় সামান্য হালকা হইবে।

উল্লেখ্য যে, রিয়া দুই প্রকার ঃ (১) রিয়া জলী (رياء جلى = প্রকাশ্য রিয়া) ও (২) রিয়া খাফী (رياء خفى = অপ্রকাশ্য বা সূক্ষ্ম রিয়া)। পূর্বে প্রকাশ্য রিয়ার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে সূক্ষ্ম রিয়া হইল লোক দেখানোর উদ্দেশে নহে, বরং ইবাদত করার সময় মনে মনে এইরূপ খেয়াল করা যে, মানুষ তাহার ইবাদত সম্পর্কে অবগত হউক এবং তদ্দ্বারা তাহার অন্তরে আনন্দ অনুভূত হউক (আল-মুরশিদুল আমীন, পৃ. ২৯২-২৯৫)।

রিয়া প্রকাশ্য অথবা গোপন হউক, ইসলামে ইহার কোনই সুযোগ নাই। সব ধরনের রিয়াই নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। মুসলমানের প্রতিটি কাজ হইতে হইবে একমাত্র মহান আল্লাহ্র জন্য। মহান আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার নিয়তই হইবে মুসলমানদের প্রতিটি কাজের মূল চালিকাশক্তি। একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশেই যেন প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়, তজ্জন্য ইসলামী শরী'আতে বিশেষ তাকীদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ·

"তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন" (৯৮ ঃ ৫)।

পক্ষান্তরে কেহ যদি লোক দেখানোর জন্য কোন আমল করে, এমনকি সালাত আদায় করে, তবে উহা তাহার জন্য দুর্ভোগ টানিয়া আনিবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ.

"সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে" (১০৭ ঃ ৪-৫-৬)।

দান-সাদাকা বড়ই নেকীর কাজ। কিন্তু কেহ যদি লোক দেখানোর জন্য দান-সাদাকা করে তবে উহা বাতুলতায় পর্যবসিত হইবে। ইহাতে দানকারী কোনই ছওয়াব পাইবে না। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা দানের কথা বলিয়া বেড়াইয়া এবং ক্লেশ দিয়া তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করিও না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করিয়া থাকে এবং যে আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তাহার উপমা একটি মসৃণ পাথর যাহার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তাহার উপর পতিত প্রবল বৃষ্টিপাত উহাকে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দেয়। যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদের কাজে লাগাইতে পারিবে না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না" (২ ঃ ২৬৪)।

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطَانُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا.

"এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাহাদেরকে ভালবাসেন না। আর শয়তান কাহারও সঙ্গী হইলে সেই সঙ্গী কত মন্দ" (৪ ঃ ৩৮)!

এমনিভাবে জিহাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও রিয়া পসন্দনীয় নহে। ইহার কারণে আমল অসার ও ফলশূন্য হইয়া যায়। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ.

"তোমরা তাহাদের ন্যায় হইবে না যাহারা দম্ভভরে ও লোক দেখাইবার জন্য স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল এবং লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন" (৮ ঃ ৪৭)।

লোক দেখানোর উদ্দেশে কৃত কর্মের পরিণাম হইল জাহান্নাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن قال واد فى جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم اربع مأة مرة قيل يارسول الله ومن يدخلها قال القراء المراءون باعمالهم.

"তোমরা জুববুল হুয্ন হইতে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাও। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জুববুল হুয্ন কি? তিনি বলিলেন, ইহা জাহান্নামের একটি প্রান্তর যাহা হইতে জাহান্নাম দৈনিক চার শতবার নিরাপদ আশ্রয় চাহিয়া থাকে। সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতে কাহারা প্রবেশ করিবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উহাতে ঐ সকলকারী প্রবেশ করিবে যাহারা দেখাইবার উদ্দেশে আমল (তথা আল-কুরআন তিলাওয়াত) করিয়াছে" (সুনান ইব্ন মাজা, পৃ. ২৩; মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ২৮)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কিয়ামতের দিন (রিয়াকারদের মধ্যে) প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার হইবে সে হইবে একজন শহীদ।

তাহাকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির করা হইবে এবং আল্লাহ তাহাকে (দুনিয়াতে প্রদত্ত) আপন নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন। আর (তখন) তাহারও ঐ নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ হইবে এবং মনে পড়িবে। অতঃপর তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি এই নিয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়ায় কি কি কাজ করিয়াছ? সে বলিবে, আপনাকে (আল্লাহ্‌কে) সন্তুষ্ট করার জন্য আপনার প্রদর্শিত পথে আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছি, এমন কি শেষ পর্যন্ত আমি শহীদ হইয়াছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, বরং তুমি তো এইজন্য লড়াই করিয়াছিলে যে, তোমাকে বীরপুরুষ বলা হইবে। আর তোমাকে উহা বলাও হইয়াছে। অতঃপর তাহার সম্পর্কে (ফেরেশ্‌তাদেরকে) আদেশ দেওয়া হইবে এবং তাহাকে অধঃমুখী করিয়া টানিতে টানিতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

তখন এমন এক ব্যক্তিরও বিচার করা হইবে যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে এবং অপরকে উহা শিক্ষাও দিয়াছে এবং আল-কুরআনও পড়িয়াছে। তাহাকে মহান আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত করার পর প্রথমে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে স্বীয় নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং সেও উহা স্মরণ করিবে অর্থাৎ এইগুলির কথা তাহারও মনে পড়িবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি এই সকল নিয়ামতের বিনিময়ে কি কি কাজ করিয়াছ? সে জবাব দিবে, আমি ইল্‌ম শিখিয়াছি, অপরকে উহা শিক্ষা দিয়াছি এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল-কুরআন পড়িয়াছি। তখন আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, বরং তুমি তো বিদ্যা শিখিয়াছ এইজন্য যাহাতে তোমাকে আলিম (বিদ্যান) বলা হইবে এবং এইজন্য আল-কুরআন পড়িয়াছ, যাহাতে তোমাকে কারী বলা হইবে। আর উহা তো বলাই হইয়াছে। অতঃপর (ফেরেশ্‌তাদেরকে) তাহার সম্পর্কে আদেশ করা হইবে। সেই প্রেক্ষিতে তাহাকে উপুড় করিয়া টানিতে টানিতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

তখন এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হইবে যাহাকে আল্লাহ তা'আলা বহু প্রাচুর্য দান করিয়াছিলেন এবং তাহাক সর্বপ্রকার ধন-দৌলত দিয়াছিলেন। তাহাকে মহান আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত করা হইবে। ইহার পর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে স্বীয় নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং তাহারও এইগুলির কথা স্মরণ হইবে অর্থাৎ এইগুলির কথা তাহার মনে পড়িবে। অতঃপর তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি এইসব নিয়ামতের বিনিময়ে কি কি কাজ করিয়াছ? সে বলিবে, এমন কোন রাস্তা অর্থাৎ ক্ষেত্র ছিল না যাহাতে দান করা আপনি পসন্দ করিতেন না। আমি আপনার অপসন্দনীয় ক্ষেত্রে দান করি নাই। এই জবাব শুনিয়া তিনি বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। বরং তুমি তো এইজন্য দান করিয়াছ যাহাতে তোমাকে বলা হয়, "সে বড় দানবীর।" আর তাহা তো বলাই হইয়াছে। ইহার পর তাহার সম্পর্কেও (ফেরেশতাদেরকে) আদেশ দেওয়া হইবে। সে মতে অধ মুখী করিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে (সহীহ মুসলিম, সূত্র মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৩৩)।

সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা গ্রন্থে আছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) উক্ত হাদীছটি বর্ণনার প্রাক্কালে তিনবার বেহুঁশ হইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত বর্ণনায় অতিরিক্ত এই কথাও উল্লেখ রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন ঃ

يا ابا هريرة اولئك الثلاثة اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة.

"হে আবূ হুরায়রা! আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে এই তিন ব্যক্তিই হইল এমন, যাহাদের দ্বারা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইবে" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১খ., পৃ. ৬২-৬৩)।

মানুষকে দেখানো ও শুনানোর উদ্দেশে কেহ যদি ইবাদত ও সৎ কাজ করে তবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার এই অসৎ নিয়তের কথা সমস্ত মানুষকে জানাইয়া দিবেন। নবী করীম (স) বলেন ঃ

من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به.

"কোন ব্যক্তি যদি ইবাদত বা সৎকাজ মানুষকে শুনানোর উদ্দেশে করিয়া থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহা অর্থাৎ তাহার অসৎ নিয়তের কথা লোকদেরকে শুনাইয়া দিবেন। আর কোন ব্যক্তি যদি ইবাদত বা সৎ কাজ লোক দেখানোর উদ্দেশে করিয়া থাকে তবে আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের দিন তাহা লোকদের কাছে প্রকাশ করিয়া দিবেন" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৯৬২)।

হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন কতিপয় মানুষের ব্যাপারে জান্নাতের আদেশ দেওয়া হইবে। অতঃপর যখন তাহারা জান্নাতের কাছাকাছি পৌঁছিয়া জান্নাতের মৃদুমন্দ বায়ুর ঘ্রাণ লইবে, জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ দেখিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তথায় জান্নাতী মানুষের জন্য যে নিয়ামতসমূহ তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবে তখন আকস্মিকভাবে ঘোষণা করা হইবে, তাহাদেরকে ঐদিক হইতে ফিরাইয়া দাও। জান্নাতে তাহাদের কোন অংশ নাই। তখন তাহারা সেখান হইতে লাঞ্ছিত ও দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। অতঃপর তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি জান্নাতে আপনার বন্ধুদের জন্য যে নিয়ামত এবং যে পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন তাহা আমাদেরকে দেখাইবার পূর্বেই যদি আমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করিতেন, তবে উহা আমাদের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ হইত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, আমি তো ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ করিয়াছি। কারণ নির্জন অবস্থায় তোমরা বড় বড় পাপকার্য সম্পাদন করিতে। আর লোকালয়ে থাকিতে অত্যন্ত বিনয়ী অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয়ে প্রকম্পিত মানুষ হিসাবে। উদ্দেশে হইল মানুষকে দেখানো। এই অবস্থা তোমাদের মানসিক অবস্থার পরিপন্থী ছিল। তোমরা মানুষকে ভয় করিতে, কিন্তু আমাকে ভয় করিতে না। তোমরা মানুষকে বড় মনে করিতে, কিন্তু আমাকে বড় মনে করিতে না। মানুষকে খুশী করার উদ্দেশে অনেক কিছু বর্জন করিতে, কিন্তু আমার জন্য কিছুই বর্জন করিতে না। পরকালের পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি আজ আমি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করাইব (তাবারানী, বায়হাকী, সূত্র আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১খ., পৃ. ৭২)।

মানুষ যখন লোক দেখানোর উদ্দেশে কোন কাজ করে তখন তাহার এই কাজে আল্লাহ্কে রাযী-খুশী করার কোন মনোবৃত্তি থাকে না বরং তখন পার্থিব কোন স্বার্থই তাহার সামনে

বিদ্যমান থাকে। এই কারণে রিয়াকে কুরআন ও হাদীছে শিরকে খফী (شرك خفى) ও শিরকে আসগার (شرك اصغر) অর্থাৎ ছোট শিরক বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। ইমাম হাকেম (র) তৎসংকলিত আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থে হযরত ইব্ন আব্বাস (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, জনৈক মুসলমান আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিত এবং মনে মনে কামনা করিত যেন জনসমাজে তাহার শৌর্য-বীর্য প্রকাশিত হয়। তাহার সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছে ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَداً.

"সুতরাং যে তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎ কর্ম করে এবং তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে" (১৮ ঃ ১১০)।

ইব্ন আবী হাতিম ও ইব্ন আবিদ-দুন্য়া (র) কিতাবুল ইখলাসে তাঊস (র) হইতে বর্ণনা করেন, জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বলিলেন, আমি মাঝে মধ্যে যখন কোন সৎ কর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি তখন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু সাথে সাথে এই কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়। আবূ নু'আয়ম (র) তারীখে আসাকির গ্রন্থে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত জুনদুব ইব্ন সুহায়ব (রা) যখন নামায পড়িতেন, রোযা রাখিতেন অথবা দান-খয়রাত করিতেন এবং এইসব আমলের কারণে লোকদেরকে তাহার প্রশংসা করিতে দেখিতেন তখন মনে মনে আনন্দিত হইতেন। ফলে আমল আরও বাড়াইয়া দিতেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। উক্ত রিওয়ায়াতসমূহের সারমর্ম হইল, উপরিউক্ত আয়াতে রিয়াকারী ব্যক্তিদেরকে গোপন শিরক হইতে নিবৃত্ত থাকার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত, পৃ. ৮২৯)।

হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন, ব্যয় কর কিন্তু খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করিও না। নিজের ব্যক্তিত্বকে এই উদ্দেশে উঁচু করিও না যে, মানুষ তোমার মহিমা কীর্তন করিবে, তোমাকে জানিবে ও চিনিবে, বরং নাখোশ থাক, লুকাইয়া থাক, তবেই নিরাপদ থাকিবে।

ইবরাহীম ইব্ন আদহাম (র) বলেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি ভালবাসিয়াছে, সে যেন আল্লাহকে বিশ্বাস করে নাই। হযরত তালহা (রা) একদল লোককে তাঁহার পিছনে হাঁটিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, এইগুলি মধু পোকা আর পতঙ্গের ঝাঁক। সুলায়মান ইব্ন হানযালা (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা)-এর পিছনে পিছনে যাইতেছিলাম। হযরত উমার (রা) এতদ্দর্শনে ক্ষিপ্ত হইয়া চাবুক উত্তোলন করিলেন। ইহা দেখিয়া উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইহা কি করিতেছেন? হযরত উমার (রা) বলিলেন, ইহা অনুসরণকারীর জন্য অবমাননাকর এবং অগ্রগামী ব্যক্তির জন্য আশংকাজনক। হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত ইব্ন মাস'উদ (রা) নিজ গৃহ হইতে বাহির হইলেন, তখন বহু লোক তাঁহার সঙ্গী হইয়া চলিল। তিনি তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা আমার পিছনে পিছনে কেন আসিতেছ? যদি তোমরা ইহা জানিতে যে, আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থা কি, তবে

তোমাদের কেহই এইভাবে আমার পিছনে পিছনে আসিতে না। হাসান (রা) বলেন, পশ্চাদানুসরণকারীদের জুতার শব্দ এমনি বস্তু যাহার প্রতিক্রিয়া হইতে সম্ভবত কেহই রেহাই পাইতে পারে না (আল-মুরশিদুল আমীন, পৃ. ২৮০-২৮১)।

রিয়া যে শিরকে খফী এই কথাটি বহু হাদীছে বিবৃত হইয়াছে। হযরত যায়দ ইব্ন আসলাম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, একদা হযরত উমার (রা) নিজ গৃহ হইতে মসজিদের উদ্দেশে বাহির হইলেন। অতঃপর দেখিলেন, হযরত মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবরের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছেন। হযরত উমার (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, সামান্যতম রিয়াও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কোন বন্ধুর সহিত শত্রুতা পোষণ করিল সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত লুক্কায়িত মুত্তাকী পুণ্যবান লোকদেরকে অধিকতর ভালবাসেন, অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহাদের কেহ সন্ধান করে না এবং উপস্থিত থাকিলে কেহ তাঁহাদেরকে চিনে না, অথচ তাঁহাদের অন্তর হিদায়াতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। তাঁহারা সর্বপ্রকার কলুষতা, যুলুম ও অবিচার হইতে মুক্ত (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১খ., পৃ. ৬৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.

"সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর বস্তু, যাহা হইতে আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করি তাহা হইতেছে শিরকে আসগার (ক্ষুদ্র শিরক)। লোকজন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! শিরকে আসগার কোন্টি ? তিনি বলিলেন, রিয়া। অতঃপর নবী করীম (স) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন যখন বান্দাদের আমলের প্রতিদান দিবেন তখন এক শ্রেণীর আমলকারীকে বলিবেন, দুনিয়াতে যাহাদেরকে দেখাইতে অর্থাৎ দেখাইবার জন্য আমল করিতে তাহাদের নিকট যাও। দেখ, তাহাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কি না" (আত-তারগীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯)।

ان اخوف ما اتخوف على امتى الاشراك بالله اما انى لست اقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن اعمالا لغير الله وشهوة خفية.

"সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর বস্তু, যাহা হইতে আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে ভয় করি তাহা হইতেছে আল্লাহ্র সহিত শিরক করা। আমি এই কথা বলি না যে, তাহারা চন্দ্র, সূর্য ও প্রতিমা পূজা করিবে, বরং তাহারা গায়রুল্লাহ্র জন্য আমল করিবে এবং সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষায় আক্রান্ত থাকিবে" (সুনান ইব্ন মাজা, পৃ. ৩২০)।

গায়রুল্লাহ্র উদ্দেশে কৃত ও সম্পাদিত আমলের সহিত আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নাই। হাদীছে কুদ্সীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لى عملا اشرك فيه غيرى فانا منه برىء وهو الذى اشرك.

"আমি শরীকদের শিরক হইতে অতি উর্ধ্বে। কেহ যদি আমার উদ্দেশে কোন নেক কাজ করে এবং ইহাতে আমি ব্যতীত অন্য কাহাকেও শরীক করে তবে ইহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই অর্থাৎ শিরককারী ব্যক্তির সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই" (সুনান ইব্ন মাজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০)।

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন ঃ

اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان شرك فى عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فان الله اغنى الشركاء عن الشرك.

"যখন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে কিয়ামতের দিন একত্র করিবেন, যেই দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিরেন, যেই ব্যক্তি নিজের সেই আমলের সহিত যাহা আল্লাহ্র জন্য করিয়াছে, অন্য কাহাকেও শরীক করিয়া লইয়াছে, সে যেন উহার ছওয়াব ঐ গায়রুল্লাহ্র কাছেই দাবি করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা শরীকদের শিরক হইতে মুক্ত" (সুনান ইব্ন মাজা, পৃ. ৩২০)।

রিয়ার বিষয়টি মসীহ দাজ্জাল হইতেও ভীতিপ্রদ ও ভয়ংকর। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা আমরা মসীহ্ দাজ্জালের কথা আলোচনা করিতেছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মাঝে আগমন করিলেন এবং বলিলেন, আমার মতে তোমাদের জন্য যেই বিষয়টি মসীহ্ দাজ্জাল হইতেও অধিক ভীতিপ্রদ ও ভয়ংকর, আমি কি তোমাদেরকে সেই বিষয়ে অবহিত করিব না? রাবী বলেন, আমরা বলিলাম, হাঁ, অবশ্যই অবগত করাইবেন। তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইল শিরকে খফী (شرك خفى) তথা সূক্ষ্ম শিরক অর্থাৎ মানুষ সালাত আদায়ের উদ্দেশে দাঁড়ায় এবং সুন্দরভাবে সালাত আদায় করে, আবার দেখিতে থাকে যে, অন্য লোকজন তাহাকে দেখিতেছে বা তাহার দিকে তাকাইতেছে কি না (সুনান ইব্ন মাজা, পৃ. ৩২০)।

হযরত মু'আয (রা) হইতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হইতে আপনি সরাসরি যে হাদীছটি শ্রবণ করিয়াছেন তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন। এই কথা শুনিয়া হযরত মু'আয (রা) এত বেশী কাঁদিলেন যে, আমার মনে হইতেছিল, তিনি হয়ত আর শান্ত হইবেন না। দীর্ঘক্ষণ পর তিনি শান্ত হইয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, হে মু'আয! জবাবে আমি বলিলাম, لبيك (উপস্থিত আছি), আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীকৃত হউক! অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে একটি হাদীছ শুনাইতেছি, যদি তুমি উহা স্মরণ রাখ, তবে

ইহাতে তোমার ফায়দা হইবে। আর যদি তুমি তাহা ভুলিয়া যাও, মুখস্থ না কর, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে তোমার দলীল পেশ করার সুযোগ বন্ধ হইয়া যাইবে।

হে মু'আয! আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীন সৃজন করার পূর্বে সাতজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার পর আসমান-যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তাঁহাদের এক একজনকে এক এক আসমানের দারোয়ান নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন। অতঃপর রক্ষী ফিরিশ্‌তাগণ যখন বান্দার সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কৃত সকল আসল লইয়া ঊর্ধ্বাকাশে গমন করিতে থাকেন তখন ঐ আমলের অবস্থা সূর্যের আলোর ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া থাকে। ঐ আমল লইয়া রক্ষী ফেরেশ্‌তাগণ প্রথম আসমানের কাছাকাছি আরোহণ করার পর তাঁহারা উহা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং উহাকে বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়া প্রথম আকাশে পাঠাইয়া দেন। তখন দ্বাররক্ষী ফেরেশ্‌তা আমলকারীর আমল প্রসঙ্গে বলেন, যাও, এই আমল আমলকারীর মুখে ছুঁড়িয়া মার। আমি গীবতের তত্ত্বাবধায়ক। আমার প্রতিপালক আমাকে হুকুম দিয়াছেন যেন মানুষের গীবতকারী ব্যক্তির আমলকে আমার সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিয়া যাইতে না দেই।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, অতঃপর রক্ষী ফেরেশতা ঐ বান্দার অন্য কোন নেক আমল লইয়া আসিয়া তাহাসহ সামনের দিকে আগাইতে থাকেন। ইহার পর ফেরেশতা উহাকে পরিশুদ্ধ করত বাড়াইতে থাকেন। এমনিভাবে দ্বিতীয় আসমানের দরজায় গিয়া পৌঁছেন। তখন দ্বিতীয় আসমানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশ্‌তা রক্ষী ফেরেশ্‌তাগণকে বলেন, দাঁড়াও এবং এই আমলকে আমলকারীর মুখে ছুঁড়িয়া মার। উক্ত ব্যক্তি এই আমলের মাধ্যমে পার্থিব সামগ্রী হাসিল করার ইচ্ছা করিয়াছিল। আমার প্রতিপালক আমাকে হুকুম করিয়াছেন, আমি যেন তাহার আমলকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সুযোগ না দেই। সে মানুষের মাহফিলে বসিয়া মানুষের সহিত অহংকার করিত।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, অতঃপর রক্ষী ফেরেশতাগণ ঐ বান্দার অন্য কতকগুলি আমল লইয়া ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করিতে থাকেন। তখন তাহার প্রদত্ত সদাকা ও আদায়কৃত সালাত ও সাওম হইতে নূর বিচ্ছুরিত হইতে থাকিবে। ইহাতে রক্ষী ফেরেশতাগণ বিস্ময়াভিভূত হইবেন। অতঃপর রক্ষী ফেরেশ্‌তাগণ উক্ত আমল লইয়া তৃতীয় আসমানের দরজা পর্যন্ত পৌঁছেন। তখন তৃতীয় আসমানের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্‌তা বলেন, দাঁড়াও, এই আমলকে আমলকারীর মুখে ছুঁড়িয়া মার। আমি অহংকারের তত্ত্বাবধায়ক। আমার প্রতিপালকের নির্দেশ, আমি যেন তাহার এই আমলকে তদূর্ধ্বে যাইতে না দেই। এই ব্যক্তি মানুষের মজলিসে বসিয়া অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিত।

নবী করীম (স) বলেন, অতঃপর রক্ষী ফেরেশতা ঐ বান্দার এমন আমল যাহা উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় ঝলমল করিতেছে এবং মধু মক্ষিকার গুঞ্জনের ন্যায় তাহার তাসবীহ, সালাত, হজ্জ ও উমরা আওয়াজ করিতেছে, উহা লইয়া চতুর্থ আসমানের দরজায় গিয়া হাযির হন। সেখানকার প্রহরী ফেরেশ্‌তা তাঁহাদেরকে ডাক দিয়া বলেন, দাঁড়াও, এই আমলকে আমলকারীর মুখে, পেটে ও পিঠে ছুঁড়িয়া মার। আমি অহংকারের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশ্‌তা। আমার প্রতি

আমার প্রতিপালকের নির্দেশ ঃ আমি যেন তাহার আমলকে আগে অগ্রসর হইতে না দেই। এই ব্যক্তি যখন আমল করিত তখন তাহার মধ্যে অহংকার বিরাজ করিত।

নবী করীম (স) বলেন, এইভাবে রক্ষী ফেরেশতা ঐ বান্দার অন্য কোন আমল লইয়া উর্ধ্বাকাশের দিকে আরোহণ করেন এবং তাহা লইয়া পঞ্চমাকাশের দরজায় গিয়া পৌছেন। আমল এত সুসজ্জিত যেন নব দম্পতির সুষমামণ্ডিত সুসজ্জিত মুখাবয়ব। তখন উক্ত আসমানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশ্তা তাঁহাদেরকে বলেন, তোমরা দাঁড়াও এবং এই আমলকে আমলকারীর মুখের উপর ছুঁড়িয়া মার এবং উহাকে তাহার কাঁধের উপর তুলিয়া দাও। আমি হিংসা-বিদ্বেষের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশ্তা। সে মানুষের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিত, হিংসা-বিদ্বেষ করিত ঐ সমস্ত মানুষের প্রতি যাহারা তাহার সমপর্যায়ের বিদ্যা ও আমলের অধিকারী ছিল। এমনিভাবে সে ঐ মানুষের প্রতিও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিত, যে কোন না কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করিয়াছেন যাহাতে আমি তাহার আমলকে উর্ধ্বকাশে যাইবার সুযোগ না দেই।

নবী করীম (স) বলেন, অতঃপর রক্ষী ফেরেশ্তা বান্দার সালাত, যাকাত, হজ্জ, উমরা এবং সাওমসহ ৬ষ্ঠ আকাশের দিকে গমন করিতে থাকেন এবং ৬ষ্ঠ আকাশে গিয়া পৌছেন। তখন তথাকার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা বলেন, থাম, এই আমল উক্ত আমলকারীর মুখে ছুঁড়িয়া মার। এই ব্যক্তি আল্লাহর কোন বিপদগ্রস্ত বান্দার প্রতি কোনরূপ দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে নাই, বরং তাহার প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছে, হাসি-কৌতুক করিয়াছে। আমি রহমতের ফেরেশ্তা। আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, আমি যেন তাহার আমলকে আমাকে অতিক্রম করিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ না দেই।

নবী করীম (স) বলেন, অতঃপর রক্ষী ফেরেশ্তা ঐ বান্দার সালাত, সাওম, দান-সদাকা, ইজতিহাদ, পরহেযগারী ইত্যাদি আমল লইয়া সপ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করেন। ঐ আমলের মধ্যে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বলতা এবং মেঘের গর্জনের ন্যায় আওয়াজ থাকিবে। আর ঐ আমলের সহিত তিন হাজার ফেরেশ্তা সহযাত্রী হইয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ আমল লইয়া সপ্তম আকাশের দ্বারপ্রান্তে গিয়া পৌছেন। অমনি সপ্তম আকাশের দ্বাররক্ষী ফেরেশতা তাঁহাদেরকে বলেন, তোমরা দাঁড়াও এবং এই আমলকে আলমকারীর মুখের উপর ছুঁড়িয়া মার এবং তাহার সর্বাঙ্গে উহা দ্বারা আঘাত কর। আর এই আমল দ্বারাই তাহার হৃদয়ে তালা লাগাইয়া দাও। যে আমল আমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশে করা হয় নাই তাহা আমি আমার প্রতিপালকের নিকট পৌছিতে দিব না । সে তো মহান আল্লাহ্র উদ্দেশে আমল করে নাই। সে আমল করিয়াছে ফকীহদের নিকট তাহার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, আলিমদের নিকট তাহার যশখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ার জন্য এবং শহরে শহরে তাহার আমলের সুনাম অর্জনের জন্য। তাহার আমল যেন উর্ধ্ব জগতের দিকে যাইতে না পারে সেইজন্য আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে আমল একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ্র জন্য সম্পাদন করা হয় নাই তাহাই রিয়া। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশে আমল করে আল্লাহ তা'আলা তাহার সেই আমল কবুল করেন না।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, অতঃপর রক্ষী ফেরেশ্‌তা এই বান্দার সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, উমরা, সচ্চরিত্র, যিকির ইত্যাদি আমল লইয়া ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করেন। আর আসমানের ফেরেশ্‌তাগণ সকলেই ঐ আমলকে বিদায় সম্ভাষণ জানান। অবশেষে ফেরেশ্‌তাগণ ঐ সকল আমল লইয়া একে একে সকল পর্দা ভেদ করিয়া মহান আল্লাহ্‌র দরবারে গিয়া হাযির হন। অতঃপর তাহারা ঐ বান্দার পক্ষে এই মর্মে সাক্ষ্য দেন যে, এই নেক আমলসমূহ একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ্‌র জন্যই সম্পাদন করা হইয়াছে। নবী করীম (স) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার আমলের রক্ষণাবেক্ষণকারী। আর আমি তাহার নিজের সত্তার রক্ষণাবেক্ষণকারী। সে আমার সন্তুষ্টির নিমিত্ত এইসব আমল করে নাই। সে তো গায়রুল্লাহ্‌র উদ্দেশে এইসব আমল করিয়াছে। কাজেই তাহার উপর আমার লা'নত বর্ষিত হউক! তখন ফেরেশ্‌তাগণ সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠেন, তাহার উপর আপনার লা'নত এবং আমাদেরও লা'নত। এতদ্‌শ্রবণে পর সপ্ত আকাশ সমস্বরে ঘোষণা করে, তাহার উপর আল্লাহর লা'নত, আমাদের লা'নত এবং সপ্ত আকাশ ও উহাতে যাহা কিছু আছে সকলের লা'নত!

মু'আয (রা) বলেন, অতঃপর আমি বলিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি তো আল্লাহ্‌র রাসূল আর আমি মু'আয (আমাদের নাজাতের উপায় কী?)। জবাবে তিনি বলিলেন, আমার আনুগত্য করিবে। হে মু'আয! যদি তোমার আমলে কোন ত্রুটি থাকে তবে জিহ্বার হিফাযত করিবে। জিহ্বা আল-কুরআনের ধারক-বাহক, উহা যেন তোমার কোন ভাইকে কষ্ট না দেয়। তোমার পাপের বোঝা তুমি নিজেই বহন করিবে, অন্যের উপর ফেলিতে চেষ্টা করিও না। অন্যকে দোষারোপ করিয়া নিজেকে নিষ্পাপ প্রকাশ করিও না। অন্যের উপর নিজেকে প্রাধান্য দিও না। আখিরাতের আমলের সহিত দুনিয়ার আমলকে মিশ্রিত করিও না। নিজের মজলিসে এইরূপ আত্মগর্ব করিও না, যাহা দ্বারা মানুষ তোমার সাহচর্যকে ভীতিকর মনে করিতে থাকে। কোন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে দুইজনে কানে কানে কথা বলিও না। মানুষের সহিত ছলচাতুরী করিয়া বড় হওয়ার চেষ্টা করিও না। মানুষের সহিত মন কষাকষি করিও না। যদি এইরূপ কর তবে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের কুকুর তোমাকেও ধাওয়া করিবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا, "এবং যাহারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেয়"। বলিতে পার, ইহার তাৎপর্য কী, হে মু'আয! আমি বলিলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হউক! ইহা কি? জবাবে তিনি বলিলেন, ইহা জাহান্নামের কুকুর যাহারা গোশত ও হাড্ডি সবই চিবাইয়া খায়। অতঃপর আমি বলিলাম, আমার বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হউক, কে আছে এমন যে এই গুণাবলীর অধিকারী হইবে এবং এই ভয়াবহ আযাব হইতে নাজাত পাইবে? উত্তরে নবী করীম (স) বলিলেন, হে মু'আয! ইহা অত্যন্ত সহজ যাহার জন্য মহান আল্লাহ সহজ করিয়া দেন। বর্ণনাকারী বলেন, মু'আয (রা)-এর ন্যায় কুরআন মজীদ অধিক তিলাওয়াতকারী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। কেননা তিনি উক্ত হাদীছে বর্ণিত নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর কার্যকলাপ হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করিতেন (আত-তারগীব ওয়াত- তারহীব, ১ খ., পৃ. ৭৩-৭৬)।

ইমাম গাযালী (র) বলেন, "রিয়া হইতে বাঁচিবার উপায় হইল, সম্মান, প্রতিপত্তি, মাল, দৌলত, প্রশংসা ও যশ-খ্যাতির পরিণতি সম্পর্কে সর্বদা চিন্তা করা এবং বারংবার এই কথার প্রতি লক্ষ্য করা যে কোন অবস্থাতেই মহান আল্লাহ তাহার মনের অবস্থার খবর রাখিতেছেন। মনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কল্পনা সম্পর্কেও তিনি অবগত। তৎসঙ্গে এই কথাও চিন্তা করিবে যে, এই রিয়ার পরিণামে কিছুই পাওয়া যাইবে না। এইভাবে রিয়ার অপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিতে থাকিলে পর্যায়ক্রমে তাহা অন্তর হইতে বিদূরীত হইয়া যাইবে (আল মুরশিদুল আমীন, পৃ. ২৯৫-২৯৬)।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ

يايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل فقال له من شاء الله ان يقول وكيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

"হে লোক সকল! তোমরা এই শিরককে ভয় করিবে। কেননা তাহা ক্ষুদ্র পিঁপড়ার পদধ্বনি হইতেও নিঃশব্দে মানুষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। অতঃপর উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে একজন বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহা তো ক্ষুদ্রাকৃতির পিপীলকার নিঃশব্দ গতি হইতেও বেশী সন্তর্পণে মানুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় কেমন করিয়া আমরা ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিব? তিনি বলিলেন, তোমরা বলিবে ঃ হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি জানিয়া-বুঝিয়া কোন কিছুতে আপনার সহিত শরীক করা হইতে এবং আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এমন শিরক করা হইতে যাহাতে আমি না জানিয়া লিপ্ত হইয়াছি" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১খ.; পৃ. ৭৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ই. ফা. বা. প্রকাশিত; (২) সায়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, আশরাফী বুক ডিপো, ভারত ১৯৯১ খৃ., পৃ. ৩১১; (৩) মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত তাফসীর), খাদেমুল হারামায়ন কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৮২৯-৮৩০; (৪) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র), সহীহ আল-বুখারী, মুখতার এ্যান্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত ১৯৮৫ খৃ., ২খ., পৃ. ৯৬২; (৫) ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজা আল-কাযবীনী (র), সুনান ইব্‌ন মাজা, কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, দেওবন্দ, ভারত, পৃ. ২৩;(৬) শায়খ ওয়ালী উদ্দীন আল-খতীব (র), মিশকাতুল মাসাবীহ, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত, পৃ. ৩৩-৩৮; (৭) ইমাম গাযালী (র), আল-মুরশিদুল আমীন, ই.ফা.বা., কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ২৮০-২৯৫; (৮) হাফিয যকীউদ্দীন আল-মুনযিরী (র), আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, দারুল-ফিকর, বৈরূত ১৯৮৮ খৃ., ১খ., পৃ. ৬২-৬৩, ৬৯-৭৬।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

কুধারণা পোষণ হইতে বিরত থাকা

আখলাকে সায়্যিআর (কুচরিত্র) মধ্যে মারাত্মক ধরনের বদ অভ্যাস হইল অন্যের প্রতি কুধারণা পোষণ করা। অন্যের প্রতি অহেতুক কুধারণা পোষণ করা হারাম। ইমাম আবূ বকর আল-জাসসাস (র) আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, ধারণা চার প্রকার। এক প্রকার হারাম, দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজিব, তৃতীয় প্রকার মুস্তাহাব এবং চতুর্থ প্রকার জায়েয। হারাম ধারণা এই যে, আল্লাহর প্রতি এমন কুধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শাস্তি দিবেনই অথবা আমাকে বিপদে ফেলিবেনই। মূলত এইরূপ ধারণা আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফিরাত হইতে নিরাশ হওয়ার নামান্তর। হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لايموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله .

"তোমাদের কাহারও আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ উচিত নহে।"

অন্য এক হাদীছে আছে ঃ انا عند ظن عبدى بى "আমি আমার বান্দার সহিত তেমনি ব্যবহার করি যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে।"

উক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ্‌র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ফরয এবং কুধারণা পোষণ করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলমান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সৎ কর্মপরায়ণ তাহাদের প্রতি কোন প্রমাণ ছাড়া কুধারণা পোষণ করাও হারাম (মা'আরিফুল কুরআন, পৃ. ১২৮৩)। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা কুধারণার আধিক্য হইতে দূরে থাকিবে; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত খাইতে চাহিবে? বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণার্হ মনে কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু" (৪৯ ঃ ১২)।

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ.

“যখন তাহারা ইহা শুনিল তখন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারিগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করিল না এবং বলিল না, ইহা তো সুস্পষ্ট অপবাদ” (২৪ ঃ ১২)?

অন্যের প্রতি কুধারণা পোষণ করা মূলত বড় ধরনের মিথ্যা প্রবণতা। তাই নবী করীম (স) এহেন মিথ্যা বদ অভ্যাস হইতে দূরে থাকার জন্য জোর তাকীদ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا .

“তোমরা কুধারণা করা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে কারণ কুধারণা মারাত্মক ধরনের মিথ্যা। আর তোমরা কাহারও দোষ অনুসন্ধান করিও না, গোয়েন্দাগিরি করিও না, একে অন্যকে ধোঁকা দিও না, পরস্পর হিংসা করিও না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিও না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিও না, বরং সকল আল্লাহ্র বান্দা ভাই ভাই হইয়া থাকিও” (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৯২)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث “তোমরা কুধারণা পোষণ করা হইতে দূরে থাকিবে। কারণ কুধারণা জঘন্য ধরনের মিথ্যা” (জামে' তিরমিযী, ২খ., পৃ. ১৯)।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যে ব্যক্তির মাল চুরি হইয়া যায় সে অন্যের প্রতি কুধারণা পোষণ করিতে থাকে। এমনিভাবে কুধারণা পোষণ করিতে করিতে তাহার অপরাধের পরিমাণ চোরের চাইতেও গুরুতর হইয়া যায় (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৩৩০)। বিলাল ইব্ন সা'দ আশ'আরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত মু'আবিয়া (রা) আবূ দারদা (রা)-এর নিকট এই মর্মে পত্র দিলেন যে, দামিশক শহরে যেসব দুষ্কৃতিকারী আছে তাহাদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আপনি তাহা আমার নিকট প্রেরণ করুন। জবাবে তিনি বলিলেন, দামিশকের দুষ্কৃতিকারীদের সহিত আমার কি সম্পর্ক আছে। আমি তাহাদেরকে কেমন করিয়া চিনিব? তখন তাহার পুত্র বিলাল (র) বলিলেন, আমি তাহাদের তালিকা লিখিয়া দিব। অতঃপর তিনি তাহা লিখিলেন। ইহা দেখিয়া আবূ দারদা (রা) তাহাকে বলিলেন, তুমি তাহাদের একজন না হইলে কেমন করিয়া তুমি এই কথা জানিবে এবং বুঝিবে যে, তাহারা দুষ্কৃতিকারী। অতএব, প্রথমে তুমি তোমার নিজের নাম লিখিয়া পাঠাও, তাহাদের নাম পাঠাইও না (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৩৩০)।

যদি কোন ব্যক্তি হইতে এমন কোন কাজ হইয়া যায় অথবা যদি কোন ব্যক্তি এমন অবস্থায় নিপতিত হয়, যাহার ফলে অন্য কাহারও কুধারণা পোষণ করার সুযোগ সৃষ্টি হইয়া যায়, তবে তাহার উচিত ঐ কুধারণা দূরীভূত করার লক্ষ্যে নিজের পক্ষ হইতে ইহার যথার্থ কারণ জানাইয়া দেওয়া। হাদীছে আছে, নবী-পত্নী হযরত সাফিয়্যা (রা) বলেন, (রমযানের শেষ দশকে) নবী

করীম (স) মসজিদে ই'তিকাফরত ছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাত করার জন্য এক রাত্রিতে আমি তাঁহার নিকট আসিলাম এবং তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিলাম, অতঃপর আমি বাড়িতে ফিরিয়া আসার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নবী করীম (স)-ও আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্য দাঁড়াইলেন। তখন আমার আবাস ছিল উসামা ইব্ন যায়দের বাড়িতে। এহেন অবস্থায় দুইজন আনসারী সাহাবী সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা নবী করীম (স)-কে (এক মহিলার সহিত) দেখিয়া দ্রুত অন্যদিকে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। নবী করীম (স) এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের ডাক দিলেন, থাম, আমার সঙ্গের এই মহিলা হইল আমার স্ত্রী সফিয়্যা। তখন তাঁহারা বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমাদের মধ্যে কাহারও প্রতি কুধারণা পোষণ করার প্রবণতা থাকিত তাহা হইলেও আমরা আপনার প্রতি কুধারণা পোষণ করিতাম না। তাঁহাদের কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, নিশ্চয় শয়তান মানুষের অভ্যন্তরে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার মতই চলাচল করিয়া থাকে (সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ২১৬; সীরাতুন নবী, ৬খ., পৃ. ৩১৪-৩১৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ৪৯ সূরা হুজুরাত ১২; ২৪ সূরা নূর ১২; (২) মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খাদিমুল হারামাইন কর্তৃক প্রকাশিত (সংক্ষিপ্ত তাফসীর), পৃ. ১২৮৩; (৩) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র), সহীহ আল-বুখারী, মুখতার এ্যান্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত, প্রকাশকাল ১৯৮৫ খৃ., ২খ., পৃ. ৮৯২; (৪) ঐ লেখক, আল-আদাবুল মুফরাদ, আল- মাকতাবাতুল আসারিয়্যা, পৃ. ৩৩০; (৫) তিরমিযী (র), জামে' তিরমিযী, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ, ভারত, ২খ., পৃ. ১৯; (৬) ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (র), সহীহ মুসলিম, মাকতাবা আশরাফিয়া, আশরাফী বুক ডিপো, সাহারানপুর, ভারত, ২খ., পৃ. ২১৬; (৭) আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) ও আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদবী (র), সীরাতুন নবী, দারুল ইশা'আত, উর্দূ বাজার, করাচী, পাকিস্তান, ৬খ., পৃ. ৩১৪-৩১৫।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

মু'জিযা কি ও কেন ?

শব্দ পরিচিতি

মু'জিযা (معجزة) মূল ঃ ع ـ ج ـ ز = عجز 'আজ্য, ضَرَبَ - يَضْرِبُ - ضَرْبًا - এর ওজনে। যথা عَجَزَ يَعْجِزُ عَجْزًا -এর যেমন ব্যবহার রহিয়াছে, তেমনি বাব-ই ইফ'আল-এর ওজনেও উহার ব্যবহার হইয়া থাকে। মু'জিযা (معجزة) শব্দটি উক্ত মূল হইতে উদ্ভূত একটি কর্তৃপদ (اسم فاعل) জাতীয় শব্দ। আসল রূপ (معجزة) মু'জিযা উহার (ة) বর্ণটি মুবালাগা (مبالغة) আধিক্য জ্ঞাপক অর্থের জন্য সংযুক্ত হইয়াছে। উহা স্ত্রীবাচক (تاء تانيث) তা (ة) নহে। তবে কাহারও কাহারও মতে معجزة শব্দটি উহ্য বিশেষ্য (موصوف) শব্দের বিশেষণ (صفت)। আসল রূপ اية معجزة (আয়াতুন মু'জিযাতুন), অলৌকিক নিদর্শন (দ্র. ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৫৮১; আর-রাগি'ব ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গ'ারীবিল-কু'রআন, শিরো.)।

সাধারণত কোন কাজ সম্পাদনে অক্ষম ও অসমর্থ হওয়ার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা القدرة (শক্তি)-এর বিপরীত। এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। যথা ঃ

قَالَ يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ·

"সে বলিল, হায়! আমি কি এই কাকের মতও হইতে অক্ষম হইলাম, যাহাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ গোপন করিতে পারি? অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল" (৫ ঃ ৩১)।

এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার আরও দেখুন আল-কুরআন ৬ ঃ ১৩৪; ৮ ঃ ৫৯; ৯ ঃ ২-৩; ১০ ঃ ৫৩; ১১ ঃ ২০, ৩৩; ১২ ঃ ৩১; ১৬ ঃ ৪৬; ২২ ঃ ৫১; ২৪ ঃ ৫৭; ২৯ ঃ ২২; ৩৪ ঃ ৩৮; ৩৫ ঃ ৪৪; ৩৯ ঃ ৫১; ৪৬ ঃ ৩২; ৭২ ঃ ১২।

এই অর্থের সূত্র ধরিয়াই শব্দটি পবিত্র কুরআনে বার্ধক্য বুঝাইবার জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা ঃ

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ·

"তখন তাহার স্ত্রী চীৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপড়াইয়া বলিল, এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হইবে" (৫১ ঃ ২৯; আরও দ্র. ১১ ঃ ৭২)!

মোটকথা মু'জিযা (معجزة) শব্দের আভিধানিক অর্থ "কোন কাজ সম্পাদনে অথবা কোন বিষয় প্রদর্শনে অক্ষম করা, অভিভূত করা" (সূত্র ঃ প্রাগুক্ত)।

মু'জিযার পারিভাষিক সংজ্ঞা

মু'জিযার পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণের ভাষ্যসমূহে কিছু মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। তবে এই মতপার্থক্য একান্তই শব্দগত, সবগুলির ভাবার্থ প্রায় এক ও অভিন্ন। নিম্নে মু'জিযার কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করা হইল।

১. আল্লামা ইব্ন হাজার আস্কালানী লিখিয়াছেন ঃ

المعجزة ان يكون المتحدى به مما يعجزه عنه البشر فى العادة المستمرة.

"রাসূলগণ কর্তৃক সম্পাদিত সেই সকল অলৌকিক বা অসাধারণ কার্যাবলীই মু'জিযা, যাহার প্রতিযোগিতা করিতে সমসাময়িক যুগের মানুষ ব্যর্থ হইয়াছে" (ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৫৮১)।

২. শায়খ আবূ হাফ্স উমার আন্-নাসাফী লিখিয়াছেন ঃ

هو امر يظهر خلاف العادة على يد من يدعى النبوة عند تحدى المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله.

"মু'জিযা হইল প্রচলিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমী কার্য যাহা একজন নবূওয়াতের দাবীদার কর্তৃক প্রকাশ পায়। নবূওয়াত অস্বীকারকারীদের চ্যালেঞ্জে তিনি উহা সম্পাদন করেন এবং কার্যটির প্রকৃতি এমন যে, অস্বীকারকারীদের পক্ষে সেইরূপ কার্য সম্পাদন করা অসম্ভব" (শারহুল 'আকাইদিন-নাসাফিয়্যা, পৃ. ১২৪)।

৩. বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ "আল্-মু'জামুল-ওয়াসীত"-এ মু'জিযার সংজ্ঞা নিম্নরূপ বিবৃত হইয়াছে ঃ

المعجزة امر خارق للعادة يظهره الله على يد نبى تائيدا النبوت.

"মু'জিযা এমন অসাধারণ কার্য, যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রেরিত নবী-রাসূলগণের দ্বারা সংঘটিত করিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য নবীর নবূওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা" (আল-মু'জামুল-ওয়াসীত, পৃ. ৫৮৫, শিরো.)।

উপরে উল্লিখিত মু'জিযার সংজ্ঞা তিনটির মর্ম প্রায় একই। উহার সারসংক্ষেপ এই যে, মু'জিযা বলা হয়— (১) যাহা অসাধারণ, অস্বাভাবিক ও অলৌকিক; (২) যাহা নবী রাসূলগণের দ্বারা প্রকাশ পায়; (৩) তবে উহার সংঘটক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা; (৪) উহা নবী-রাসূলগণের নবূওয়াত ও রিসালাতের দাবির সত্যতার প্রমাণস্বরূপ; (৫) উহার মধ্যে নবী-রাসূলগণের পক্ষ হইতে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি মুকাবিলার চ্যালেঞ্জ ছুড়িয়া দেওয়া হয়। তবে তাহারা উহার মুকাবিলা করিতে সক্ষম হয় না।

মু'জিযার উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে আল-ঈযী আল-মাওয়াকি'ফ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যিনি আল্লাহ্‌র নবী তাঁহার নবূওয়াতের দাবির সত্যতা প্রমাণ করাই মু'জিযার উদ্দেশ্য। তবে যে কোনও অসাধারণ ঘটনাই মু'জিযা নহে, বরং তাহা মু'জিযারূপে স্বীকৃত হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলীর উপস্থিতি অপরিহার্য ঃ

১. উহা আল্লাহ্‌র কার্য হইতে হইবে।

২. প্রচলিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে হইবে।

৩. অনুরূপ কার্য সম্পাদন অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইতে হইবে।

৪. মু'জিযা এমন ব্যক্তির মাধ্যমে সংঘটিত হইবে, যিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবি করেন যাহা তাঁহার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ প্রকাশ পায়।

৫. তাঁহার মাধ্যমে প্রকাশিত মু'জিযাটি তাঁহার ঘোষণার সমর্থন জ্ঞাপক হইতে হইবে।

৬. মু'জিযা তাঁহার দাবির পরিপন্থী হইবে না।

৭. মু'জিযা দাবির পরে সংঘটিত হইতে হইবে, পূর্বে নহে।

আল-ঈযীর মতে, মু'জিযা এইভাবে সংঘটিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাঁহার (নবী-রাসূল) সত্যতা প্রমাণ করিতে চাহেন তাঁহার মাধ্যমে উহা ঘটাইয়া থাকেন। ফলে মু'জিযা দর্শকদের মধ্যে নবী-রাসূলের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় সৃষ্টি করে (আল-মাওয়াকি'ফ, মু'জিযা অধ্যায়, পৃ. ১৭৫)।

আল্লামা ইব্‌ন হাজার আস্‌কালানীর মতেও নবী-রাসূলগণের দ্বারা সংঘটিত যে কোন অসাধারণ কর্মকাণ্ডই মু'জিযা নহে, বরং তিনি এই ক্ষেত্রে দুইটি পরিভাষা স্থির করিয়াছেন। যথা ঃ (১) মু'জিযা এবং (২) 'আলামাতুন-নুবূওয়াত বা নবূওয়াতের নিদর্শন বা চিহ্ন। যেই সকল অসাধারণ কার্যের মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ বিরুদ্ধবাদীদেরকে চ্যালেঞ্জ করিয়া থাকেন, কেবল তাহাই মু'জিযা। যেমন তিনি বলিলেন, "যদি আমি এই কার্য করিতে পারি, তবে আমি নবী, অন্যথা আমি মিথ্যাবাদী"। পক্ষান্তরে নবূওয়াতের 'আলামত ও নিদর্শনের মধ্যে কোন চ্যালেঞ্জ থাকে না, মুকাবিলার আহ্বান থাকে না (ফাতহুল-বারী, ৬খ., পৃ. ৫৮১-৫৮)।

পবিত্র কুরআনে মু'জিযা (معجزة) শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, পারিভাষিক অর্থে নহে। মু'জিযা অর্থ প্রকাশের জন্য পবিত্র কুরআনে আয়াত (اٰية) শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, বহুবচনে আয়াত (اٰيات) এবং (اٰى) আই। ইহার অর্থ কোন বস্তু চিনিবার উপায় বা নিদর্শন। এই চিহ্ন বা নিদর্শন বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। যথা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁহার একত্ব প্রমাণের জন্য সমগ্র সৃষ্টি একটি প্রমাণ বা নিদর্শন। এই অর্থে আয়াত-এর ব্যবহার এইরূপ ঃ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ الاية "আর আমি রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুইটি নিদর্শন" (১৭-১২; আরও দ্র. ৩০ ঃ ২২-২৫, ৪৬; ১০ ঃ ৬; ২ ঃ ৭৩; ১৮৭; ৩ ঃ ১৯০)।

অনুরূপ নবীগণের নবূওয়াতের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে শব্দটি অসাধারণ কার্য ও অলৌকিক বিষয় বুঝাইবার অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ ۔

"যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তুমি যদি তাহাদের নিকট সমস্ত দলীলও পেশ কর" (২ ঃ ১৪৫ আরও দ্র. ২১১, ২৪৮, ২৫৯; ৩ ঃ ৪৯, ৫০; ৫ ঃ ১১৪; ৬ ঃ ২৫; ১২৪, ৭ ঃ ৭৩; ১০৬, ১৩২, ১৪৬)।

অবশ্য আয়াত শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে উক্ত দুইটি অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, বরং শব্দটি ইহা ছাড়া অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন উপদেশ ও শিক্ষণীয় অর্থে, যথা আল-কুরআনে আছে ঃ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ "তাঁহার রাজত্বের নিদর্শন এই যে," (২ ঃ ২৪৮; ৩ ঃ ১৩; ১০ ঃ ৯২; ১১ ঃ ১০৩) এবং কুরআনের আয়াত অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যথা আল-কুরআনে আছে ঃ وَلَاتَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلاً "তোমরা আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করিও না" (২ ঃ ৪১ আরও দ্র. ৯৯, ১০৬, ২২১, ২৫২; ৬ ঃ ৪, ১২৪; ১৬ ঃ ১০১; ৩৬ ঃ ৪৬; ৪৫ ঃ ৩১; ৬২ ঃ ২; ৮৩ ঃ ১৩)।

"আয়াতুন" (اٰية) শব্দটি মু'জিযা (معجزة) শব্দ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং বলা যায়, পবিত্র কুরআনে 'মু'জিযা' শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া বরং "আয়াতুন" শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় নবী-রাসূলগণের মু'জিযা ও তাঁহাদের আলামতে নবূওয়াত উভয়বিধ বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত। মু'জিযা-এর অর্থ বুঝাইতে পবিত্র কুরআনে আরও একটি শব্দের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। তাহা হইল বুরহান (برهان) শব্দ। ইহার অর্থ অকাট্য এবং সুস্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ। আল-মু'জামুল ওয়াসীতে আছে ঃ البرهان : البينة النبية الفاصلة অর্থাৎ 'সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী প্রমাণ'। যথা পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۔ اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۔

"যখন মূসা আগুনের নিকট পৌছিল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষের দিক হইতে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলা হইল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। আরও বলা হইল, তুমি তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়া তাকাইল না। তাঁহাকে বলা হইল, হে মূসা! সম্মুখে আইস, ভয় করিও না; তুমি-তো নিরাপদ। আর তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষ হইয়া। ভয় দূর করিবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চাপিয়া ধর। এই দুইটি তোমার

প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ফিরআওন ও তাহার পরিষদবর্গের জন্য। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়" (২৮ ঃ ৩০-৩২)।

সারকথা এই যে, নবূওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনকারিগণের হাতে কখনো কখনো মানবিক শক্তির অতীত কর্মকাণ্ড সাধিত হয়, যাহা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবনে মানবিক প্রজ্ঞা ও মনীষা অপারগ হইয়া যায়। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর আগুন শীতল হইয়া যাওয়া, হযরত মূসা (আ)-এর যষ্টি সর্পে পরিণত হওয়া, হযরত ঈসা (আ)-এর হাতে মৃত জীবিত হওয়া, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর এক রজনীতে পবিত্র কা'বা গৃহ হইতে আল-বায়তুল মুকাদ্দাস, অতঃপর তথা হইতে সিদরাতুল মুনতাহা, অতঃপর আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্য জগত পরিদর্শন করা ইত্যাদি। এই সমস্ত ঘটনার মর্মোদঘাটন এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি একান্তই অপারগ। আল-কুরআনের ভাষায় এই সমস্ত ঘটনার নাম বুরহান (برهان), বায়্যিনাত (بينات)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা আয়াত (ايات) অথবা আয়াতুম বায়্যিনাত (ايات بينات)- রূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে। মুহাদ্দিছগণ এই সমস্ত ঘটনাকে দালাইলুন নুবূওয়াত (دلائل النبوة) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আর 'আকাইদ বিশেষজ্ঞ (মুতাকাল্লিমূন) এবং দার্শনিকদের পরিভাষায় উহাকে মু'জিযাত (معجزات) বলা হয়।

মু'জিযা কখন ও কিভাবে সংঘটিত হয় ?

মু'জিযা দুইভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে। (১) তলবী (طلبى) ঃ মানুষের মু'জিযা প্রদর্শনের দাবির প্রেক্ষিতে। ইহার প্রকাশ এইভাবে হয় যে, বিরুদ্ধবাদীরা নবী-রাসূলকে মিথ্যাবাদী মনে করে। তাই তাঁহার নিকট অতি প্রাকৃত কিছু ঘটাইবার দাবি জানায়। তাহারা মনে করে যে, পয়গাম্বর তাহা কখনও প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন না। ফলে তাঁহাকে মানুষের সম্মুখে লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হইবে। তখন আল্লাহ তা'আলা উহা উপযোগী মনে করিলে তাঁহার পয়গাম্বরের হাতে অতি প্রাকৃত ঘটনার প্রকাশ ঘটান। আর তখন উহার ফল দাঁড়ায় বিপরীতমুখী। পয়গাম্বরের লজ্জিত ও অপমানিত হওয়ার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁহার সত্যতা ও যথার্থতা। যেমন ফেরআওন যাদুকরদেরকে সমবেত করিয়া হযরত মূসা (আ)-কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে এবং তাঁহাকে জনসম্মুখে লজ্জিত ও অপমানিত করিতে চেষ্টা চালাইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্র কুদরতে মূসা (আ)-এর যষ্টি সর্পে পরিণত হওয়ার মু'জিযা সংঘটিত হইল। ফলে ঘটনাটি পরিণামে মূসা (আ)-এর লজ্জা ও অপমানের পরিবর্তে তাঁহার সফলতা ও তাঁহার মিশন বিজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার নবূওয়াতের দাবির সত্যতা জনসম্মুখে সূর্যের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পরিণামে উপস্থিত যাদুকরগণ তাঁহার নবূওয়াতে বিশ্বাসী হইয়া ঈমানদার হইয়া গেল (দ্র. ৭ ঃ ১০৩-১২৬)।

আরিফ রূমী তাঁহার মছনবীতে চমৎকার বলিয়াছেন ঃ

منکران را قصد ازلال نقات + ذل شده عز وظهور معجزات

قصد شان زاں کارذل ایں بده + عین ذل عز رسوال الله

"অবিশ্বাসীরা মু'জিযা তলবের মাধ্যমে সত্যকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতে চাহে। অথচ তাহাদের এই অপচেষ্টার ভিতর দিয়াই সত্যের বিজয় ও যথার্থতা পরিস্ফুটিত হইয়া উঠে। তাহাদের ইচ্ছা ছিল মু'জিযা তলব করিয়া পয়গাম্বরকে লজ্জিত ও অপমানিত করা। কিন্তু তাহাদের এই পায়তারাই পয়গাম্বরের মর্যাদাকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে" (মহুনবীর বরাতে সীরাতুন্নবী, ৪ খ., পৃ. ১০৮-১০৯)।

(২) গায়রে তলবী (غير طلبى) ঃ অর্থাৎ মানুষের পক্ষ হইতে মু'জিযার দাবি করা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাঁহার (নবী-রাসূল) সত্যতা প্রমাণ করিতে চাহেন তাঁহারই দ্বারা কোন অসাধারণ কর্মকাণ্ড ঘটাইয়া থাকেন, যাহাতে উহা তাঁহার নবূওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণ হিসাবে দর্শকদের মধ্যে প্রভাব ও প্রত্যয় সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। যেমন খাবারের মধ্যে বরকতের মু'জিযা। ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রদত্ত ঐতিহাসিক মু'জিযা। খন্দকের যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ চরম আর্থিক সংকট এবং অনাহারের মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স) ক্ষুধায় কাতর হইয়া কটিদেশ সোজা করিতে পারিতেছিলেন না, তাই তিনি পেটে পাথর বাঁধিয়া খন্দক খননকার্য চালাইয়া যাইতেছিলেন। অন্যান্য সাহাবীদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া হযরত জাবির (রা) তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘরে খাবার আছে কি? স্ত্রী বলিলেন, এক সা' অর্থাৎ প্রায় সোয়া তিন কিলো গম আছে। তৎপর হযরত জাবির (রা) তাঁহার গৃহে পালিত একটি ছাগল যবেহ করিয়া দিয়া স্ত্রীকে রুটি ও গোশ্ত পাকাইবার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাজির হইয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে আরও দুই/তিনজন সাহাবীসহ তাহার গৃহে রুটি ও গোশ্তের দাওয়াত গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার দাওয়াত কবূল করিলেন এবং উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, হে পরিখা খননকারী! জাবির তোমাদেরকে দাওয়াত করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার গৃহে চলিয়া আস। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই আহ্বান শুনিয়া হযরত জাবির (রা) প্রমাদ গুনিতে লাগিলেন। মাত্র এক সা' গমের রুটি আর একটি ছাগলের গোশ্ত দ্বারা সহস্রাধিক মেহমানকে কিভাবে পরিতুষ্ট করিবেন, তাহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত জাবির (রা)-এর রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া উনুনের উপর চড়ানো গোশতের হাঁড়িতে এবং খামীর করা আটায় পবিত্র মুখের লালা মিশ্রণ করিয়া বলিলেন, সমস্ত মেহমানের আহার গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুলার উপর হইতে হাঁড়ি নামাইও না। আর এই খামীর হইতে অল্প অল্প করিয়া আটা লইয়া রুটি তৈয়ার করিতে থাক। তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হইল। ফলে সহস্রাধিক মেহমানকে আহার করানো পরও দেখা গেল, যেই পরিমাণ আটা খামীর করা হইয়াছিল এখনও সেই পরিমাণই অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং হাঁড়ি পূর্ববৎ গোশ্তে পরিপূর্ণই আছে (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৮৮-৫৮৯)।

মু'জিযার প্রকারভেদ

নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের নবূওয়াত ও রিসালাতের দাবির স্বপক্ষে যেই প্রমাণ তথা মু'জিযা প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রথমত দুই প্রকারের—জাহেরী (ظاهرى) বা

বস্তুভিত্তিক এবং বাতেনী (باطنى) বা আত্মিক। জাহেরী ও বস্তুভিত্তিক মু'জিযা, যেমন মৃতকে জীবিত করা, যষ্টিকে সর্পে পরিণত করা, আঙ্গুল হইতে পানির প্রবাহ জারী হওয়া, রুগ্নকে সুস্থ করা, চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা, সমুদ্র বক্ষে চলার পথ তৈরী হইয়া যাওয়া ইত্যাদি। আর বাতেনী ও আত্মিক (রূহানী) মু'জিযা হইতেছে—নবূওয়াতের দাবিদারের সত্যতা, নবীগণের নিষ্পাপ ও পবিত্র হওয়া, তাঁহাদের প্রভাব শক্তি, সফলতা ও গায়বী সাহায্য ইত্যাদি। ইহার মধ্যে পবিত্র কুরআন রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম বাতেনী মু'জিযা। বস্তুত নবূওয়াত ও রিসালাতের আসল ও মৌলিক প্রমাণ হইতেছে এই সমস্ত আত্মিক ও রূহানী নিদর্শন। আর জাহেরী ও বস্তুভিত্তিক মু'জিযাসমূহ শুধুই আবরণ এবং বাহিরের প্রতি দৃষ্টি দানকারীদের জন্য। এই কারণে দেখা যায়, যাহারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গূঢ় মর্মজ্ঞানী, তাহারা কখনও জাহেরী মু'জিযা তলব করেন নাই। অনুরূপ নবী-রাসূলগণের যুগে যাহারা শিক্ষিত সমাজ হিসাবে পরিচিত ছিল তাহারাও নবী-রাসূলগণের নিকট কোন জাহেরী মু'জিযা দাবি করেন নাই। উদাহরণস্বরূপ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগের আহলে কিতাবগণ। তাহারা সন্দেহপ্রবণ মন লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে বারংবার উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার সত্যতার পরীক্ষা লইয়াছে। কিন্তু তাহাদের পরীক্ষার বিষয়বস্তু কি ছিল? তাহা ছিল এই যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র চরিত্র ও আখলাক পরীক্ষা করিয়াছিল। তাহারা অতীতের বনী ইসরাঈলী নবী-রাসূলের অবস্থাসমূহ ও ঘটনাবলী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং তাঁহার শিক্ষা ও উলূমের ভাণ্ডার পর্যালোচনা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে কেহই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জাহেরী মু'জিযা তলব করে নাই। কারণ তাহারা জানিত যে, নবূওয়াতের দাবির সত্যতার আসল ও মৌলিক প্রমাণ হইতেছে দাবিদারের আধ্যাত্মিক ও অভ্যন্তরীণ দিক এবং তাঁহার আখলাক ও চারিত্রিক অবস্থা। ঠিক একই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালীন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস-এর দরবারে যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দূত হযরত দিহয়া কালবী (রা) উপস্থিত হইলেন এবং সম্রাটের নিকট ইসলামের দাওয়াত পত্র পেশ করিলেন তখন হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াতের দাবির সত্যতা যাচাই করিবার জন্য কুরায়শ সর্দার আবূ সুফয়ানকে রাজ দরবারে ডাকাইয়া আনিয়া কতিপয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার এই প্রশ্নগুলির সমস্তটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র এবং প্রভাব সম্বন্ধে। সবশেষে হিরাক্লিয়াস বলিয়াছিলেন, তুমি (আবূ সুফয়ান) যাহা বলিয়াছ তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে মুহাম্মাদ (স) অবশ্যই আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী এবং রাসূল (সহীহুল বুখারী, ১০খ., পৃ. ৪)।

অনুরূপ নাজরানের খৃস্টান বিদ্বানগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া কুরআনের আয়াতসমূহ শ্রবণ করিল এবং মুসলমানদের আত্মিক বিকাশের অবস্থা লক্ষ্য করিল। তৎপর তাহারা হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধে ইসলামের সিদ্ধান্ত কি তাহা জানিতে চাহিল। সবশেষে রাসূলুল্লাহ (স) আল-কুরআনের হুকুম মুতাবিক তাহাদের সহিত মুবাহালা করিতে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহারা ইহাতে সম্মত হইল না। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, প্রকৃতই যদি মুহাম্মাদ (স) নবী হন তাহা হইলে আমরা সবংশে ধ্বংস হইয়া যাইবে। পরিশেষে তাহারা বাৎসরিক খারাজ আদায় করিবার শর্তে সন্ধি স্থাপন করিল। লক্ষ্য করুন, তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সার্বিক শিক্ষা ও তাঁহার আখলাক-চরিত্র ও আচার-অনুষ্ঠান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছে,

কিন্তু দাবি প্রমাণের জন্য বাহ্যিক বস্তুভিত্তিক কোন মু'জিযা তলব করে নাই (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৬৩১-৬৩৭)।

স্বয়ং আরবের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের কথা পর্যালোচনা করিয়া দেখুন। তাহাদের হাজারও ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াতের দাবির সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাতেনী ও আত্মিক মু'জিযা অনুধাবন করিয়াছেন, তাহাদের একজনও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জাহেরী ও বস্তুভিত্তিক মু'জিযা দাবি করেন নাই। যথা হযরত খাদীজা (রা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উছমান (রা), হযরত আলী (রা), আম্মার (রা), হযরত ইয়াসির (রা), হযরত আবূ যর গিফারী (রা), হযরত বেলাল (রা) প্রমুখ সাহাবা-ই কিরাম। হযরত আবূ যার গিফারী (রা) যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির কথা জানিতে পারিলেন, তখন স্বীয় ভ্রাতাকে বলিলেন, ঐ ব্যক্তির নিকট যাও। সে দাবি করিয়াছে যে, তাঁহার নিকট আসমান হইতে ওহী আসিয়াছে। তাঁহার অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর। তাহার ভ্রাতা মক্কায় আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আবূ যার গিফারী (রা)-কে বলিলেন, আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি সচ্চরিত্রের নির্দেশ দেন এবং তিনি এমন কালাম পেশ করেন যাহা কবিতা নহে (সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৯৭)।

হযরত জা'ফার (রা) আবিসিনিয়ায় নাজাশীর দরবারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াতের পরিচয় সম্বন্ধে ভাষণ দিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, হে সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞ ও জাহেল সমাজ। আমরা মূর্তিপূজা করিতাম, মৃত জীব ভক্ষণ করিতাম, দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিলাম, প্রতিবেশীদের উপর অবিচার করিতাম, পরস্পর হানাহানি ও মারামারি করিতাম, দুর্বল লোককে সবল লোক নিশ্চিহ্ন করিয়া দিত। এমন অমানিশা ও দুর্যোগের সময় আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইলেন—যাঁহার ভদ্র ও শিষ্ট আচরণ, সততা, ন্যায়ানুবর্তিতা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই জ্ঞাত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে ইসলামের পথে আহবান করিলেন। তিনি আমাদের এই শিক্ষা দিলেন যে, আমরা যেন মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করি, সত্য কথা বলি, রক্তপাত হইতে বিরত থাকি, ইয়াতীমের অধিকার হরণ না করি, প্রতিবেশীদের কষ্ট না দেই, সতী রমণীদের প্রতি যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ না করি, নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, সিয়াম পালন করি। আমরা এই সমস্ত কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, শিরক বর্জন করিয়াছি, সকল প্রকার অপকর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি (ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩৩২; মুসনাদ আহমাদ ইব্ন হাম্বল, ১খ., পৃ. ২০২)।

আলোচনার সারাংশ এই যে, নবূওয়াত ও রিসালাতের আসল ও মৌলিক দলীল হইতেছে, নবী-রাসূলগণের বাতেনী ও আধ্যাত্মিক মু'জিযা ও নিদর্শনাবলী। তবে তাঁহাদের জাহেরী ও বস্তুভিত্তিক মু'জিযাও ছিল। তাই পবিত্র কুরআনে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা অতীত নবী-রাসূলগণের জীবনেতিহাস বর্ণনার প্রেক্ষাপটে তাঁহাদের জাহেরী মু'জিযার বিস্তৃত বর্ণনা পেশ করিয়াছেন। তথা হযরত মূসা (আ)-এর যষ্টি সর্পে পরিণত হওয়া, তাঁহার হস্ত শুভ্র আলোকোজ্জ্বল হওয়া, হযরত সালিহ (আ)-এর সময়ে পাথরের মধ্য হইতে উষ্ট্রী বাহির হইয়া

আসা, হযরত 'ঈসা (আ)-এর হাতে মৃত ব্যক্তির জীবিত হইয়া যাওয়া, অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থ হওয়া ইত্যাদি। নবীগণের জাহেরী ও বাতেনী মু'জিযার আরও একটি পর্যালোচনা এই যে, জাহেরী ও বস্তুভিত্তিক মু'জিযা শুধু ঐ সমস্ত লোক তলব করে যাহাদের অন্তরচক্ষু অন্ধ এবং যাহারা বিরুদ্ধবাদিতা, পক্ষপাতিত্ব এবং কুপমণ্ডুকতাসুলভ মনোভাবের কারণে সত্যকে মানিয়া লইতে রাজি হয় না। বস্তুত গোঁড়া কাফিররাই জাহেরী মু'জিযা তলব করিয়া থাকে। এই কারণে দেখা যায়, পবিত্র কুরআনে মু'জিযা তলব সংক্রান্ত দাবিগুলিকে সর্বদা কাফিরদের প্রতিই আরোপ করা হইয়াছে। যথা ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَا اٰيَةٌ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ٠

"এবং যাহারা কিছু জানে না তাহারা বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন, কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন ? এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীরাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিত। তাহাদের অন্তর একই রকম। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছি" (২ ঃ ১১৮)।

وَقَالُوْا لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ

"তাহারা বলে, তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন নাযিল করা হয় না কেন ? বল, নিদর্শন নাযিল করিতে আল্লাহ অবশ্যই সক্ষম, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না" (৬ ঃ ৩৭)।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لاَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٠

"যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন নাযিল করা হয় না কেন? তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথপ্রদর্শক" (১৩ ঃ ৭)।

وَقَالُوْا لَوْلاَ يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى

"উহারা বলে, সে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন ? উহাদের নিকট কি আসে নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ, যাহা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে" (২০ ঃ ১৩৩)।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে লক্ষণীয় যে, প্রত্যেক আয়াতেই মু'জিযা তলব করার বিষয়টি কাফিরদের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। পুণ্যবানগণ কখনও মু'জিযা তলব করেন নাই। ইহা হইতে এই কথাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আ)-কে প্রদত্ত মু'জিযা বনী ইসরাঈলের দাবির

প্রেক্ষিতে দেওয়া হয় নাই, বরং ফিরআওন ও তাহার অনুসারীদের দাবির প্রেক্ষিতে দেওয়া হইয়াছিল। তাই যখন হাওয়ারীগণ ঈসা (আ)-এর নিকট খাদ্যভর্তি আসমানী খাঞ্চার জন্য বলিল–

يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۔

"হে মরিয়ম-তনয় ঈসা! আপনার পালনকর্তা কি এইরূপ করিতে পারেন যে, আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করিয়া দিবেন"?

তখন ঈসা (আ) উত্তরে বলিলেন –

اِتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔

"যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে আল্লাহকে ভয় কর"।

ইহাতে বুঝা যায়, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের ফরমাইশ করিয়া আল্লাহ্কে পরীক্ষা করা কিংবা তাঁহার কাছে অলৌকিক বিষয় দাবি করা একান্তই অনুচিত (পবিত্র কুরআনুল-করীম, অনূদিত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ৩৬৩)। এমনিভাবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট মু'জিযাসমূহ হযরত আবূ বকর, উমার এবং উছমান (রা) তলব্ করেন নাই, বরং আবূ জাহল, আবূ লাহাব, উৎবা, শায়বা প্রমুখ কাফিররাই তলব করিয়াছিল। অন্যান্য নবী-রাসূলগণের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কাফিররা জাহেরী মু'জিযা তলব করিত তাহাদের শত্রুতা, হিংসা, দ্বেষ এবং অন্তরের হঠকারিতা ও গোঁয়ার্তুমির বশবর্তী হইয়া—সত্যানুসন্ধানী হইয়া নহে। এই কারণে তাহারা একের পর এক জাহেরী মু'জিযা তলব করিয়াই যাইতেছিল। পক্ষান্তরে যখনই তাহাদের দাবি অনুসারে কোন মু'জিযা বাস্তবায়িত হইত তখন তাহারাই উহাকে যাদু বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া বসিত। বস্তুত এইরূপ গোঁয়ার্তুমি ও কূপমণ্ডুকতায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা কখনও জাহেরী মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিয়া উপকৃত হইতে পারে না বরং তাহারা নিজেদের অন্তরের কপটতার দরুন জাহেরী মু'জিযাকে যাদু ইত্যাদি বলিয়া আখ্যায়িত করে এবং নবূওয়াতের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে উহাকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করে। হযরত মূসা (আ) ফিরআওন ও তাহার অনুসারিদেরকে অনেক মু'জিযা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিটি মু'জিযার ক্ষেত্রেই মূসা (আ)-কে ফিরআওনের মুখে একই জবাব শুনিতে হইয়াছিল, "তুমি মহাযাদুকর" (انك لساحر عليم) অথবা "ইহা তো প্রকাশ্য যাদু" (ان هٰذا الا سحر مبين) অথবা "এই মূসা ও তাহার ভ্রাতা হারূন উভয়ে যাদুকর" (ان هذان لسحران) (দ্র. ৫ঃ ১১০; ৬ ঃ ৭; ১০ ঃ ৭৬; ১১ ঃ ৭; ২৭ ঃ ১৩; ৩৪ ঃ ৪৩; ৩৭ ঃ ১৫; ২০ ঃ ৬৩; ৭ ঃ ১১২)।

আরও আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা দেখিয়া মিসরের সমস্ত যাদুকর সিজদায় পতিত হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রত্যেকে ঈমান আনয়ন করিয়া চির সৌভাগ্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু ফিরআওনের মুখে ছিল পূর্বের সেই একই কথা, অভিন্ন বুলি ঃ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ "সে তো তোমাদের (যাদুকর) প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে" (২০ ঃ ৭১)।

শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ক্ষেত্রে ঠিক একই অবস্থা ঘটিয়াছিল। কাফির কুরায়শ সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট মু'জিযা তলব করিয়াছিল এবং মু'জিযার বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার পরই তাঁহাকে যাদুকর বা কাহিনীকার বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল (দ্র. আল-কুরআন ৭৪ ঃ ২৪; ৫২ ঃ ২৯, ৩০; ৫৪ ঃ ১-২; ৬৯ ঃ ৪০, ৪৮)।

উপরে উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা একটি সংশয়ের অবসানও হইয়া গেল যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীছে লক্ষ্য করা যায় যে, মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বারবার মু'জিযা তলব করিয়াছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের সেই দাবি অনুসারে মু'জিযা প্রদর্শন করেন নাই কেন?

বস্তুত তাহাদেরকে অনেক জাহেরী মু'জিযা প্রদর্শন করান হইয়াছিল, কিন্তু জাহেরী মু'জিযা দ্বারা কাফিরদের মন কখনও শান্ত হয় না এবং ইহাতে তাহারা কখনও হিদায়াত লাভ করিতে পারে না। কারণ এই সমস্ত মু'জিযা তলবের পশ্চাতে তাহাদের অন্তরের কপটতা, হিংসা, দ্বেষ ও গোঁয়াতুর্মি কার্যকর থাকে। এই অবস্থায় তাহাদের প্রার্থিত মু'জিযা সংঘটনে তাহাদের বিশেষ কোন ফায়দা হইত না, বরং ইহা তাহাদের অন্তরের শঠতাকে আরও বৃদ্ধি করিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ ·

"এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, ইহা তাহাদের কলুষের সহিত আরও কলুষ যুক্ত করে" (৯ ঃ ১২৫; আরও দ্র. ২ ঃ ১০; ৭১ ঃ ২৪, ২৮; ১৭ ঃ ৮২; ৫ ঃ ৬৪, ৬৮)।

তাই পবিত্র কুরআনে জাহেরী মু'জিযা তলবের কারণে কাফিরদেরকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে এবং বাতেনী মু'জিযার প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইতেছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْ لَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ·

"উহারা বলে, সে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? উহাদের নিকট কি আসে নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ যাহা আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে" (২০ ঃ ১৩৩)?

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ · اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ·

"উহারা বলে, তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন? বল, নিদর্শন আল্লাহর এখতিয়ারে; আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। ইহা কি উহাদের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার নিকট কুরআন নাযিল করিয়াছি, যাহা উহাদের নিকট পাঠ করা হয়? ইহাতে অবশ্যই মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ এবং উপদেশ রহিয়াছে" (২৯ ঃ ৫০-৫১)।

এই কারণেই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কাফিরদের জাহেরী মু'জিযা তলবের প্রতিউত্তরে রাসূলুল্লাহ (স)-কে কেবল এতটুকু বলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, "আমি তো কেবল একজন মানুষ এবং পয়গাম্বর"। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا ۔ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۔ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلًا ۔ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۔

"এবং উহারা বলে, আমরা কখনও তোমাতে ঈমান আনিব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করিবে অথবা তোমার খেজুরের বা আংগুরের এক বাগান হইবে, যাহার ফাঁকে-ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করিবে নদী-নালা। অথবা তুমি যেমন বলিয়া থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া আমাদের উপর ফেলিবে অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবে অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হইবে অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করিবে। কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও ঈমান আনিব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল না করিবে, যাহা আমরা পাঠ করিব। বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক। আমি তো হইতেছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল" (১৭ ঃ ৯০-৯৩)।

মু'জিযা সম্পর্কে বিতর্ক

নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার মু'জিযা প্রদান করিয়াছেন। ইহা প্রত্যেক নবীর বেলায়ই ঘটিয়াছে। কিন্তু এই জাহেরী ও বাতেনী মু'জিযার পার্থক্য এবং উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহের গূঢ়ার্থ অনুধাবনে ব্যর্থতার কারণে কোন কোন লোক মনে করিয়া বসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) কাফিরদেরকে কোন জাহেরী মু'জিযা দেখান নাই। যদি তিনি জাহেরী মু'জিযা দেখাইতেন তাহা হইলে বারংবার তাহারা কেন মু'জিযা তলব করিয়াছিল? এমনকি কোন কোন অবিবেচক ইসলামী পণ্ডিত এই কথাও বলিয়াছেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর কুরআন ভিন্ন অন্য কোন মু'জিযাই ছিল না"। এই কারণে বর্তমান কালে নূতন বির্তকের সূচনা হইয়াছে যে, আসলে কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্য কোন মু'জিযা ছিল কি না?

মিসরের কয়েকজন মুসলিম পণ্ডিত, যথা উস্তাদ মুহাম্মাদ ফারীদ ওয়াজদী, শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহু, সায়্যিদ আবদুল আযীয জাবীশ, আল-মানার সাময়িকীর সম্পাদক সায়্যিদ রাশীদ রিদা এবং মিসরের আল-আযহার রেক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফা আল-মারাগী এবং প্রখ্যাত লেখক শায়খ মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল প্রমুখ আধুনিক মুসলিম পণ্ডিতদের অভিমত এই যে, "পবিত্র

কুরআনের বাহিরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্য কোন মু'জিযা ছিল না" [দ্র. (১) মুহাম্মাদ ফারীদ ওয়াজদী, "আল-মাদীনা ওয়াল-ইসলাম, মিসর, হি. ১৩৫৩ / খৃ. ১৯৩৩, পৃ. ৭১-৭২; (২) মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা, তাফসীরুল মানার, মিসর, হি. ১৩৭৩ / খৃ. ১৯৫৪, ১১খ., পৃ. ১৫৫; (৩) ঐ লেখক, আল-ওয়াহ্‌য়ুউল-মুহাম্মাদী, মিসর হি. ১৩৫৪, পৃ. ৬২; (৪) শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহু, রিসালাতুত-তাওহীদ, মিসর, হি. ১৩৬৫, পৃ. ১৪৩; (৫) মুস্তাফা আল-মারাগী, মুকাদ্দামা হায়াতে মুহাম্মাদ লিল-হায়কাল, মিসর, খৃ. ১৯৭৪, ১২শ সংস্করণ, পৃ. ১৩; (৬) সায়্যিদ আবদুল আজীজ জাবীশ, দীনুল ফিতরাতি ওয়াল-হুরারিয়্যাহ, পৃ. ১৪৮; (৭) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, হায়াতে মুহাম্মাদ, মিসর, দারুল-মা'আরিফ, খৃ. ১৯৭৪, ১২শ সংস্করণ, ভূমিকা]।

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কাল তাঁহার "হায়াতে মুহাম্মাদ" গ্রন্থের ভূমিকায় তাহাদের উক্ত অভিমতের সমর্থনে পবিত্র কুরআনের পূর্বোক্ত চারটি আয়াত (১৭ ঃ ৯০-৯৩) এবং তৎসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণ হিসাবে পেশ করিয়াছেন ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۔

"তাহারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে যে, তাহাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসিত তবে অবশ্যই তাহারা ইহাতে ঈমান আনিত। বল, নিদর্শন-তো আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত, তাহাদের নিকট নিদর্শন আসলেও তাহারা যে ঈমান আনিবে না ইহা কিভাবে তোমাদের বোধগম্য করান যাইবে" (৬ ঃ ১০৯) ?

ড. হায়কাল আয়াত দুইটি উপস্থাপনের পর লিখিয়াছেন, "বস্তুত পবিত্র কুরআন ও উহার সহিত সাযুজ্যপূর্ণ হাদীছসমূহ কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যান্য মু'জিযার ব্যাপারে অনেকটা নীরব বলা চলে। এই ক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এমতাবস্থায় পূর্ববর্তীদের হইতে শুরু করিয়া বর্তমান যুগের মুসলমানগণ পর্যন্ত সকলেই পবিত্র কুরআন ছাড়া অন্যান্য মু'জিযার ব্যাপারে এতটা সোচ্চার কেন ? এই প্রশ্নের একটাই উত্তর হইতে পারে। তাহা এই যে, মুসলমানগণ পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের বিভিন্ন মু'জিযার ঘটনা ও কাহিনী দেখিতে পাইয়াছে। ইহাতে তাহারা প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা মনে করিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যও মু'জিযা হওয়া অত্যাবশ্যক। তাহাদের ধারণায় জড়ো অলৌকিক ঘটনা ছাড়া বিশ্বাস-ই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তাহারা অলৌকিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে বর্ণনাগুলিকে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য মনে করিয়া বসিয়াছে; অথচ এই সমস্ত বর্ণনা যে পবিত্র কুরআন সমর্থিত নহে, এই দিকটির প্রতি তাহারা কোন প্রকার গুরুত্বারোপই করেন নাই। তাহারা ধারণা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মু'জিযার প্রাচুর্য তাঁহার রিসালাতের প্রতি মানুষের ঈমান ও বিশ্বাসকেই শক্তিশালী ও বৃদ্ধির কারণ হইবে। অথচ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাদৃশ্য", "ভিন্নধর্মী বিষয়কে একত্রিকরণ বৈ আর কিছু নহে" (হায়াতে মুহাম্মাদ, ভূমিকা)।

"পবিত্র কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্য কোন মু'জিযা ছিল না" এই দাবির সমর্থনে ড. হায়কাল কুরআনের যেই দুইটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা দ্বারা তাহার দাবি কোন ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় না। কারণ, সকল নির্ভরযোগ্য তাফসীর ও হাদীছে উক্ত আয়াত দুইটির যেই শানে নুযূল, প্রেক্ষাপট ও ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে তাহার দাবির সমর্থন নাই বরং আয়াত দুইটির মর্ম এই যে, ইহাতে মক্কার মুশরিকদের কূট-উদ্দেশ্য তুলিয়া ধরা হইয়াছে। "পবিত্র কুরআনের বাহিরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আর কোন মু'জিযা নাই", ইহাতে এমন উক্তি করা হয় নাই। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁহার তাফসীরুল কুরআনিল আযীম গ্রন্থে প্রথমোক্ত আয়াতটির পটভূমি বর্ণনা প্রসংগে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে সহীহ হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, একদিন মক্কার মুশরিক সর্দারগণ বসিয়া খোশগল্প করিতেছিল। তাহারা এক লোক দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে ডাকিয়া পাঠাইল। রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে হাযির হইলে তাহারা তাঁহাকে উপরের আয়াতে উল্লিখিত প্রশ্নগুলি করিল। এই সমস্ত প্রশ্নের পশ্চাতে তাহাদের কোন সদুদ্দেশ্য ছিল না। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের দাবিগুলি বাস্তবায়িত করিয়া দেখাইলেও তাহারা ঈমান আনয়ন করিত না, বরং আরও হাজারও মু'জিযা দাবি করিয়া বসিত। আর তাহাদের দেখাদেখি অন্যরাও এই ধরনের দাবি করিতে আরম্ভ করিত। ফলে আল্লাহর নবীকে ইসলাম প্রচারের মহান ব্রতকে বাদ দিয়া তাহাদের এই সমস্ত গোঁয়ার্তুমিমূলক প্রশ্নের উত্তরেও দাবি-দাওয়া পূরণের কাজ করিয়াই বেড়াইতে হইত। তাই আল্লাহ্র রাসূল (স) মুশরিকদের এই সমস্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রশ্নের কোন গুরুত্ব দেন নাই (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ৬০-৬১)।

পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতটির পটভূমিও এমন একটি ঘটনা। মক্কার মুশরিকরা শপথ পূর্বক রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিল, আপনি আমাদের প্রত্যাশিত মু'জিযার অংশবিশেষ বাস্তবায়িত করিয়া দেখাইলে আমরা ঈমান আনয়ন করিব। বস্তুত তাহাদের এই শপথ ছিল মিথ্যা, অসার। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই মিথ্যা শপথের পর্দা উন্মোচনের লক্ষ্যে উক্ত আয়াতটি নাযিল করেন এবং বলেন, একটি মু'জিযা প্রকাশের পর আরেকটি, তৎপর আরও একটি, এইভাবে মু'জিযা পর মু'জিযা প্রকাশের মাধ্যমে কোন শুভ ফল হইতে পারে না; বরং সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পাথক্য নির্ণয় করার মত একটি মু'জিযাই যথেষ্ট। বারংবার অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের দাবি নিরর্থক বৈ কিছু নহে (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ১৭৪)।

মোটকথা, উক্ত ভাষ্য দুইটিতে এই কথা বুঝানো হয় নাই যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কুরআনের বাহিরে কোন মু'জিযা নাই; বরং উহাতে এই কথা বুঝানো হইয়াছে যে, সত্য প্রমাণের জন্য বারংবার জাহেরী মু'জিযা তলব ও উহা প্রদর্শনের মধ্যে কোন ফায়দা নাই। হঠকারী ও গোঁয়ার্তুমিমুক্ত অন্তর লইয়া একটি মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিলেই সত্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যের বিপরীতে ড. হায়কাল যুক্তি পেশ করিয়াছেন যে, "কুরআনের বাহিরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মু'জিযা আছে" মানিয়া লইলে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সহিত মুহাম্মাদ (স)-এর সাদৃশ্য ভিন্নধর্মী বিষয়কে একত্রকরণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাহার এই যুক্তি

গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ মুহাম্মাদ (স) সকল নবী-রাসূলের নেতা এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য নবী-রাসূলগণের সহিত তাঁহার কোন সাদৃশ্য ও মিল থাকিবে না, এমন নহে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ الاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ٠

"মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র, তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছেন। সুতরাং যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে" (৩ ঃ ১৪৪)?

অনুরূপ অসংখ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের নানাবিধ অবস্থাকে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের অবস্থার সাথে তুলনা করা হইয়াছে এবং উহা হইতে উপদেশ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণের জন্য বলা হইয়াছে (দ্র. ৬ ঃ ১০; ৩৩, ৩৪, ৪২)। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال إن مثلى و مثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع اللبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين ٠

"আমার এবং অন্যান্য রাসূলের উদাহরণ এইরূপ যেমন একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্মিত হইল। বহু লোক সমবেত হইয়া ইহার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিল, তাহারা সকলেই বাহবা বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু এই সুরম্য অট্টালিকার এক কোণে একটি ইষ্টকের স্থান শূন্য দেখিয়া তাহারা বলিতে লাগিল, আহা! যদি এই শূন্য স্থানটি পূর্ণ হইত তবে কতইনা সুন্দর হইত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, অনন্তর আমিই সেই (শূন্যস্থান পূর্ণকারী) ইষ্টক; আর আমিই সর্বশেষ নবী" (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৫০; সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৪৮)।

সুতরাং অন্যান্য নবী-রাসূলগণের যাহেরী ও জড়ো মু'জিযা ছিল বলিয়া অনুরূপ মু'জিযা তাঁহার থাকিতে পারিবে না, ইহা কোন যুক্তিগ্রাহ্য কথা নহে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় অতীতে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, এই কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে এই কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, অতীতের বিভিন্ন যুগের মুহাদ্দিছীন ও হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন-চরিত বিষয়ক বর্ণনারাজিকে সেই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে মুক্ত করিবার নিরলস চেষ্টা চালাইয়াছেন এবং এই ক্ষেত্রে তাঁহারা অভাবিত সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা রিওয়ায়াতসমূহের শুদ্ধ-অশুদ্ধ পার্থক্যকরণে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী সম্পর্কিত বিশুদ্ধ হাদীছ ও রিওয়ায়াতসমূহ গ্রহণ করিতে এখন আর আপত্তি করিবার সঙ্গত কোন কারণ নাই।

কিন্তু ড. হায়কাল তাঁহার "হায়াতে মুহাম্মাদ" গ্রন্থের ভূমিকায় এই সমস্ত হাদীছ ও রিওয়ায়াতসমূহকে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্বিশেষে এক দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তিনি লিখেন ঃ "পবিত্র কুরআনই রাসূলুল্লাহ (স)-এর একক মু'জিযা।" তৎপর তিনি লিখিয়াছেন, "যদি রিসালাত প্রমাণের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্য কোন মু'জিযা থাকিত তবে তাহা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হইল না কেন?" এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, আরও একটু অগ্রসর হইয়া তিনি মু'জিযাকে যুক্তি-বুদ্ধির নিরিখে বিচার করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলেন, "আজও যদি কোন অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং মু'জিযার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ছাড়া অন্য কোন কিছু স্বীকার না করে, তাহা হইলে এই জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা যাইবে না। ইহাতে তাহাদের ধর্মবিশ্বাস অসম্পূর্ণ হইবে না। কেননা সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছে। তাহার এই অধিকার রহিয়াছে যে, সে পবিত্র কুরআনের আলোকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যান্য মু'জিযা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা-গবেষণা করিতে পারিবে। অতঃপর যদি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা কোন কিছু সাব্যস্ত হয়, তাহা বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইবে।"

ডঃ হায়কালের এই অভিমতও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ যাহা অস্বাভাবিক ও যাহা যুক্তি-বুদ্ধির উর্ধ্বে, তাহাই তো মু'জিযা। সুতরাং যুক্তি-বুদ্ধির নিরিখে কিরূপে কোন নবী ও রাসূলের অলৌকিক কর্মকীর্তির বিশুদ্ধতা মূল্যায়ন করা যাইবে?

তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, কুরআন ছাড়া অন্য কোন মু'জিযা রাসূলুল্লাহ (স)-এর থাকিলে তাহা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হইল না কেন? অথচ কুরআনের সাধারণ পাঠক মাত্রই জানেন, কুরআনে মাত্র এক-দুইটি নহে, বরং রাসূলুল্লাহ (স)-এর একাধিক মু'জিযার উল্লেখ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

(এক) রাসূলুল্লাহ (স)-এর মি'রাজে গমন তাঁহার জীবনের একটি ঐতিহাসিক সুবিখ্যাত মু'জিযা। পবিত্র কুরআনে মি'রাজ সম্পর্কে পরিষ্কার আলোচনা হইয়াছে। এমনকি উহার একটি সূরার নামকরণ হইয়াছে-'ইসরা' তথা মি'রাজ নামে। এই সূরাতুল ইসরার সূচনাই হইয়াছে এইভাবে ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ....

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁহার বান্দাকে রজনী যোগে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আকসায়, যাহার পরিবেশ আমি করিয়াছিলাম বরকতময়, তাহাকে আমার নিদর্শন দেখাইবার জন্য। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বদ্রষ্টা" (১৭ ঃ ১)।

(দুই) রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতও ছিল তাঁহার জীবনের একটি অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা। হিজরত মাত্র একটি মু'জিযাই নহে, বরং ইহা ছিল একাধিক মু'জিযার ধারক ও সংঘটন

স্থল। রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন পার্থিব সহায়-সম্বলহীন। অপরদিকে কুরায়শ কাফিররা ছিল অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ধনে-জনে বলিয়ান। তাহারা তাঁহাকে হত্যার পরিকল্পনা করিয়াছিল। প্রত্যেক গোত্র হইতে একজন করিয়া দুর্ধর্ষ বীর নাঙ্গা তরবারি লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার দৃঢ় উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া তাঁহার গৃহের চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছিল। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের কবল হইতে তাঁহাকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করিলেন। পবিত্র কুরআনে সেই ভয়াল ষড়যন্ত্রের দৃশ্য এইভাবে চিত্রিত হইয়াছে শব্দের গাঁথুনীতে ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ .

"স্মরণ কর, কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করিবার জন্য, হত্যা করিবার জন্য অথবা নির্বাসিত করিবার জন্য এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন। আর আল্লাহ্ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" (৮ ঃ ৩০)।

কুরআনের অপর একটি সূরায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের অলৌকিক ঘটনাবলী এইভাবে বিবৃত হইয়াছে ঃ

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

"যদি তোমরা তাহাকে সাহায্য না কর তবে স্মরণ কর, আল্লাহ্ তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন কাফিররা তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল এবং সে ছিল দুইজনের একজন, যখন তাহারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তাহার সংগীকে বলিয়াছিল, বিষণ্ন হইও না। আমাদের সাথে আল্লাহ্ আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাহার উপর তাঁহার প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাহাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাহা তোমরা দেখ নাই। তিনি কাফিরদের বাক্য হেয় করেন এবং আল্লাহ্র বাক্যই সর্বোপরি। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়" (৯ ঃ ৪০)।

(তিন) অনুরূপ বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে অলৌকিকভাবে বিজয় দান করিয়াছিলেন, বদরে তিনি তাঁহার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরও অলৌকিক ঘটনা বদরে সংঘটিত হইয়াছে, যাহার প্রতিটির বর্ণনা কুরআনে রহিয়াছে। ফেরেশতা বাহিনীর মাধ্যমে যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদের অনুকূলে আনয়নের মু'জিযা এইভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে, তিনি উহা কবুল করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করিব এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা যাহারা একের পর এক আসিবে। আল্লাহ ইহা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই আসে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৮ ঃ ৯-১০)।

(চার) এমনিভাবে বদর প্রান্তরে মুসলমানদের কল্যাণে অসময়ে বৃষ্টি বর্ষণের মু'জিযা কুরআনে বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝

"এবং আকাশ হইতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন, উহা দ্বারা তোমাদের পবিত্র করার জন্য, তোমাদের হইতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করিবার জন্য এবং তোমাদের স্থির রাখিবার জন্য" (৮ ঃ ১১)।

(পাঁচ) অনুরূপ বদর প্রান্তরে কাফিরদের চক্ষে মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখানো হইয়াছে যাহাতে তাহারা অধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অপর দিকে মুসলমানদের চক্ষে কাফিরদেরকে কম দেখানো হইয়াছে যাহাতে মুসলমানগণ ঘাবড়াইয়া না যায়। ইহা ছিল একটি মু'জিযা ও অসাধারণ ব্যাপার। কুরআনে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ

"দুইটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করিতেছিল, অন্যদল কাফির ছিল। উহারা তাহাদেরকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখিতেছিল। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় ইহাতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে" (৩ ঃ ১৩)।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. মওলানা তফাজ্জল হোছাইন রচিত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)ঃ মু'জিযার স্বরূপ ও মু'জিযা। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র কয়েকটি মু'জিযা এখানে উদ্ধৃত করা হইল। ইহা ছাড়াও আরও বহু মু'জিযার ঘটনা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং ড. হায়কালের এই দাবি যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মু'জিযা বলিতে শুধু পবিত্র কুরআনকে বুঝায় এবং ইহা ছাড়া তাঁহার কোন মু'জিযা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয় নাই, সম্পূর্ণ মনগড়া ও ভিত্তিহীন।

ড. হায়কালের মতে, হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে সংঘটিত যেই সমস্ত অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা হয় মনগড়া, বানোয়াট কিংবা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহে। সুতরাং তাহার নানারূপ ব্যাখ্যার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতঃপর তিনি কুরআন ব্যতীত অন্যান্য মু'জিযাসমূহের অসারতা ও অবাস্তবতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে দুইটি কাহিনী উপস্থাপন করিয়াছেন এবং উহার অসারতা প্রমাণের জন্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। কাহিনী দুইটি নিম্নরূপ ঃ

(এক) ড. হায়কল লিখিয়াছেন, সীরাত বিষয়ক সকল গ্রন্থেই অভিন্ন মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মি'রাজের পূর্বে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে শুনিতে পাইলেন যে, একই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-কে মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করানো হইয়াছে এবং সেখানের পবিত্র স্থানগুলি পরিদর্শন করানো হইয়াছে। এই কথা শুনিবার সাথে সাথে একদল মুসলমান তাহা অবিশ্বাস করিয়া ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিল (হায়াতে মুহাম্মাদ, ভূমিকা)।

(দুই) ড. হায়কাল লিখিয়াছেন, সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শুমের ঘটনাও এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। হিজরতের সময় মহানবী (স) মদীনার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করেন। তাঁহাকে জীবিত কিংবা মৃত ধরিয়া দেওয়ার জন্য মক্কাবাসী কাফিররা পুরস্কার ঘোষণা করে। সুরাকা পুরস্কারের লোভে মহানবী (স)-কে ধরিবার জন্য তাঁহার পিছু ধাওয়া করে। সে তাঁহার পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হয়। এমনকি কোন কোন জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন, সে তাঁহার নিকট পৌঁছিলে অলৌকিকভাবে তাহার ঘোড়ার ক্ষুর মাটিতে ডাবিয়া যায় (হায়াতে মুহাম্মাদ, ভূমিকা)।

ড. হায়কালের এই ঘটনা দুইটি বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, নবী-রাসূলগণের মু'জিযা তাঁহাদের দাবির সত্যতা প্রতিষ্ঠা ও তাহাদের প্রতি ঈমান আরও সুদৃঢ়করণের জন্য সহায়কস্বরূপ। সেই হিসাবে কোন নবী-রাসূল হইতে কোন মু'জিযা প্রকাশ পাওয়া তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসীদের ঈমান আনয়নের সহায়ক হইবে, আর বিশ্বাসীদের ঈমানকে আরও সুদৃঢ় করিবে। ইহাই যুক্তির চাহিদা। অথচ মি'রাজের ঘটনায় কোন কাফিরের ঈমান আনয়ন তো দূরের কথা, স্বয়ং ইতোপূর্বে যাহারা ঈমানদার ছিল তাহাদের একটি দল পর্যন্ত এই ঘটনা শুনিয়া মুরতাদ হইয়া গেল। ইহা তো এই কথাই প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনে আল-কুরআন ভিন্ন অন্য কোন মু'জিযা ছিলনা।

অনুরূপ সুরাকার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, এই মু'জিযা দেখিয়াও সুরাকা ঈমান আনিল না কেন? ফিরআওনের যাদুকররা তো মূসা (আ)-এর মু'জিযা দেখিয়া ঈমান আনয়ন করিয়াছিল।

মু'জিযার সত্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ড. হায়কালের গৃহীত মূলনীতি দেখিয়া বড়ই আশ্চর্যবোধ হয়। তিনি কোথা হইতে এই মূলনীতি আবিষ্কার করিলেন যে, কোন নবীর মু'জিযা দেখিয়া তাঁহার উম্মত ঈমান আনয়ন না করিলে উক্ত মু'জিযা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে? স্বয়ং ড. হায়কালের দাবি মতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একমাত্র মু'জিযা পবিত্র কুরআন শুনিয়া উহার

সকল শ্রোতাই কি ঈমান আনয়ন করিয়াছিল? উত্তর 'না' হইলে পবিত্র কুরআন কি অসত্য হইয়া যাইবে? বস্তুত তিনি তাহার ভিত্তিহীন মনগড়া একটি যুক্তির দ্বারা দুইটি সুপ্রতিষ্ঠিত মু'জিযা অস্বীকার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, যাহার একটি (মি'রাজ) স্বয়ং কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে এবং অপরটি (সুরাকার ঘটনা) বুখারী ও মুসলিমসহ হাদীছ ও সীরাতের সকল বিশুদ্ধ গ্রন্থে সহীহ্ সনদে সংরক্ষিত রহিয়াছে (দ্র. সহীহ্ বুখারী, ১খ., পৃ. ৫১০, ৫১৫, ৫৫৪; মুসলিম, ২খ., পৃ. ৪১৯)।

ড. হায়কাল আরও একটি যুক্তি পেশ করিয়াছেন যে, অন্যান্য নবী-রাসূলগণের মু'জিযা দেখিয়া বিরুদ্ধবাদীদের ঈমান আনয়নের ঘটনা পবিত্র কুরআন ও ইতিহাসে উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিয়া কোন মুশরিক ঈমান আনয়ন করিয়াছে এমন বর্ণনা ইতিহাসে উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা প্রমাণ করে যে, কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন মু'জিযা ছিল না (হায়াতে মুহাম্মদ, ভূমিকা দ্র.)।

ড. হায়কালের এই যুক্তি তথ্যনির্ভর নহে। কারণ হাদীছ ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে এই জাতীয় একাধিক ঘটনা সহীহ্ সনদ দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা উহার কয়েকটি ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

(এক) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া বলিল, আমি ঐ পর্যন্ত আপনাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করিব না, যতক্ষণ না এই খেজুর বৃক্ষের কাঁদিসমূহ আপনার নিকট আসিয়া আপনার রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে। আল্লাহর কৃপায় তাহাই ঘটিল। যখন সে এই ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিল, তখন ইসলাম গ্রহণ করিল (সুনান তিরমিযী, পৃ. ৬০৩)।

(দুই) একবার এক সফরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত এক বেদুঈনের সাক্ষাত হইল। তিনি লোকটিকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। লোকটি বলিল, আপনার সত্যতার সাক্ষ্য কে দিতেছে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সম্মুখের এই বৃক্ষটি। এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বৃক্ষটিকে কাছে ডাকিলেন। তৎক্ষণাত বৃক্ষটি তাঁহার সম্মুখে হাযির হইল এবং উহার মধ্য হইতে তিনবার কলেমা তায়্যিবার ধ্বনি উচ্চারিত হইল। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া লোকটি তৎক্ষণাত ইসলামে দাখিল হইয়া গেল (সীরাতুন্নবী (স), ৪খ., পৃ. ১০২৬)।

(তিন) রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতকালে উম্মে মা'বাদ ও আবূ মা'বাদ নামক দুইজন মরুবাসীর ইসলাম গ্রহণের কথা সুবিখ্যাত। ইহারা ছিলেন খুযা'আ গোত্রের লোক। মদীনার পথে একটি ঝুপড়ীতে তাহারা বাস করিত এবং পথিক-মুসাফিরদের সেবা ও মেহমানদারী করিত। মেষ পালনই ছিল তাহাদের একমাত্র জীবিকা নির্বাহের উপায়। রাসূলুল্লাহ (স) এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উম্মে মা'বাদের ঝুপড়ীর পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা কিছু পাথেয় খরীদ করার জন্য উম্মে মা'বাদের ঝুপড়ীতে আগমন করিলেন। কিন্তু খরীদ করার মত কিছুই তাহার নিকট পাওয়া গেল না। রাসূলুল্লাহ (স) দেখিলেন, উম্মে মা'বাদের ঝুপড়ীর এক কোণে একটি ছাগী দাঁড়াইয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ছাগীটি দুধ দেয় কি? উম্মে মা'বাদ বলিল, সে তো হাটিতেই পারে না, এত দুর্বল ছাগী আবার দুধ দেয়?

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি অনুমতি দিলে আমি দোহন করিয়া দেখিতে পারি। উম্মে মা'বাদ বলিল আচ্ছা, আপনি দোহন করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বিসমিল্লাহ বলিয়া উহার দুধ দোহন করিতে লাগিলেন। দেখা গেল দুধ বাহির হইয়া আসিতেছে। রাসূলুল্লাহ (স), তাহার সাথীগণ, উম্মে মা'বাদ ও তাঁহার ঝুপড়ীর লোকজন সকলেই তৃপ্তি সহকারে পেট ভরিয়া দুধ পান করিলেন। তৎপর আরও কিছু দুধ উম্মে মা'বাদের কাছে অবশিষ্ট রহিয়া গেল।

দুধ পান করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাথীসহ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবূ মা'বাদ মরুভূমিতে মেষ চারণ করিয়া ঝুপড়ীতে ফিরিয়া আসিল। আবূ মা'বাদ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়া বলিল, আল্লাহ্র শপথ! ইনি মনে হয় কুরায়শ গোত্রের সেই লোকটি। তাঁহার কথা অনেক শুনিয়াছি। আমাদের সুযোগ হইলে আমরা তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইব। ইব্ন কাছীর রিওয়ায়াত করিয়াছেন, এই ঘটনার পর উম্মে মা'বাদ ও আবূ মা'বাদ উভয় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৭২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৮৯)।

কতিপয় আধুনিক সীরাতকার উম্মে মা'বাদের হাদীছটিকে সনদের দিক হইতে দুর্বল আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু মুহাক্কিক আলিমগণ হাদীছটির সনদ সম্বন্ধে তথ্য-তালাশের পর হাদীছটিকে সহীহ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসন্ধান মতে এই হাদীছটি একাধিক সাহাবী হইতে একাধিক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

(এক) উম্মে মা'বাদ-এর সনদে ইবনুস-সাকান, আল-ইসাবায় (দ্র. ইসাবা, বাবুল-আসমা ওয়াল- কুনা); (দুই) আবূ মা'বাদ-এর সনদে ইমাম বুখারী তাঁহার "তারীখ" গ্রন্থে (দ্র. তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১৫৫); (তিন) হুবায়শ ইব্ন খালিদ-এর সনদে আল্লামা বাগাবী, ইব্ন শাহীন, ইবনুস-সাকান ও ইমাম তাবারানী প্রমুখ মুহাদ্দিছ নিজ নিজ গ্রন্থে (দ্র. তাহযীবুল-কামাল, ১খ., পৃ. ৩৪); (চার) আবূ সালীত বদরী-এর সনদে হাদীছটি 'উয়ূনুল- আছার গ্রন্থে বর্ণিত আছে (দ্র. সীরাতে মোস্তফা, ১খ., পৃ. ৩৯০); (পাঁচ) হিশামের সনদে মুস্তাদরাক হাকেম গ্রন্থে। হাকেম হাদীছটি রিওয়ায়াত কারার পর মন্তব্য কারিয়াছেন, هٰذا حديث صحيح الاسناد "এই হাদীছটির সনদ সহীহ" (মুস্তাদরাক, ৩খ., পৃ. ১০)।

উপরন্তু এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের সাথী হযরত আবূ বকর (রা) হইতেও সহীহ সনদে বর্ণিত হইয়াছে (দ্র. দালায়েল লিল-বায়হাকী, মুস্তাদরাক লিল-হাকেম ও আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া লি ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ১৯১)। ইব্ন কাছীর বলেন, اسناده حسن "উহার সনদ হাসান-নির্ভরযোগ্য"।

অতএব, উম্মে মা'বাদের বর্ণিত এই মু'জিযার ঘটনাটি সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় পোষণ করিবার কোনই যুক্তিসংগত কারণ নাই।

ড. হায়কালের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণের জন্য সূরা আল-কামারের প্রথম দুইটি আয়াতই যথেষ্ট। ইরশাদ হয়েছে ঃ

"কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে। ইহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, ইহাত চিরাচরিত যাদু" (৫৪ ঃ ১-২)।

সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ

قال انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه وقال رسول الله ﷺ اشهدوا۔

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল, এক খণ্ড পাহাড়ের উপরের দিকে এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের নীচের দিকে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা সাক্ষী থাক" (বুখারী, কিতাবুত-তাফসীর)।

আধুনিক মুসলিম পণ্ডিতদের এইরূপ অভিমতের কারণ

জড়বাদী, বস্তু পূজারী ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে একটি প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা যায় যে, তাহারা নবী-রাসূলগণের জীবদ্দশায় সংঘটিত যথার্থ তথ্য-প্রমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত অলৌকিক (মু'জিযা) ঘটনাবলী অস্বীকার করিয়া থাকেন অথবা তাহারা নিজেদের সীমাবদ্ধ মানবীয় বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা উহা বিকৃত করিবার অপচেষ্টা চালাইয়া থাকেন। তাহাদের এই সংকীর্ণ মানসিকতা সম্বন্ধে ইহাই যথার্থ বক্তব্য হইবে যে, যাহারা আধ্যাত্মিক জগতের খোঁজ জানে না, যাহাদের জ্ঞানের দৌড় বস্তুতান্ত্রিক জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যাহাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক জড় জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ—তাহাদের চক্ষে এই সমস্ত অলৌকিক (মু'জিযা) ঘটনাবলী এইভাবে প্রতিভাত হওয়াই স্বাভাবিক।

যাহারা নিজেদের রাসূল হযরত ঈসা (আ)-এর অলৌকিক জন্মের কথা অস্বীকার করিতে পারিয়াছে, তাহারা যে অন্যান্য নবী-রাসূলের, বিশেষত শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনে সংঘটিত অলৌকিক (মু'জিযা) ঘটনাবলী অস্বীকার করিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? তবে বিস্ময় লাগে আমাদের কতিপয় মুসলিম পণ্ডিতের জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-বিবেচনার উপর। কারণ তাহারা আল্লাহ তা'আলার জড়-উর্ধ্ব মহান কুদরত ও অসাধারণ ক্ষমতায় বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত মু'জিযাসমূহকে নিজেদের প্রসার যুক্তি ও সংকীর্ণ মেধা বুদ্ধি দ্বারা অস্বীকার করিতে কিংবা উহার অপব্যাখ্যা সন্ধানে উদ্যত হইয়াছেন। তাহারা যে নিরপেক্ষ, সুস্থ যুক্তি ও বিবেক দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌছান নাই বরং ইউরোপীয়া জড়বাদী লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন-উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলে তাহাদেরই অন্যতম লেখক বন্ধু মিসরের ড. হুসায়ন হায়কালের এই বক্তব্য হইতে। তিনি তাহার হায়াতে মুহাম্মাদ গ্রন্থের ভূমিকায় মু'জিযা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, খুব সম্ভব সে কালের ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখকগণ যুগের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট পবিত্র কুরআন বহির্ভূত অলৌকিক ঘটনাবলী তাহাদের গ্রন্থরাজিতে সংকলন করিয়াছিলেন। বলা চলে, যুগের প্রয়োজনে এই ব্যাপারে তাহারা নিরুপায় ছিলেন। পরবর্তী যুগের লেখক ও চিন্তাবিদগণও এই ব্যাপারে তাহাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছেন। তাহারা মনে করিয়াছেন যে, এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান সুদৃঢ় হইবে। এমনকি এই

সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করাও তাহাদের ধারণায় উপকার বৈ ক্ষতি ছিল না। তাহারা যদি এই ধরনের সু-ধারণা পোষণ না করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা হইতে বিরত থাকিতেন। তাহারা বর্তমানে জীবিত থাকিলে দেখিতে পাইতেন, ইসলামের শত্রুরা এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ইসলাম সম্পর্কে জঘন্য সমালোচনা করিয়াছে। এই পরিণতি দেখিতে পাইলে পবিত্র কুরআন বহির্ভূত অলৌকিক ঘটনাবলী কখনও তাহারা নিজেদের গ্রন্থরাজিতে সংকলন করিতেন না (দ্র. হায়াতে মুহাম্মাদ, ভূমিকা, মু'জিযা প্রসংগে)।

মু'জিযা নবূওয়াতের প্রমাণ না নিদর্শন?

"মু'জিযা নবূওয়াতের প্রমাণ না নির্দশন" বিষয়টি লইয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে প্রাচীন মুসলিম মনীষীদের মধ্যে যেমন মতবিরোধ হইয়াছে, বর্তমান কালেও উহাতে প্রচণ্ড মতভেদ বহাল রহিয়াছে। অতীত ও প্রাচীন মুসলিম মনীষীদের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত-এর 'আশাইরা আকীদা বিশেষজ্ঞ আলিমদের অভিমত এই যে, মু'জিযা নবূওয়াত ও রিসালাতের হুজ্জত বা প্রমাণস্বরূপ। পক্ষান্তরে " আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত বহির্ভূত মু'তাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত চিন্তাবিদগণের অভিমত এই যে, "মু'জিযা নবূওয়াতের হুজ্জত বা প্রমাণ নহে, তবে উহা নবূওয়াতের আলামত যে নিদর্শন মাত্র" (দ্র. সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ১০০৮)।

বর্তমান কালে মিসরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখগণও এই অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন, ইহার বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ট আলিম, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও ইসলামী বিশেষজ্ঞ মনীষীদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, মু'জিযা নবূওয়াত ও রিসালাতের দাবির সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উহা নিছক আলামত বা নিদর্শনের পর্যায়ের নহে (দ্র. মানহাজুল মাদরাসাতিল আকলিয়া আল-হাদীছাহ ফিত-তাফসীর, ড. ফাহ্‌দ বিন আবদুর রহমান, বৈরূত, মুআস্‌সাসতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি., ২খ., পৃ. ৫৪৫-৫৯৫)।

যুক্তি ভিত্তিক প্রমাণ

মু'তাযিলাদের দাবীর পক্ষে যুক্তি এই যে, তর্কশাস্ত্রের বিধানানুসারে দাবি ও দলীলের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র থাকা অপরিহার্য। কিন্তু মু'জিযা ও নবূওয়াতের মধ্যে কোন প্রকার যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায় না। যেমন, কোন ব্যক্তি যখন নবূওয়াতের দাবি করেন তখন তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে মানব জাতির আকীদা ও বিশ্বাস, আমল ও কার্যক্রম এবং আখলাক ও চরিত্র সংশোধনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার নিকট এই দাবির সত্যতা নিরূপণের জন্য দলীল প্রমাণ তলব করা হয়, তখন তিনি বিশুষ্ক কুয়াকে পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন কিংবা চাঁদকে দুই টুকরা করিয়া দেখান অথবা তাহার যষ্টি সর্পে পরিণত হইয়া যায়। এই সমস্ত ঘটনা যদিও নেহায়েত আশ্চর্যজনক এবং অভাবিতপূর্ব, কিন্তু এই সমস্ত দলীল-প্রমাণের সহিত দাবির কোন যোগসূত্র আছে কি?

'আশাইরা মনীষিগণ মু'তাযিলাদের এই তর্ক-যুক্তির উত্তরে বলেন নবূওয়াত হইতেছে 'ইলম ও 'আমল-এর সমন্বিত রূপ। যেই ব্যক্তি নবূওয়াতের দাবি করেন ও তাহার সম্পর্কে এই কথা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, তিনি এই 'ইলম ও আমল সম্বন্ধে পরিপূর্ণ দক্ষতার অধিকারী এবং তাঁহার এই পরিপূর্ণতার বিকাশকল্পে তাহার নিকট মু'জিযা তলব করা হয়। নবীগণের মু'জিযা যদিও বিভিন্ন শ্রেণীর হইয়া থাকে, তবুও এইগুলিকে শুধু দুই শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। যেমন অদৃশ্য জগতের সংবাদ প্রদান করা এবং সৃষ্টি জগতের বস্তুনিচয়ের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখা। এই দুই শ্রেণীর কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন অংশের সহিত এবং নবূওয়াতের বিভিন্ন অংশের সহিত রহিয়াছে এক নিবিড় বন্ধন ও একাত্মতা । অদৃশ্য জগতের সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের জ্ঞান ও মনীষার পরিপূর্ণতা বিকশিত হইয়া উঠে। অপরদিকে সৃষ্টি জগতের বস্তুনিচয়ের উপর কর্তৃত্ব নিষ্পন্ন করিবার দ্বারা তাহার ব্যবহারিক শক্তির বিকাশ সাধিত হয়।

অপর একটি যোগসূত্র হইতেছে, মু'জিযা হইল সহজাত স্বভাবের অতীত কোন স্বভাবের নাম। তবে এই ক্ষেত্রে ইহা লইয়া কোন মতবিরোধ নাই যে, বস্তুনিচয় উহার গুণাবলী এবং উহার কারণসমূহ কেবল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও হুকুম দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে। এখন যদি কোন শক্তি এইসব বৈশিষ্ট্য ও কারণসমূহকে স্বীয় মু'জিযার দ্বারা নিশ্চিহ্ন কিংবা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একাকার করিয়া দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি বস্তুত এই কথার যথার্থতাই তুলিয়া ধরিলেন যে, যেই মহানুভব ও সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী সত্তা এই সমস্ত কারণ ও উপাদান সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল তিনিই সেইগুলিকে ধ্বংস কিংবা অকেজো করিয়া দিতে পারেন। এই ভাঙ্গা-গড়ার অবিকল ধারা যেহেতু তাঁহার (নবীর) মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে, সেহেতু ইহা প্রমাণ করে যে, ইনিই সেই সত্তার প্রতিনিধি।

ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, একজন বাদশাহ স্বীয় প্রজাদের নিকট প্রয়োজনের তাকিদে দূত প্রেরণ করেন। প্রজাগণ জিজ্ঞাসা করিল, এই কথার প্রমাণ কি যে, আপনি মহান বাদশাহর একজন বার্তাবাহক প্রতিনিধি? তখন সে উহার প্রতিউত্তরে বাদশাহর সীলমোহর এবং অঙ্গুরী পেশ করিতে বাধ্য হয়। যদিও প্রকাশ্যভাবে দূতের পয়গাম্বরীসুলভ দাবির সহিত সীলমোহর এবং অঙ্গুরীয়ের সরাসরি কোন যোগসূত্র নাই, কিন্তু তবুও ইহার মধ্যে সম্পর্ক এইভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, সীলমোহর এবং অঙ্গুরীয় বাদশাহরই নিদর্শন বটে, যাহা একজন সাধারণ মানুষের হাতে কখনও আসিতে পারে না। সুতরাং ইহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, এই দূতকে বাদশাহ সরাসরি তাহার একান্ত ব্যক্তিগত নিদর্শন প্রদান করিয়াই প্রেরণ করিয়াছেন।

মু'জিযা নবূওয়াতের প্রমাণ হওয়ার অনুকূলে কুরআন-হাদীছের দলীল

(এক) আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগের মুশরিক ও পৌত্তলিকদের নিন্দা, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়াছেন এবং এই মর্মে তাহাদের বর্ণনা দিয়াছেন যে, মুশরিকরা আল্লাহর আয়াত ও মু'জিযায় বিশ্বাসী নহে। যদি মু'জিযা নবূওয়াতের প্রমাণই না হইত তাহা হইলে মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিবার পর উহাতে ঈমান আনয়ন না করিলে তাহারা ভর্ৎসনা ও নিন্দার যোগ্য

হইবে কেন ? অথচ দেখুন, নিজের আয়াতসমূহে মু'জিযা অস্বীকার করার কারণে মুশরিকদেরকে কিরূপ ভর্ৎসনা করা হইয়াছে।

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلاَّ كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ . فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ اَنْبٰؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ .

"তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর এমন কোন নির্দশন তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় না যাহা হইতে তাহারা মুখ না ফিরায়। সত্য যখন তাহাদের নিকট আসিয়াছে, তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহার যথার্থ বিবরণ অচিরেই তাহাদের নিকট পৌঁছিবে" (৬ ঃ ৪-৫)।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لاَّيُؤْمِنُوْا بِهَا حَتّٰى اِذَا جَاءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ . وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ . وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

"তাহাদের মধ্যে কতকলোক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে, কিন্তু আমি তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে। আমি তাহাদেরকে বধির করিয়াছি এবং তাহারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও উহাতে ঈমান আনিবে না, এমনকি তাহারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন কাফিররা বলে, ইহা তো সেকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নহে। তাহারা অন্যকেও উহা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকে। আর তাহারা নিজেরাই শুধু নিজেদেরকে ধ্বংস করে, অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না। তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদেরকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে, হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূকে অস্বীকার করিতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম" (৬ ঃ ২৫-২৭)।

মু'জিযা যদি হুজ্জত বা প্রমাণই না হয় তাহা হইলে কিসের ভিত্তিতে উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে মু'জিযা অস্বীকারকারীদেরকে এইরূপ তিরস্কার করা হইল ?

(দুই) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلاَّ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلاَّ تَخْوِيْفًا .

"পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ ছামূদ জাতিকে উষ্ট্র দিয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা উহার প্রতি জুলুম করিয়াছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি" (১৭ : ৫৯)।

এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হইয়া মানুষের প্রতি মু'জিযা প্রেরণ করেন না। কেননা মু'জিযা প্রকাশের পর মানুষ যদি তাহা অস্বীকার করে তাহা হইলে তাহারা আযাবের যোগ্য হইয়া পড়িবে। যেমন অতীতের উম্মতসমূহের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটিয়াছে। সুতরাং ইহাই এই কথার প্রমাণ বহন করে যে, মু'জিযা নবূওয়াতের হুজ্জত বা প্রমাণ, যাহার প্রকাশের পর আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। ইহার পরও কেহ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করিলে সে শাস্তিযোগ্য হইয়া যাইবে। সুতরাং মু'জিযা হুজ্জত না হইলে উহা অস্বীকার করার প্রেক্ষিতে আযাব অবধারিত হয় কিরূপে?

(তিন) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ . قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ . قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ . قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ .

"স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, হে মরিয়ম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করিতে সক্ষম? সে বলিয়াছিল, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। তাহারা বলিয়াছিল, আমি চাহি যে, উহা হইতে আমরা কিছু খাইব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করিবে। আর আমরা জানিতে চাহি যে, তুমি আমাদেরকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা উহার সাক্ষী থাকিতে চাহি। মরিয়ম-তনয় ঈসা বলিল, হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর। ইহা আমাদের এবং পরবর্তী সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসবস্বরূপ এবং তোমার নিকট হইতে নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান কর আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। আল্লাহ বলিলেন, আমিই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব, কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ কুফরী করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাহাকেও দিব না" (৫ : ১১২-১১৫)।

কুরআনের উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, হাঁ, আমি তোমাদের কাঙ্ক্ষিত মু'জিযা প্রদান করিব। কিন্তু উহা প্রদানের পর কেহ উহা অস্বীকার করিলে তাহাকে

নজীরবিহীন শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। 'মু'জিযা নবূওয়াতের প্রমাণ'-এই অভিমতের সমর্থনে কুরআনের এই আয়াতগুলি অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ ।

(চার) আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ ۔ قَالَ فَأْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۔ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۔ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاۤءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۔ قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۔

"মূসা বলিল, আমি তোমার কাছে স্পষ্ট কোন প্রমাণ আনয়ন করিলেও ? ফিরআওন বলিল, তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে উহা (প্রমাণ) পেশ কর। অতঃপর মূসা তাহার যষ্ঠি নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল। এবং মূসা হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল। ফিরআওন তাহার পরিষদবর্গকে বলিল, এ তো সুদক্ষ যাদুকর" (২৬ ঃ ৩০-৩৪)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে প্রদত্ত মু'জিযাকে بشىء مبين 'স্পষ্ট ব্যাপার' তথা প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ফিরআওনও উহাকে তাঁহার নবুওয়াতের দাবির সত্যতার প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করিবার জন্য আহবান করিয়াছে। অতঃপর মূসা (আ) তাঁহার নবূওয়াতের দাবির সত্যতার প্রমাণ হিসাবে তাঁহাকে প্রদত্ত মু'জিযা পেশ করিয়াছেন।

(পাঁচ) নবী ও রাসূলগণকে প্রদত্ত মু'জিযা তাহাদের নবূওয়াত ও রিসালাতের দাবির সত্যতার প্রমাণস্বরূপ—একথা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে প্রদত্ত দুইটি মু'জিযা সম্বন্ধে স্পষ্টত বলিয়াছেন। যেমন ঃ

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَاۤنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۔ اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاۤءَ مِنْ غَيْرِ سُوْۤءٍ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۔

"আরও বলা হইল, তুমি তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়া তাকাইল না। তাহাকে বলা হইল, হে মূসা! সম্মুখে আইস! ভয় করিও না, তুমি তো নিরাপদ। তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষ হইয়া। ভয় দূর করিবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চাপিয়া ধর। এই দুইটি তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গের জন্য। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়" (২৮ ঃ ৩১-৩২)।

অতএব কুরআনের এ জাতীয় সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্তমান থাকিবার পর—মু'জিযা প্রমাণ না নিদর্শন—এই বিষয়ে কোনরূপ মতবিরোধ এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই।

মু'জিযার সত্যতা প্রতিষ্ঠা

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনাক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী আকাইদ ও মু'জিযা সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তিক কোন বিতর্কের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন গ্রীক দর্শন সম্বলিত গ্রন্থাবলীর আরবী তরজমা মুসলমানদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে, তখন ইহা ইসলামের 'ইলমে কালাম তথা আকাইদ তর্কশাস্ত্রের একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে রচিত হয় এবং এই সমস্ত যুক্তি-তর্কের গুরুত্ব এতই বৃদ্ধি পায় যে, তখন এই গ্রীক দর্শনের কষ্টিপাথরে যাচাই ব্যতীত কোন বিষয়ই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না।

গ্রীসের অধিবাসীরা আল্লাহ-প্রদত্ত শরী'আত সম্বন্ধে পরিচিত ছিল না। তাহারা ছিল পৌত্তলিক। এইজন্য তাহারা নবূওয়াত, নবূওয়াতের বৈশিষ্ট্য, ওহী, ইলহাম ও মু'জিযা সম্পর্কেও ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অপরিচিত। এই কারণে গ্রীক দর্শনে এই সমস্ত বিষয়ের কোন আলোচনাই স্থান পায় নাই। এই প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্‌ন রুশদ তাঁহার "তাহাফাতুত-তাহাফুত" নামক গ্রন্থে বিস্তৃত বিশ্লেষণ পেশ করিয়াছেন। আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়াযও স্বীয় রচনাবলীতে এই প্রসঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তবে এই ক্ষেত্রে সবচাইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছেন মুসলিম দার্শনিক শায়খ ইয়া'কূব আল-কিন্দী। তাঁহার পর দার্শনিক ফারাবীও এই সম্পর্কে যথেষ্ট লেখালেখি করিয়াছেন। তিনি মু'জিযা সম্পর্কে লিখিয়াছেন ঃ নবূওয়াতের অধিকারী সত্তার রূহের মধ্যে এক ধরনের পবিত্র শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন তোমাদের দেহের মধ্যে তোমাদের প্রাণশক্তি রহিয়াছে এবং তোমাদের দেহ তোমাদের রূহের অনুগত হইয়া থাকে, অনুরূপ সেই পবিত্র শক্তিসম্পন্ন রূহ সার্বিকভাবে বিশ্বের অবয়বধারী বস্তুনিচয়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে এবং সমগ্র বিশ্বজগত তাহার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং এই কারণেই পবিত্র রূহানী শক্তিসম্পন্ন সত্তা হইতে সহজাত স্বভাবের অতীত কর্মকাণ্ড প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাই মু'জিযা (দ্র. সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ৯১৮)।

"যে কোন বস্তুর সহজাত স্বভাবের অতীত কর্মকাণ্ডের নাম মু'জিযা"—কথাটির ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক বস্তুর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও নিয়মতান্ত্রিকতা আছে যাহা উহা হইতে কখনও পৃথক হয় না। যেমন আগুনের সহজাত বৈশিষ্ট্য হইল ভস্মিভূত কর, সমুদ্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য হইল প্রবাহিত থাকা, বৃক্ষের সহজাত স্বভাব হইল স্থির থাকা, পাথরের বৈশিষ্ট্য হইল চলিতে না পারা, মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য হইল, মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত না হওয়া ইত্যাদি। এখন যদি এমন হয় যে, আগুন ভস্মিভূত করে নাই, সমুদ্র স্থির হইয়া রহিয়াছে, প্রবাহ নাই, পাথর চলিতে শুরু করিয়াছে, কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, মৃত জীবিত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ইহা পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। ইহা সেই বস্তুর সহজাত কার্যকারণ সম্পর্কের সুশৃংখল ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, পৃথিবীর বস্তুনিচয়ের এই সহজাত নিয়মাবলী কি পরিবর্তনযোগ্য? দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের একটি দলের অভিমত এই যে, বস্তুনিচয়ের সহজাত নিয়মতান্ত্রিকতার কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে। এই ভিত্তিতে

তাহারা মু'জিযার অসম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। মুসলিম দার্শনিকদের একটি শ্রেণীও এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। যেমন ফারাবী, ইব্ন সীনা, ইব্ন মিসকাওয়ায়হ্ প্রমুখ.(দ্র. সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ৯৪৩)।

ইব্ন তায়মিয়্যা তাঁহার "রাদ্দুল মানতিক" নামক গ্রন্থে এবং ইব্ন হাযম জাহিরী তাঁহার 'আল-ফিসাল ফিল-মিলালি ওয়ান-নিহাল' নামক গ্রন্থে ফারাবী, ইব্ন সীনা প্রমুখ দার্শনিকের অভিমতকে পরিত্যজ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কারণ "প্রকৃতির সহজাত নিয়মাবলীর পরিবর্তন সম্ভব নহে" কথাটি বাস্তবসম্মত নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন প্রাণীর জন্মের প্রাকৃতিক নিয়ম হইল, এক ফোটা বীর্য হইতে রক্ত উৎপন্ন হয়; রক্ত হইতে গোশত উৎপন্ন হয়, তৎপর পর্যায়ক্রমে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত উহা মাতৃ উদরে প্রতিপালিত হয়, ফলে উহা পরিণত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ দেহাবয়বে। অতঃপর উহা নবজাত শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয় এবং পর্যায়ক্রমে শিশুরূপ ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে এবং পরবর্তীতে সুস্থ, সুডৌল দৈহিক কান্তির অধিকারী একজন শৌর্য-বীর্য সমৃদ্ধ যুবকে রূপান্তরিত হয় এবং তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

এই হইল একটি মানুষের জন্মের সহজাত প্রাকৃতিক নিয়ম। এখন এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়সমূহ অতিক্রম করা ব্যতীত কাহারও পক্ষে সুদেহী প্রাণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করাও সম্ভব। মোটেও অসম্ভব নহে। এই ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য এই যে, এক ফোটা বীর্য রক্তে রূপান্তরিত হইতে, তৎপর গোশতে, তৎপর অস্থি-মজ্জায় ও সুডৌল- সুঠাম হইতে অন্তর্বর্তীকালীন যেই পর্যায়গুলি অতিক্রম করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে, তাহা যদি কোনভাবে পূরণ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়গুলি অতিক্রম করা ছাড়াই এক ফোটা বীর্য একটি সুঠাম-সুডৌল দেহে রূপান্তরিত হইতে পারে। আধুনিক কালে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে নানান ফসলাদির উৎপাদন বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গের প্রকৃষ্ট উদাহরণ নহে কি?

কতিপয় দার্শনিক মনে করেন, পৃথিবীর ঘটনাবলী কোন না কোন প্রাকৃতিক কার্যকারণ দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু সহজাত প্রকৃতির অতীত কর্মকাণ্ডে এই কার্যকারণ অনুপস্থিত। এই ভিত্তিতেও তাহারা মু'জিযা অস্বীকার করিবার প্রয়াস পান। ইহার সমাধান এই যে, হাঁ, যাবতীয় ঘটনার পশ্চাতে কোন না কোন কার্যকারণ ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। কিন্তু ইহা তো জরুরী নহে যে, সকল ধরনের প্রাকৃতিক কারণসমূহ আমরা আমাদের জ্ঞান ও মনীষা দ্বারা সার্বিকভাবে অনুধাবন করিতে সক্ষম হইব? কিছু কিছু কার্যকারণ এমনও রহিয়াছে, যাহা অতিশয় প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম হওয়ার দরুন স্বভাবত মানুষের জ্ঞান ও মনীষা তাহা অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় না। এই পৃথিবীতে অসংখ্য-অগণিত সৃষ্টি রহিয়াছে যাহার সূক্ষ্ম রহস্যটির যৎসামান্যই মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হইয়াছে। আবার বহু সংখ্যক এমনও আছে যে, উহার কার্যকারণের গূঢ় রহস্য আজও অজানার পর্দার অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে। যেমন নবী-রাসূলগণ চল্লিশ দিন পর্যন্ত একটানা সিয়াম সাধনা করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা সামান্যতম আহার্য-পানীয় গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের শারীরিক শক্তির মধ্যে কোনই পরিবর্তন

দেখা দেয় নাই। ইহা স্পষ্টত আশ্চর্যজনক বিষয়। কিন্তু এই ঘটনাও কার্যকারণ হইতে পৃথক নহে। কেননা আমরা যদি অনুসন্ধান করি, মানুষের ক্ষুধার তাড়না দেখা দেয় কেন, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষের উদরস্থ হজমশক্তি ভক্ষিত খাদ্যকণাকে পরিপূর্ণরূপে হজম করিবার পর উহা হইতে উদ্ভূত রক্ত কণিকাগুলিকে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছাইয়া দেয়। ইহার উদরস্থ হজম শক্তির আর কোন কাজ অবশিষ্ট থাকে না, যাহার ফলে উহার মধ্যে তালাশ করার প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠে। ইহারই ফলে মানুষ ক্ষুধার তাড়না অনুভব করিয়া থাকে।

কিন্তু আমরা চলমান জীবনে এমন অভিজ্ঞতারও সম্মুখীন হই যে, কোন রোগের কারণে অথবা ভয়ভীতির কারণে অথবা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকার কারণে আমাদের দেহে এমন এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যাহার প্রভাবে দীর্ঘ কয়েক দিন পর্যন্ত আমাদের পাকস্থলীর হজমশক্তি লোপ পাইয়া যায়। ইহার ফলে আমরা ক্ষুদার তাড়না অনুভব করি না। ঠিক একই নীতির ভিত্তিতে যদি কোনও ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সহিত নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া-উঠে এবং দৈহিক অবস্থার সহিত তাহার সম্পর্ক শিথিল হয়, এমতাবস্থায়ও তাহার শারীরিক শক্তির মধ্যে স্থবিরতা বা শক্তিহীনতা দেখা দিতে পারে। এই ক্ষেত্রেও সে কয়েক দিন পর্যন্ত উপবাস থাকিতে পারে।

মোটকথা, আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত যখন গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন দৈহিক স্বাভাবিক গতিবিধি এবং কার্যক্রমের মধ্যে নিস্পৃহ ভাব দেখা দেয়। এই নাজুক লগ্নেও মানুষ দীর্ঘ দিন পর্যন্ত উপবাস করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সুতরাং এই সহজাত প্রকৃতির বরখেলাপ কার্যপ্রবাহকে যদি স্বীকার করিয়া লইতে কষ্ট না হয়, তাহা হইলে অতি প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ মু'জিযাসমূহকে অস্বীকার করার কোনই কারণ থাকিতে পারে না (দ্র. সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ৯৫০)।

বস্তুত কার্যকারণ সম্পর্কের উপর সর্বাঙ্গীন অভিজ্ঞতা মানুষের নাই। মানুষ যাহা কিছু জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, উহার তুলনা বিশাল সমুদ্রের একফোঁটা পানি অথবা উহা হইতও স্বল্প ও ক্ষীণ। উপরন্তু মানুষ যাহা কিছু জানিবার এবং অনুধাবন করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহাও পৃথিবীর কতিপয় বস্তুর চলমান গতি-প্রকৃতির সামান্য নিরীক্ষা মাত্র। উহার হাকীকতও প্রকৃত জ্ঞান নহে। মানুষ জ্ঞানের এই সীমানায় পৌছিতে অক্ষম যে, বস্তুটি কেন চলিতেছে এবং যদি বস্তুটি বিপরীত দিকে চলিত তাহা হইলে কি কি অসামঞ্জস্য প্রকাশ পাইত? এই কারণেই পৃথিবীর স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে এই কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, তাহারা কেমন প্রশ্নটির উত্তর দিতে সক্ষম, কিন্তু কেন প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর দেওয়া তাহাদের আলোচ্য বিষয়ের বাহিরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পানি কেমন ? ইহার উত্তর বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পানি কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর তাহারা দিতে পারেন নাই, এমনকি এই প্রশ্নের আলোচনাও তাহারা করেন নাই।

প্রকৃত সত্য এই যে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ কার্যকারণ সম্বন্ধে যেই মতাদর্শ দৃঢ়ভাবে আকড়াইয়া ধরিয়াছেন, বস্তুত ইহার পরিণতি অজ্ঞতা ও বুদ্ধিহীনতা বৈ কিছু নহে। কারণ

তাহাদের বিশ্বাস যে, এই বস্তুটি এই কার্যকারণ ও উপাদানে সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এই বস্তুটি অস্তিত্বে আসিতেই পারে না। যেমন বীর্য হইতে প্রাণের উৎপত্তি, ডিম হইতে পাখির উৎপত্তি, উদ্ভিদের উৎস বীজ, তাহাদের বিশ্বাসের এই সমস্ত উপাদান ছাড়া এইসব বস্তু অস্তিত্বে আসিবার কথা কল্পনাও করা যায় না। এখানে আমাদের প্রশ্ন যে, দুনিয়ার প্রথম প্রাণী, প্রথম পাখি এবং প্রথম উদ্ভিদ কি বীর্য, ডিম ও বীজ ছাড়াই সৃষ্টি হইয়াছে? এর উত্তরে যদি তাহারা হাঁ বলেন, তাহা হইলে তো তাহারা নিজেদের দাবি ও মতাদর্শের বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। আর যদি ইহা অস্বীকার করেন তাহা হইলে এই কথাও তাহাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, প্রথম বীর্য, প্রথম ডিম এবং প্রথম বীজ, প্রাণী, পাখী ও উদ্ভিদ ছাড়াই সৃষ্টি হইয়াছে।

মোটকথা, এই লক্ষ্যমাত্রাকে কখনও বিজ্ঞান তাহার বুদ্ধির শাণিত অস্ত্র দ্বারা নির্মূল করিতে পারিবে না। এমতাবস্থায় কার্যকারণ সম্পর্কিত কতিপয় দর্শন এবং মতাদর্শ তাহাদেরকে অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে। পাশাপাশি তাহাদেরকে এই কথারও স্বীকৃতি দিতে হইবে যে, এক মহা শক্তিমান ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব অবশ্যই বর্তমান রহিয়াছে, যাঁহার ইচ্ছা ও নির্দেশে বিশ্বজগতের এই কারখানা পরিচালিত হইতেছে। উপরন্তু তাহাকে এই কথাও মানিয়া লইতে হইবে যে, কার্যকারণ সম্পর্কে সেই মহান শক্তিমান সত্তার ইচ্ছা এবং নির্দেশ বিকাশের বাহ্যিক দৃষ্টান্ত ছাড়া অতিরিক্ত আর কিছু নহে। বস্তুত কার্যকারণও তাহার সার্বভৌম ইচ্ছার অধীন। পবিত্র কুরআনে এই কথাই বিবৃত হইয়াছে ঃ

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ .

"জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই। মহিমাময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ" (৭ ঃ ৫৪)।

সুতরাং বিশ্বজগতের সব কিছুর পশ্চাতে আল্লাহ্র কুদরত এবং তাঁহার ইচ্ছাই হইল মূল কারণ।

আল্লামা রূমী বলিয়াছেন, বাহ্যিক কারণসমূহের উপর হাকীকী ও মৌলিক কারণসমূহের নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকে। সুতরাং হে দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ! তোমরা বাহ্যিক কারণসমূহ দেখিয়া অভিভূত হইও না, বরং হাকিকী ও মৌলিক কারণসমূহ সম্পর্কেও গভীর চিন্তা-গবেষণা কর। কেননা নবীগণ বাহ্যিক কারণ ও উপাদান সম্পর্ককে পরিহার করিয়া নিজেদের লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া যান এবং আল্লাহ প্রদত্ত মু'জিযা ও অলৌকিক শক্তির ঝাণ্ডা সর্বত্র সমুন্নত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাই দেখা যায়, কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়াই তাহারা গহীন সমুদ্রকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া নিজেদের চলার পথ রচনা করেন এবং কৃষিক্ষেত-খামার ছাড়াই গম ও যবের ফসল লাভ করেন। এমনকি পবিত্র কুরআনে যেই দিকনির্দেশনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও এই যে, কার্যকারণ সম্পর্ক শক্তিহীন ও নিষ্ক্রিয়। এইজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে বিজয়ী হইয়াছেন এবং তাঁহারই পার্শ্বে আবূ জাহল হইয়াছে ধ্বংস। এইভাবে ক্ষুদ্র আবাবিল

পাখির প্রস্তর খণ্ডে আবিসিনিয়ার হস্তিবাহিনী হইয়াছে পর্যুদস্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর কণা আবাবীলের চঞ্চু হইতে নিক্ষিপ্ত হইত হস্তি বাহিনীর উপর, ফলে দীর্ণ-বিদীর্ণ এবং ঝাঁঝরা করিয়া দিত চর্বিত তৃণলতার মত।

মোটের উপর পবিত্র কুরআনে আগাগোড়া এই কথাই তুলিয়া ধরা হইয়াছে যে, কার্যকারণ সম্পর্কিত চলমান দুনিয়ার বাহ্যিক কারণের মধ্যে কোনই মৌলিক ক্ষমতা ও শক্তি নাই। মূল কার্যকারণের নিয়ন্ত্রণকারী মহান আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছানুসারে বাহ্যিক কার্যকারণের মধ্যে কখনও কখনও কার্যকরী শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ ঘটাইয়া থাকেন। তথাপি এই বিকাশ কারণসম্ভূত নহে, বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণাবলীর বাহ্যিক প্রতিফলন মাত্র (মছনবী)।

এই পর্যন্ত আমরা যাহা কিছু আলোচনা করিয়াছি উহার সারমর্ম এই যে, সহজাত স্বভাবকে এবং কার্যকারণ সম্পর্কের নিয়মতান্ত্রিকতাকে সর্বতোভাবে পরাজিত করার নাম হইতেছে মু'জিযা, যাহা মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মনোনীত পয়গাম্বরের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় কথা এই যে, সহজাত স্বভাবের বিপরীত কোন কিছু সংঘটিত হওয়া এবং কার্যকারণ সম্পর্কের বাঁধন ছিন্ন-বিছিন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন বিষয়ের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাব্যতা উহার কার্যত সংঘটিত হওয়ার দলীল বহন করে না, বরং কোন বিষয়ের কার্যত সংঘটিত হওয়াকে কবূল করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলীর উপস্থিতি অপরিহার্য।

(এক) বর্ণনাকারীর সন্দেহাতীত প্রত্যক্ষ করা এবং গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া। (দুই) বর্ণনাকারীর সত্যবাদী হওয়া এবং তাহার স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ ও সুস্থ হওয়া, তাহার মধ্যে প্রতারণা ও প্রবঞ্চণার প্রবণতা না থাকা। (তিন) বর্ণনাটি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমগুণ সম্পন্ন বর্ণনাকারীদের দ্বারা বিবৃত হওয়া। চার. উপরন্তু এই প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ও প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ অবিচ্ছিন্ন ধারায় সকল যুগের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সূত্র-পরম্পরায় সংরক্ষিত হইয়া আমাদের পর্যন্ত পৌছা।

এখন উল্লিখিত নীতি ও মানদণ্ডের আলোকে আমাদেরকে দেখিতে হইবে যে, হাদীছ, ইতিহাস ও ধর্মীয় কিতাবাদিতে মহানবী (স)-এর যেই সমস্ত মু'জিযার বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহাতে উপরিউক্ত শর্তানুসারে দলীল-প্রমাণ ও সাক্ষ্য পাওয়া যায় কিনা?

আমাদের উসূলে হাদীছে প্রত্যেকটি রিওয়ায়াত গ্রহণ করার জন্য উপরে উল্লিখিত নীতিসমূহকে পূর্বশর্তরূপে নির্ধারণ করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মু'জিযাত সম্পর্কে যেই সমস্ত সাহাবী প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের সত্যবাদিতা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা, স্মরণশক্তি এবং সুষ্ঠ বিচার-বিশ্লেণনী প্রতিভার প্রমাণ সর্বজন স্বীকৃত। তাহাদের নিকট হইতে পরবর্তী সময়ে যেই সমস্ত মুহাদ্দিছীনে কেরাম উক্ত বর্ণনাসমূহ নকল করিয়াছেন তাঁহাদের সত্যবাদিতা, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ ধীশক্তির কথা আসমাউর রিজাল-এর কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে সুসংরক্ষিত রহিয়াছে। উপরন্তু তাহাদের সামনে সর্বদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই সতর্ক হুঁশিয়ারী বারংবার ঝংকৃত হইত ঃ

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .

"যেই ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাহার ঠিকানা হইবে জাহান্নাম" (সহীহ মুসলিম, ১খ., পৃ. ৭)।

এই কারণে তাঁহারা যখনই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সম্পর্কিত কোন বক্তব্য রিওয়ায়াত করিতেন, তখন পরিপূর্ণ মানবিক সচেতনতা এবং বিশেষ বিবেচনার সহিত তাহা বর্ণনা করিতেন। তবে যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে সকলের সচেতনতা ও স্মৃতিশক্তি সমান নহে, সেইহেতু সার্বিক সতর্কতা এবং মনোনিবেশের পরও সকলের বর্ণনা একই মূল্যমানের হওয়া সম্ভব ছিল না। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সম্পর্কিত মু'জিযার বর্ণনাসমূহ নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা বা স্তর বিবেচনায় কম-বেশী হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমাদের সচেতন মুহাদ্দিছীনে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম এবং পরিপূর্ণ আমানতদারির সহিত নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্বল বর্ণনাসমূহকে সহীহ বর্ণনাসমূহ হইতে পৃথক করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং এই মানদণ্ডের দ্বারা সত্যতা ও যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

সারকথা এই যে, মু'জিযার সত্যতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যপ্রমাণ বিদ্যমান থাকা একান্ত জরুরী। সহীহ মু'জিযাতই পরবর্তী সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্বলিত রিওয়ায়াত-সমূহ এতই মজবুত ও সুদৃঢ় যে, দুনিয়ার কোন বর্ণনা উহার মুকাবিলা করিতে সক্ষম নহে। ইহার ফলে মু'জিযার অকাট্যতা এবং সহজাত প্রকৃতির বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বাস্তবতাকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইমাম বুখারী, সহীহুল বুখারী, মাকতাবা এমদাদিয়া, ঢাকা, তা.বি.; (২) মুসলিম, আস-সাহীহ, মাকতাবা এমদাদিয়া, ঢাকা, তা.বি.; (৩) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন্নাবাবিয়্যা-মাতবা মুস্তাফা আল-বাবিল হালাবী, মিসর; (৪) আবূ নুআয়ম ইসপাহানী, দালাইলুন নুবূয়াহ, ইসদারু আলামিল কুতুব, বৈরূত, তা. বি.; (৫) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, মাকতাবাতুন আসরিয়াহ, বৈরূত, ১৯৯৬ খৃ.; (৬) ইব্ন হাজার আস-কালানী, ফাতাহুল বারী; (৭) আবূ হাফস আন-নাসাফী, আকাইদুন-নাসাফিয়া, তাফতাযানীর ভাষ্যসহ, মু'জিযা অধ্যায়; (৮) আল-ঈযী, মাওয়াকিফ, সম্পা. sorensen, পৃ. ১৭৫; (৯) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, দালাইলুন নুবূওয়াত ও মু'জিযাতে নববী অধ্যায়, খ-৪; (১০) আল-মুজামুল বাসীত, কুতুবখানা হুসায়নিয়্যা, দেওবন্দ, তা.বি., সংশ্লিষ্ট শিরো.; (১১) ড. মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, হায়াতে মুহাম্মাদ, দারুল মাআরিফ, মিসর ১৯৭৪ খৃ., ১২তম সংস্করণের ভূমিকা; (১২) মওলানা মুহাম্মদ তাফাজ্জল হোসাইন, মু'জিযার স্বরূপ ও মু'জিযা, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ.।

মাসঊদুল করীম

নবী-রাসূলগণের মু'জিযা

আল্লাহ তা'আলা সকল যুগের সকল নবী-রাসূলকেই তাহাদের নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণ ও নিদর্শনস্বরূপ কোন না কোন অসাধারণ, অস্বাভাবিক ও অলৌকিক বিষয় প্রয়োজনবোধে মানুষকে প্রদর্শনের জন্য দান করিয়াছেন, যাহার মোকাবিলা করিতে সমকালীন মানবগোষ্ঠী চরমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাকে ইসলামের পরিভাষায় মু'জিযা বলা হয়। নবীদের যুগে সংঘটিত এই সমস্ত মু'জিযা সাধারণত চারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

(এক) কখনও মূল ঘটনাটিই ছিল সাধারণ নিয়মের বিপরীত ও অস্বাভাবিক। যেমন—হাতের লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, অংগুলী হইতে পানির ঝর্ণাধারা উৎসারিত হওয়া, মৃত ব্যক্তির জীবিত হওয়া ইত্যাদি।

(দুই) কখনও এমন হইয়াছে যে, মূল ঘটনাটি যদিও অস্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনার বিপরীত নহে, কিন্তু উহা সংঘটিত হওয়ার সময়টি ছিল অস্বাভাবিক ও অসাধারণ। যেমন– ঝড়, তুফান, বন্যা, ভূমিধ্বস ও ভূমিকম্প হওয়া, কাফির ও সত্যবিরোধী শক্তির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সহায়-সম্বলহীন মুষ্টিমেয় ঈমানদার হকপন্থীর দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়া ইত্যাদি। আল্লাহ্র গায়বী সাহায্য এই পর্যায়ের মু'জিযা হিসাবে গণ্য।

(তিন) নবী-রাসূলদের যুগে সংঘটিত মু'জিযার আরও এক প্রকার এই যে, মূল ঘটনা ও উহার প্রকাশের বিশেষ সময় যদিও সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী নহে, কিন্তু উহার প্রকাশের পন্থা ও পদ্ধতি অবশ্যই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এবং অলৌকিক। যেমন নবী-রাসূলগণের দু'আয় পানি বর্ষিত হওয়া, রোগীর নিরাময় হওয়া, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির আপদ-বিপদ কাটিয়া যাওয়া ইত্যাদি।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলির কোন একটিও সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী নহে এবং উহার আত্মপ্রকাশ ও বাস্তবায়নেরও কোন বিশেষ সময়-কাল নির্দিষ্ট নাই; কিন্তু যেইভাবে এবং যেই সকল কার্যকারণের দ্বারা এই মু'জিযা প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা নিঃসন্দেহে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ও অস্বাভাবিক। নবী-রাসূলগণের দু'আ কবূল হওয়া এই পর্যায়ের একটি মু'জিযা।

(চার) কখনও এমন হয় যে, না মূল ঘটনাটি অস্বাভাবিক, আর না উহার প্রকাশ কাল ও প্রকাশ পদ্ধতি অসাধারণ। তবে উহার সংঘটনের পূর্বেই উহা সম্পর্কে জানিতে পারা, উহা সবিশেষ অবহিত হওয়া একান্তই অসাধারণ ও অলৌকিক ব্যাপার। নবী-রাসূলগণের ভবিষ্যত বাণী এই প্রকারের একটি মু'জিযা।

মু'জিযার উপরে উল্লিখিত প্রকরণের আলোকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই কোন না কোন প্রকার মু'জিযাশক্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন।

প্রত্যেক জাতির নিকট প্রেরিত নবীর মু'জিযা ঐ জাতির তাহযীব-তমদ্দুন সামাজিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনা ও মানসিক অবস্থার অনুরূপ হইয়া থাকে। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর যুগে জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) এবং রসায়ন শাস্ত্রের প্রভাব ছিল। তাহার জাতির লোকেরা তারকা-নক্ষত্রের চিহ্নসমূহকে তাহাদের জাতিগত শুভ-অশুভ-এর নিদর্শন বলিয়া মনে করিত। এইগুলিকে প্রকৃত প্রভাবশালী সত্তা মনে করিয়া তাহারা এক আল্লাহকে বাদ দিয়া এইগুলির পূজা-অর্চনায় লিপ্ত ছিল। আর সূর্য ছিল তাহাদের সবচেয়ে বড় দেবতা। কেননা ইহা আলো ও উত্তাপ দান করে।

উপরন্তু বিভিন্ন জিনিসের বৈশিষ্ট্য, ইহার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও তাহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। মনে হয় আজিকার জ্ঞান-বিজ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ হইতে রসায়ন শাস্ত্রের উপর তাহাদের জ্ঞান ছিল। এইজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে এমন মু'জিযা দান করিলেন যাহা তাহাদের সকল যুক্তি-প্রমাণকে নিরুত্তর করিয়া দিল। যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদের যেই বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে, অগ্নি জ্বলে ও দগ্ধ করে। তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সেই অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিল না, নিষ্প্রভ হইয়া রহিল (দ্র. ২১ ঃ ৬৮-৭০; কাসাসুল কুরআন, ৪খ., পৃ. ৬০-৬১)।

হযরত মূসা (আ)-এর যুগে যাদুবিদ্যা মিসরীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া রাখিয়াছিল। মিসরীয়রা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এইজন্য হযরত মূসা (আ)-কে হাত উজ্জ্বল শুভ্র হওয়া এবং লাঠি সর্পে পরিণত হওয়ার মত মু'জিযা দেওয়া হইয়াছিল। তিনি যখন মিসরীয় যাদুকরদের সম্মুখে ইহা প্রদর্শন করিলেন, তখন সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, ইহা যাদু নহে। ইহা তো যাদু হইতে স্বতন্ত্র এবং মানব শক্তির বহির্ভূত বিষয়, এমনকি সকল যাদুকর উহা দেখিয়া সিজদাবনত হইল এবং ঈমান আনয়ন করিল (দ্র. ৭ ঃ ১২০- ১২২)।

এইভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা ছিল। গ্রীক চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকদের চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের বিশেষজ্ঞদেরও যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে যুগের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন কতকগুলি মু'জিযা দান করিলেন, যাহা সমসাময়িক বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদসহ সর্বস্তরের মানুষকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহার এই জাতীয় চারটি মু'জিযার কথা আল-কুরআনে উল্লেখ রহিয়াছে। যথা মৃতকে জীবিত করা, হাতের স্পর্শে জন্মান্ধকে সুস্থ করা, শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করা এবং কে কি খাইয়াছে, কি খরচ করিয়াছে এবং গৃহে কি জমা রাখিয়াছে তাহা বলিয়া দেওয়া (দ্র. ৩ ঃ ৪৯)।

হযরত ঈসা (আ)-এর জাতির মধ্যে এমন চিকিৎসকও বর্তমান ছিল যাহাদের অভিজ্ঞতায় হতাশ রোগীও আরোগ্য লাভ করিত। তাহাদের মধ্যে পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী এমন দার্শনিকও

বিদ্যমান ছিল, যাহাদিগকে আত্মিক জড় পদার্থের রহস্য নির্ণয় এবং প্রকৃতি অনুধাবনে বিশেষজ্ঞ মনে করা হইত। কিন্তু তাহাদের সামনে যখন হযরত ঈসা (আ)-এর জাগতিক উপায়-উপকরণ ব্যতীত এই সমস্ত বিষয়ের উপর গভীর পারদর্শিতা প্রত্যক্ষ করিল তখন তাহারা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, নিঃসন্দেহে এই সমস্ত মু'জিযা মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের উর্ধ্বে। ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে সংঘটিত। ইহার বাহক নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নবী। নিম্নে বিশিষ্ট কয়েকজন নবী-রাসূলের কয়েকটি মু'জিযা বর্ণনা করা হইল।

হযরত আদম (আ)-এর সময়ে সংঘটিত মু'জিযা

হযরত আদম (আ) পৃথিবীতে প্রথম মনব ও প্রথম নবী, মানবজাতির আদি পিতা। হযরত হাওয়া (আ) পৃথিবীর প্রথম মানবী। তাঁহারা যখন পৃথিবীতে আগমন করেন তখন হযরত হাওয়া (আ) প্রতিবার গর্ভধারণের পর দুইজন করিয়া সন্তান প্রসব করিতেন। উহাদের একজন পুত্র সন্তান হইত এবং অন্যজন হইত কন্যা সন্তান। আল্লাহ তা'আলা সমসাময়িক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই মর্মে আদেশ জারী করিলেন যে, একই গর্ভজাত যমজ ভাই-বোন পরস্পর সহোদর ভাই-বোন গণ্য হইবে এবং তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হইবে, কিন্তু পরবর্তী গর্ভের পূত্রের জন্য প্রথম গর্ভের কন্যা পরস্পর সহোদরা বিবেচিত হইবে না। অতএব তাহাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হইবে।

হযরত হাওয়া প্রথমে হাবিল ও গাযা নামক যমজ পুত্র ও কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কাবিল ও আকলিমা নামক যমজ পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্ম দিলেন। শরী'আতের উল্লিখিত বিধান মতে হযরত আদম (আ) হাবিলের সহিত আকলিমার এবং কাবিলের সহিত গাযার বিবাহ সম্পাদনের বন্দোবস্ত করিলেন। কাবিলের সহোদরা বোন গাযা ছিল অতিশয় সুন্দরী। তাই সে এই বিধান মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল এবং 'গাযা'-কে বিবাহ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহা ছিল প্রকারান্তরে হযরত আদম (আ)-এর আনিত শরীয়তের পরিপন্থী।

হযরত আদম (আ) একজন নবী। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেকটি আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলা তাঁহার সকল সন্তানের জন্য একান্ত জরুরী। হযরত আদম (আ) বলিলেন ঃ আমি যাহা বলিয়াছি তাহা আল্লাহ্ পাকের আদেশমতই বলিয়াছি। ইহার সত্যতা প্রমাণের জন্য তোমরা আল্লাহর নামে কুরবানী পেশ কর। যাহার কুরবানী আসমানী অগ্নি আসিয়া ভস্মিভূত করিয়া দিবে তাহার করবানী গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তাহারা উভয়ে কুরবানী পেশ করিলে তখন অলৌকিকভাবে আসমান হইতে এক জাতীয় অগ্নি নামিয়া আসিল এবং হাবিলের কুরবানী-কে ভস্মিভূত করিয়া দিল (তাবারী, তাফসীর, ৬খ., পৃ ১৯১) । পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এইভাবে বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ.

"আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাহাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও। যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করিয়াছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হইল এবং অন্যজনের কবুল হইল না। সে বলিল, আমি তোমাকে হত্যা করিবই। অপরজন বলিল, আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন" (৫ ঃ ২৭)।

হযরত শীছ (আ)-এর মু'জিযা

হযরত আদম (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে শীছ (আ) অন্যতম। আদম (আ)-এর ইন্তিকালের পর হযরত শীছ নবী হন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ ৯১)

হযরত শীছ (আ)-এর মু'জিযাসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ মু'জিযা হইল তাহার দু'আর মাধ্যমে দুনিয়াতেই জান্নাতের ফল প্রাপ্তি এবং জান্নাতী হূরের আগমন। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, হযরত আদম (আ) তাঁহার অন্তিম শয্যায় ছেলেদের নিকট জান্নাতী ফল খাওয়ার আবদার করিলেন। পিতার আবদার বাস্তবায়নের জন্য সন্তানগণ দিক-বিদিক ছুটিতে লাগিলেন। কিন্তু জান্নাতী ফল লাভে ব্যর্থ হইয়া সকলেই ফিরিয়া আসিলেন। হযরত আদম (আ)-এর নির্দেশে 'শীছ' আল্লাহ্র নিকট জান্নাতী ফল চাহিয়া দু'আ করিলেন। দু'আ কবুল হইল। হযরত জিবরীল (আ) খাঞ্চাপূর্ণ বেহেশতী ফলমূল অপূর্ব সুন্দরী একজন বেহেশতী 'হূর'-এর মাথায় চাপাইয়া দিয়া হযরত আদম (আ)-এর সম্মুখে হাযির হইলেন। বস্তুত হযরত আদম (আ)-এর এই আবদার এবং তাহা পূরণের এই অলৌকিক ঘটনা ছিল তাঁহার পরবর্তী নবী 'শীছ' (আ)-এর নবূওয়াতের অভিষেকস্বরূপ যাহাতে তাহার অন্যান্য সন্তানগণ তাঁহার মৃত্যুর পর 'শীছ'-কে বিনা দ্বিধায় নবী হিসাবে মানিয়া লইতে পারে (দ্র. গোলাম নবী কুমিল্লায়ী অনূদিত ঃ উর্দূ কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২০-২১)।

হযরত ইদরীস (আ)-এর মু'জিযা

হযরত ইদরীস (আ) হযরত শীছ-এর পর নবী হইলেন। আল-কুরআনের একাধিক স্থানে তাঁহার আলোচনা হইয়াছে (দ্র. ১৯ ঃ ৫৬, ২১ ঃ ৮৫)। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সর্বপ্রথম মু'জিযা হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংক শাস্ত্রের জ্ঞান দান করেন (ইবন কাছীর, মুখতাসার তাফসীর, ২খ., পৃ. ৪৫৬)।

তাঁহার আরও একটি মু'জিযা ছিল এই যে, তাঁহার সময়কালে পৃথিবীতে বাহাত্তরটি ভাষা প্রচলিত ছিল। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত মু'জিযাবলে সকল ভাষা বুঝিতেন এবং সকল ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। তিনি প্রত্যেক জাতিকে তাহাদের নিজস্ব ভাষায় দাওয়াত ও তালীম দিতেন (মুফতী মাসউদুল করীম, কাসাসুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৯৪)।

হযরত নূহ (আ)-এর মু'জিযা

হযরত নূহ (আ) একজন বিশিষ্ট নবী ও রাসূল ছিলেন। হযরত আদম (আ)-এর দশ পুরুষ পর হযরত শীছ-এর বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নবূওয়াতী জীবনের ঐতিহাসিক

শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী পবিত্র কুরআনে বারবার বিবৃত হইয়াছে (দ্র. ১১ ঃ ২৫-৪৮, ১৭ ঃ ৩, ২৩, ৩১; ২৫ ঃ ৩৮; ৭১ ঃ ১-২৮০ কাসাসুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৬৪)।

হযরত নূহ (আ)-এর যুগের ঐতিহাসিক বিশ্বব্যাপী প্রলয়ংকরী তুফান তাঁহার অন্যতম মু'জিযা ও নবূওয়াতের সত্যতার মহানিদর্শন (দ্র. ১১ ঃ ২৫-৪৮; ৫৪ ঃ ৯-১৬)। হযরত নূহ (আ)-এর এই তুফান মু'জিযার মধ্যে আরও অনেকগুলি মু'জিযার সমাবেশ ঘটিয়াছে। যথা ঃ

(এক) আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিশাল এক নৌকা তৈরী করা। তাঁহার পূর্বে পৃথিবীতে নৌযান ব্যবহারের সূচনা হয় নাই। যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি নৌযান তৈরী করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন তখন আল্লাহ্‌র নিকট আরয করিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌। নৌযান কি ? আল্লাহ বলিলেন, একটি কাঠ নির্মিত ঘর যাহা পানিতে ভাসিয়া চলে। নূহ বলিলেন, আল্লাহ্‌! কাঠ কোথায় পাইব ? আল্লাহ বলিলেন, হে নূহ! আমি যাহা চাহি তাহা করিতে সক্ষম। তুমি আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার প্রত্যাদেশ মুতাবিক নৌযান নির্মাণ আরম্ভ কর (দ্র. ১১ ঃ ২৫-৪৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ১১০)।

(দুই) আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে প্রাণীজগতের প্রত্যেক জাতের এক জোড়া করিয়া নৌযানে তুলিবার নির্দেশ দেন। যখন তুফানের সময় নিকটবর্তী হইল তখন জল-স্থল, পর্বত ও সমভূমির সকল জীব-জন্তু আল্লাহর কুদরতে নূহ (আ)-এর নিকটে আসিয়া জড়ো হইল। তিনি তাঁহার পছন্দমত প্রত্যেক জাত হইতে এক জোড়া করিয়া প্রাণী নৌযানে তুলিয়া লইলেন (ইবন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৪১)।

(তিন) বিভিন্ন প্রজাতির জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ একত্রে দীর্ঘ দিন নৌযানে বসবাস করিল। কেহ কাহারও উপর কোন রকম আক্রমণ করে নাই এবং শান্তি ভঙ্গ করে নাই। এমনকি সিংহ ও গাভীর মধ্যেও শান্তি ও সম্প্রীতির সম্পর্ক বিরাজমান ছিল (আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনী, ২খ., পৃ. ৫৪)।

(চার) তাননূর তথা রুটি তৈয়ারীর উনুন হইতে সর্বপ্রথম পানি উথলিয়া উঠে, যাহা ছিল সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবন শুরু হওয়ার পূর্ব নিদর্শন (দ্র. ১১ ঃ ৪০)।

হযরত হূদ (আ)-এর মু'জিযা

হযরত হূদ (আ) সাম ইব্ন নূহ-এর বংশধর। তিনি 'আদ জাতির প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হন (কাসাসুল কুরআন, গোলাম নবী, ১খ., পৃ. ৭৫)। তাঁহার জাতি মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তিনি তাহাদেরকে উহা হইতে বিরত হইয়া তাওহীদের দিকে ফিরিয়া আসিতে আহবান জানাইলেন। তাহারা তাঁহার আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল, তুমি আমাদের নিকট কোন প্রমাণ লইয়া আস নাই। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না। তাহারা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিল, তোমার কথা অস্বীকার করিলে তুমি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র যেই আযাবের ভয় দেখাইতেছ, পারিলে তাহা আনয়ন করিয়া দেখাও। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় পয়গাম্বর হযরত হূদ (আ)-এর দাবির সত্যতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকল্পে দীর্ঘ তিন বৎসর ব্যাপী তাহাদের উপর চরম দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির আযাব নাযিল করিলেন। এই আযাব অপসারিত হইতে না হইতেই তাহাদের উপর আরেক আযাব

নামিয়া আসিল। অন্ধকারপূর্ণ প্রচণ্ড তুফান আরম্ভ হইল। এই তুফান দীর্ঘ সাত রাত্র ও আট-দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ফলে 'আদ জাতি সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল (দ্র. ১১ ঃ ৫৩-৫৪; ৭ ঃ ৬৬-৭০; ২৬ ঃ ১৩৬; ৪৬ ঃ ২৪; ইবন কাছীর, তাফসীর, ২খ., পৃ. ২২৬)।

এই সর্বগ্রাসী ধ্বংস হইতে হযরত হূদ (আ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ অলৌকিকভাবে রক্ষা পান। তাহারা নিজ নিজ গৃহে পূর্ণ নিরাপদে অবস্থান করেন (ইবন কাছীর, তাফসীর, ২খ., পৃ. ২২৬)।

হযরত সালিহ (আ)-এর মু'জিযা

ছামূদ জাতির প্রতি প্রেরিত নবী হযরত সালিহ (আ)। তিনি ছিলেন সাম ইবন নূহ-এর বংশোদ্ভূত। তাঁহার নবূওয়াতের সময়কাল হযরত হূদ (আ)-এর পর (দ্র. ৭ ঃ ৭৩-৭৯, ১১ ঃ ৬১-৬৮; ১৫ ঃ ৮০-৮৪; ১৭ ঃ ৫৩; ২৬ ঃ ১৪১-১৫৯; ২৭ ঃ ৪৫-৫৩; ৪১ ঃ ১৭-১৮; ৫৪ ঃ ২৩-৩২; আলূসী, রূহুল মা'আনী, ৮খ., পৃ. ১৬২; রাযী, তাফসীরুল কাবীর, ১৪খ., পৃ. ১৬২)।

তাঁহার জাতিও ছিল মূর্তিপূজারী। তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তাঁহার জাতি তাঁহাকে অস্বীকার করিল এবং অলৌকিক কিছু ঘটাইয়া দেখাইবার দাবি করিল। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত সালিহ (আ)-এর নবূওয়াতের দাবির সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মু'জিযা প্রদান করিলেন। একটি পাথর হইতে লাল বর্ণের একটি উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসিল । আল্লাহ তা'আলা তাহার জাতিকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, ইহা আল্লাহর উষ্ট্রী। ইহার কোনরূপ ক্ষতি করা যাইবে না। অন্যথায় তাহাদের উপর আল্লাহর আযাব নামিয়া আসিবে (দ্র. ৭ ঃ ৭৩)। কিন্তু তাহারা উহাকে হত্যা করিল। ফলে তাহাদের উপর নামিয়া আসিল মর্মন্তুদ শাস্তি (দ্র. ৯১ ঃ ১১, তাফসীর কাবীর, ১৪খ., পৃ. ১৬২)।

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর মু'জিযা

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বরকতময় জীবনে বেশ কিছু মু'জিযা লক্ষ্য করা যায়। যথা,

(এক) ইব্রাহীম (আ)-এর স্ত্রী সারা ছিলেন পরমা সুন্দরী। একবার তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী মিসরের স্বৈরাচারী বাদশাহর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদেরকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং কুমতলবে হযরত সারার দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিল। আল্লাহর কুদরতে তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত অবশ হইয়া গেল। বাদশাহ স্বীয় অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট দু'আ চাহিল। তিনি দু'আ করিলেন, বাদশাহর হস্ত পূর্ববৎ সুস্থ হইয়া গেল। এইভাবে তিনবার তাঁহার এই মু'জিযার প্রকাশ ঘটিল (বুখারী, সহীহ, হাদীছ নং ৩১৪৩) ।

(দুই) হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের দরুন তৎকালীন স্বৈরাচারী বাদশাহ নমরূদ তাঁহার প্রতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত সে তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধীভূত করার মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করিল। যথারীতি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইলে বাদশাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তীব্র দাহের অগ্নি তাঁহার একটি কেশাগ্রও স্পর্শ করিল না। আল্লাহর কুদরতে অলৌকিকভাবে

তিনি অগ্নিগর্ভে নিরাপদে অবস্থান করিলেন। আল্লাহ তা'আলা অগ্নিকে নির্দেশ দিলেন, يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ "হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও" (২১ ঃ ৬৯)।

(তিন) হযরত ইব্‌রাহীম (আ) মিসর হইতে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনকালে ফিলিস্তীনের আস-সাব' নামক স্থানে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি একটি কূপ খনন করেন। কূপটির পানি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট। অতঃপর সেখানকার অধিবাসিগণ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে পীড়া ও কষ্ট দিতে আরম্ভ করিল। তিনি সেখান হইতে চলিয়া যাইতেই কূপটির পানি অদৃশ্য হইয়া গেল। সাব'বাসী নিজেদের অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইল এবং ইব্‌রাহীম (আ)-এর সন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ইব্‌রাহীম (আ) তাহাদের প্রতি সদয় হইলেন এবং নিজ ছাগপাল হইতে সাতটি ছাগল তাহাদিগকে দান করিয়া বলিলেন, এই ছাগলগুলি লইয়া যাও। এই ছাগলগুলিকে পানি পান করিতে দিলেই কূপ হইতে স্বচ্ছ পানির ধারা উৎসারিত হইবে। তবে কোন ঋতুবতী নারী যেন অঞ্জলী ভরিয়া উহা হইতে পানি না উঠায়। তাহারা নবীর কথামত কাজ করিল, ফলে কূপ হইতে পুনরায় পানির ধারা জারি হইয়া গেল। বেশ কিছু দিন পর জনৈকা ঋতুবতী নারী নবীর কথা অমান্য করিয়া উক্ত কূপ হইতে অঞ্জলী ভরিয়া পানি তুলিল। ফলে কূপটি আবার শুকাইয়া গেল (তারীখ, আত্-তাবারী, ১খ., পৃ. ১২৭; আল-কামিল, ১খ., পৃ. ৭৯)।

(চার) হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বার্ধক্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছার পর সন্তান লাভ করা তাঁহার জীবনে সংঘটিত অলৌকিক নিদর্শনাবলীর অন্যতম। তাঁহার বয়স যখন ১২০ এবং তাঁহার স্ত্রীর বয়স ৯০ বৎসর, তখন তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে ফেরেশ্‌তা মারফত ইসহাক নামক সন্তান লাভের সুসংবাদ প্রাপ্ত হন (দ্র. ১১ ঃ ৭১; ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৬)।

(পাঁচ) হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আল্লাহর নির্দেশে তাঁহার স্ত্রী হাজেরা (রা) এবং দুগ্ধপোষ্য সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ)-কে মক্কার জন-মানবহীন মরুভূমিতে নির্বাসনে রাখিয়া আসেন (দ্র. ১৪ ঃ ৩৭)। তাঁহাদের মশকের পানি এবং সামান্য পাথেয় শেষ হইয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পায়ের গোড়ালীর ঘর্ষণে উহার তলাস্থ ভূমি হইতে একটি সুমিষ্ট পানির ধারা জারি করিয়া দেন, যাহা আজও যমযম কূপ নামে প্রবহমান রহিয়াছে (বুখারী, কিতাবুল- আম্বিয়া, ১খ., পৃ. ৪৭৪)।

(ছয়) হযরত ইসমাঈল (আ) যখন ১৩ বৎসর বয়সে পৌঁছেন তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে স্বপ্নে নির্দেশ দেন, তোমার আদরের পুত্র ইসমাঈলকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যবেহ কর (দ্র. আল-বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৫৯)। তিনি যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়া একটি ধারালো ছুরি লইয়া হযরত ইসমাঈল (আ)-এর গলায় চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু ছুরিটি অকেজো হইয়া গেল। তিনি গায়েব হইতে আল্লাহর প্রত্যাদেশ পাইলেন, তোমার স্বপ্ন পূরণ হইয়াছে। তুমি ইসমাঈলের পরিবর্তে এই দুম্বাটি কুরবানী কর। তিনি উহাকে যবেহ করিলেন (দ্র. ৩৭ ঃ ১০৪-১০৭; আল-বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৫৮)।

(সাত) আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ)-কে কা'বাগৃহ পুনরায় নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। ইতোপূর্বে কা'বাগৃহ, হযরত নূহ (আ)-এর সময়ের মহাপ্লাবনের দরুন বালুতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি পুত্র হযরত ইসমাঈলকে সঙ্গে লইয়া কা'বা গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করিলেন। দেয়ালের গাঁথনি উঁচু হইয়া গেল তখন তিনি একটি পাথরের উপর দাঁড়াইয়া নির্মাণকার্য করিতে লাগিলেন। আল্লাহর কুদরতে পাথরটি তাঁহার নির্মাণ কার্যের সুবিধার্থে উঠা-নামা করিত। তাঁহার পদচিহ্ন পাথরবক্ষে অংকিত হইয়া রহিল যাহা আজও কা'বা চত্বরে মাকামে ইবরাহীম নামক স্থানে সংরক্ষিত রহিয়াছে (দ্র. ২ ঃ ১২৫; ৩ ঃ ৯৬-৯৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ১৬৩)।

(আট) আল্লাহ তা'আলা মৃতকে কিভাবে আবার জীবিত করিবেন তাহা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি চারটি পাখি লও এবং উহাদিগকে তোমার বশীভূত করিয়া লও। অতঃপর পাখিগুলিকে যবেহ করিয়া উহাদের রক্ত-গোশত ও হাড় সবকিছু একত্রে মিশাইয়া ফেল। অতঃপর উহাকে ভাগ করিয়া চারটি পর্বত চূড়ায় রাখিয়া আস। তারপর উহাদিগকে এইভাবে ডাকিয়া লও, হে টুকরা টুকরা হইয়া যাওয়া হাড্ডিসমূহ, বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া গোশতসমূহ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রক্ত-শিরাসমূহ ! তোমরা একত্র হইয়া যাও। তোমাদের মাধ্যে আল্লাহ তা'আলা রূহ ফিরাইয়া দিবেন। ঘোষণা মাত্রই এক হাড্ডি অপর হাড্ডির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। এক রক্ত অপর রক্তের সহিত মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইতে শুরু করিল। গোশতের একাংশ অপর অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া পুন দেহাবয়বে রূপান্তরিত হইয়া গেল। এইভাবে প্রত্যেকটি পাখির রক্ত, গোশত, হাড্ডি ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে মিলিত হইল এবং পূর্ণাঙ্গ পাখি হইয়া গেল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সেইগুলির রূহ ফিরাইয়া দিলেন। ফলে সবগুলি পাখি পুনরায় জীবিত হইয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিল (দ্র. ২ ঃ ২৬০; আলূসী, রূহুল মা'আনী, ৩খ., পৃ. ২৮-২৯)।

হযরত লূত (আ)-এর মু'জিযা

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সহোদর হারানের পুত্র লূত (আ)। তিনি সাদূম (জর্দান)-এ নবী হিসাবে প্রেরিত হন। তিনি হযরত ইব্রাহীম-এর সমসাময়িক। তাঁহার জাতি মূর্তিপূজা ও সমকামিতার ঘৃণ্য পাপাচারে লিপ্ত ছিল (দ্র. ৬ ঃ ৮৩; ৭ ঃ ৮০; ১১ ঃ ৬৯; ১৫ ঃ ৫১; ২১ ঃ ৭১)। হযরত লূত (আ) তাঁহার জাতির নিকট সত্যের দাওয়াত লইয়া আগমন করিলে জাতি তাঁহাকে অস্বীকার করিল। জাতি চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিল, তুমি সত্যবাদী হইলে আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর। আমরা তোমাকে সত্যবাদী বলিয়া মনে করি না (দ্র. ২৯ ঃ ২৯)।

আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপর চরম আযাব নাযিল করিলেন। তাহাদের জনপদকে শূন্যে উঠাইয়া অতঃপর তাহাদেরসহ উল্টাইয়া দিলেন। ইহাতে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। লূত জাতির ধ্বংসাবশেষ আজও মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শনরূপে লূত সাগরের আশেপাশে বিদ্যমান রহিয়াছে (দ্র. ১১ ঃ ৮৩, তাফসীরে উসমানী, পৃ. ৬০১)।

হযরত ইয়া'কূব (আ) এবং হযরত ইউসুফ (আ) -এর মু'জিযা

হযরত ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র হযরত ইয়া'কূব (আ) তিনি কিন'আনে (ফিলিস্তীনে) প্রেরিত হন। তাঁহার বারজন পুত্র সন্তান এবং একজন কন্যা সন্তান ছিল। সন্তানদের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ)-কে তিনি খুব বেশী ভালবাসিতেন। কারণ তিনিই পরবর্তীর্তে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন— এই মর্মে তিনি আল্লাহর ইচ্ছা জানিতে পারিয়াছিলেন। অন্যান্য সন্তান বিষয়টি মানিয়া লইতে পারিলেন না। তাই তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া ফেলার ফন্দি করিলেন। ইহার ফলে হযরত ইউসুফ (আ) মিসরে নীত হইলেন। এই দিকে পুত্রশোকে হযরত ইয়া'কূব (আ) কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইয়া গেলেন। অপর দিকে হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহর রহমতে মিসরের শাসন কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এক সময়ে কিনআনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য তাহারা মিসরে গেলেন এবং সেখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত তাহাদের পূর্ণ পরিচয় ঘটিল।

হযরত ইউসুফ (আ) পিতার অন্ধত্বের কথা জানিয়া তাঁহার নিজের জামা ভাইদের হাতে তুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, জামাটি পিতার চোখে স্পর্শ করাও, দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিবে। বাস্তবে তাহাই হইল (দ্র. ১২ ঃ ৪)।

অপরদিকে ভাইয়েরা যখন ইউসুফের জামা লইয়া মিসর হইতে কিনআনের পথে রওয়ানা হইল তখন শত শত মাইল দূর হইতে হযরত ইয়া'কূব (আ) হযরত ইউসুফের ঘ্রাণ পাইতেছিলেন। ইহা ছিল তাঁহার দ্বিতীয় মু'জিযা (দ্র. ১২ ঃ ৮৫)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর মু'জিযা ছিল অসংখ্য। স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও বিদ্যা তাঁহার মু'জিযাসমূহের অন্যতম (দ্র. ১২ ঃ ১০১; ১২ ঃ ৪৬-৫০)। তাঁহার অন্যতম মু'জিযা হইল, দোলনার দুগ্ধপোষ্য শিশুর তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা। এই শিশু বলিল, ইউসুফের ছেঁড়া জামা দেখিয়া অপরাধী নির্ণয়ের সূত্র বাহির করা যাইতে পারে। যদি জামাটি সম্মুখ দিয়া ছিঁড়িয়া থাকে তবে মহিলার অভিযোগ সত্য এবং পুরুষ অপরাধী। আর যদি জামা পশ্চাদদিক হইতে ছিঁড়িয়া থাকে তবে মহিলার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইবে এবং পুরুষ নির্দোষ সাব্যস্ত হইবে (দ্র. ১২ ঃ ২৬-২৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ২০৪)।

হযরত শু'আয়ব (আ)-এর মু'জিযা

হযরত শু'আয়ব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অধস্তন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার নবূওয়াতকাল হযরত লূত (আ)-এর পরে এবং হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বে তিনি আয়কা ও মাদয়ানবাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন (দ্র.৭ ঃ ৮৫)। তাহারা পেশায় ছিল ব্যবসায়ী, তাহাদের মধ্যে শঠতা ও ওজনে কম দেওয়ার অভ্যাস চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। হযরত শু'আয়ব (আ) তাহাদেরকে সত্যের বাণী শুনাইলেন এবং এই বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করার আহবান জানাইলেন (দ্র. ৭ ঃ ৮৫; ১১ ঃ ৮৪-৮৫)।

তাহারা নবীকে অস্বীকার করিল। তিনি তাহাদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাইলেন। জাতি বলিল, তুমি সত্যবাদী হইলে শাস্তি আনয়ন কর (দ্র. ৭ ঃ ৮৮, ৮৯; ২৯ ঃ ৩৭; ২৬ ঃ

২৮৭)। আল্লাহ্ তা'আলা নবীর দাবির সত্যতা প্রমাণার্থে তাহাদের উপর ভীষণ আযাব নাযিল করিলেন (দ্র. ১৫ ঃ ১৭৯)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, জাহান্নামের উত্তপ্ত বাতাস তাহাদের উপর প্রবাহিত হয়। সাতদিন তাহারা এই উত্তপ্ত বাতাসের মধ্যে রহিল। যখন তাহাদের ঘর-বাড়ি এমনকি পানির কূপ পর্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তখন তাহারা উহা হইতে বাঁচিবার জন্য ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করিল। কিন্তু সূর্যের তাপদাহ প্রচণ্ড বাড়িয়া গেল, এমনকি পায়ের নীচ হইতেও গরম লাভা নির্গত হইতে লাগিল। ফলে তাহাদের পায়ের নীচের গোশত খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। একদা তাহারা দেখিল, আকাশে কালো মেঘ জমিতেছে। যমীনে ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আর তখনই কালো মেঘ হইতে অগ্নি-বৃষ্টি বর্ষিত হইল এবং তাহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল (দ্র. ২৯ ঃ ৩৭; ৭ ঃ ৯১-৯২, ১১ ঃ ৯৪-৯৫; আল-কামিল, ১খ., পৃ. ৮৯)।

হযরত আয়্যূব (আ)-এর মু'জিযা

হযরত আয়্যূব (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের নবী এবং হযরত লূত (আ)-এর দৌহিত্র। তিনি "আদূম" জাতির নিকট প্রেরিত হন (দ্র. রূহুল-মা'আনী, ১২খ., পৃ. ২০৫)।

তাঁহার জীবনে সংঘটিত মু'জিযাসমূহের মধ্যে ছিল অলৌকিকভাবে তাঁহার রোগ মুক্তি এবং সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ পুন ফিরিয়া পাওয়া। তিনি এক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অপরদিকে তাঁহার সকল ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও হাতছাড়া হইয়া যায়। তিনি লোকালয়ের বাহিরে এক বিরাণ ভূমিতে দীর্ঘ কয়েক বৎসর পড়িয়া থাকেন। ইহা ছিল তাঁহার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে ধৈর্যের পরীক্ষা। অবশেষে তিনি এই সবরের পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হন (দ্র. ৩৮ ঃ ৪৪, ২১ ঃ ৮৪)। তাঁহার দু'আ আল্লাহ্ কবুল করিলেন, তাঁহাকে সুস্থতা দান করিলেন এবং তাঁহার সকল ধন-সম্পদ ফিরাইয়া দিলেন (২১ ঃ ৮৪)। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বলিলেন, হে আয়্যূব ! তুমি তোমার পা দ্বারা যমীনে আঘাত কর। এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়' (৩৮ ঃ ৪১-৪২)। তিনি পা দ্বারা আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ একটি সুমিষ্ট পানির ফোয়ারা জারি হইল। তিনি এ ফোয়ারার পানি দ্বারা গোসল করার সাথে সাথে পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এমনকি সুঠাম সুন্দর যুবকে পরিণত হইয়া গেলেন (ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৪২০; ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, ২খ., পৃ. ১৯০)।

হযরত আয়্যূব (আ)-এর নিকট দৈনন্দিন আহারের জন্য সামান্য পরিমাণ গম ও যব থাকিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্য গমগুলিকে স্বর্ণ এবং যবগুলিকে রৌপ্যে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন (ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৪২১; আল-বিদায়া, ১খ., পৃ. ২৫৬)।

হযরত আয়্যূব (আ)-এর সাত কন্যা ও সাত পুত্র সন্তান ছিল। পরীক্ষার দিনগুলিতে তাহারা সকলেই ইন্তিকাল করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সকলকেই পুনরায় জীবিত করিয়া দিলেন। অতঃপর নবীর স্ত্রীর গর্ভে নূতন সন্তানও উক্ত পরিমাণ দান করিলেন। পবিত্র কুরআনে

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ এবং আমি তাহাকে তাঁহার পরিবার-পরিজন ফিরাইয়া দিলাম এবং তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মত আরও দান করিলাম" (২১ ঃ ৮৪; রূহুল মায়ানী, ২৩খ., পৃ. ২০৯)।

তাঁহারা আরও একটি মু'জিযা ছিল এই যে, তিনি যখন গোসল করিয়া সুস্থ হইয়া উঠিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে জান্নাতী পোশাক পরিধান করাইলেন এবং তাঁহার শারীরিক গঠনও সৌন্দর্য বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ফলে তাঁহার স্ত্রী রহীমা তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছিলেন না (রূহুল মা'আনী, ২৩ খ., পৃ. ২০৭)।

হযরত ইউনুস (আ)-এর মু'জিযা

তিনি হযরত ইয়া'কূব ইব্ন ইসহাক (আ)-এর বংশের অন্যতম নবী। তাঁহার নবূওয়াতের এলাকা ছিল ইরাকের মাওসিল-এর প্রসিদ্ধ নগরী 'নিনাওয়া'। তাঁহার জাতি শির্ক-এ নিমজ্জিত ছিল। তিনি তাঁহার জাতিকে ৩৩ বৎসর যাবৎ অবিরাম আল্লাহর দিকে ডাকিলেন। কিন্তু তাহারা ঈমান তো আনয়ন করিলই না, উপরন্তু তাঁহাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করিল। অবশেষে যখন জাতির ধ্বংস অনিবার্য হইয়া গেল, তিনি জাতির প্রতি ক্ষোভে, অভিমানে হিজরত করার সংকল্প করিলেন। এমনকি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা না করিয়া তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথিমধ্যে তিনি একটি নৌযানে আরোহণ করিলেন। যাত্রীসংখ্যা অধিক হওয়ায় নৌযানটি ডুবিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে নৌযান কর্তৃপক্ষ সেখানে কোন পলাতক দাস থাকার আশংকা করে এবং লটারীর মাধ্যমে তাহাকে বাহির করিবার সিদ্ধান্ত নেয়। লটারীতে বারংবার হযরত ইউনুস (আ)-এর নামই আসিতেছিল। অবশেষে তিনি সমুদ্র বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ বৃহদাকার এক মৎস তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল। আল্লাহ তা'আলা মাছকে আদেশ করিলেন, সে যেন ইউনুস (আ)-কে না খায়, বরং তাঁহার হিফাজত করে। মাছটি তাঁহাকে লইয়া সমুদ্র বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। অবশেষে হযরত ইউনুস (আ) তাঁহার অপরাধ বুঝিতে পারিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করত তওবা করিলেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

"তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; তুমি পবিত্র মহান! আমি তো সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত" (২১ ঃ ৮৭)।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রার্থনা কবূল করিলেন এবং তাঁহাকে মাছের উদর হইতে নাজাত দিলেন। তিনি চল্লিশ দিন মৎস উদরে ছিলেন। ইহা ছিল মহান আল্লাহ্র কুদরতের অসাধারণ নিদর্শন। মাছটি যখন তাঁহাকে সমুদ্র তীরে উদগীরণ করিল তখন তাঁহার অসুস্থ তুলতুলে দেহকে ছায়াদানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তৎক্ষণাত সেখানে একটি লাউ গাছ জন্মাইলেন এবং তাঁহার জীবিকার জন্য একটি দুগ্ধদায়িনী দুম্বা, অপর বর্ণনাতে হরিণী নিয়োজিত করিয়া দিলেন (দ্র. আল-কুরআনের সূরা আস-সাফ্ফাতের এবং সূরা আল-আম্বিয়ার সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর)।

তাঁহার আরেকটি মু'জিযা ছিল এই যে, মৎস উদর হইতে নিষ্কৃতির পর আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে পুনরায় নিজ জাতির নিকট ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি যথাসময়ে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার দেশের এক রাখালের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইল। তিনি রাখালকে বলিলেন, সে যেন তাঁহার জাতিকে তাঁহার আগমন বার্তা পৌছাইয়া দেয়। রাখাল বলিল, আমি কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া জাতিকে এই বার্তা পৌছাইতে পারিব না। "আমি ভয় পাইতেছি, আপনিই ইউনুস নবী কিনা", "আপনিই আমাদের প্রতীক্ষিত নবী কিনা"। তখন রাখালের ছাগল পালের একটি ছাগল, তাঁহার চারণভূমির একটি বৃক্ষ এবং স্বয়ং চারণভূমি এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করিল যে, তিনিই তোমাদের প্রতীক্ষিত নবী ইউনুস (আ)।

রাখাল জাতিকে নবীর আগমন বার্তা শুনাইলে জাতির লোকজন চারণভূমিতে নবীর সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিল। কিন্তু পূর্ব স্থানে নবীকে না পাইয়া রাখাল উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। তখন সেই সাক্ষ্যদাতা ছাগলটি আগত লোকদিগকে ইউনুস (আ)-এর সন্ধান দিল (সীরাত বিশ্বকোষ, ইফাবা, ২খ., পৃ. ২১৫-২১৬)।

হযরত যুল-কিফ্‌ল (আ)-এর মু'জিযা

হযরত যুল-কিফ্‌ল (আ) সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি নবী অথবা নবীর খলীফা ছিলেন (রূহুল মা'আনী, ১৯খ., পৃ. ৮২)। তাঁহার মু'জিযার বর্ণনায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রহিয়াছে। উহা এই যে, তিনি তাঁহার সমসাময়িক কাফির বাদশাহকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করিলে সে বলিল, ইহা গ্রহণ করিলে আমার কী লাভ হইবে? নবী বলিলেন, ইহাতে আপনি জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবেন। বাদশাহ বলিল, আমার জন্য এই জান্নাতের যামিন কে হইবে? নবী বলিলেন, আমি হইব। বাদশাহ ঈমান আনয়ন করিলেন। কিছু দিন পরেই বাদশাহর মৃত্যু হইল। পরদিন লোকেরা ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল, বাদশাহর একটি হাত কবরের বাহিরে বাহির হইয়া আছে এবং উহার মধ্যে একটি সবুজ বর্ণের কাগজে লিখিত রহিয়াছে: "আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়াছেন এবং অমুক ব্যক্তি তাহার যামানত পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন"। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া হযরত যুল-কিফ্‌ল (আ)-এর জাতির সকলেই তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিল (কুরতুবী, তাফসীর, ১১খ., পৃ. ৩২৭)।

হযরত ইলয়াস (আ)-এর মু'জিযা

বনূ ইসরাঈলের অন্যতম নবী হযরত ইলয়াস (আ)। বা'লাবাক্ক (بعلبك) শহরে প্রেরিত হন। তাঁহার সময়কালে বানূ ইসরাঈলী সমাজে রাজা 'উজব'-এর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা ও তাহার প্রজাবৃন্দ বা'ল নামক এক মূর্তির পূঁজা করিত। নবী তাহাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। ইহাতে রাজা ভীষণ ক্ষুব্ধ হইল এবং নবীকে হত্যা করিবার জন্য সংকল্প করিল। নবী ইলয়াস (আ) একটি পর্বত গুহায় আশ্রয় লইলেন। সত্য অস্বীকারের পরিণতিতে জাতির উপর নামিয়া আসিল চরম দুর্ভিক্ষ। হযরত ইলয়াস (আ) রাজা উজবের সহিত সাক্ষাত করিয়া বলিলেন, "তোমরা মহান আল্লাহর নাফরমানী হইতে বিরত হইলেই তোমাদের দুর্ভিক্ষ দূর হইতে পারে"। তিনি আরও বলিলেন, "আমার আনীত ধর্মই যে সত্য ধর্ম উহা প্রমাণ করিবার

জন্য আস আমরা কুরবানী পেশ করি। আমি আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী পেশ করিব। তোমরা তোমাদের দেবতার নামে কুরবানী পেশ করিবে। যাহার কুরবানী আসমানী অগ্নি আসিয়া ভস্মীভূত করিবে তাহার ধর্ম সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে"।

রাজা এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়া দেবতার নামে কুরবানী পেশ করিল। হযরত ইলয়াস (আ) মহান আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী পেশ করিলেন। নবীর কুরবানী কবূল হইল। ইহা দেখিয়া বা'ল দেবতার অনুসারীরা সিজদায় পড়িল এবং নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করিল (নূরুল কুরআন, ২৩খ., পৃ. ১৪৬)।

একবার রাজা উজব কতিপয় ঘাতককে এই বলিয়া প্রেরণ করিল, যেইভাবেই হউক প্রতারণা করিয়া ইলয়াসকে হত্যা করিতে হইবে। হযরত ইলয়াস (আ) একটি পর্বত গুহায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঘাতকরা আসিয়া নিজেদেরকে ঈমানদার দাবি করিল এবং নবীকে বাহির হইয়া আসিতে আহ্বান জানাইল। নবী বলিলেন, "হে আল্লাহ! তাহারা মিথ্যাবাদী হইলে তাহাদেরকে আসমানী অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত কর"। তৎক্ষণাত আসমানী অগ্নি আসিয়া তাহাদেরকে ভস্মীভূত করিয়া দিল। এইভাবে রাজা উজব দুই দুইবার ঘাতক দল প্রেরণ করিল এবং প্রত্যেক বারই তাহারা মহান আল্লাহ্‌র গযবে অলৌকিকভাবে ধ্বংস হইল (তাফসীরে মাযহারী, ৮খ., পৃ. ১৪৯)।

একবার হযরত ইলয়াস (আ) হযরত ইউনুস (আ)-এর বাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন। ইউনুস (আ) ছিলেন তখন ছোট শিশু। কিছু দিন পর ইলয়াস (আ) চলিয়া গেলে শিশু ইউনুস ইন্তিকাল করেন। তাহার মাতা ইলয়াস (আ)-এর খিদমতে আসিয়া আরয করিলেন, "হে আল্লাহর নবী! আপনি চলিয়া আসিবার পর আমার সন্তান ইউনুস ইন্তিকাল করিয়াছে। দয়া করিয়া আপনি তাহার পুনর্জীবিত হওয়ার জন্য দু'আ করুন"। নবী দু'আ করিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইউনুস (আ)-কে চৌদ্দ দিন পর পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন।

একবার তিনি এক বৃদ্ধার বাড়িতে মেহমান হইলেন। বৃদ্ধার নিকট একটি পাত্রে সামান্য আটা এবং অপর পাত্রে সামান্য যয়তূনের তৈল ছিল। তিনি দু'আ করিলেন, ফলে পাত্র দুইটি আটা ও যয়তূন দ্বারা ভরিয়া গেল।

এক সময় সত্য অস্বীকারের অপরাধে তাঁহার জাতির উপর অনাবৃষ্টির আযাব আসিল। তিনি জাতিকে বলিলেন, তোমরা শিরক বর্জন কর, তোমাদের আযাব বিদূরিত হইবে। জাতি উহাই মানিয়া লইল। তৎক্ষণাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিল এবং উহা হইতে প্রবল বর্ষণ হইল (সীরাত বিশ্বকোষ, ইফাবা, ২খ., পৃ. ২৫৮)।

হযরত আল-ইয়াসা' (আ)-এর মু'জিযা

আল-ইয়াসা' (আ) হযরত ইলয়াস (আ)-এর চাচাতো ভাই এবং বনী ইসরাঈলের নবী। হযরত ইলয়াস (আ)-এর পর তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সর্বদা হযরত ইলয়াস (আ)-এর সহিত চলাফেরা করিতেন। একবার বনী ইসরাঈলের মধ্যে চরম দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে হযরত ইলয়াস (আ) আল-য়াসা'কে সঙ্গে লইয়া মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত হয়। জাতি চাষাবাদের জন্য বীজ না থাকায় অভিযোগ

করিল। মহান আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইলয়াস বলিলেন, তোমরা জমিতে লবণ ছিটাইয়া দাও। তাহারা লবণ ছিটাইয়া দিল। ফলে জমিতে ছোলা উৎপন্ন হইল। তিনি আরও বলিলেন, তোমরা জমিতে বালু ছিটাইয়া দাও। তাহারা বালু ছিটাইয়া দিল। ফলে জমিতে চারাগাছ উদ্‌গত হইল (ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ২৭৮)।

হযরত আল-ইয়াসা' (আ)-এর মু'জিযা ছিল হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযার অনুরূপ। তিনি পানির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন, মৃতকে জীবিত করিতেন, জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান করিতেন, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করিতেন (সায়্যিদ হুসায়ন, আল-মীযান ফী তাফসীরিল কুরআন, পৃ. ২৭৫)।

একদা হযরত ইলয়াস (আ) হযরত আল-ইয়াসা' (আ)-কে তাঁহার চাদর দান করিয়াছিলেন। আল-ইয়াসা' (আ) উক্ত চাদর দ্বারা জর্ডান নদীতে আঘাত করিলেন। ফলে পানি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া রাস্তা হইয়া গেল। তিনি নদী পার হইয়া গেলেন (দা'ইরাতুল মা'আরিফ, ৪খ., পৃ. ৩৩৫)।

আরীহা নগরীর পানি ছিল ব্যবহারের অনুপযোগী। তিনি উহাতে লবণ নিক্ষেপ করিলেন। ফলে উহার পানি সুমিষ্ট, নির্মল ও সুপেয় পানিতে পরিণত হইল (প্রগুক্ত)। একদা কতিপয় দুষ্ট যুবক তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে দুইটি বন্য ভাল্লুক আসিয়া যুবকদিগকে হত্যা করিল (প্রাগুক্ত)।

হযরত হিযকীল (আ)-এর মু'জিযা

হযরত হিযকীল (আ) বানূ ইসরাঈলী নবীদের একজন। তিনি 'জুদাহ' নামক এলাকায় প্রেরিত হন। তাঁহার নবূওয়াতকাল হযরত য়ূশা' ইবন নূন-এর পরবর্তী সময় (কাসাসুল-কুরআন, ২খ., পৃ. ২০)। পবিত্র কুরআনে তাহার নাম আলোচিত হয় নাই। তবে সূরা বাকারা ২৪৩ নং আয়াতে তাঁহার ও তাঁহার জাতির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুত এই ঘটনাটিই তাঁহার জীবনের অন্যতম অলৌকিক ঘটনা ও মু'জিযা।

ঘটনার বিবরণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার জাতিকে জিহাদের নির্দেশ দেন। জাতি মৃত্যুর ভয়ে জিহাদে যাইতে অস্বীকার করে এবং পলায়ন করে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে মৃত্যুদান করেন, যাহাতে সকলেই এই কথা বুঝিতে পারে যে, কোন কৌশলই মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী হিযকীলের দু'আয় সকলকে পুনরায় জীবিত করে (মা'আলিমুত-তানযীল, ১খ., পৃ. ২২৩)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে হিযকীল! আমি তাহাদেরকে কীভাবে জীবিত করিব তাহা কি তুমি দেখিতে চাও? তিনি বলিলেন, হাঁ। আল্লাহ পাক বলিলেন, তুমি এই বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ দাও, "হে পুরাতন হাড়সমূহ! মহান আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে একত্রিত হইতে আদেশ করিতেছেন।" ঘোষণার পরপর বিক্ষিপ্ত হাড়গুলি উড়িয়া নিজ নিজ স্থানে আসিয়া সংযুক্ত হইল এবং পরিণত হইল পূর্ণ মানব কংকালে। আল্লাহর নির্দেশে নবী বলিলেন, হে মানব কংকাল ! তোমারা গোশ্তে সজ্জিত হও। সবগুলি দেহ গোশতে সজ্জিত হইল। অতঃপর দেহগুলি চামড়ায় সজ্জিত

হইল, এমনকি আল্লাহ্র কুদরতে মানবদেহগুলি পরিধেয় বস্ত্রেও সজ্জিত হইয়া গেল। ইহার পর নবী হিযকীল বলিলেন, হে দেহসমূহ! আল্লাহ তোমাদেরকে দাঁড়াইবার আদেশ করিতেছেন। ইহা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে সকলে দাঁড়াইয়া গেল (২ ঃ ২৪৩, তাবারী, তাফসীর, ১খ., পৃ. ৩২৩)।

তাহারা জীবিত হওয়ার পর তাহাদের পোশাক ও চেহারা হরিদ্রা বর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এমনকি তাহারা নূতন কোন পোশাক পরিধান করিলে তাহাও হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যাইত। এই ধারা তাহাদের পরবর্তী বংশের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল (হাশিয়াতুস-সাবী, ১খ., পৃ. ১০৭)।

হযরত 'উযায়র (আ)-এর মু'জিযা

হযরত উযায়র (আ) হারূন ইব্ন ইমরান (আ)-এর বংশধর এবং ইসরাঈলী বংশের নবীদের অন্যতম। ইয়াহূদীরা তাঁহাকে আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া মনে করিত (আল-কুরআন ৯ ঃ ৩০; আল-বিদায়া, ২খ., পৃ. ৪৩)।

তাঁহার জীবনে অলৌকিক ঘটনা ছিল এই যে, একদা তিনি গাধায় চড়িয়া একটি বিধ্বস্ত জনপদ অতিক্রম করিতেছিলেন। সেখানে কেহই জীবিত ছিল না। তিনি বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, এমন বিধ্বস্ত উজাড় জনপদ আবার কিভাবে আবাদ হইবে ? আল্লাহ তা'আলা তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু দিলেন এবং পূর্ণ এক শত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। তিনি জীবিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় অবিকৃত রহিয়াছে। অপরদিকে গাধাটি মরিয়া গিয়াছে এবং প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি দেখিলেন, মৃত গাধাটি তাঁহার সামনে পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিল। তিনি আরও দেখিলেন, ধ্বংসপ্রাপ্ত উজাড় জনপদটি পূর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুশোভিতরূপে আবাদ হইয়া রহিয়াছে। এই সবই ছিল অসাধারণ, অলৌকিক ও মু'জিযাস্বরূপ (দ্র. ২ ঃ ২৫৯)।

হযরত উযায়র (আ) দীর্ঘ এক শত বৎসর পর যখন নিজ এলাকায় ফিরিয়া আসিলেন তখন জনপদবাসীর কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। সকলেই বলিল, সে তো এক শত বৎসর পূর্বে নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বাড়ির সম্মুখে এক বৃদ্ধার সাক্ষাৎ পাইলেন। সে ছিল অন্ধ। নবী তাঁহাকে নিজের পরিচয় দিলেন। বৃদ্ধা অস্বীকার করিল। অবশেষে বৃদ্ধা বলিল "তুমি সত্যই উযায়র হইয়া থাকিলে আমার জন্য দু'আ কর যেন আমার অন্ধত্ব দূর হইয়া যায়"। নবী দু'আ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। বৃদ্ধা পঙ্গুও ছিল। উযায়র (আ)-এর দু'আয় তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৪০)।

তাঁহার আরও একটি মু'জিযা ছিল এই যে, তিনি এক শত বৎসর পর জনপদে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, আসমানী কিতাব তাওরাত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং মানুষ তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে। তখন তিনি আল্লাহ্র কুদরতে সম্পূর্ণ তাওরাত আদ্যন্ত মানুষের সম্মুখে পড়িয়া শোনান এবং পুনরায় তাওরাত সংকলন করেন। তাঁহার এই অলৌকিক কর্ম দেখিয়া জাতির কতিপয় লোক বিভ্রান্ত হইল এবং তাঁহাকে আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া বসিল (দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৪৪)।

একটি ইসরাঈলী সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত উযায়র (আ)-এর সময়ে তৎকালীন জালিম বাদশাহ 'বুখ্‌তনসর' এই মর্মে নির্দেশ জারি করিল যে, সকলকে তাঁহার দেবতার পূজা করিতে হইবে। অন্যথা অস্বীকারকারীকে অগ্নিকাণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে। নবী উযায়র এবং তাঁহার সঙ্গীগণ রাজার এই নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাতে রাজা ক্ষুব্ধ হইয়া নবীকে তাঁহার দুইজন সঙ্গীসহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরতে অগ্নি তাঁহাদেরকে স্পর্শও করিল না। তাঁহারা সকলেই অক্ষত রহিলেন। বুখ্‌তনসর এই দৃশ্য দেখিয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারিল এবং ভবিষ্যতে নবীর ধর্মমতকে সংরক্ষণের ঘোষণা প্রদান করিল (দানিয়াল, ৩য় অধ্যায়, পৃ. ২৮)।

হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা

হযরত মূসা (আ) বনূ ইসরাঈলের প্রখ্যাত নবী ও রাসূল। তিনি মিসরে ভূমিষ্ঠ হন এবং অলৌকিকভাবে তাঁহার প্রাণের দুশমন ফিরআওনের গৃহে লালিত-পালিত হন। তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা বহু সংখ্যক মু'জিযা দান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল ।

(এক) **লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া** ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবূওয়াতের প্রমাণস্বরূপ এই নিদর্শন প্রদান করেন। তিনি যখন ফিরআওনের নিকট দাওয়াত লইয়া গেলেন এবং নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী ও রাসূল বলিয়া দাবি করিলেন, তখন ফিরআওন তাঁহাকে অস্বীকার করিল। নবী বলিলেন, যদি ইহার প্রমাণ পেশ করিতে পারি, তবুও কি তুমি আমাকে অস্বীকার করিবে ? ফিরআওন বলিল, তুমি সত্যবাদী হইলে প্রমাণ পেশ কর। মূসা (আ) তাঁহার হাতের লাঠি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি তাহা সর্পে রূপান্তরিত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল (দ্র. ২৬ ঃ ২৯-৩২)।

(দুই) **তাঁহার দক্ষিণ হস্ত শুভ্র উজ্জ্বল হইয়া যাওয়া** ঃ ইহাও একটি মু'জিযা যাহা ফিরআওনের দরবারে সংঘটিত হইয়াছিল। মূসা (আ) তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বগলে চাপিয়া রাখিয়া বাহির করিলেন। তৎক্ষণাৎ উহা শুভ্র উজ্জ্বল হইয়া গেল। আবার যখন তিনি তাঁহার হাত বগলে স্থাপন করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্বের ন্যায় হইয়া গেল (দ্র. ২৬ ঃ ৩৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ২৫১)।

(তিন) ফিরআওনের দরবারে মূসা (আ)-এর লাঠি সর্পে পরিণত হইলে ফিরআওন উহাকে যাদু বলিয়া আখ্যায়িত করে এবং যাদুকরদিগকে ডাকিয়া আনিয়া উহার মুকাবিলা করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করে। মূসা (আ) যাদুকরদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে যাদুকরদের যাদু প্রদর্শন শুরু হইল। যাদুকরগণ তাহাদের হাতের অসংখ্য রশিকে সর্পে পরিণত করিয়া প্রদর্শন করিল। সর্বশেষে মূসা (আ) তাঁহার লাঠি মাটিতে ছাড়িয়া দিলেন। উহা অজগর সর্পে পরিণত হইয়া যাদুকরদের সকল যাদু গিলিয়া ফেলিল। যাদুকরগণ মূসা (আ)-এর এই অলৌকিক মু'জিযা দেখিয়া ঈমান আনয়ন করিল (দ্র. ২৬ ঃ ৪৬-৪৮; ৭ ঃ ১১৬; ২০ ঃ ৬৮-৬৯; ১০ ঃ ৮১; তারীখুল-কামিল, ১খ., পৃ. ১৪০)। কিন্তু ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায় ঈমান আনয়ন করিল না বরং তাহারা পূর্বের তুলনায় আরও বেশি বিরোধিতায় লিপ্ত হইল। এই জাতীয়

মু'জিযা ও নিদর্শনাবলীর মধ্যে ছিল দুর্ভিক্ষ, ফল ও ফসলের ক্ষতি এবং উৎপাদন হ্রাস, তুফান, কীট পোকার মহামারী, পঙ্গপাল ও অস্বাভাবিক ব্যাঙের উপদ্রব ইত্যাদি। রক্তবৃষ্টি বর্ষণও ছিল ইহার মধ্যে একটি (দ্র. ৭ ঃ ১৩০-১৩৪)।

প্রথমে তাহাদের উপর চরম দুর্ভিক্ষ এবং ফল ও ফসলের উৎপাদন হ্রাসের আযাব আসিল। তাহাদের অনুরোধে মূসা (আ)-এর দু'আয় এই আযাব অপসারিত হইল। কিন্তু পূর্ববৎ তাহারা কুফরীতে লিপ্ত হইলে এইবার তাহাদের উপর নামিয়া আসিল প্রবল তুফান। তাহাদের উপর এত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইল যে, তাহাদের দেশ সম্পূর্ণ ভাসিয়া গেল। এমনকি তাহারা ঘর হইতে বাহির হইতে পারিতেছিল না (কামিল, ১খ., পৃ. ১৪২)।

এই আযাবের পর আসিল উকুনের (نمل) আযাব (৭ ঃ ১৩০)। তাহাদের ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার, আসবাবপত্র, এমনকি খাবার-দাবারের মধ্যে পর্যন্ত ইহারা ছড়াইয়া গেল। ফলে তাহাদের জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। অতঃপর মূসা (আ)-এর দু'আয় ইহাও অপসারিত হইল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ২৬১)।

ইহার পর তাহাদের উপর আসিল পঙ্গপালের আযাব। পঙ্গপালে তাহাদের শস্যাদি ও ফল-ফলাদি ছাইয়া গেল। ক্ষেত-খামার ধ্বংস করিয়া অবশেষে ইহারা তাহাদের ঘর-বাড়ির পেরেক পর্যন্ত খাইয়া ফেলিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ২৬৬)। নবীর দু'আয় এই আযাব বিদূরিত হওয়ার পর তাহাদের উপর ব্যাঙের আযাব আপতিত হইল। তাহাদের ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র সবকিছুই ব্যাঙে ভরিয়া গেল। ডেক-ডেকচী, হাঁড়ি-পাতিল সবকিছুতেই শুধু ব্যাঙ আর ব্যাঙ, এমনকি পানি পান করিবার জন্য পানপাত্র হাতে লইয়া মুখের নিকটবর্তী করিলে দেখা গেল উহাতে ব্যাঙ রহিয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ২৬৫)।

সবশেষে তাহাদের নিকট আসিল রক্তের মহামারী। তাহাদের নদী ও কূপের সমস্ত পানি রক্তে পরিণত হইয়া গেল। আরও আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, এক সময় ফিরআওনের এক লোক (কিবতী) এবং বনি ইসরাঈলের এক লোক একই স্থানে পানি পান করিতে গেল। ইসরাঈলী নির্মল পানি পাইল, কিন্তু কিবতী পাইল রক্তপূর্ণ পানি। নবীর দু'আয় ইহাও অপসারিত হইল (আল-বিদায়া, ১খ., পৃ. ২৬৬)।

ফিরআওন ও তাহার জাতির সম্মুখে উল্লিখিত নিদর্শনাবলীর সবগুলি বাস্তবায়িত হওয়ার পরও তাহারা ঈমানের পথে ফিরিয়া আসিল না, বরং পূর্বের মতই সত্যের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকিল। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে তাঁহার জাতি বানূ ইসরাঈলকে লইয়া হিজরত করিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। নবী মূসা (আ)-এর এই হিজরতের পথে এবং হিজরত পরবর্তী সময়ে বানূ ইসরাঈলের সম্মুখে আরও বেশ কিছু মু'জিযা প্রকাশিত হয়। উহার উদ্দেশ্য ছিল বানূ ইসরাঈলের প্রতি মহান আল্লাহর রহমতে তাহাদের মনোবল ও ঈমানকে আরও সুদৃঢ় এবং মজবুত করা। এই জাতীয় মু'জিযার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা হইল।

যখন মূসা (আ) বানূ ইসরাঈলকে লইয়া মিসর হইতে রওয়ানা হইলেন তখন ফিরআওন ও তাহার দলবল তাহাদের পশ্চাদধাবন করিল। মূসা (আ) সম্মুখে অগ্রসর হইয়া লোহিত

সাগরের তীর পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলেন। সংগে বানূ ইসরাঈলের বিশাল কাফেলা। তিনি তাঁহার হাতের লাঠি দ্বারা পানিতে আঘাত করিলেই সমুদ্র বক্ষে প্রশস্ত রাস্তা হইয়া গেল। তাঁহারা নির্বিঘ্নে সমুদ্র পার হইয়া গেলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ফিরআওন ও তাহার দলের লোকেরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিল। যখন তাহারা সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছিল আল্লাহর কুদরতে রাস্তা তখন পানিতে একাকার হইয়া গেল। ফলে ফিরআওন তাহার বিশাল দলবলসহ সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া মরিল (দ্র. ৪৪ ঃ ২৩-২৪)।

লোহিত সাগর পার হইয়া মূসা (আ) উম্মতের বিশাল বাহিনীসহ তীহ্ উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে পানির তীব্র সংকট দেখা দিল। আল্লাহ্‌র নির্দেশে মূসা (আ) তাঁহার হাতের লাঠি দ্বারা একটি পাথরে আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ পাথর হইতে বারটি পানির ধারা জারি হইয়া গেল (দ্র. ২ ঃ ৬০; ৭ ঃ ১৬০)।

তীহ্ উপত্যকায় তাহাদের খাবারের চাহিদা মিটানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আসমান হইতে মান্না ও সালওয়া নামক খাবার প্রেরণ করেন। 'মান্না' ছিল এক জাতীয় সুস্বাদু খাবার এবং সালওয়া ছিল চড়ুই পাখি সদৃশ্য এক জাতীয় গোশতের খাবার। ইহা প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তাহাদের নিকট প্রেরিত হইত (দ্র. ২ ঃ ৫৭; ৭ ঃ ১৬০; ২০ ঃ ৮১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ২৮২)।

তাই প্রান্তরে বানূ ইসরাঈলকে উত্তপ্ত রৌদ্র হইতে ছায়া প্রদানের জন্য মূসা (আ)-এর দু'আয় আল্লাহ তা'আলা মেঘমালা প্রেরণ করেন। উহা তাহাদের মাথার উপর ভাসমান থাকিয়া তাহাদেরকে ছায়া দান করিত (দ্র. ২ ঃ ৫৭)।

মূসা (আ)-এর উপর পবিত্র আসমানী কিতাব "তাওরাত" নাযিল হইলে তিনি তাহা লইয়া জাতির নিকট আসিলেন। জাতি বলিল, আমরা চাক্ষুষ আল্লাহকে না দেখিয়া এবং 'এই তাওরাত আমার কিতাব, তোমরা ইহার উপর আমল কর' এই কথা না শুনিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিব না। শেষ পর্যন্ত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত তাহাদের নেতৃস্থানীয় সত্তরজনকে সঙ্গে লইয়া তূর পর্বতে গমন করিলেন। সেখানে তাহারা আল্লাহ্‌র তাজাল্লী দেখিতে পাইল এবং সকলেই আল্লাহ্‌র বাণী শুনিতে পাইল, এমনকি তাহারা সকলে সেজদায় পড়িয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা বলিল, ইহা যে আল্লাহ্‌রই তাজাল্লী এবং তাঁহারই বাণী 'ইহার প্রমাণ কি' ? তাহাদের উক্তিতে আল্লাহ তা'আলা ভীষণ নারায হইলেন এবং বিদ্যুৎ চমক, বজ্র-আওয়াজ ও ভূমিকম্প দ্বারা তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিয়া দিলেন (দ্র. ২ ঃ ৫৫)। এই দৃশ্য দেখিয়া হযরত মূসা (আ) কাঁদিয়া ফেলিলেন, তিনি তাহাদের পুনর্জীবনের জন্য দু'আ করিলেন। ফলে তাহারা সকলেই পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল এবং বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল (দ্র. ৭ ঃ ১৫৫-১৫৬; তাবারী, তারীখ, ১খ., পৃ. ৪২৯) ।

বানূ ইসরাঈলীগণ তাওরাতের বিধান মানিয়া চলা কষ্টসাধ্য মনে করিল এবং উহার উপর আমল করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। তখন আল্লাহ তা'আলা একটি পর্বত তাহাদের মাথার উপর তুলিয়া ধরিলেন, যেন পর্বতটি এখনই তাহাদের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে ! ইহা দেখিয়া তাহারা তাওরাত মানিয়া চলিতে স্বীকার করিল (দ্র. ২ ঃ ৬৩, ৭ ঃ ১৭১; আল-কামিল, ১খ.,

হারূন (আ)-এর মরদেহের উপস্থিতি

একদা হযরত মূসা ও হারূন (আ) হাওর পর্বতে সফরে গেলেন। সেখানে অবস্থানকালে হযরত হারূন (আ) ইন্তিকাল করেন। হযরত মূসা (আ) সেইখানেই ভাই হারূনকে কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করেন। পরে যখন তিনি বানূ ইসরাঈলের নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহারা তাঁহাকে এই মর্মে অপবাদ দিল যে, তিনি আপন ভ্রাতা হারূনকে হত্যা করিয়াছেন। এই জঘন্য অপবাদ শুনিয়া মূসা (আ) অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাহিলেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর নিষ্কলুষতা প্রমাণের জন্য জনসম্মুখে হযরত হারূন (আ)-এর মরদেহ উপস্থিত করিলেন। সকলেই তাঁহার লাশ দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার শরীরে হত্যার কোনই আলামত ছিল না (কাসাসুল-কুরআন, ১খ., পৃ. ৫৩৫)।

হযরত খিযির (আ)-এর সহিত মূসা (আ)-এর ভ্রমণ

এই ভ্রমণটি ছিল অনেক অলৌকিক কর্মকাণ্ড দ্বারা সমৃদ্ধ। যেমন তাঁহার থলির মধ্যকার মাছ যেখানে হারাইয়া যাইবে, সেখানে তাঁহার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির অবস্থান নির্ণিত হওয়া, মৃত মাছের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হওয়া, মাছটি যেই স্থান দিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিল সেখানকার পানির প্রবাহ বন্ধ হইয়া সুড়ংয়ের ন্যায় পথ হইয়া যাওয়া ইত্যাদি (দ্র. ১৭ ঃ ৬০-৮৩; বুখারী, কিতাবুত-তাফসীর)।

হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ)-এর মু'জিযা

হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর মৃত্যুর পর ইউশা ইব্ন নূন (আ) নবী হন। হযরত মূসা (আ)-এর জীবদ্দশায় তিনি তাঁহার সহচর ছিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর ন্যায় তাঁহার জীবনেও অনেক মু'জিযা সংঘটিত হইয়াছে। যথা ঃ

(এক) তিনি যখন বানূ ইসরাঈলকে লইয়া আরীহা নগর জয় করেন, তখন প্রচুর গনীমতের সম্পদ তাঁহার হস্তগত হয়। সেকালে গনীমতের সম্পদ ভোগ করার অনুমতি ছিল না। গনীমতের সম্পদ একত্র করিয়া আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করা হইত। অতঃপর আসমান হইতে অগ্নি আসিয়া উহা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিত। নবী তাহাই করিলেন। কিন্তু আসমান হইতে অগ্নি নামিয়া আসিল না। নবী বলিলেন, নিশ্চয় কেহ গনীমতের সম্পদ আত্মসাত করিয়াছে। পরিশেষে তিনি সকলের হাত স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ইয়াহূদা গোত্রের এক ব্যক্তির হাত ধরিয়া তাহাকে আত্মসাতকারী চিহ্নিত করিলেন। বাস্তবে তাহাই প্রমাণিত হইল। আত্মসাতকৃত সম্পদ উদ্ধারের পর আসমানী অগ্নি আসিয়া সব ভস্মীভূত করিয়া দিল (কুরতুবী, ৬খ., পৃ. ১৩০)।

(দুই) আরীহা অভিযানকালে তিনি যখন জর্ডান নদীর তীরে পৌঁছেন, তখন নদী পার হইবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। আল্লাহ্র কুদরতে নদীবক্ষে তাহার সৈন্যদের জন্য রাস্তা তৈরী হইয়া গেল (সীরাত বিশ্বকোষ, ইফাবা, ২খ., পৃ. ৫৩০)।

(তিন) একবার তিনি বায়তুল মাক্দিস এলাকা মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আদিষ্ট হন। সৈন্য-সামন্তসহ তিনি রওয়ানা হইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিনটি ছিল জুমু'আ

বার। বানূ ইসরাঈলের ধর্মমতে শনিবার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। তাই যেইভাবেই হউক সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই যুদ্ধ সমাপ্ত করিতে হইবে এবং বায়তুল মাক্দিসে প্রবেশ করিতে হইবে। তিনি দু'আ করিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রু সৈন্য পরাস্ত না হয় এবং ঈমানদারদের বিজয় অর্জিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যেন সূর্য অস্ত না যায়। আল্লাহ্র কুদরতে তাহাই ঘটিল (মুসলিম, ২খ., পৃ. ৮৫)।

হযরত শামূঈল (আ)-এর মু'জিযা

হযরত শামূঈল (আ) বানূ ইসরাঈলী নবীদের একজন। পবিত্র কুরআনে তাঁহার নাম উল্লেখ হয় নাই। তবে তাফসীরকারকগণ সূরা বাকারার ২৪৬ ও ২৪৭ নং আয়াতের বর্ণনা তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (কুরতুবী, ৬খ., পৃ. ১৭১)।

তাঁহার নবূওয়াতকালে স্বৈরাচারী বাদশাহ জালূতের শাসন ছিল। সে বানূ ইসরাঈলীদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করিয়া লয়। বানূ ইসরাঈলীগণ নবী শামূঈলের নিকট এমন একজন বাদশাহ দাবি করে, যিনি জালূতের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া তাহাদিগকে জালূতের দাসত্বের শৃংখল হইতে মুক্ত করিবে। নবী দু'আ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তালূত নামক একজন সুঠাম বীর পুরুষ ও গুণী ব্যক্তিকে বাদশাহ মনোনীত করিলেন এবং তাহার নেতৃত্বে জালূত বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিলেন। তালূত জ্ঞানে এবং গড়নে-পঠনে সমৃদ্ধ হইলেও বংশগত মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে দুর্বল ছিলেন। এই কারণে বানূ ইসরাঈলীগণ তাঁহাকে বাদশাহ মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল। নবী শামূঈল তখন তাঁহার নিযুক্তির প্রমাণস্বরূপ একটি মু'জিযা প্রদর্শন করিলেন। মু'জিযাখানা ছিল এই যে, বানূ ইসরাঈলীদের নিকট একটি ঐতিহাসিক বরকতময় সিন্ধুক ছিল। এই সিন্ধুকটি জালূত হস্তগত করিয়া লইয়া গিয়াছিল। নবী বলিলেন, তোমাদের নিকট সেই বরকতময় সিন্ধুকটি ফেরেশতাগণ লইয়া আসিবেন। তাহারা বাস্তবিক দেখিতে পাইল যে, সিন্ধুকটি জালূতের ভূখণ্ডের দিক হইতে তাহাদের ভূখণ্ডের দিকে চলিয়া আসিতেছে। এই মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা তালূতের বাদশাহী মানিয়া লইল (কাসাসুল-কুরআন, ২খ., পৃ. ৪৩)

হযরত দাঊদ (আ)-এর মু'জিযা

হযরত ইয়া'কূব (আ)-এর অধস্তন নবম পুরুষের বংশে তাঁহার জন্ম। তিনি বানূ ইসরাঈলী নবীদের অন্যতম। তাঁহার জাতির বসবাস ছিল লোহিত সাগরের তীরে।

তাঁহার কয়েকটি ঐতিহাসিক মু'জিযার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে বিবৃত হইয়াছে। যথা ঃ

(এক) **তাঁহার হাতে লোহা গলিয়া যাওয়া ঃ** আল্লাহ তা'আলা মু'জিযা রূপ লোহাকে তাঁহার জন্য মোমের মত নরম করিয়া দিয়াছিলেন। লোহা দ্বারা কোন কিছু তৈরি করিতে অগ্নির প্রয়োজন হইত না। হাঁতুড়ি অথবা অন্য কোন হাতিয়ারেরও প্রয়োজন পড়িত না। তিনি লৌহ বর্ম ইত্যাদি যাহাই তৈরি করিতে ইচ্ছা করিতেন অনায়াসে উহাই করিতে পারিতেন

(দুই) **মধুর কণ্ঠস্বর ঃ** আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে মু'জিযারূপে এমন মধুর কণ্ঠস্বর দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন মহান আল্লাহ্র যিকির করিতেন অথবা তাঁহাকে প্রদত্ত আসমানী গ্রন্থ "যাবূর" তিলাওয়াত করিতেন তখন আসমানের পক্ষীকুল এবং পানির প্রাণীকুল পর্যন্ত তাঁহার সুর মূর্ছনায় মুগ্ধ হইয়া উহা শুনিতে মশগুল হইয়া যাইত এবং সব কিছু তাঁহার সামনে সমবেত হইত। তাঁহার যিকির ও তিলাওয়াতের সহিত পর্বতমালাও কণ্ঠ মিলাইত (দ্র. ৩৪ ঃ ১০)।

(তিন) বানূ ইসরাঈলের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র দিন। ইহা ছিল তাহাদের সাপ্তাহিক উপাসনার দিন। এই দিন মৎস শিকার নিষিদ্ধ ছিল। হযরত দাউদ (আ) তাঁহার সমুদ্র তীরবর্তী জেলে সম্প্রদায়কে মহান আল্লাহ্র এই নিষেধাজ্ঞা জানাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা নবীর কথা না মানিয়া মৎস শিকারে লিপ্ত হইল। পরিণতিতে তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশে বানরে পরিণত হইয়া গেল (দ্র. ২ ঃ ৬৫)।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর মু'জিযা

হযরত দাউদ (আ)-এর পুত্র হযরত সুলায়মান (আ)। তিনিও নবী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মানকে অনেক মু'জিযা দান করিয়াছিলেন। যথা ঃ

(এক) **বায়ু মণ্ডলকে বশীভূত করা ঃ** আল্লাহ তা'আলা বায়ুকে তাঁহার হুকুমের অধীন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বায়ুতে তাঁহার সিংহাসন স্থাপন করিয়া পরিবার-পরিজন, সভাসদবৃন্দ এবং প্রজাকুলসহ আরোহণ করিতেন এবং বায়ু তাঁহার নির্দেশ পালন করিত। উহার গতিও ছিল এত দ্রুত যে, দিনের প্রথমার্ধে (প্রভাতে) তিনি এক মাসের দূরত্ব এবং দিনের শেষার্ধে (সন্ধ্যায়) এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করিয়া যাইতেন (দ্র. ৩৪ ঃ ১২)।

(দুই) **তাঁহার দ্বিতীয় মু'জিযা ছিল তামার প্রস্রবণ ঃ** আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন তৈজসপত্র তৈরীর কাজে ব্যবহারের জন্য ভূগর্ভস্থ শক্ত তামার ধাতুকে তাঁহার জন্য পানির ন্যায় বহমান করিয়া তরল পদার্থে পরিণত করিয়া দেন। এই তামার প্রস্রবণ নিজ গতিতে ভূগর্ভস্থ পানির ন্যায় উৎসারিত হইত এবং উহা উত্তপ্তও ছিল না। অনায়াসেই উহা দ্বারা বিভিন্ন পাত্র তৈরী করা যাইত। এই তামার প্রস্রবণটি ইয়ামান হইতে উৎসারিত হইয়াছিল (দ্র. ৩৪ ঃ ১২)।

(তিন) আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে মু'জিযাস্বরূপ এক নজীরবিহীন সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব শুধু গোটা বিশ্বের মানবজাতির উপরই নহে বরং জিন জাতি, প্রাণী জগত, এক কথায় সমস্ত কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (দ্র. ৩৪ ঃ ১৩)।

(চার) হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা সকল প্রাণীজগতের জীব জন্তুর ও পক্ষীকুলের ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনাধীন সকল জীব-জন্তু তাহাদের নিজ সুবিধা-অসুবিধা সরাসরি নবী সুলায়মান (আ)-কে অবহিত করিত এবং তিনি তাহাদের সকল সমস্যার সমাধান দিতেন। এই প্রসঙ্গে পিপীলিকার এবং হুদহুদ পাখির আলোচনা পবিত্র কুরআন বিবৃত হইয়াছে (দ্র. ২৭ ঃ ১৬-৩১)।

(পাঁচ) রাণী বিলকীসের সিংহাসন নিজ রাজ্যে আনয়ন ঃ রানী বিলকীসের একটি বৃহৎ ও সুরক্ষিত রাজ-সিংহাসন ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-এর দরবারে যখন বিলকীস তাহার দলবলসহ আগমন করিবার জন্য রওয়ানা হইলেন এবং তাঁহার দরবারের প্রায় নিকটবর্তী হইয়া গেলেন তখন আল্লাহ তা'আলা চাহিলেন যে, বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গাম্বরসুলভ মু'জিযাও প্রত্যক্ষ করুক। ইহা তাহার বিশ্বাস স্থাপনে সহায়ক হইবে। তাই আল্লাহ্‌র কুদরতে বিলকীস সুলায়মান (আ)-এর দরবারে পৌঁছার পূর্বেই আসাফ ইব্‌ন বারাখ্‌য়া তাহার সুরক্ষিত সিংহাসন তুলিয়া আনিয়া সুলায়মান (আ)-এর দরবারে রাখিয়া দিলেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া বিলকীস আশ্চর্য হইলেন এবং নবীর আজ্ঞাবহ হইয়া গেলেন (দ্র. ২৭ ঃ ৩৮-৪২)।

(ছয়) বায়তুল মাক্‌দিস নির্মাণ এবং তাঁহার মৃত্যুর বিস্ময়কর মু'জিযা ঃ হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র হুকুমে জিন্ন জাতিকে বশীভূত করিয়া বায়তুল মাক্‌দিস মসজিদের নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। জিন্নরা দিনরাত অনবরত কাজ করিতে লাগিল। মসজিদের নির্মাণ কাজ কিছু বাকী থাকিতে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবগত হইলেন যে, তাঁহার জীবনকাল শেষ। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইয়া গেলে জিন্নেরা অবশিষ্ট কাজ ছাড়িয়া দিবে। সুলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করত তাঁহার মেহরাবে প্রবেশ করিলেন। মেহবারটি ছিল স্বচ্ছ কাঁচ নির্মিত। বাহির হইতে উহার অভ্যন্তর ভাগ দেখা যাইত। তিনি উহার ভিতরে ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। যথাসময়ে তাঁহার রূহ কবয হইয়া গেল। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁহার দেহ মৃত্যুর পরও লাঠির উপর ঐভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবাধ্য জিন্নেরা "তিনি তাকাইয়া আছেন" ভাবিয়া তাঁহার ভয়ে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিতে লাগিল। দীর্ঘ সময় পর তাহাদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত হইল। অপরদিকে উইপোকা লাঠির অভ্যন্তর ভাগ খাইয়া ফেলিল। ফলে লাঠি ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং নবীর লাশ মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন জিন্নেরা বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে (দ্র. ৩৪ ঃ ১৪)।

হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর মু'জিযা

হযরত যাকারিয়া (আ) বানূ ইসরাঈলী নবীদের একজন। তিনি বায়তুল মাক্‌দিস এলাকায় নবূওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বায়তুল মাক্‌দিসের ইমাম এবং তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। হযরত মারয়াম (আ) তাঁহার তত্ত্বাবধানে বায়তুল মাক্‌দিসের একটি প্রকোষ্ঠে লালিত-পালিত হন। তিনি তাঁহার দেখাশুনা করিতেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান এবং তাঁহার স্ত্রীও ছিল বন্ধ্যা। তাঁহারা উভয়ে তখন চরম বার্ধক্যে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। একদা যাকারিয়্যা (আ) মারয়ামের প্রকোষ্ঠে যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার সামানে অ-মৌসুমী ফল-মূল বিদ্যমান। যাকারিয়্যা (আ) উহা কোথা হইতে আসিয়াছে জানিতে চাহিলেন। মারয়াম বলিলেন, ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আসিয়াছে। হযরত যাকারিয়্যা (আ) মনে মনে চিন্তা করিলেন, যেই আল্লাহ্‌র অ-মৌসুমে ফল দিতে সক্ষম তিনি তো আমাদের এই চরম বার্ধক্যে এবং আমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূর করিয়া সন্তান দিতে পারেন। তিনি দু'আ করিলেন এবং দু'আ কবূল হইল। তিনি ইয়াহ্‌ইয়া নামক পুত্র সন্তান লাভে ধন্য হইলেন (দ্র. ৩ ঃ ৩৭-৪১; ১৯ ঃ ১-১১)।

হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযা

হযরত ঈসা (আ) মহান আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের নিদর্শনস্বরূপ মারয়ামের গর্ভে পিতাবিহীন জন্মলাভ করেন। এইভাবে তাঁহার জন্মলাভ একটি অলৌকিক বিষয় এবং মু'জিযা। ইহা ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে একাধিক মু'জিযা দান করিয়াছিলেন। সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ. "আমি ঈসা ইব্‌ন মারয়ামকে কয়েকটি মু'জিযা দান করিয়াছি" (২ ঃ ৮৭)। সংক্ষেপে তাহার মু'জিযাগুলির বিবরণ নিম্নে তুলিয়া ধরা হইল ঃ

(এক) দুধ পানকালীন কথা বলা ঃ হযরত মারয়াম যখন শিশু ঈসাকে লইয়া তাঁহার বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে শুরু করিল। শিশু ঈসা তখন মারয়ামের কোলে দুধ পান করিতেছিলেন। তিনি মানুষের ভর্ৎসনা শুনিয়া দুধপান ছাড়িয়া দিলেন এবং মানুষের দিকে মুখ ফিরাইয়া শাহাদাত অঙ্গুলী খাড়া করিয়া বলিলেন ঃ

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا. وَجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَ اَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَّبَرًّا بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا. وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا.

"সে (ঈসা) বলিল, আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন। আমাকে নবী করিয়াছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করিয়াছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করিতে। আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য। আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হইব" (১৯ ঃ ৩০-৩৩)।

এতদ্ব্যতীত মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে সুস্থ করা, শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করা এবং মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়া দেওয়া— এই চারটি মু'জিযার কথা পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে একসংগে বিবৃত হইয়াছে। আয়াতটি এই ঃ

اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّيْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হইতে নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করি। অতঃপর উহাতে যখন ফুৎকার করি আর উহা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হইয়া যায়। আল্লাহ্‌র হুকুমে আমি সুস্থ করিয়া থাকি

জন্মান্ধকে এবং শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে, আর আমি জীবিত করি মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলিয়া দেই যাহা তোমরা খাইয়া আস এবং যাহা তোমারা ঘরে রাখিয়া আস। ইহাতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে যদি তোমরা মুমিন হও" (৩ ঃ ৪৯; ৫ ঃ ১১০)।

(দুই) ইয়াহূদীরা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করিতে এবং শূলীতে চড়াইতে চাহিয়াছিল এবং ইহা বাস্তবায়নের জন্য যাবতীয় কার্যক্রমও সম্পন্ন করিয়াছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলিয়া নেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করিবেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে। তাঁহার এই জীবিতাবস্থায় আসমানে উত্থান নিঃসন্দেহে একটি অনন্য মু'জিযা (দ্র. ৩ ঃ ৫৫)।

(তিন) আসমান হইতে খাদ্য নাযিল হওয়া ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারী ও তাঁহার সহচর হাওয়ারীগণ একবার এই মর্মে আবেদন করিলেন যে, হযরত! আল্লাহ তা'আলা তো সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। সেই হিসাবে তিনি আমাদের জন্য আসমান হইতে খাবার পাঠাইতেও নিঃসন্দেহে সক্ষম। সুতরাং তিনি যদি আমাদের জন্য আসমান হইতে খাবারের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে তো আমরা সব সময় তাঁহার যিকিরে মশগুল থাকিতে পারিতাম। আমাদেরকে খাবার সংগ্রহের জন্য সময় ব্যয় করিতে হইত না। মেহেরবানী করিয়া দু'আ করুন। হযরত ঈসা (আ) দু'আ করিলেন। আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবূল করিলেন। তাহাদের নিকট আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা নাযিল হইল (৫ ঃ ১১২-১১৫; কাসাসুল-কুরআন, ৪খ., পৃ. ৮৪-৮৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) হিফযুর রহমান সিওহারবী, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, বাংলা অনুবাদ, ইফাবা, ১৯৮৯ খৃ.; (৩) আত্-তাবারী, তাফসীর, কায়রো, তা. বি.; (৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মিসর, দারুল ফিকর, তা.বি.; (৫) ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, আল-মারকাযুল আরাবী, মিসর, তা. বি.; (৬) আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, আল-মাক্তাবা আল-কাসতুলিয়া, হি. ১২৮২; (৭) ইবনুল আছীর, আল- কামিল ফিত্-তারীখ, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, বৈরূত ১৪০৭ হি.; (৮) আল-কুরতুবী, আল-জামি' লিআহ্কামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, বৈরূত, ১৯৯৩ খৃ.; (৯) আলূসী, রূহুল মায়ানী, মুলতান, পাকিস্তান তা. বি.; (১০) বুখারী, আস-সাহীহ, কুতুবখানা রাহীমিয়া দিল্লী, তা. বি.; (১১) মুসলিম, আস-সাহীহ (ঐ); (১২) ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, দারুল কলম, বৈরূত, তা. বি.; (১৩) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, আত্-তাফসীরুল কাবীর, দারুল ইহ্য়া, বৈরূত, তা. বি.; (১৪) দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়া, দানিশগাহ পাঞ্জাব, লাহোর ১৯৮৯ খৃ.; (১৫) ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল-বারী, বৈরূত ১৯৮৫ খৃ.; (১৬) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারুল সাদির, বৈরূত, তা. বি.; (১৭) সীরাত বিশ্বকোষ, ইফাবা, ১৯৯৩ খৃ., ১ম ও ২য় খ.।

মাসউদুল করীম

মু'জিযা, কারামাত ও ইসতিদরাজের মধ্যে পার্থক্য

আল-কুরআনে উল্লিখিত আছে ঃ

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ.

"তাহাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ আনিয়াছিল" (৫ ঃ ৩২)।

মু'জিযার আভিধানিক অর্থ

মু'জিযা শব্দটি মূল হলো 'ইজায, অর্থ অক্ষম বা অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া। ইহার বিপরীত শব্দ কুদরত, অর্থ সক্ষম বা সমর্থ হওয়া। আল-ই'জায হইতে গঠিত মু'জিযা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ কর্তৃবাচক । আল-মু'জিযা অর্থ অক্ষমকারী। পারিভাষিক অর্থে

مَا اعجز به الخصم عند التحدى.

"চ্যালেঞ্জের সময় যাহা প্রতিপক্ষকে অক্ষম করিয়া দেয়। প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে" (আয্-যুবায়দী, তাজুল 'আরূস, ১৫খ., পৃ. ২২১)।

আশ-শামী বলেন ঃ

قال المحققون المعجزة هى الامر الخارق للعادة المقرون بالتحدى الدّال على صدق الانبياء عليهم الصلوة والسلام الواقع على وفق دعوى المتحدّى بها مع امن المعارضة وسميت المعجزة لعجز البشر عن الاتيان بمثلها .

"মুহাক্কিক আলেমগণ বলিয়াছেন, নবীগণের সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় যে অস্বাভাবিক বিস্ময়কর ঘটনা তাহাদের দ্বারা সংঘটিত হয় উহাই মু'জিযা। চ্যালেঞ্জকারীর দাবির প্রেক্ষিতে যাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়। মানুষের পক্ষে অনুরূপ কিছু করা অসম্ভব বিধায় উহার নামকরণ করা হয় মু'জিযা" (সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৪০৫)।

আল্লামা জুরজানী বলেন ঃ

المعجزة امر خارق للعادة داعية الى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة قصد به اظهار صدق من ادعى انه رسول من الله .

"মু'জিযা হইল অস্বাভাবিক একটি ঘটনা, যাহা কল্যাণ ও সৌভাগ্যের প্রতি আমন্ত্রণ জানায়, যাহা নবূওয়াত কর্মের সহিত জড়িত। ইহার উদ্দেশ্য হইল, যিনি নবূওয়াতের দাবি করিয়াছেন উহার সত্যতা প্রমাণ করা" (আল-জুরজানী, কিতাবুত্ তা'রীফাত, পৃ. ২১৫)।

আল-মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে উল্লেখ হইয়াছে ঃ

المعجزة امر خارق للعادة يظهر الله على يد بنى تائيداً النبوته وما يعجزه البشران يأتوا بمثله ـ

"অস্বাভাবিক বিষয়কে মু'জিযা বলে। একজন নবীর নবূওয়াতের সমর্থনে আল্লাহ পাক তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনুরূপ কিছু প্রকাশ করিতে সাধারণ মানুষ অক্ষম" (মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৫৮৫)।

ইমাম ইবন তায়মিয়্যা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন, কর্ম, চরিত্র ও বাণী তথা তাঁহার জীবনের প্রতিটি আচরণ, উচ্চারণ এক একটি জীবন্ত মু'জিযা। তাঁহার উপর নাযিলকৃত শরী'আত একটি স্বতন্ত্র মু'জিযা। তদুপরি উম্মতের পূণ্যবান লোকদের কারামাতসমূহও তাঁহার নবূওয়াতের মু'জিযা বলিয়া গণ্য করা হয় (ইমাম ইবন তায়মিয়্যা, আল-জাওয়াবুস সাহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ, ৪খ., পৃ.৭৮-৯৪)।

নবী-রাসূলগণ (আ) আল্লাহ পাকের নির্দেশে মানুষকে হিদায়াতের বাণী শুনাইয়া সৎপথ প্রদর্শন করেন। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ তাঁহাদের হিদায়াতের বাণী শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের প্রতি ঈমান আনেন। পক্ষান্তরে হতভাগ্যগণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হইয়া তাঁহাদেরকে অবিশ্বাস করিয়া থাকে। এই হতভাগ্যদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে নবী-রাসূলগণের নবূওয়াতের সমর্থনে আল্লাহ পাক অভূতপূর্ব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাইয়া থাকেন। উহাই মু'জিযা বলিয়া অভিহিত (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭খ., পৃ. ৭২৪)।

ইবন ইউসুফ সালিহী বলেন, মু'জিযাকে মু'জিযা বলিয়া স্বীকার করিবার ক্ষেত্রে চারিটি শর্তের আওতায় উহাকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

(এক) যাহা স্বাভাবিক নিয়ম নীতি ভঙ্গ করিয়া সংঘটিত হইবে, যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, অঙ্গুলী সমূহ হইতে পানির ঝরণা প্রবাহিত হওয়া, লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, প্রস্তরের মধ্য হইতে উষ্ট্রী বাহির হওয়া ইত্যাদি।

(দুই) যাহা চ্যালেঞ্জের সহিত জড়িত। আবার অনেকে বলিয়াছেন, যাহা চ্যালেঞ্জের সহিত জড়িত নহে। কারণ মহানবী (স) হইতে স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে উহার অধিকাংশই চ্যালেঞ্জবিহীন। অতএব যাহারা চ্যালেঞ্জের শর্ত আরোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিমত সঠিক নহে। সমস্যাটির সমাধান এইভাবে করা যাইতে পারে যে, যখনই নবী করীম (স) নবূওয়াতের দাবি করিয়াছেন, তখনই স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াই তাহা সংঘটিত হইয়াছে। যখনই তিনি দাবি করিতেছেন أنَا رَسُولُ اللهِ الى الخَلْقِ "আমি সৃষ্টি জগতের প্রতি আল্লাহ তা'আলার একজন রাসূল", তখনই বুঝিতে হইবে স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াই এই দাবিটি করা হইতেছে। মুখ্যত চ্যালেঞ্জ এইখানে পরোক্ষভাবেই জড়িত (শায়খ কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, মাসীরাত)।

(তিন) যাহা নবূওয়াত ও রিসালাত প্রাপ্তির পূর্বে সংঘটিত হইয়াছে। উহাতে চ্যালেঞ্জ বা মুকাবিলার কোন উৎস থকে না। ইহা মু'জিযা বলিয়া অভিহিত নহে বরং কারামাত বলা যাইতে

পারে। যেমন মহানবী (স)-এর শৈশব অবস্থায় তাঁহার বক্ষ বিদারণ, কৈশোরাবস্থায় তাঁহাকে মেঘের ছায়াদান। শিশুকালে হযরত ঈসার দোলনা হইতে কথা বলা। ইহা নবী-রাসূলগণের নবূওয়াত ও রিসালতের ভিত্তি।

(চার) যাহা দাবিদারের দাবির স্বপক্ষে সংঘটিত হইবে তাহাই মু'জিযা, বিপক্ষে হইলে মু'জিযা নহে। যেমন নবূওয়াতের দাবিদার দাবি করিবেন, আমার নবূওয়াতের নিদর্শন হইল, আমার দাবির স্বপক্ষে আমার হাত অথবা এই প্রাণী যাহার কথা বলিবে। তাহার হাত অথবা প্রাণীটি যদি তাহার বিপক্ষে বলে এই লোকটি মিথ্যুক, সে নবী নহে। তাহা হইলে তাহার হাত ও প্রাণীটি কথা বলা সত্ত্বেও তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া উহা মু'জিযা নহে। যেমন মুসায়লামা কায্যাব একটি কূপে পানি বৃদ্ধির জন্য থুথু নিক্ষেপ করিয়াছিল। ফলে কূপটি ধ্বসিয়া গিয়া উহার পানি উধাও হইয়া গিয়াছিল।

এই চারটি শর্ত বহির্ভূত বিষয়গুলি মু'জিযা নহে। তবে দাজ্জাল তাহার দুই হাতে স্বাভাবিক নীতি বিরুদ্ধ নিদর্শনসহ আগমন করিবে। উহাকে মু'জিযা বলা যাইবে না। কারণ সে নবূওয়াতের দাবিদার হইবে না, বরং সে দাবিদার হইবে প্রভুত্বের (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৪০৬)।

শব্দ বিভ্রাট—নবী-রাসূলগণ দ্বারা প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাকে সাধারণত মু'জিযা বলা হয়। শব্দটি বহুল প্রচলিত। তবে কয়েকটি কারণেই শব্দটির ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়।

(এক) পবিত্র কুরআন ও হাদীছে শব্দটি আদৌ-ব্যবহৃত হয় নাই। তদস্থলে কুরআনে ব্যবহৃত হইয়াছে আয়াত বায়্যিনাত ও বুরহান। এই পরিভাষাদ্বয় মূল বক্তব্যকে যথাযথ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে। অনুরূপ হাদীছ গ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে 'দলীল' ও 'আলামত' শব্দদ্বয়। মু'জিযা শব্দটির ব্যবহারে অস্বাভাবিক, অলৌকিক ইত্যাদি বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা হইয়া থাকে। আল-কুরআন ও হাদীছে ব্যবহৃত শব্দগুলি 'আয়াত,' 'বায়্যিনাত', 'বুরহান', 'দলীল', 'আলামত' অর্থাৎ নিদর্শন, দলীল, ব্যবহার করা হইলে বিষয়টি বিতর্কিত হইত না।

(দুই) মু'জিযা পরিভাষাটির ব্যবহারগত কারণে ইহার সহিত কিছু মানসিক বিশেষ কারণ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ উহা অসমীচীন। যেমন নবী-রাসূলগণ কর্তৃক উহা প্রকাশ পায় বলিয়া সাধারণ মানুষ উহাকে নবী-রাসূলগণের অলৌকিক কাজ ইত্যাদি বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে।

(তিন) মু'জিযা শব্দটি হইতে বুঝা যায়, উহা একটি অসম্ভব অস্বাভাবিক কাজ। বাস্তবে তাহা নহে। তাই বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শনের দিক হইতে মু'জিযার উপর যতগুলি প্রশ্ন আরোপিত হইয়াছে, তাহা এই ভুল পরিভাষা ব্যবহার করার কারণেই।

(চার) সর্বাপেক্ষা বড় কথা হইল, আমাদের এমন একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের প্রয়োজন যাহাতে নবূওয়াতের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট থাকিবে। মু'জিযা শব্দটি তেমন ব্যাপক অর্থবোধক নহে বরং কুরআন পাকে ব্যবহৃত শব্দাবলী ব্যাপক অর্থবহ। সুতরাং কুরআন পাকে ব্যবহৃত আয়াত, 'বায়্যিনাত', 'বুরহান' হাদীছ শরীফে ব্যবহৃত 'দলীল',

'আলামতই মু'জিযার ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য যথাযথ শব্দ (সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী, ৩খ., পৃ. ১৭)।

আল-কুরআনে মু'জিযাকে 'আয়াত' বলা হইয়াছে। কুরআন পাকের পরিভাষায় নবী-রাসূলগণের মু'জিযাকে আয়াত ও বায়্যিনাত বলিয়া এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى .

"মূসা যখন উহাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন লইয়া আসিল, উহারা বলিল, ইহা-তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র" (২৮ ঃ ৩৬)!

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ .

"অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, রক্ত ও ভেক দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন" (৭ ঃ ১৩৩)।

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ .

"ফিরআওন বলিল, যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তবে তুমি সত্যবাদী হইলে তাহা পেশ কর" (৭ ঃ ১০৬)।

মক্কার মুশরিকরা যখন মু'জিযা দাবি করিল তখন উহার প্রত্যুত্তরে ঘোষণা করা হইল ঃ

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ .

"বল, নিদর্শন তো আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত" (৬ ঃ ১০৯)।

অবিশ্বাসীরা বলিত ঃ

فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ .

"অতএব সে আনয়ন করুক আমাদের নিকট এক নিদর্শন যেইরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হইয়াছিল পূর্ববর্তিগণ" (২১ ঃ ৫)।

হযরত সালেহ (আ) তাঁহার মু'জিযা সম্পর্কে ঘোষণা করেন ঃ

وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً .

"হে আমার সম্প্রদায়! ইহা আল্লাহ্র উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ" (১১ ঃ ৬৪)।

মু'জিযার তাৎপর্য

নবূওয়াতের দাবিদার স্বীয় গোত্রীয় সন্তানদিগকে যে আমন্ত্রণ জানান এবং এই জগতের বুকে যে পয়গাম ছড়াইয়া দেন, উহার সত্যতার সমুজ্জ্বল প্রমাণ বা নিদর্শন যদিও স্বয়ং পয়গাম বা পয়গামবাহকের অস্তিত্ব, তথাপি সংশয়ী চিত্তের স্বস্তির প্রয়োজনে প্রমাণে পূর্ণতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সত্যের আহ্বায়কের দ্বারা এমন কিছু কার্যাবলী প্রকাশ পায় যাহা সাধারণ মানুষের ক্ষমতা বা ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর বেলায় অগ্নি শীতল হয়। হযরত মূসা (আ)-এর হাতের লাঠি পরিণত হইল অজগর সাপে। পিতাবিহীন সন্তানের অস্তিত্ব হইলেন হযরত ঈসা (আ)। মহানবী (স) মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আক্‌সা, তথা হইতে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা পরিভ্রমণ করিয়া আসেন স্বল্প সময়ে। মানববুদ্ধি যেহেতু এইগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করিতে অক্ষম, সেহেতু ইহাতে এক অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়া ধরা পড়ে। যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইহা প্রকাশ পায়, অদৃশ্যের জ্ঞানসহ অন্যান্য নিদর্শনাদি যাহার সহায়ক হয়, তাহাকে অদৃশ্য সাহায্যপ্রাপ্ত বলিয়া ধরা হয়। কুরআন মজীদ এই সমস্ত ঘটনার নাম দিয়াছে 'বায়্যিনাত', 'বারাহীন' এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'আয়াত'। মুহাদ্দিছগণ ঐগুলিকে 'দালাইলুন নুবূওয়াত' আখ্যা দিয়াছেন। দার্শনিকগণের পরিভাষায় উহা নাম হইল মু'জিযা' বা অস্বাভাবিক কার্যাবলী (সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী, ৩খ., পৃ. ৭৬)।

মু'জিযার স্বরূপ

আল্লাহ তা'আলা কোন নিয়ম, উপকরণ, কার্যকারণ নীতি ব্যতীতই যে কোন বস্তুকে অস্তিত্বে আনয়ন করিতে সক্ষম। মু'জিযা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও তেমনই কোন নিয়ম-নীতির প্রয়োজন নাই। যখনই তিনি ইচ্ছা করেন তখনই তিনি মু'জিযা প্রদর্শন করেন। তবে ইহা মানবিক শক্তির উর্ধ্বে। ইহা শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোন শিক্ষাগার, পাঠাগার, পরীক্ষাগার বা পাঠ্যসূচি তৈয়ার করাও সম্ভব নহে। হযরত মূসার লাঠি দ্বারা লক্ষবার মাটিতে আঘাত করিলেও আর ঝরনা প্রবাহিত হইবে না। লক্ষবার মাটিতে নিক্ষেপ করিলেও তাহা সাপে পরিণত হইবে না। শুধু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হইলেই তাহা সম্ভব হইবে। আবার যে নবীর মাধ্যমে মু'জিযা প্রদর্শিত হইবে, তিনি নিজেও অনবহিত যে, কখন ও কিভাবে মু'জিযা প্রদর্শিত হইবে। কারণ মু'জিযা প্রদর্শনের জন্য কোন সুনির্ধারিত নিয়ম-কানুন বা সময়ও নাই। দেখা গিয়াছে, ফিরআওন ও তাহার স্বজাতির সম্মুখে হযরত মূসা (আ) তাঁহার হাতের লাঠিটি মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটি বিরাট একটি অজগর সাপে পরিণত হইল এবং ফোঁস ফাঁস, লম্ফঝম্ফ করিতে লাগিল। হযরত মূসা (আ) নিজেও ভীত-সন্ত্রস্ত হইলেন। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন ঃ

خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۔

"তুমি ইহাকে ধর, ভয় করিও না, আমি ইহাকে ইহার পূর্বরূপে ফিরাইয়া দিব" (২০ ঃ ২১)।

হযরত মূসা (আ) যদি পূর্ব হইতেই জানিতেন, লাঠি ছাড়িয়া দিলে সাপে পরিণত হইবে, তাহা হইলে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হইতেন না।

মু'জিযার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। এই জগতে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতার খেলা চলিতেছে। দেখা যায়, কেহ যদি কোন কিছু আবিষ্কার-উদ্ভাবন করে, তখন অপর একজন উহার প্রতিযোগিতায় উহা অপেক্ষা উন্নততর আবিষ্কারে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মু'জিযার ক্ষেত্রে তেমনটি চিন্তা-ভাবনারও উর্ধ্বে। মহা প্রলয়কাল পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়াও কেহ মু'জিযার অনুরূপ

কিছু প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবে না। উড়োজাহাজ আকাশে উড়িয়া চলে মেশিনের সাহায্যে। আরও উন্নততর মেশিনের সাহায্যে রকেট চলে। পক্ষান্তরে হযরত সুলায়মান-এর (আ) তখত-সিংহাসন আকাশে উড্ডীয়মান হয় মেশিন ছাড়াই, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার দ্বারা। অনুরূপ মেশিন ছাড়া উড়া কি আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইয়াছে ? মানবিক শক্তি ও জগতের যাবতীয় শক্তি মু'জিযার ক্ষেত্রে অচল, অকার্যকর। বস্তুত মু'জিযা উপাত্ত-উপকরণ বহির্ভূত আল্লাহ তা'আলার গোপন ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

মু'জিযার প্রকারভেদ

হাফিজ ইব্ন কাছীর বলেন, মু'জিযা দুই প্রকার ঃ (১) অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক; (২) পার্থিব বা জড়। পবিত্র কুরআন মজীদ একটি অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা। ইহা সমুজ্জ্বল প্রমাণাদির উৎকৃষ্ট বর্ণনাকারী ও নবূওয়াতের বিস্ময়কর নিদর্শন। স্বয়ংসম্পূর্ণ, অজেয়, রচনাশৈলীর অনন্যতায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইহা আল্লাহ্‌র কালাম। জিন-ইনসানকে এই কুরআনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করিয়া দেখাইতে আহবান করা হইয়াছে। ইহাতে আরবী ভাষার পণ্ডিতবর্গ অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে। যেমন কুরআন পাকে উল্লেখ হইয়াছে ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لاَ يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ٠

"বল, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবেন না" (১৭ ঃ ৮৮)।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রথমত অবিশ্বাসীদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে, তোমরা যদি সক্ষম হও তবে এই কুরআনের অনুরূপ একটি কুরআন রচনা করিয়া লইয়া আইস। তাহাদের অক্ষমতা সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তোমরা পরস্পর সহায়তা করিয়াও অনুরূপ রচনা করিতে সক্ষম হইবে না।

কারামাত ঃ كرامة (কারামাত) শব্দটি كرم ধাতুমূল হইতে গঠিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, উদার, দয়ালু, সম্মানিত হওয়া। আল্লাহ পাকের অসংখ্য গুণবাচক নামের মধ্যে 'কারীম' একটি গুণবাচক নাম। আল-কুরআনে ইহা একাধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। আল্লাহ পাক সেইখানে আল-কারীম (الكريم) অর্থাৎ উদার বা দয়ালু নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন। তবে কারামাত বলিতে যাহা বুঝায়, আল-কুরআনে উল্লিখিত আল-কারীম শব্দ তাহা বুঝায় না। কারামাত (كرامة) শব্দটির বহুবচন কারামাত (كرامات)। ধর্মীয় পরিভাষায় ইহার অর্থ, আল্লাহর দেওয়া দান, যাহা সম্পূর্ণ মুক্ত, অবারিত অনুগ্রহ (ইহসান বা ইন'আম)। তবে যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে এইভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ পূর্বক তাঁহার প্রিয়জনদেরকে অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন করিবার যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকেন। আর তাহারাও আল্লাহ পাকের অনুকম্পাসিক্ত হইয়া অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন। ইহাই কারামাত নামে অভিহিত। এই সমস্ত ঘটনা

সাধারণত বস্তু জগতে সংঘটিত অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনার সমন্বয়ে ঘটিত নতুবা ভবিষ্যতের কোন পূর্ব সংকেতস্বরূপ অথবা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কোন ব্যাখ্যাস্বরূপ (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭খ, পৃ. ৩২৪)।

মু'জিযা ও কারামাতের মধ্যে পার্থক্য

মু'জিযা ও কারামাতের সংজ্ঞা হইতে এই কথা সুস্পষ্ট যে, মু'জিযা ও কারামাতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। তবে আওলিয়ায়ে কিরামের দ্বারা কারামাত প্রকাশ পাওয়া আদৌ সঠিক কি না, সেই ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করিয়াছেন।

মু'তাযিলী মতবাদ ঃ অধিকাংশ মু'তাযিলী সম্প্রদায় কারামাতের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। তাহাদের প্রসিদ্ধ যুক্তি, যাহা আল-কুরআনের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার জারুল্লাহ যামাখশারী কর্তৃক ৭২:২৬-২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হইয়াছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَداً ۝ اِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ۝

"তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, তাহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন" (৭২ ঃ ২৬-২৭)।

আল-কুরআনের এই আয়াত হইতে যামাখশারী বুঝাইতে চাহেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রেরিত নবীগণের মিশনের সত্যতা সুনিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তাহাদের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বিভিন্ন রকমের অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ করেন, কিন্তু অন্য সকল অতি-প্রাকৃত ঘটনা তিনি সৃষ্টির অগোচরে সম্পন্ন করেন। আল-জুব্বাঈ বলেন, ওয়ালীগণ যদি এই ক্ষমতার অধিকারী হন তাহা হইলে কিভাবে তাহাদিগকে নবীগণ হইতে পৃথক করা যাইবে? এইভাবে মু'তাযিলী সম্প্রদায় কারামাতের যথার্থতা অস্বীকারের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।

দার্শনিকগণের অভিমত

দার্শনিক ইব্ন সীনার দৃষ্টান্ত হইতে কারামাতের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব "অপরিহার্য এবং আত্মসচেতন ইচ্ছাসম্পন্ন' উদ্ভবের অস্তিত্বমূলক অদৃষ্টবাদের মধ্যে মু'জিযাত ও কারামাতকে তিনি স্থান দিয়াছেন। নবীগণ তাহাদের মানবীয় প্রকৃতির পরিপূর্ণতা ও বাহ্যিক বস্তুনিচয়ের উপর প্রকৃতিগত আত্মিক প্রভাবেই মু'জিযা দ্বারা তাহাদের আগমনকে সুনিশ্চিত করিয়া থাকেন। উল্লেখ্য যে, ইব্ন রুশদ 'তাহাফুতুত তাহাফুত' গ্রন্থে (সম্পা. Bouyes, 515) একটি পার্থক্য উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইল, যাহার মধ্যে গুণগত পার্থক্য নিহিত শুধু সেইগুলিই অলৌকিক ঘটনা। কারণ, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা সম্ভব। তাঁহার রিসালা ফী আক্সামিল উলূম গ্রন্থে (তিস'উর রাসাইলের অন্তর্ভুক্ত, কায়রো সংস্করণ, ১৩২৬/১৯০৪, পৃ. ১৪)। ইবন সীনা বলেন, কারামাত প্রকৃতিগতভাবে মু'জিযার

সমার্থক। তাঁহার ইশারাত গ্রন্থে (সম্পা., Foget Lieden, ১৮২০ খৃ., ১২০) তিনি এই কথা সমর্থন করেন যে, আধ্যাত্মিক গভীরতার কল্যাণে যাহার আত্মা জাগতিক বস্তুর উপর প্রভাবশীল এবং যিনি এই প্রভাব কল্যাণকর ও নীতিসিদ্ধ পন্থায় ব্যবহার করেন, যদি তিনি নবী হন তাহা হইলে আল্লাহ্‌র দান হিসাবে তিনি উহা লাভ করেন তাহাই মু'জিযা। আর যদি তিনি ওলী হন, তাহা হইলে তিনি কারামাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। নবীগণ নবূওয়াতপ্রাপ্ত হন আল্লাহর প্রতি তাঁহাদের প্রকৃতিগত সহজাত প্রবৃত্তি, প্রজ্ঞার ত্রিবিধ পরিপূর্ণতা, চিন্তাশক্তি ও কঠোর সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমে, যদিও সেই সাধনা বা মু'জিযা নিম্ন মানের হয় (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭খ., পৃ. ৩২৫)।

(৩) আশ'আরী সম্প্রদায়ের জওয়াব—ধারণা করা হয়, কিছু সংখ্যক আশ'আরী-যেমন আল-ইসফারাইনী, আল-হালিমী প্রমুখাত কারামাত প্রসঙ্গে মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের জোরাল মতামত বা বিচার-বিবেচনাকে সমর্থন করে। তবে আশ'আরী সম্প্রদায়ের সাধারণ মতবাদের যথার্থতা নিম্নে বর্ণিত যুক্তির ভিত্তিতে স্বীকৃত।

(ক) **বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাব্যতা ঃ** কোন নবীর নৈতিক পরিপূর্ণতার নিদর্শন কোন অলৌকিক ঘটনা বা মু'জিযা অহেতুক নহে, বরং উহা আল্লাহ পাকের সদিচ্ছা বা কার্যকর ইচ্ছা। তিনি তাঁহার সেই ইচ্ছাকে একজন নবীর মাধ্যমে সম্পাদন করিয়া থাকেন। সেই অলৌকিক কার্যটি সম্পাদিত হয় কোন ঘোষণা বা চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায়। সুতরাং আল্লাহ পাকের পক্ষে কোন বিজ্ঞপ্তি বা চ্যালেঞ্জ ছাড়াই কোন সাধকের মাধ্যমে অতি প্রাকৃত কোন ঘটনা ঘটান বৈধ বা জাইয।

(খ) **আল-কুরআনের সমর্থন ঃ** এমন কতকগুলি ঘটনার অস্তিত্ব দিবালোকের মত দেদীপ্যমান ও যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত, কুরআন মজীদে যাহা উল্লেখিত হইয়াছে, যাহার ধারকগণ কোন নবূওয়াতের দাবিদার ছিলেন না। যেমন ঃ

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۔

"যখনই যাকারিয়া কক্ষে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত তখনই তাহার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখিতে পাইত। সে বলিত, এইসব তুমি কোথায় পাইলে? সে বলিত, উহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে। নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন" (৩ ঃ ৩৭)।

সন্দেহাতীতরূপে ঘটনাটি ছিল বিস্ময়কর, অলৌকিক। হযরত ঈসা ('আ)-এর জননী মারয়াম ('আ) নিজে কোন নবী ছিলেন না, নবূওয়াতের দাবিদারও ছিলেন না, অথচ তাঁহার নিকট পাওয়া যাইত অসম মৌসুমে মৌসুমী ফল। আরও উল্লেখ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۔

"তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর" (১৮ ঃ ৯)?

যাহারা একটি পার্বত্য গুহাতে একাধারে তিন শত বৎসর ঘুমন্ত ছিলেন তাহারা নবী-রাসূল নহেন, অথচ এই সকল ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘটনা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে অলৌকিক নিদর্শন। আরও উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ ٠

"কিতাবের জ্ঞান যাহার ছিল সে বলিল, আপনি চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব। সুলায়মান যখন উহা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখিল তখন বলিল, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ" (২৭ ঃ ৪০)।

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল হযরত সুলায়মান (আ)-এর আদেশে হয় একজন জিন্ন অথবা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে, যাহারা কোন নবী ছিলেন না যিনি চক্ষের পলকে রানী বিলকীসের বিরাট সিংহাসন আনিয়াছিলেন অনেক দূর হইতে।

(গ) সুতরাং কারামাত সম্ভব, তবে উহাকে মু'জিযার সহিত সংযুক্ত করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইবে না। আল্লাহ পাক মু'জিযা প্রকাশ করেন নবীগণের মিশনের প্রমাণস্বরূপ, আর কারামাতকে প্রকাশ করেন ওলীগণকে সম্মানিত ও তাহাদের ধর্মনিষ্ঠা ও তাকওয়া সংরক্ষণ মানসে। মু'জিযাত সকল মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করা উচিত, তবে কারামাত গোপন করাই বিধেয়। সর্বদা দুইটির মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পার্থক্য বজায় রাখা কর্তব্য। জানিয়া রাখিতে হইবে, যাবতীয় ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ইহা হইতে ভিন্নতর। উল্লেখ্য যে, আশ'আরী মতবাদ আরও বিধৃত হইয়াছে-ইবন খালদূন, মুকাদ্দিমা, অনু. ৬খ., পৃ. ৩৩২; DE Slane, ১খ., পৃ. ১৯১; ৪৩খ., ১১১-১২; অনু. Rosenthal, ১খ., পৃ. ১৮৮-৯১; ৯১খ., পৃ. ১৬৭/৬৮ গ্রন্থসমূহে।

(খ) **সূফী মনস্তত্ত্ব কর্তৃক স্বীকৃত ঃ** ওলীগণের কারামাত সূফী দার্শনিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। সুন্নী সূফী বিদ্যায় পারদর্শিগণ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সাধারণভাবে আশ'আরী মতবাদের খুবই নিকটবর্তী। এই মতবাদে কারামাত ও মু'জিযার পার্থক্যের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কোন ওলী-দরবেশ বিস্ময়কর কার্যাবলী সম্পাদন করিলে তিনি সেই কারণে নবী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারেন না। তিনি তদানীন্তন রাসূল (আ) কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মীয় আইনের অনুশাসন মানিতে বাধ্য থাকেন।

কারামাত কখনও মু'জিযার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না, বরং মু'জিযার পৃষ্ঠপোষকতা করে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ওলীগণের কারামাত সেই নবীর মু'জিযার প্রমাণ যে নবীর তিনি উম্মত। সেইহেতু মু'জিযা নবীর সত্যতার প্রতীক। আমরা দেখিতে পাই, হযরত খুবায়ব (রা)-কে অবিশ্বাসীরা যখন মক্কাতে শূলীতে দেয়, তখন মহানবী (স) অনেক দূরে মদীনার মসজিদে তাঁহার সহচরবৃন্দ পরিবেষ্টিত অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি অন্তরদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিলেম, হযরত খুবায়বের উপর জুলুম-অত্যাচারের করুণ অবস্থা। সহচরবৃন্দকে তাহা

সবিস্তারে অবহিত করেন। অপরদিকে আল্লাহ পাক হযরত খুবায়বের অন্তরায় দূরীভূত করেন। তিনি মহানবী (স)-এর পবিত্র দর্শন লাভ করেন, সালাম পেশ করেন তাঁহাকে। তিনিও সালামের জবাব দেন। হযরত খুবায়বও সালামের জবাব শুনিতে পান। মহানবী (স) তাহার জন্য দো'আ করেন। মক্কা-মদীনার মধ্যে দূরত্ব ছিল বিস্তর। তবুও তাঁহাদের মধ্যে সাক্ষাত, সালাম আদান-প্রদান সুনিশ্চিতরূপে অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইহা হযরত খুবায়বের জন্য ছিল কারামাত আর মহানবী (স)-এর জন্য ছিল মু'জিযা (দাতা গনজে বখশ, কাশফুল মাহজূব, পৃ. ২৭২)।

ইসতিদরাজ ঃ ইসতিদরাজ শব্দটি সাধিত হইয়াছে 'দারজ' ধাতুমূল হইতে। ইসতিদরাজ অর্থ ধোঁকা দেওয়া, প্রতারণা করা। আবার ইসতিদরাজ অর্থ, শনৈঃ শনৈঃ নিকটবর্তী হওয়া। বলা হয়, ইসতাদরাজাল্লাহুল 'আবদা' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধীর গতিতে বান্দার নিকটবর্তী হইলেন। ইহার অর্থ, বান্দা যখন নিত্য-নূতন পাপ কর্মে লিপ্ত হয় আল্লাহ তা'আলাও তখন নূতন নূতন নি'আমত রাশি দ্বারা তাহাকে পরিতুষ্ট করেন, তাহাকে ভুলাইয়া দেন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُوْنَ ٠

"আমি অচিরেই তাহাদেরকে আস্তে আস্তে এমনভাবে পাকড়াও করিব যে, তাহারা বুঝিতেই পারিবে না"।

এই কারণেই হযরত ওমর (রা)-এর সম্মুখে যখন বাদ্‌শাহ কিসরার ধনভাণ্ডার আনীত হইল তখন তিনি আল্লাহ-তা'আলার নিকট দু'আ করিয়াছিলেন, আয় আল্লাহ! ইসতিদরাজকারী হওয়া হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যেহেতু আমি তোমার ঘোষণা শুনিয়াছি, তুমি বলিয়াছ, "আমি অচিরেই তাহাদেরকে আস্তে আস্তে পাকড়াও করিব যেন তাহারা উপলব্ধিই করিতে না পারে" (আল-যাবীদী, তাজুল 'আরূস, ৫খ., পৃ. ৫৬০)।

ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার দ্বারা মানুষকে ধীরে ধীরে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রক্রিয়াকে আরবী পরিভাষায় ইসতিদরাজ বলে। সিহ্‌র, যাদু, ইন্দ্রজাল, সম্মোহন, ভেল্কীবাজি, নজরবন্দী ইত্যাদি পরিভাষাগত ইসতিদরাজ। যাদুকররা সম্মোহন বা ইন্দ্রজালের দ্বারা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। অস্তে আস্তে মানুষ তাহাদের খপ্পরে পড়ে।

অস্বাভাবিক কার্যকলাপ দ্বারা মানুষকে প্রতারণা করে। ফলে ইহাও অলৌকিক মু'জিযা বা কারামাতের পর্যায়ে বিবেচিত হয়। তবে ইহা শরী'আত সমর্থিত নহে।

মুফতী মুহাম্মাদ ইউসুফ বলেন, যে অস্বাভাবিক ক্রিয়া-কর্ম কোন ফাসিক পাপী বিধর্মী কাফির হইতে প্রকাশ পায়, উহাকে প্রতারণা বা ইসতিদরাজ বলে। একজন ফাসিক ফাজির হইতে এই রকম অলৌকিক কার্য প্রকাশ পাওয়া একটা ফিৎনা এবং মানুষের জন্য মহাপরীক্ষা (মুফতী মুহাম্মাদ ইউসুফ, যাওয়াহিরুল ফারাইদ, পৃ. ৬২৭)।

মু'জিযা, কারামাত ও ইসতিদরাজের মধ্যে পার্থক্য— কারামাত শব্দের ভাবার্থ মু'জিযা হইতে ভিন্নতর। তবে বিষয় দুইটিই বস্তুর স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন ভঙ্গের সহিত জড়িত। উহা

একটি বিস্ময়কর ঘটনা যাহা আল্লাহ্র নিয়ম-কানুনের (সুন্নাতুল্লাহ) স্বাভাবিক ধারাকে লঙ্ঘন করে। উহা যদি নবী-রাসূলের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাহা হইলে মু'জিযা, আর যদি কোন ওলীর মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাহা হইলে কারামাত বলিয়া অভিহিত হয়। আল্লামা জুরজানী বলেন,

الكرامة هى ظهور امر خارق من قبل شخص غير مقارن الدعوة النبوة فما لايكون مقرونًا للايمان والعمل الصالح يكون استدراجاً وما يكون مقرونًا بدعوة النبوة يكون معجزة .

"নবী নহেন এমন কোন মুসলিম ব্যক্তি হইতে যদি অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ পায় তাহা হইলে উহা কারামাত। আর প্রকাশিত বিষয় যদি ঈমান ও পুণ্য কর্মের সহায়ক না হয় তবে উহা ইন্দ্রজাল। আর যদি অনুরূপ ঘটনা প্রকৃতই নবূওয়াতের দাবিদার হইতে প্রকাশ পায় তাহা হইলে উহা মু'জিযা বলিয়া অভিহিত" (কিতাবুত-তা'রীফাত, পৃ. ১৮০)।

আল্লামা শাববীর আহমাদ বলেন, মু'জিযা এবং কারামাত দুইটিই সুসম্পন্ন হয় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে। মু'জিযা একজন নবী হইতে আর কারামাত একজন ওলী হইতে প্রকাশ পায়। এই দুইটিই শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের উর্ধ্বে। দুইটিরই কারণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

(এক) আল্লাহ পাকের অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের মত মু'জিযাও একটি কর্ম যাহা সাধারণ নিয়ম নীতির উর্ধ্বে। তিনি তাঁহার ইচ্ছার অধীন মু'জিযাকে কার্যকর করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যাদু বা ইন্দ্রজাল এমনই একটি বিষয় যাহার জন্য যথারীতি শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যে কেহ এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবে তাহার দ্বারাই বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক কার্যাদি প্রকাশিত হইবে। অথচ মু'জিযা শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে কোন শিক্ষাসার বা পাঠ্যসূচি, কোন নীতিমালা রচিত হয় নাই। পক্ষান্তরে ইন্দ্রজাল বা সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষার জন্য বই-পুস্তক রচিত হইয়াছে, যাহার অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকদের দ্বারা রচিত। আজ যদি প্রতিদিন কেহ হযরত ঈসার কথা 'আল্লাহ্র হুকুমে উঠিয়া দাঁড়াও' 'সহস্রবারও মুখে আওড়ায় তবুও কোন মৃত উঠিয়া দাঁড়াইবে না। হযরত মূসার লাঠি দ্বারা মাটিতে লক্ষবার আঘাত করিলে অথবা মাটিতে নিক্ষেপ করিলেও কোনরূপ মু'জিযাই প্রকাশ পাইবে না, না সাপে পরিণত হইবে, না পানির ঝরণা প্রবাহিত হইবে। কারণ শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের দ্বারা মু'জিযাকে আয়ত্ত করা যায় না।

মু'জিযা প্রদর্শনকারী নবী মু'জিযা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে উহার রূপ-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারেন না। পক্ষান্তরে যাদুকর তাহার যাদুর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পুরাপুরি অবগত থাকে। মু'জিযার জন্য কোন সময়ও নির্ধারিত থাকে না। পক্ষান্তরে যাদু নির্দিষ্ট স্থান ও কালের মুখাপেক্ষী। হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ফিরআওনের যাদুকরগণ রশির উপর মন্ত্র পাঠ করার পূর্বেই জানিত যে, রশিতে মন্ত্র পড়িয়া ছাড়িয়া দিলে উহা সাপে পরিণত হইবে। এই কারণেই যাদুর প্রতিক্রিয়াতে সর্প দর্শনের পরেও তাহাদের মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই, বরং তাহাদের যাদুর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনে দর্শকদের নিকট হইতে তাহারা বাহবা লুটিতেছিল, আনন্দে বিভোর ছিল।

অপরদিকে হযরত মূসা (আ)-এর উপর লাঠি নিক্ষেপ করার আদেশ হইলে তিনি লাঠি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিণত হইয়াছিল একটি বিরাট অজগর সাপে, যাহা দেখিয়া হযরত মূসা (আ) ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর প্রত্যাদেশ হইল, 'হে মূসা-উহা ধারণ কর, ভীত হইও না। আমি উহাকে পূর্বাকৃতিতে পরিবর্তিত করিব'। তাঁহার ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ একটিই ছিল যে, তিনি পূর্ব হইতে জানিতেন না যে, লাঠি ছড়িয়া দিলে উহার প্রতিক্রিয়া কি হইবে। সুতরাং মু'জিযার রূপ প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকই সর্বজ্ঞ।

যাদু বিদ্যায় শয়তান অংশগ্রহণ করে। এই কারণেই একজন অভিজ্ঞ যাদুকর অশ্লীলতার শিরোমনী সর্বশ্রেষ্ঠ দাজ্জাল। আর মু'জিযার শিরোমনী খতমে নবূওয়াত হযরত মুহাম্মাদ (স)। সুতরাং এই দুইটি কল্যাণ ও অকল্যাণ, আলো ও আঁধারকে এই নশ্বর জগতে জড়াজড়ি করিয়া রাখা একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা।

মু'জিযা ও ইসতিদরাজের মধ্যে পার্থক্য

পূর্ববর্তী আলোচনায় মু'জিযার সংজ্ঞা, স্বরূপ ও তাৎপর্য এবং ইসতিদরাজের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই মু'জিযাও ইসতিদরাজ এবং নবী ও যাদুকরের মধ্যে তারতম্য সুস্পষ্ট রূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে। যাদু, সম্মোহন বা ভেল্কিবাজি শুধু হাসি-কৌতুকের সাময়িক প্রহসন মাত্র। পক্ষান্তরে মু'জিযা বা নিদর্শন হইল বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সংস্কার ও ধ্বংস, নির্মাণ ও বিনষ্ট, উন্নতি ও অবনতির উপায় উপাদান। যাদুকরের উদ্দেশ্য থাকে, যাদুর প্রহসন দ্বারা কোন অসাধারণ ঘটনাকে শুধু বিস্ময়কর পদ্ধতিতে প্রতিহত করা, যাহাতে সে কিছুক্ষণের জন্য দর্শকমণ্ডলীকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া দিতে পারে। পক্ষান্তরে একজন নবীর উদ্দেশ্য থাকে সেই বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে বিশ্বজোড়া সংস্কার সাধন, জাতিকে চিরসত্যের পথে আহ্বান, গোত্রসমূহকে কৃষ্টি ও ঐতিহ্য ঐশ্বর্যশালী হওয়ার শিক্ষাদান ও আল্লাহ্র দীনকে সুদৃঢ় করা। নবী-রাসূলগণ হইলেন সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, পূত-পবিত্রকারী, উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা ও বিশ্ববাসীর সাক্ষ্যদাতা। আর যাদুকর এই সকল গুণের দিক হইতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত।

পবিত্র কুরআনে যাদুমন্ত্র সম্পর্কে যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় আল-কুরআন যাদু-মন্ত্রের অস্তিত্ব বা প্রতিক্রিয়াকে স্বীকার করে, কিন্তু তাহা অনুমোদন বা সমর্থন করে না। একটি ধাঁধা বা সম্মোহন ব্যতীত উহার কোন গুরুত্বই দেয় না। লক্ষ্য করা যায়, হারূত-মারূত ঘটনায় যাদুর শক্তি ও ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُوَ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَيَنْفَعُهُمْ .

"তাহারা উভয়ের (হারূত-মারূত) নিকট স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত, অথচ আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তাহারা কাহারও কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারিত না। তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদের ক্ষতিসাধন করিত, কোন উপকারে আসিত না"

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ·

"উহাদের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মূসা (আ)-এর মনে হইল তাহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি ছোটাছুটি করিতেছে" (২০ ঃ ৬৬)।

হযরত মূসা (আ)-এর সম্মুখে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকররা প্রথমে তাহাদের যাদু প্রদর্শন করিলে এই রকম ঘটনা ঘটিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ হইতে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ হইল ঃ

قُلْنَا لاَ تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى · وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ وَّلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ·

"আমি বলিলাম, ভয় করিও না, তুমিই প্রবল, তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর। উহারা হা করিয়া তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। উহা যাহা করিয়াছে তাহা-তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হইবে না" (২০ ঃ ৬৮-৬৯)।

আল্লাহ তা'আলা যাদুকর ও নবীর মধ্যে যে পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন তাহা হইল, নবী কৃতকার্য হন আর যাদুকর হয় অকৃতকার্য। নবীর কার্যকলাপ চেষ্টা-সাধনা ও মু'জিযার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে সফলকাম ও কল্যাণধর্মী হওয়া। অপরপক্ষে যাদুকরের উদ্দেশ্য হইল- ধোঁকাবাজি, প্রবঞ্চনা ও অনিষ্ট সাধন করা। অপর একটি আয়াতে এই ব্যাখ্যারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। মিসরীয় যাদুকরদিগকে লক্ষ্য করিয়া হযরত মূসা (আ) বলিলেন ঃ

مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ·

"তোমরা যাহা আনিয়াছ তাহা যাদু, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকে অসার করিয়া দিবেন। আল্লাহ নিশ্চয় অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না" (১০ ঃ ৮১)।

যাদু ও তন্ত্রমন্ত্র একটি সাময়িক ক্রীড়া-কৌতুক। আর মু'জিযার প্রভাব, ক্রিয়াশীলতা সার্বজনীন, সর্বকালীন। এই জগতে উহার ফলাফল অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা অবলোকন করিয়া ফিরআওন যখন বলিল, ইহাতো সব যাদুমন্ত্রের লীলাখেলা। জবাবে হযরত মূসা (আ) বলিলেন ঃ

اَسِحْرٌ هٰذَا وَلاَ يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ·

"ইহা কি যাদু ? যাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না" (১০ ঃ ৭৭)।

পৌত্তলিক অবিশ্বাসীরা মহানবী (স) সম্পর্কে বলাবলি করিত, এই লোকটি শয়তানী শক্তির সাহায্যে এইসব বাণী পেশ করিতেছে তাঁহার বাণীর উৎস হইল শয়তানী শিক্ষা। উহার জবাবে আল্লাহ পাক তাহাদেরকে জানাইয়া দিলেন, মহানবী (স)-এর বাণীর উৎসমূল ভাল না মন্দ, শয়তানী শক্তির বহিঃপ্রকাশ, না ফেরেশতা শক্তির ফল—এই তত্ত্ব ও তথ্যটি অনুধাবন করা খুবই সহজ। স্বয়ং আহ্বানকারীর জীবন, তাঁহার চরিত্র ও কার্যকলাপ উহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। হযরত

ঈসা (আ)-এর ভাষায় বৃক্ষের পরিচয় ফল দ্বারাই। সুতরাং শয়তানী ও আসমানী উভয় শক্তির মধ্যে তারতম্য নিরূপণ করা মোটেই কষ্টসাধ্য নহে। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন শয়তান কাহার নিকট গমন করে ঃ

تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۔ يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَ اَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ۔

"উহারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। উহারা কান পাতিয়া থাকে এবং উহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী" (২৬ ঃ ২২২-২২৩)।

আসল ও নকল নবীর মধ্যে তারতম্য নিরূপণের নিমিত্ত তাহার চারিত্রিক জীবনই যথেষ্ট। এতদ্ব্যতীত মিথ্যাবাদী ও অপবাদ রটনাকারী ও অসৎ চলাফেরা কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরন্তন হয় না। যেমন আল-কুরআন ঘোষণা দেয় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ ۔ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔

"নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না। উহাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্যই এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি" (১৬ ঃ ১১৬-১১৭); (আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ৩খ., পৃ. ১৭৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। ১৯৯৭ খৃ.; (২) আয-যাবীদী, তাজুল 'আরূস, ১৫খ., পৃ. ২১১, দারু ইহ্য়াউত তুরাছুল আরাবী, বৈরূত, ১৯৭৫ খৃ.; (৩) ইবন ইউসুফ সালেহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরূত, ১৯৯৩ খৃ.; (৪) শারীফ আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, মাকতাবাতু ফাকীহিল উম্মাহ, দেওবন্দ, ভারত, তা.বি.; (৫) আল-মু'জামুল ওয়াসীত, মাকতাবা কুতুবখানা হুসায়নিয়া, দেওবন্দ ১৯৯৬ খৃ.; (৬) ইমাম ইবন তায়মিয়া, আল-জওয়াবুস-সাহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ; (৭) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা; (৮) আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, উর্দূ বাজার, করাচী, পাকিস্তান ১৯৮৪ খৃ.; (৯) হাফিজ ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.; (১০) দাতা গনজে বখশ, কাশফুল মাহজূব, মাকতাবা থানবী, দেওবন্দ, তা.বি.; (১১) মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ, জাওয়াহিরুল ফারাইদ, মাকতাবা-ই থানবী, দেওবন্দ, তা.বি., (১২) সা'দুদ্দীন মাস'উদ, তাফতাযানী, শরহে আকাইদে নাসাফী, ইমদাদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, তা.বি.; (১৩) শাব্বীর আহমাদ, মাআরিবুত তুল'বা, ফৈজিয়া কুতুবখানা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, তা.বি.; (১৪) ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, শরাহ, আল্লামা নাবাবী, মাতবাউ আসাহহুল মাতাবি, দেওবন্দ, ১৯৮৩ খৃ.; (১৫) তাকী উছমানী, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, মাকতাবা দারুল উলূম, করাচী।

মোহাম্মদ তালেব আলী

শ্রেষ্ঠ মু'জিযা আল-কুরআন

আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা মানবজাতির নিকট তাঁহার পরিচয় তুলিয়া ধরিবার জন্য, তাঁহার আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কিত বাণী পৌঁছাইবার জন্য এবং তাঁহার পুরস্কারের (বেহেশত) ও তাঁহার শাস্তির (দোযখ) সংবাদ তাহাদেরকে অবহিত করিবার জন্য যাহাতে মানুষ এই নশ্বর পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্র মনোনীত জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করিতে পারে এবং অনন্ত অসীম পরকালের সুখ-শান্তি অর্জন করিয়া ধন্য হইতে পারে। এই সমস্ত নবী-রাসূলকে মানুষ যেন সহজেই চিনিয়া লইতে পারে এবং তাহাদের নবূওয়াতের দাবির সত্যতার প্রমাণ খুব সহজেই বুঝিয়া লইতে পারে, এই লক্ষ্যে আল্লাহ তাঁহাদেরকে মানবীয় শক্তি, সামর্থ্য ও আকল-বুদ্ধি-বিবেকের উর্ধ্বে এমন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, যাহা নবী-রাসূলগণ ছাড়া মানব-দানব সকলের পক্ষে যে কোন প্রকারে অর্জন করা অসম্ভব। ইসলামের পরিভাষায়, নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত ও সংঘটিত এই জাতীয় কর্মকাণ্ড ও বিষয়কেই আয়াত (বা মু'জিযা) বলা হয়'।

আল্লাহ তা'আলা এক একজন নবীর মাধ্যমে এক এক প্রকারের মু'জিযা প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারও হাতে লাঠি সর্পে পরিণত হইয়াছে, কাহারও হাতে লোহা মোমের মত নরম হইয়া গিয়াছে, কাহারও নির্দেশে শূন্যে সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে এবং বায়ু তাহা দূর দেশ পর্যন্ত বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। কোন কোন নবীর জন্য পাথর বিদীর্ণ হইয়া ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হইয়াছে। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা শুধু নবী-রাসূলগণকে কোন না কোন মু'জিযা প্রদান করিয়াছেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই, বরং তাঁহার নবূওয়াতের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা চির শাশ্বত নীতি অনুসারে একাধিক মু'জিযা দান করিয়াছেন। যেমন তাঁহার অঙ্গুলীর ইশারায় আকাশের চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, বনের পশু তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছে, বেদুঈনের গুইসাপ তাঁহার নবূওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাঁহার কুলি করিয়া ফেলিয়া দেওয়া পানির বরকতে পরিত্যক্ত কূপ প্রবাহিত হইয়া পানি উপচাইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। এমনি জাতীয় আরও কত বিস্ময়কর এবং অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছে তাঁহার মুবারক হাতের সুস্পর্শে। তবে এই পর্যন্ত যুগ-যুগান্তরে নবী-রাসূলগণ যত মু'জিযা প্রাপ্ত হইয়াছেন উহার মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা হইল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থ 'আল- কুরআনুল কারীম। ইহা সর্বশেষ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

আল-কুরআন ও অন্যান্য মু'জিযার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য এই যে, আল-কুরআন ব্যতীত অন্যান্য সকল মু'জিযাই ছিল ক্ষণস্থায়ী, নবী-রাসূলগণের জীবদ্দশায়ই বিলয়প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে

আল-কুরআনের মু'জিযা হইল গতিশীল, চিরস্থায়ী, যাহা মহানবী (স)-এর জীবনাবসানের পরও উহার যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যসহ অবিনাশী রহিয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই অবস্থায় সুরক্ষিত থাকিবে। এই হিসাবে কুরআনুল কারীমকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্রেষ্ঠতম 'চিরন্তন মু'জিযা' বলা হইয়া থাকে।

বর্তমানেও একজন সাধারণ মুসলিম পৃথিবীর যে কোন জ্ঞানী-মহাজ্ঞানীকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারে যে, আল-কুরআনের একটি ক্ষুদ্রতম আয়াতের সমতুল্য কোন আয়াত ইতোপূর্বেও কেহ রচনা করিয়া দেখাইতে পারে নাই, এখনও কেহ তাহা করিতে সক্ষম হইতেছে না এবং ভবিষ্যতেও কাহারও পক্ষে ইহা সম্ভব হইবে না। কিন্তু চৌদ্দ শত বৎসরের এই দীর্ঘ সময়ে আল-কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস কেহ দেখাইতে পারে নাই। আমরা সুনিশ্চিত যে, ভবিষ্যতেও কেহ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সক্ষম হইবে না।

কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার পর কাফির ও মুশরিকরা যখন ইহাকে আল্লাহ তা'আলার কালাম হওয়ার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিল এবং আল-কুরআন সম্পর্কে সন্দেহমূলক নানা ধরনের উক্তি করিতে আরম্ভ করিল, তখন স্বয়ং আল-কুরআন সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করিল—

(এক) আরবের জগদবিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকগণ বলিল, কুরআন মুহাম্মাদের রচিত গ্রন্থ। মুহাম্মাদ একজন কবি।

بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۔

"বরং তাহারা ইহাও বলিল যে, এই সমস্ত (কুরআনের বাণীসমূহ) অলীক কল্পনা, হয় সে উদ্ভাবন করিয়াছে, না হয় সে একজন কবি" (২১ ঃ ৫)।

وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۔

"তাহারা বলিত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহগণকে বর্জন করিব" (৩৭ ঃ ৩৬)?

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ۔

"উহারা কি বলিতে চাহে যে, (মুহাম্মাদ) একজন কবি? আমরা তাহার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি" (৫২ ঃ ৩০)।

আরবের কাফির কবি ও সাহিত্যিকদের এই মিথ্যা দাবি প্রত্যাখ্যান করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۔

"আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয়ও নহে। ইহা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন" (৩৬ ঃ ৬৯)।

(দুই) আরবের কাফির ও মুশরিকরা দাবি করিল যে, মুহাম্মাদ (স)-এর উপর নাযিলকৃত কুরআন মহান আল্লাহ প্রদত্ত নহে। ইহা বরং তাঁহার বানানো ও তৈরীকৃত কিছু মন্ত্র ও তত্ত্বকথা মাত্র। বস্তুত মুহাম্মাদ (স) একজন গণক বা যাদুকর।

فَقَالَ اِنْ هٰذَا الاَّ سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ۔ اِنْ هٰذَا الاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ۔

"কাফিররা ঘোষণা করিল, ইহা (কুরআন)-তো লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহা তো মানুষেরই কথা" (৭৪ ঃ ২৪-২৫)।

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۔

"যখন তাহাদের নিকট সত্য আসিল, উহারা বলিল, ইহা তো যাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যান করি" (৪৩ ঃ ৩০)।

কুরআন তাহাদের এই অপবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া ঘোষণা করিয়াছে ঃ

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّاتُؤْمِنُوْنَ ۔ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۔ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

"ইহা (কুরআন) কোন কবির রচন নহে; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। ইহা কোন গণকেরও কথা নহে, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে নাযিলকৃত" (৬৯ ঃ ৪১)।

فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلاَ مَجْنُوْنٍ ۔

"অতএব, আপনি মানুষকে এই কুরআন দ্বারা উপদেশ দান করিতে থাকুন। আপনি মহান প্রতিপালকের অনুগ্রহে গণকও নহেন, উম্মাদও নহেন" (৫২ ঃ ২৯)।

(তিন) আরবের কবি, সাহিত্যিক ও ভাষাপণ্ডিতদের সকল দাবি প্রত্যাখ্যাত হইবার পর তাহারা দাবি করিল যে, মুহাম্মাদ মূলত অপর কাহারও নিকট হইতে ইহা শিখিয়া লয়, তৎপর আমাদের নিকট উহা আবৃত্তি করে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا الاَّ اِفْكُ نِ افْتَرٰهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۔ فَقَدْ جَاءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۔ وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ۔

"কাফিররা বলে, ইহা (কুরআন) মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নহে, সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। এইরূপে উহারা অবশ্যই যুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হইয়াছে। উহারা বলে, এইগুলি তো পূর্ববর্তীদের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে। এইগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়" (২৫ ঃ ৪-৫)।

মোটকথা, কাফির ও মুশরিকদের কুরআন সম্পর্কে এইরূপ উপর্যুপরি মিথ্যা অপবাদ ও প্রোপাগাণ্ডার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ঘোষণা করিলেন, কুরআন আমার পক্ষ হইতে নাযিলকৃত, ইহা মানব রচিত নহে। কি মানব, কি দানব, কাহারও পক্ষে কুরআনের

অনুরূপ কিছু আনয়ন করা কাস্মিনকালেও সম্ভব নহে। এই কথা তোমাদেরকে স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি ইহা স্বীকার করিতে না চাও, তাহা হইলে আমার পক্ষ হইতে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর। তোমরা মানব-দানব সকলে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিয়া হইলেও কুরআনের অনুরূপ একটি কুরআন আনয়ন কর।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ٠

"আপনি বলিয়া দিন, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন্ন সমবেত হয় এবং তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবে না" (১৭ ঃ ৮৮)।

কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। ইহা ছিল আরবদের শত শত বৎসরের পুরাতন রসম-রেওয়াজ ও ঐতিহ্যের উপর এক চরম আঘাত, তাহাদের প্রাচীন আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিঘাত। ইহা ছিল তাহাদের ভাষা-সাহিত্য ও নৈপুণ্য কলার বিপক্ষে এক যবরদস্ত চ্যালেঞ্জ। আরব কবি-সাহিত্যিকগণ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিবে, ইহাই ছিল স্বাভাবিক সত্য ও বাস্তবতা। কারণ, তাহারা তো ছিল ইসলাম ও ইসলামের নবীকে পরাস্ত করিবার জন্য উদ্যত। ইহার জন্য ধন-সম্পদ, ইয্যত, আবরূ, এমনকি জীবন উৎসর্গ করিবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় তাহারা উদ্বুদ্ধ ছিল। এই পথে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার জন্য তাহারা সচেষ্ট ছিল। সুতরাং তাহাদের পক্ষে এই চ্যালেঞ্জ-এর জবাব না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই কথাই ঐতিহাসিক সত্য যে, আরব কবি-সাহিত্যিক ও ভাষা পণ্ডিতগণ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস দেখাইতে পারে নাই।

আরবদের চরম অক্ষমতা আর অসহায়ত্ব দেখিয়া কুরআন তাহার চ্যালেঞ্জকে শিথিল করিয়া দিল। কুরআন পুনরায় ঘোষণা করিল, তোমরা যদি গোটা কুরআনের অনুরূপ একটি পূর্ণ কুরআন রচনা করিতে না পার, তবে কুরআনের দশটি সূরার অনুরূপ দশটি সূরা আনয়ন করিয়া দেখাও।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٠ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ٠

"তাহারা কি বলে, মুহাম্মাদ ইহা নিজে রচনা করিয়াছে? বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমরা উহার অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাহাকে পার এই কাজে সাহায্যের জন্য ডাকিয়া লও। যদি তাহারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে জানিয়া রাখ, ইহা আল্লাহর-ই ইলম হইতে নাযিলকৃত এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হইবে না" (১১ ঃ ১৩-১৪)।

কুরআনের এই চ্যালেঞ্জের পরও উহা গ্রহণে কেহ আগাইয়া আসে নাই। এবার কুরআন তাহার পূর্ব চ্যালেঞ্জকে আরও শিথিল করিয়া দিল এবং কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ একটি মাত্র সূরা আনয়নের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আহ্বান জানাইল ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاۤءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ .

"আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা নাযিল করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা উহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনও করিতে পারিবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর হইবে যাহার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যাহা প্রস্তুত রহিয়াছে" (২ ঃ ২৩-২৪)।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ .

"এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও রচনা নহে। পক্ষান্তরে ইহার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে, ইহা তাহার সমর্থন এবং ইহা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে। তাহারা কি বলে, মুহাম্মাদ ইহা রচনা করিয়াছে? বল, তবে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাহাকে পার আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। পরন্তু উহারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত্ব করে নাই তাহা অস্বীকার করে এবং এখনও ইহার পরিণাম উহাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই। এইভাবে উহাদের পূর্ববর্তিগণও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। সুতরাং দেখ, জালিমদের পরিণাম কি হইয়াছিল" (১০ ঃ ৩৭-৩৯)!

মোটকথা, পৃথিবীর সর্বাধিক আত্মচেতনাবোধসম্পন্ন আরবজাতি কুরআনের এই উপর্যুপরি চ্যালেঞ্জের সামনে পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করিল। তাহারা কুরআনের অনুরূপ একটি পংক্তিও পেশ করিতে সক্ষম হইল না। অথচ যদি তাহারা ইহা পারিত, তবে অবশ্যই ইহা করিত। কারণ তাহারা ছিল কুরআনের ঘোরতর দুশমন। কুরআনকে মিথ্যা ও অসার প্রতিপন্ন করাই ছিল তাহাদের প্রধানতম টার্গেট। কুরআনের ঘোষণা স্থায়ী। তাহারা সূরা কাওছার-এর মত ক্ষুদ্রতম একটি সূরা রচনা করিয়া দিতে পারিলেই তো তাহারা এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় পৌছিতে

পারিত। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, তাহারা ইহা করিতে সক্ষম হয় নাই, বরং তাহারা কুরআন ও কুরআনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে বিপদসংকুল যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ অবলম্বন করিয়াছে। যদি কুরআন মানব রচিতই হইত, তবে তাহারা অনুরূপ একটি সূরা রচনা করিয়া অতি সহজে বিজয় লাভ করিতে পারিত।

উপরে উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে পাঠকের মনে এই প্রশ্নটি উদিত হওয়া অতি স্বাভাবিক যে, কিসের ভিত্তিতে কুরআনুল কারীমকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মু'জিযা বলা হয় এবং কুরআনের কী সেই বৈশিষ্ট্য যাহার অনুকরণ করা বিশ্ববাসীর পক্ষে সম্ভব নহে? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। তথাপি আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিষয় দুইটির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করিব (ইনশাআল্লাহ)।

আল-কুরআনুল কারীম শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা, এই বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই ইসলামী 'উলূম ও ফুনূন বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বিশদ গবেষণা করিয়াছেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব রুচি ও বর্ণনা ভঙ্গিতে ইহার বিবরণ দিয়াছেন। আমরা এখানে তাহার প্রয়োজনীয় সার-সংক্ষেপ আলোচনা পেশ করিব এবং নিবন্ধের শেষে সেই সকল মূল্যবান গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিব।

মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সর্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কোন পরিবেশে এবং কাহার উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল? আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সেই যুগের সামাজিক পরিবেশে কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল যাহার দ্বারা এমন পূর্ণাঙ্গ একটি কিতাব রচনা করা যাইতে পারে, যাহার মধ্যে সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সর্বাধিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয় এবং উপায়-উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হইতে পারে? সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সর্বকালীন ও সার্বজনীন জীবনপথের দিকনির্দেশনা নির্ভুলভাবে বিবৃত থাকিতে পারে? মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয়বিধ জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের যাবতীয় হিদায়াত সংগৃহীত থাকিতে পারে? ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক, এক কথায় মানব সমাজের তৃণমূল হইতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য আইন-কানুন বিদ্যমান থাকিতে পারে?

এই সর্বাধিক জ্ঞানের আধার মহা বিস্ময়কর আল-কুরআনুল কারীম যেই ভূখণ্ডে এবং যেই মহান ব্যক্তির উপর নাযিল হইয়াছে, উহার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা সন্ধান করিতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটিবে এমন একটি উষর শুষ্ক মরুময় এলাকার সহিত, যাহা ছিল 'বাতহা' বা 'মক্কা' নামে পরিচিত। সেই এলাকার ভূমি ছিল কৃষির অনুপযোগী। সেখানে ছিল না কোন কারিগরি শিল্প, আবহাওয়াও এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না যাহা কোন বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করিতে পারে। পথ-ঘাটও এমন ছিল না যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেই ভূখণ্ড ছিল গোটা দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্নপ্রায় একটি মরুময় উপদ্বীপ। সেখানে তৃণলতাহীন প্রস্তরময় পাহাড় পর্বত ও বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়িত না। জনবসতিও ছিল যৎসামান্য, অপ্রতুল। ঐ ভূখণ্ডে এমন কোন উল্লেখযোগ্য শহরও ছিল না যেখানে মানুষ খুব সুখে জীবন যাপন করিতে পারে। গ্রাম আর পাড়াপল্লী তো দূরের কথা, নামমাত্র যেই কয়টি জনবসতি ছিল

সেইগুলিতেও লেখা-পড়ার কোন চর্চা ছিল না, শুধু ঐতিহ্যগতভাবে প্রাপ্ত এক মহা নিয়ামত—ভাষা-সাহিত্য সম্পদ ছাড়া। আল্লাহ তা'আলা এই মরু আরববাসীদিগকে এমন একটি সুসমৃদ্ধ ভাষা সম্পদ দান করিয়াছিলেন যাহার গদ্য ও বাকরীতি ছিল অনন্য। সেই ভাষার মাধুর্য অপূর্ব সাহিত্য রসে সিক্ত ছিল। অতুলনীয় রসময় কাব্য-সম্ভার বারীধারার মত আবৃত্তি হইত সেই দেশের পথে-প্রান্তরে। এই সম্পদ ছিল একটি বিস্ময়, আজ পর্যন্তও যাহার আস্বাদন অব্যাহত আছে।

ভাষা-সাহিত্যের এই পরম উৎকর্ষিত সম্পদ ছিল তাহাদের স্বভাবজাত এক উত্তরাধিকার, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই ভাষাজ্ঞান অর্জনের রীতি ছিল না। এমনকি সেইখানের অধিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের কোন আগ্রহও পরিলক্ষিত হইত না। যাহারা শহরে বাস করিত তাহাদের জীবিকার প্রধান মাধ্যম ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য।

এই ছিল সেই ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক অবস্থা যেইখানে এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল হইয়াছিল। মহানবী (স)-এর উপর এই মহাগ্রন্থ নাযিল হইয়াছিল, তাহার অবস্থা বর্ণনা এই যে, তাঁহার লেখাপড়া শিখিবার কোন সুযোগই ছিল না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উম্মী, অক্ষর-জ্ঞানহীন। এই কারণে কুরআন করীমে তদানীন্তন আরবজাতিকে 'উম্মী' বা 'নিরক্ষর' জাতি বলা হইয়াছে।

هُوَالَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাহাদের একজনকে পাঠাইয়াছেন নবীরূপে যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাহার আয়াত, তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতোপূর্বে-তো ইহারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে" (৬২ ঃ ২)।

মোটকথা, যেহেতু একটি অপার মু'জিযা প্রদান করা মহান আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল, এই কারণে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সেই নবীকে এমনভাবে 'উম্মী' রাখা হয় যে, তিনি নিজের নামটি পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না।

তদানীন্তন আরব সমাজে কাব্যচর্চা ছিল একটি বিশেষ কামনার বস্তু এবং জনপ্রিয় বিষয়। স্থানে স্থানে কবিদের মজলিস বসিত, প্রতিযোগিতা হইত। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁহার অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য সেই নবীকে তাঁহার শৈশব হইতে নবূওয়াত প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত এমন কাব্য বা এক ছত্র কবিতা রচনার প্রতিও তিনি কোন দিন আগ্রহী হন নাই।

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ .

"আমি রাসূলকে কাব্য রচনা শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয় নহে" (৩৬ ঃ ৬৯)।

তবে 'উম্মী' হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (স) ছিলেন উন্নত চরিত্র-মাধুর্যে অনন্য, তুলনাহীন। তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশটি বৎসর তিনি মক্কায় আপন গোত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন।

সিরিয়ায় দুইটি বাণিজ্যিক সফরে গিয়াছিলেন, উহাতেও তাঁহার কোন শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ ঘটে নাই। তিনি মক্কার জীবনে এমনভাবে চল্লিশটি বৎসর কাটাইয়া দিলেন যে, কোন পুস্তক কখনও স্পর্শ করেন নাই। এমন একজন উম্মী ব্যক্তির মুখে চল্লিশ বৎসর বয়সে এমন বাণী নিঃসৃত হইতে লাগিল যাহা শব্দ ও মর্মের দিক বিচারে গোটা মানবজাতিকে স্তম্ভিত করিল। যাহার রচনাশৈলী ও সাহিত্যরস বিমোহিত করিয়া দিল স্বভাবজাত ভাষা-পণ্ডিত আরবজাতিকে। ইহাই হইল মহা বিস্ময়কর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম।

কুরআন মজীদ মু'জিযা হওয়ার কারণসমূহ

এখন আমরা কুরআনের ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করিব যাহা বিস্ময়কর মু'জিযা, মানব-দানব যাহার নমুনা পেশ করিতে অপারগ।

প্রথম কারণ ঃ প্রথম কারণ হইল, একজন উম্মী নবীর মুখে এইরূপ তাৎপর্য ও হিকমতপূর্ণ, আরবী ভাষার সর্বোচ্চ সাহিত্যমানসম্পন্ন 'কালাম' নিঃসৃত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীর নিরক্ষরতার পরিচয় প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ اِذاً لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ٠

"তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিবে" (২৯ ঃ ৪৮)।

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) যদি উম্মী না হইতেন তবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সন্দেহ করিতে পারিত, হয়ত তিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ দেখিয়া বা উহা নকল করিয়া সুযোগ-সুবিধামত কুরআন রচনা করিয়া লইয়াছেন, তৎপর উহা মুখস্ত করিয়া লোকদেরকে শুনাইতেছেন। অবিশ্বাসীদের এইরূপ সন্দেহ-সংশয় এবং উহার উৎসের মূলোৎপাটন করিয়া আল-কুরআন ঘোষণা করিয়াছে ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَايَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاۤئِ نَفْسِيْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ٠ قُلْ لَّوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ اَدْرٰكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ٠ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهِ اِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ٠

"যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত তাহাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহারা বলে, ইহা ছাড়া অন্য এক কুরআন আন অথবা ইহাকে বদলাও। আপনি বলুন, নিজ হইতে ইহা বদলান আমার কাজ নহে। আমার প্রতি যাহা ওহী হয়,

আমি কেবল তাহাই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করিলে অবশ্যই মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করি। আপনি বলুন, আল্লাহর সেইরূপ ইচ্ছা হইলে আমিও তোমাদিগের নিকট ইহা তেলাওয়াত করিতাম না এবং তিনিও তোমাদিগকে এই বিষয়ে অবহিত করিতেন এবং আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদিগের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি। তবুও কি তোমরা বুঝিতে পার না? যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করে, তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? নিশ্চয় অপরাধীরা সফলকাম হয় না" (১০ ঃ ১৫-১৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন একজন উম্মী, তাঁহার এই বিষয়টি তাঁহার জাতির নিকট অজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাঁহার নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশটি বৎসর তাঁহার জাতির সহিতই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব এমন একজন উম্মী ব্যক্তি হইতে উচ্চতর পর্যায়ের বাগ্মিতা ও সাহিত্যমানসম্পন্ন, সমধিক তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ, অসাধারণ জ্ঞানের আধার মহাগ্রন্থ আল-কুরআন প্রকাশ পাওয়া 'মুজিযা' নহে তো আর কি? তাই তো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘোর বিরোধী নাদ্র ইবন হারিছের মুখে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। নাদ্র ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরম বিরোধী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুরায়শদের মধ্যে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। একদিন নাদর কুরায়শদিগকে খেতাব করিয়া বলিল, হে কুরায়শগণ! মুহাম্মদ তোমাদেরকে এমন কি সমস্যায় ফেলিয়াছে, যাহার কোন সমাধান খুঁজিয়া পাইতেছ না? সে তো তোমাদের চোখের সামনেই বড় হইল। তোমরা ভাল-ভাবেই জান, মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী, সবচেয়ে বেশি আমানতদার এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার চুল সাদা হইতে চলিয়াছে এবং সে ঐ দাবি উথাপন করিয়াছে যাহা তোমরা শুনিয়াছ, তখন তোমরা বলিতে লাগিলে, এই ব্যক্তি যাদুকর, ইনি কবি, ইনি উম্মাদ। হে জাতি! আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমি মুহাম্মাদের কথা শুনিয়াছি, মুহাম্মাদ যাদুকর নহেন, সে কবিও নহেন, সে উম্মাদও নহেন। আমার অশংকা হইতেছে, নূতন কোন বিপদ তোমাদেরকে গ্রাস করিয়া না বসে (ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৯৭)।

দ্বিতীয় কারণ ঃ কুরআন কারীম সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হইল, কুরআনের উচ্চ সাহিত্যমান এবং উহার মুকাবিলায় গোটা মানবজাতির অক্ষমতা। কুরআনের প্রথম সম্বোধন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব জাতির প্রতি। আরবদের অন্য কোন একাডেমিক জ্ঞান না থাকিলেও ভাষা শৈলীর উপর তাহাদের ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। এই হিসাবে আরবজাতি গোটা মানব বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। কুরআন তাহাদেরকে আহ্বান করিয়া বলিল, কুরআন মহান আল্লাহর কালাম, মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত নহে। এই বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহের মধ্যে থাক, তবে উহার অনুরূপ অন্তত একটি সূরা তোমরা রচনা করিয়া দেখাও। যদি তোমাদের পক্ষে এককভাবে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তবে তোমরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা কর। এমনকি দানব জনগোষ্ঠীকেও এই কাজে সহযোগিতার জন্য ডাকিয়া লও এবং যেভাবেই হউক এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া কুরআনের ক্ষুদ্রতর একটি আয়াত সমতুল্য কালাম রচনা করিয়া পেশ কর।

আরব জনগোষ্ঠী ছিল ইসলাম ও কুরআনকে উৎখাত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে উজ্জীবিত। ইহার জন্য তাহারা যাহা কিছু সম্ভাব্য তাহাই করিয়াছে। যুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন, দেশান্তরিতকরণ, এমনকি অসংখ্য যুদ্ধ ও লড়াই-এ পর্যন্ত তাহারা প্রবৃত্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করাই ছিল তাহাদের জন্য অতি সহজতর উপায়। কিন্তু তাহাদের কেহই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস দেখাইতে সক্ষম হয় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ ইহাই যে, কুরআনের উচ্চতর ভাষাশৈলী, বাগ্মিতা, প্রাঞ্জলতা, ভাবের প্রাণময়তা এবং সহজ ও সাবলীল উপস্থাপনা নিরপেক্ষ স্বচ্ছ অন্তর লইয়া যে কোন পাঠকারী ব্যক্তি বিমোহিত না হইয়া পারে না। রুচিশীল পাঠক মাত্রই কুরআনের এই অনুপম সাহিত্যরসের অলৌকিকত্বে প্রীত ও বিমুগ্ধ হইতে বাধ্য। কুরআনের ভাষা সম্পদ, শব্দ-সম্ভার, শিক্ষা ও বুদ্ধিগ্রাহ্যতা, এক কথায় যেই দিক দিয়াই বিচার করা হউক না কেন—কুরআন অতুলনীয়, নজীরবিহীন, চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কুরআনের অনুরূপ সাহিত্য বৈশিষ্ট্য না অতীতে কেহ দেখাইতে পারিয়াছে, আর না কস্মিনকালেও কেহ দেখাইতে সক্ষম হইবে।

কুরআন নাযিলকালীন সুনাম খ্যাত, বিশ্বনন্দিত কবি- সাহিত্যিক ও বাগ্মীগণের অভিব্যক্তিসমূহ একটু মনযোগ সহকারে পাঠ করুন। দেখিবেন, কুরআনের প্রতি তাহাদের কিরূপ অকৃত্রিম স্বীকারোক্তি।

ওয়ালীদ ইবন মুগীরা ছিল আরবের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও ভাষাজ্ঞানীদের অন্যতম। ইসলামের ঘোরতর দুশমন আবূ জাহলের ভ্রাতুষ্পুত্র। একদিন সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, মুহাম্মাদ! আমাকে কিছু আয়াত পড়িয়া শুনাও। রাসূলুল্লাহ (স) কয়েকটি আয়াত পাঠ করিলেন। ওয়ালীদ তৃপ্ত হইল না। বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া সে বলিল, মুহাম্মাদ! আবার পড়। রাসূলুল্লাহ (স) আরও কিছু আয়াত পাঠ করিলেন। এইভাবে কয়েকবার পুনঃ পুনঃ পাঠ শুনিবার পর ওয়ালীদ আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিতেছি, ইহার স্বাদ ও প্রাঞ্জলতাই ভিন্ন রকমের। যেই বৃক্ষের এইগুলি ফল, উহার কাণ্ড খুবই মজবুত। নিশ্চয় ইহা কোন মানুষের রচনা নহে।'

"ওয়ালীদ মুহাম্মাদের কালাম শুনিয়া প্রভাবান্বিত হইতেছে"–এই সংবাদ শুনিয়া আবু জাহল দৌড়িয়া আসিল এবং ওয়ালীদকে সতর্ক করিতে লাগিল। আবূ জাহলের হুমকি-ধমকি ও তিরস্কারের প্রতি উত্তরে ওয়ালীদ সেদিন যাহা বলিয়াছিল তাহা খুবই হৃদয়গ্রাহী এবং কুরআনের সত্যতার সাক্ষ্যস্বরূপ। ওয়ালীদ বলিল, আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, কবিতার ছন্দ, পদবিন্যাস, সুর, ভাষার গতি-প্রকৃতি ও উজান-ভাটি ইত্যাদি আমি তোমাদের চাইতে বেশি জানি। পুনরায় আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি, মুহাম্মাদের পঠিত কালামের মধ্যে এই সমস্তের কোনই বালাই নাই। কবিতার সহিত তাঁহার পঠিত কালামের কোনই সামঞ্জস্যতা নাই ('উলূমুল কুরআন, পৃ. ২৫১)।

এই ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার আরও একটি ঘটনা ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূল কারীম (স)-এর মক্কায় অবস্থানকালীন দাওয়াতের প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে একটি প্রক্রিয়া এই ছিল যে, তিনি হজ্জ মৌসুমে আগত আরবের বিভিন্ন তীর্থযাত্রী কাফেলার নিকট যাইয়া

তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। বিষয়টি কুরায়শ কাফিরদেরকে মহা ভাবনায় ফেলিয়া দিল। তাহারা চিন্তা করিল, এইভাবে যদি মুহাম্মাদ তাঁহার ইসলামের প্রচার ও প্রসার করে, তবে অল্প দিনের মধ্যেই গোটা আরবময় ইসলামের আকর্ষণ বাড়িয়া যাইবে এবং মানুষ ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হইয়া যাইবে।

এই দুঃশ্চিন্তা লইয়া তাহারা পরামর্শ করিতে বসিল। ওয়ালীদের সভাপতিত্বে পরামর্শ সভা আরম্ভ হইল। আলোচ্য বিষয়পত্র একটিই ঃ কিভাবে মুহাম্মাদের এই দাওয়াতের সুযোগকে বানচাল করা যায়? এক সর্দার প্রস্তাব করিল, মুহাম্মাদের পশ্চাতে আমরা এই কথা প্রচার করিব যে, 'সাবধান! এই লোক গণক। কাজেই তোমরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিও না'। সভাপতি ওয়ালীদ এই প্রস্তাব নাকচ করিয়া বলিল, "আল্লাহ্‌র কসম! ইহা কিছুতেই সত্য নহে"। আমি নিজ কর্ণে মুহাম্মাদের কালাম শুনিয়াছি। তাহা কখনও গণকের কথা নহে। অপর এক কুরায়শী প্রস্তাব করিল, তাহাকে উন্মাদ বলা হউক। ওয়ালীদ বলিল, লোকেরা বরং তোমাদেরকেই পাগল বলিবে। মুহাম্মাদের মধ্যে পাগলামির কিছুই নাই।

আরেকজন প্রস্তাব করিল, তবে কি আমরা তাহাকে কবি বলিয়া প্রচার করিব? সভাষদ প্রধান ওয়ালীদ বলিল, না, ইহাও সত্য হইবে না। আমি কবিতার ছন্দ ও পদ বিন্যাস, সুর ও ব্যঞ্জনা সব কিছুই জানি। কিন্তু মুহাম্মাদের প্রচারিত কালামে উহার কোনটাই পাই না। মুহাম্মাদের কালামের ছন্দ ও বিন্যাস চমৎকার, এক নূতন ও অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারী।

একে একে সকল প্রস্তাব নাকচ হইয়া গেলে একজন শীর্ষ কুরায়শী সর্দার বলিল, মুহাম্মাদ আসলে একজন যাদুকর। ওয়ালীদ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে একথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, মুহাম্মাদ যাদুকর নহেন। কারণ যাদুর মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক ইহার কিছুই তাঁহার মধ্যে নাই। দীর্ঘ আলোচনার পর ওয়ালীদ সিদ্ধান্ত দিল, হাঁ, মুহাম্মাদকে আর কিইবা বলিবে? এক অর্থে তাহাকে যাদুকর বলিতে পার। কারণ, তাহার যাদুময়ী কালাম পাঠ ভাই-ভাই, পিতা-পুত্র, এমনকি স্বামী-স্ত্রীতে পর্যন্ত বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছে। এইজন্য তাঁহার সাথে চলাফেরা এবং আলাপ-আলোচনা করা উচিত নহে (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন–নাবাবিয়্যা, ১খ. পৃ. ২৭০-২৭১)।

আরও একটি দৃষ্টান্ত, কুরায়শদের শীর্ষ নেতা উৎবা ইব্‌ন রবী'আহ একদিন রাসূল করীম (স)-এর দরবারে হাযির হইয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ! তুমি ইসলাম ধর্ম প্রচার হইতে বিরত হইলে আমরা তোমাকে অমুক অমুক প্রতিদান প্রদান করিব। রাসূল করীম (স) মনযোগ সহকারে উৎবার বক্তব্য শুনিলেন। উৎবা ক্ষান্ত হইলে রাসূল করীম (স) তাহার প্রস্তাবসমূহের কোন প্রতিউত্তর না দিয়া 'সূরাই হা-মীম'-এর কিছু আয়াত পাঠ করিয়া তাহাকে শুনাইয়া দিলেন। বর্ষীয়ান নেতা উৎবা আয়াতগুলি শুনিয়া এতই বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হইল যে, সে বলিতে লাগিল, মুহাম্মাদ! আমাকে কী শুনাইলে! অনুগ্রহ করিয়া আবার শুনাও। রাসূল কারীম (স) আয়াতগুলি পুনরায় পাঠ করিলেন, উৎবা নীরব হইয়া অতি মনোযোগ সহকারে পুনঃপাঠ শুনিল। তৎপর সে তাহার সহকর্মীদিগের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল। সহকর্মিগণ বলিল, উৎবা! খবর কি? কী ফলাফল লইয়া আসিয়াছ? উৎবা গম্ভীর স্বরে বলিল, আজ আমি মুহাম্মাদের মুখে যেই কালাম

শুনিয়াছি, জীবনে কখনও ইহা শুনি নাই। আল্লাহর কসম! এইগুলি না কবিতা, না গণকের গণনা, আর না যাদুর মন্ত্র। উৎবা আরও বলিল, 'আমার মতে তোমরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা পরিত্যাগ কর এবং স্বাধীনভাবে তাঁহাকে ধর্ম প্রচার করিতে দাও। তিনি যদি কৃতকার্য হইয়া সারা আরবের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তবে ইহাতে তোমাদেরই মর্যাদা বাড়িবে। অন্যথা আরবদের হাতে তিনি নিহত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন (ইবন হিশাম, আস- সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ২৯৩)।

আরেকটি দৃষ্টান্ত। একদিন রাত্রিকালে আবূ সুফ্য়ান, আবূ জাহ্ল্ ও আখনাস ইবন শারীক—কুরায়শদের এই তিন শীর্ষ নেতা নিজ নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া অতি গোপনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কুরআন তিলাওয়াত শুনিবার জন্য তাঁহার গৃহের নিকটে অবস্থান লইল। প্রত্যেকেই নিজেকে গোপন রাখিয়াছে, কেহই পরস্পরের খবর জানে না। রাত্রির গভীরে রাসূল কারীম (স) নিজ গৃহাভ্যন্তরে নামাযে দাঁড়াইয়া কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হইলেন। নেতৃত্রয় গভীর মনোযোগসহ কুরআন শুনিতে লগিল। কুরআনের অপূর্ব মাধুর্যে বিমোহিত হইয়া তাহারা সারা রাত্রি কাটাইয়া দিল। চারিদিকে যখন ভোরের আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন তাহারা ত্রস্ত পদে নিজ নিজ বাড়ির দিকে পালাইতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! পথিমধ্যে তাহাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। লজ্জা আর অপমানে তাহারা পরস্পরকে ভর্ৎসনা ও ধিক্কার দিতে লাগিল এবং এই মর্মে শপথ করিল যে, 'আজ যাহাই হইয়াছে, আগামীতে সাবধান! আর কেহই কোন দিন আসিবে না'।

দ্বিতীয় দিন প্রত্যেকেই ভাবিল, আজ তো আর কেহ আসিবে না, কাজেই এই সুযোগ আমি হাতাইয়া লই। দেখা গেল, পরবর্তী রজনীতে তিনজনই উপস্থিত। এবারও তাহারা পরস্পর কসম খাইয়া পুনরায় না আসিবার অঙ্গীকার করিল। কিন্তু কুরআন কারীমের অলৌকিক স্বাদ তাহারা আস্বাদন করিয়াছিল। তাই উহা ভুলিয়া থাকা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

তৃতীয় রজনীতেও সকলেই অঙ্গীকারের কথা বেমালুম ভুলিয়া যাইয়া সংগোপনে কুরআন তিলাওয়াত শুনিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহপার্শ্বে উপস্থিত হইল। অবশেষে তাহারা একে অপরকে কুরআন সম্পর্কে মন্তব্য জিজ্ঞাসা করিল। আবূ সুফ্য়ান বলিল, 'সত্যি বলিতে কি, এমন বহু কিছু শুনিলাম, যাহা আমি বুঝিয়াছি এবং আমিও উহা সত্য বলিয়া জানি। আর বহু কিছু বিষয় এমন যাহার নিগূঢ় মর্ম আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আখনাস ইবন শরীক বলিল, আল্লাহ্র শপথ! আমার মন্তব্যও তাহাই। আবূ জাহ্ল বলিল, স্পষ্ট কথা। যুগ যুগ ধরিয়া বনী 'আব্দ মানাফের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। তাহারাও দান-খয়রাত করে, আমরাও দান- খয়রাত করি। তাহারা মেহমানদারী করে, আমরাও মেহমানদারী করি। এইভাবে তাহারা যাহা কিছু করে, আমরাও সমানভাবে তাহাই করি। কাজেই মানে-সম্মানে ও ঐতিহ্যে আমরা কোন অংশেই তাহাদের চেয়ে কম নহি। আজ তাহারা দাবি করিয়াছে যে, তাহাদের বংশে নবী আসিয়াছে, তাহাদের নিকট ওহী আসে। আমরা ইহা কোথায় পাইব? সুতরাং এই কারণে তাহারা আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইবে, তাহা হইতে

পারে না। অতএব ভাল, কি মন্দ, তাহা বুঝি না। আমরা মুহাম্মাদের উপর ঈমান আনিব না (মা'আরিফুল কুরআন, ১খ., পৃ. ১৫২)।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত ঃ বনী সুলায়ম গোত্রের জনৈক কায়স ইবন নাছীরা নামক এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন তিলওয়াত করিয়া শুনাইলেন। পাঠ শ্রবণান্তে কায়স স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার কওমকে আহ্বান করিয়া বলিল, হে আমার জাতি! রোম ও পারস্যের সেরা কবি ও সাহিত্যিকদের রচিত কবিতা ও রচনাবলী শুনিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। বহু জ্যোতিষীর কথাও আমি শুনিয়াছি। হিম্য়ারের খ্যাতনামা জনপ্রিয় সাহিত্য রচনাও আমি পড়িয়াছি, কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-এর মুখ নিঃসৃত বাণীর সমতুল্য কোন কালাম আজ পর্যন্ত আমি কোথাও পাই নাই ও শুনি নাই। তোমরা আমার কথা শুনিয়া লও এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লও (কুরআন সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ২৭৭)।

পঞ্চম দৃষ্টান্ত ঃ বানূ গিফার গোত্রের বিখ্যাত কবি ও বাগ্মী উনায়স বলেন, মক্কাবাসিগণ বলে, মুহাম্মাদ কবি, গণক, যাদুকর। অথচ জীবনে আমি বহু কবি, সাহিত্যিক ও গণকের কথা শুনিয়াছি। স্বয়ং আমি কবিতার ছন্দ ও পদবিন্যাসে অভিজ্ঞ। কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-এর মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা কবিতাও নহে, গণকের কথাও নহে। আমি নিশ্চিন্ত করিয়া বলিতে পারি যে, 'মুহাম্মাদই সত্যবাদী' আর মক্কাবাসীরা মিথ্যাবাদী (কুরআন সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ২৭৭)।

ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত ঃ বানূ আয্দ গোত্রের বিখ্যাত কবি দিমাদ ছিল একজন বৈদ্য চিকিৎসক। একবার সে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইল। রাসূল কারীম (স) তাহাকে সূরা ফাতিহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। গভীর ধ্যান ও মনোযোগ সহকারে দিমাদ তিলাওয়াত শুনিল এবং বিমুগ্ধ হইয়া বারবার শুনাইতে অনুরোধ করিতে লাগিল।

রাসূলুল্লাহ (স) বেশ কয়েকবার তাহাকে সূরা ফাতিহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। দিমাদ স্বতস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠিল, 'আল্লাহ্র শপথ! আমি যাদুকরদের মন্ত্রশাস্ত্র, কবিদের কাব্য-ছন্দ সবই-শুনিয়াছি। কিন্তু মুহাম্মাদ! তোমার কথাগুলি নিশ্চয়ই ভিন্ন কিছু। সত্যিই ইহা মহাসমুদ্রের অতল গহ্বরেও মহা আলোড়ন সৃষ্টি করিবে।' অতঃপর দিমাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে হাত রাখিয়া ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন (রাহমাতুলল্লিল আলামীন, ১খ, পৃ. ৭৬-৭৭)।

সপ্তম দৃষ্টান্ত ঃ একবার এক বেদুঈন এক তিলাওয়াতকারীর মুখে শুনিল,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۔ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۔

"অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর। আমি যথেষ্ট তোমার জন্য বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে" (১৫ ঃ ৯৪-৯৫)।

বেদুঈন তৎক্ষণাত সিজদায় মাথা নত করিল। উপস্থিত লোকেরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বেদুঈন বলিল, পঠিত কালামের উচ্চাঙ্গ ভাব ও ভাষালংকারে বিমোহিত হইয়া আমি সিজদায় নত হইয়াছি (কুরআন সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ২৭৮)।

অষ্টম দৃষ্টান্ত ঃ একদিন জনৈক বেদুঈন একজন তিলাওয়াতকারীর মুখে নিম্নোক্ত আয়াত শুনিতে পাইল ঃ

فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْ اَبِيْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ ٠

"যখন উহারা তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইল, তখন উহারা নির্জনে গিয়া পরামর্শ করিল। উহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ জন বলিল, তোমরা কি জান না, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার লইয়াছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফ-এর ব্যাপারে ত্রুটি করিয়াছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করিব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই বিচারকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"।

তিলাওয়াত সমাপ্ত হইলে বেদুইন বলিয়া উঠিল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, কোন মাখলুকের পক্ষে এমন কালাম বলা সম্ভব নহে (কুরআন সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ২৭৮)।

নবম দৃষ্টান্ত ঃ মক্কাবাসীরা বাৎসরিক কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করিত। প্রতিযোগিতায় যাহার কবিতা প্রথম স্থান অধিকার করিত, প্রতিযোগিতার মূল্যায়নে কা'বাগৃহের দরজায় তাহার কবিতা শোভা পাইত। ইহা ছিল বিজয় ও গৌরবের স্বীকৃতি। একদিন জনৈক মুসলমান কুরআনের নিম্নোক্ত ক্ষুদ্রতর সূরাটি কা'বাগৃহের দরজায় লটকাইয়া দিলেন ঃ

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ٠ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٠ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ٠

"আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ" (১০৮ ঃ ১-৩)।

ইহা ছিল একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। আরবের যশস্বী কবি-সাহিত্যিকগণ উহার মুকাবিলায় দুই-এক পংক্তি রচনার চেষ্টা করিল। কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হইয়া সমস্বরে বলিল, ليس هذا كلام البشر . "ইহা মানুষের রচিত কালাম নহে" (কুরআন সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ২৭৯)।

দশম দৃষ্টান্ত ঃ কুরআন কারীমের সমস্ত আয়াতই মু'জিযা, ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মু'জিযাপূর্ণ আয়াত হইল সূরা হূদের এই আয়াত ঃ

وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَيٰسَمَاءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ٠

"ইহার পর বলা হইল, হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করিয়া লও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং কার্য সমাপ্ত হইল, নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হইল এবং বলা হইল, জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হউক" (১১ ঃ ৪৪)।

আয়াতটিকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম মু'জিযাপূর্ণ আয়াত বলার কারণ এই যে, এই আয়াতের মধ্যে সর্বমোট উনিশটি কলেমা রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি কলেমার মধ্যে ফাসাহাত ও বালাগাত তথা আরবী ভাষা-সাহিত্যশৈলী ও অলংকার শাস্ত্রের একটি করিয়া নিয়ম-নীতি প্রয়োগ হইয়াছে। এই হিসাবে এই আয়াতের উনিশটি শব্দের মধ্যে উনিশটি নিয়ম-নীতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

কুরআন কারীমের চ্যালেঞ্জিং ইতিহাসে এই আয়াত সম্পর্কে দুইটি চমকপ্রদ ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত আছে। জাহিলী যুগে আরব কবিদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তাহারা নির্বাচিত ও শ্রেষ্ঠ বিবেচিত কবিতা ও সাহিত্য রচনা কাবাগৃহের দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিত। যতক্ষণ পর্যন্ত উহার তুলনায় শ্রেষ্ঠ রচনা উপস্থাপিত না হইত, ততক্ষণ পর্যন্ত উহাই কা'বাগৃহের দেওয়ালে শোভা পাইত। এইভাবে সেরা কবি-সাহিত্যিকগণ সাহিত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইত। জাহিলী যুগের বিখ্যাত কবি ইমরুউল কায়স-এর ভগ্নি তখনও জীবিত ছিল। সে ছিল তৎকালীন আরবের সেরা কবি-সাহিত্যিকদের অন্যতম। একদিন ইমরুউল কায়সের ভগ্নি তাহার স্বরচিত একটি কবিতা পংক্তি কা'বাগৃহের দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিয়া ঘোষণা করিল, 'আমার এই কবিতা পংক্তির মুকাবিলায় শ্রেষ্ঠ কোন রচনা কেহ উপস্থিত করিতে সক্ষম হইবে না। আমার এই রচনা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অতুলনীয়।' জনৈক মুসলিম তাহার এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে কুরআনের উপরে উল্লিখিত আয়াতটি কাবাগৃহে দেওয়ালে লটকাইয়া দিলেন। প্রত্যূষে ইমরুলে কায়সের ভগ্নি দেখিল, তাহার কবিতা পংক্তির যাবতীয় সৌন্দর্য আল-কুরআনের আয়াতের শিল্পের তুলনায় কোন বিবেচনাই রাখে না। সে দ্রুত তাহার পংক্তিটি দেওয়াল হইতে নামাইয়া ফেলিল এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করিল, ليس كلام ابلغ من هذا "ইহার তুলনায় শ্রেষ্ঠ কোন রচনা নাই" (আল-ইতকান)।

অপর ঘটনাটি আব্বাসী খিলাফাত আমলের। তদানীন্তন আরব কবিদের মধ্যে সেরা কবি ছিল 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা', অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি। একদিন সে ঘোষণা করিল, কেহ যদি আমার এক বৎসরের ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তবে আমি দিবারাত্র সর্ব সময় আল-কুরআনের অনুরূপ কালাম রচনায় আত্মনিয়োগ করিব এবং আমি এই মর্মে ঘোষণা দিতেছি যে, আমি কুরআনের অনুরূপ কালাম রচনা করিতে সক্ষম হইব। এক ব্যক্তি তাহার এক বৎসরের যাবতীয় ব্যয় বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল। ইবনুল মুকাফ্ফা' একটি বদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিয়া গভীর অধ্যবসায়ে মগ্ন হইল। সুদীর্ঘ এক বৎসরকাল নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা ও গবেষণার পর সে কিছু কালাম রচনা করিল। অতঃপর চরম আত্মতৃপ্তি ও গর্বস্ফিত স্বরে ঘোষণা করিল, 'আমি কুরআনের সমতুল্য বাগ্মিতাপূর্ণ কালাম রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছি। অমুক দিন তাহা জনসম্মুখে প্রকাশ করিব'। পূর্ব ঘোষণানুসারে সে যখন তাহার স্বরচিত সাহিত্য লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইল তখন দেখিতে পাইল, একটি ছোট্ট মেয়ে কুরআনের পূর্বোক্ত (১১ ঃ ৪৪) আয়াতটি তিলাওয়াত করিতেছে।

একটি ছোট্ট মেয়ের মুখে কুরআনের এই অভূতপূর্ব বিস্ময়কর সাহিত্যপূর্ণ আয়াত শুনিয়া ইবনুল মুকাফ্ফা' উল্টা পদে হাঁটিয়া গৃহে প্রস্থান করিল এবং দীর্ঘ এক বৎসরের মেহনতের ফলে

রচিত কালামের পাণ্ডুলিপিগুলি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দিল। চরম হতাশা আর ব্যর্থতার মধ্য দিয়া সে বলিতে লাগিল ঃ

ياليتنى قدخاب سعى وصنعى عند سماع تلاوة هذه الصبية والله ان هذا القران لا يمكن . ان يتحدى به احد والله ان هذا من كلام الله ليس هذا من كلام البشر .

"হায় আফসোস! এই ছোট্ট মেয়ের তিলাওয়াতের সামনেই আমার দীর্ঘ এক বৎসরের একনিষ্ঠ মেহনত ও জীবনপণ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। আল্লাহ্‌র শপথ! এই কুরআনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। আল্লাহ্‌র শপথ! নিঃসন্দেহে ইহা মহান আল্লাহ্‌র কালাম, কোন মানুষের কালাম নহে" (বাকিল্লানী, ই'জাযুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৫০)।

কুরআন কারীমের এই অতুলনীয় বাগ্মিতা ও উচ্চ সাহিত্য মানের অলৌকিকত্বকে আরবী ভাষা-পণ্ডিতগণ চারটি শিরোনামে বিভক্ত করিয়াছেন।

১. শব্দসমূহের অলৌকিকত্ব;

২. বাক্য বিন্যাসের অলৌকিকত্ব;

৩. বর্ণনা রীতি, ভঙ্গি ও উপস্থাপনার অলৌকিকত্ব;

৪. আয়াতসমূহের পারস্পরিক সুসামঞ্জস্যশীলতার অলৌকিক যোগসূত্র ('উলূমুল কুরআন, ২৫৪)।

শব্দসমূহের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য

আরবী ভাষা খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত। শব্দসম্ভারের দিক হইতে আরবী ভাষা পৃথিবীর সর্বাধিক সমৃদ্ধ ভাষা। ভাব প্রকাশের জন্য অতি সামান্য পার্থক্যের কারণে আরবী ভাষায় প্রচুর শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে। এই শব্দের মহাভাণ্ডার হইতে কুরআন কারীমে ঠিক ঐ শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে যাহার অর্থ সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল; যাহার মধ্যে আছে গতিশীলতা ও প্রাণময়তা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া ব্যাকরণ দুষ্ট ও অসামঞ্জস্য শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে কুরআন কারীমের সূরা ফাতিহা হইতে সূরা নাস পর্যন্ত কোন অস্পষ্ট বা অসামঞ্জস্য শব্দ ব্যবহৃত হওয়া তো দূরের কথা, আল-কুরআনের যেখানে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ভাষা নৈপুণ্য ও গতিশীলতার বিচারে তাহা এমন অটল যে, সেখানে ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তে অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ করা মোটেই সম্ভব নহে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হইবে।

দৃষ্টান্ত-১

প্রত্যেক ভাষায় এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায় যাহার ধ্বনি ও উচ্চারণ শ্রুতিমধুর হয় না। অথচ ভাব প্রকাশের জন্য উহার বিকল্প কোন শব্দও নাই। ফলে কবি-সাহিত্যিকগণ বাধ্য হইয়া ঐ সমস্ত শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কুরআন কারীমে এমন একটি হৃদয়গ্রাহী, মনপ্রীতিকর পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে যে, সাহিত্য রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই উহাতে চমৎকৃত না হইয়া পারে না। যেমন 'পাকা ইট' অর্থ ব্যক্ত করার জন্য আরবী ভাষায় যতগুলি

শব্দ রহিয়াছে, উহার সবগুলিই অতি নিচু পর্যায়ের। যথা اجر ، رطوب ، قرمد ; কিন্তু আল-কুরআনে যখন এই ভাবটি প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিল তখন উহাকে এমন সুন্দর ও সাবলীল আন্দাযে আশ্চর্যকর ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হইল যে, প্রয়োজনীয় ভাব প্রকাশের সাথে সাথে অপছন্দনীয় শব্দ পরিহার করাও সম্ভব হইল। উপরন্তু উহার মধ্যে সৃষ্টি হইল এক অপরূপ বাগ্মিতা। ইরশাদ হইল ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ·

"ফির'আওন বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলিয়া জানি না! হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার কর; হয়ত আমি ইহাতে উঠিয়া মূসার ইলাহকে দেখিয়া লইতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী" (২৮ ঃ ৩৮)।

অর্থাৎ কাঁচা ইট বুঝাইবার জন্য কুরআন কারীম وقد علی الطین । শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত-২

জাহিলী যুগে আরবী সাহিত্যে 'মৃত্যু' অর্থ প্রকাশের জন্য অনেকগুলি শব্দ ব্যবহার করিত। যেমন ঃ خالج، قتيم، سام، فناء، حتف، هلاك، حلاق · ইত্যাদি। এই শব্দগুলির প্রত্যেকটির পশ্চাতে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধারণা কার্যকর ছিল যে, মৃত্যুর কারণে মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস হইয়া যায়। কাজেই মানুষের পুনরায় জীবিত হওয়া এবং হাশরের ময়দানে পুনরুত্থিত হওয়া সম্ভব নহে। তৎকালীন আরববাসীরা যেহেতু পরকালে বিশ্বাসী ছিল না, তাই মৃত্যুর অর্থ প্রকাশের জন্য তাহারা এইরূপ শব্দই নির্বাচন করিয়াছিল। এই মৃত্যুর অর্থ প্রকাশের জন্য ঐ সমস্ত জাহিলী চেতনাসমৃদ্ধ শব্দের কোন একটি শব্দও আল-কুরআন গ্রহণ করে নাই বরং কুরআন ইহার জন্য توفّى শব্দটি সৃষ্টি করিল। এই توفى শব্দটি একদিকে যেমন মৃত্যুর ভাব প্রকাশ করে যে, মৃত্যু অর্থ চিরতরে ধ্বংস নহে বরং মৃত্যুর মর্ম হইল, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মানুষের রূহকে কবজা করিয়া লওয়া, তৎপর আল্লাহ যখন চাহিবেন, 'রূহকে মানবদেহে পুনপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। এইভাবে মানবজাতির পুনরুত্থান ঘটিবে। মৃত্যুর অর্থ প্রকাশের জন্য এই শব্দটির ব্যবহার কুরআনের পূর্বে আর কোথাও দেখা যায় নাই (শায়খ বিন্নুরী, য়াতীমাতুল-বায়ান লিমুশকিলাতিল-কুরআন, পৃ. ৫৬)।

দৃষ্টান্ত-৩

'আরবী ভাষায় বেশ কিছু শব্দ এমন রহিয়াছে যাহার একবচন স্পষ্ট প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য হওয়া সত্ত্বেও উহার বহুবচন দুষ্পাঠ্য। যেমন 'পৃথিবী'-এর অর্থ প্রকাশের জন্য ارض। শব্দটির দুইরূপ বহুবচন ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। একটি ارضون। অপরটি أراضی উভয় রূপ ব্যবহারই

দুষ্পাঠ্য হিসাবে বিবেচিত। ফলে শব্দ দুইটির ব্যবহার ফাসাহাত ও বালাগাতপূর্ণ ভাষার প্রাঞ্জল্য ও সাবলীলতা ব্যাহত করে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আরব কবি-সাহিত্যিকগণ প্রয়োজনের খাতিরে শব্দ দুইটির ব্যবহার পরিহার করিতে সক্ষম হন নাই। কারণ উহার বিকল্প শব্দ তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডারে অনুপস্থিত। কিন্তু কুরআন কারীম যখন এই শব্দটি ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করিল তখন ارضون বা أراضى শব্দদ্বয় প্রয়োগ না করিয়া এমন একটি সুন্দর ও রুচিশীল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, যাহার দ্বারা একদিকে যেমন প্রকৃত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, অপরদিকে বাক্যের দুষ্পাঠ্যতাও বিদূরিত হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে ভাষার এক অভিনব লালিত্য ও সৌন্দর্য। কুরআনের ভাষা শুনুন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ‏.

"আল্লাহই সপ্তাকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীকেও সৃষ্টি করিয়াছেন" (৬৫ ঃ ১২)।

এই আয়াতে سموات শব্দটি বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ارض শব্দটির বহুবচন প্রয়োগ করা হয় নাই, বরং বহুবচনের ভাব প্রকাশের জন্য ومن الارض مثلهن শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাক্যবিন্যাসের অলৌকিকত্ব

কুরআনের বাক্য গঠনের রীতি-পদ্ধতি, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস ও উচ্চাঙ্গ ভাব এবং ভাষা অলংকারের দিকটিও অলৌকিক। সাহিত্য রুচিসম্পন্ন যে কোন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কুরআনের বাক্য গঠন ও বাক্য বিন্যাসের নিখুঁত কলাকৌশল দেখিয়া অবাক না হইয়া পারিবে না। উহার প্রাঞ্জল ভাষার প্রাণময়তা যে কোন পাঠকের হৃদয়-মন বিমোহিত করিয়া দিবে। নিঃসন্দেহে আল- কুরআনের বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভাষা ও ভাবের অপূর্ব সমন্বয় নজীরবিহীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি আয়াত দেখুন ঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ‏.

"হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে যাহাতে তোমরা সাবধান হইতে পার" (২ ঃ ১৭৯)।

হত্যাকারীর প্রতিশোধ গ্রহণ করা আরববাসীর নিকট অতিশয় প্রশংসনীয় বিষয় ছিল। ইহার গুরুত্ব ও সার্থকতা প্রকাশের জন্য তাহাদের সমাজে কতিপয় প্রবাদ প্রচলিত ছিল। যেমন القتل انفى للقتل "খুনীর মৃত্যুদণ্ড হত্যাকাণ্ড নির্মূল করে"। القتل إحياء للجميع "খুনীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান, সকলকে জীবন দান"। এই বাক্য দুইটি আরববাসীদের দৃষ্টিতে অতি উচুঁমার্গীয় অলংকার সমৃদ্ধ ও ভাবগম্ভীর বাক্য বলিয়া স্বীকৃত। কিন্তু আল-কুরআনে বিষয়টিকে যেভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে তাহা আরববাসীদের প্রচলিত বাক্য দুইটির তুলনায় সর্বদিক হইতেই অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষালংকারের বিচারেও বাক্যটি অতি উচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত। এই বাক্যটির সংক্ষিপ্ততা, সারগর্ভতা, প্রাঞ্জলতা, সজীবতা ও উৎকর্ষতা যে কোন শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করিবে ('উলূমুল কুরআন, পৃ. ২৫৯)।

বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপনার অলৌকিকত্ব

কুরআন কারীমের ভাষা ও সাহিত্যগত মু'জিযা ও অলৌকিকত্ব যে সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে, উহার মধ্যে আল-কুরআনের অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গি ও বিস্ময়কর উপস্থাপনার শৈল্পিক রীতি অন্যতম। আল-কুরআনের এই বর্ণনা পদ্ধতি নজীরবিহীন। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় ঃ

(এক) আল-কুরআন সম্পূর্ণ গদ্যও নয়, পদ্যও নয়—এমন এক অতুলনীয় রীতিতে নাযিল হইয়াছে। এই কারণে উহার মধ্যে পদ্য ও পদ্যের নিয়ম-রীতির অবতারণা হয় নাই, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কুরআনের বর্ণনাধারায় এমন বিমুগ্ধকর মধুময় সুর ও ছন্দের ঝংকার পাওয়া যায়, যাহা কবিতার ছন্দ ও সুরের গতিময়তা ও প্রাণময়তার তুলনায় অনেক অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও স্বাদ-সমৃদ্ধ। আমরা দেখিতে পাই যে, পদ্য সাহিত্য ও কবিতার ছন্দে ওযন বা মাত্রার সাম্য সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রত্যেকটি ছন্দের মিত্রাক্ষরের মিল লক্ষ্য করা হয়। এই ক্ষেত্রে যে ছন্দ যত উৎকর্ষতা লাভ করে, উহার রুচিও চমৎকারিত্ব তত বৃদ্ধি পায়। তৎপর কবিতার ছান্দিক মাধুর্য ও উৎকর্ষতা আরও বৃদ্ধি পায়, যদি মিত্রাক্ষরের সমিলের সাথে সাথে প্রান্তাক্ষরগুলিও এক ধরনের ব্যবহৃত হয়। কারণ ইহার প্রভাবে কবিতা ও ছন্দের প্রত্যেকটি চরণে অনুভূত হয় এক তুলনাহীন ধ্বনিরস এবং চিত্তাকর্ষক স্বাদ।

পদ্য-সাহিত্য ও কাব্য-ছন্দে এই রুচি সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক ভাষায় স্বতন্ত্র নিয়ম-রীতি রহিয়াছে। পরিবেশ ও অঞ্চলের বিভিন্নতার কারণে এই সমস্ত নিয়ম-রীতিতেও পার্থক্য হইয়া থাকে। উহার কোন রীতিই সার্বজনীন নহে। কিন্তু কুরআনের মু'জিযা ও অলৌকিকত্ব এই যে, কুরআন পৃথিবীর কোন একটি ভাষার বা অঞ্চলের স্বতন্ত্র নিয়ম-রীতিকে অনুসরণ না করিয়া বরং সর্বঅঞ্চলের সর্ব ভাষার সর্ব রীতিতে সমানভাবে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যসমূহকে সমন্বিত করিয়া এমন একটি মনোমুগ্ধকর পদ্ধতিতে উপস্থাপন রীতি সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার রুচি ও প্রাঞ্জলতা, ধ্বনিরস ও সাবলীলতা এমন সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী যে, উহা কেবল আরবী ভাষাভাষীদের জন্যই চিত্তাকর্ষক নহে, বরং আরব-আযম তথা গোটা পৃথিবীর সকল অঞ্চলের এবং সকল ভাষার মানুষের জন্যই, যেমন রুচিশীল তেমনি বিস্ময়কর। আরব ও অনারব সকলেই উহাতে মুগ্ধ হয়, বিমোহিত হয়। এই কারণেই আমরা দেখি যে, কুরআন নাযিলকালীন যুগের আরব কবি ও সাহিত্যিকগণ কুরআনের বর্ণনাধারার এই অলৌকিক উপস্থাপনা রীতি দেখিয়া বলিতে শুরু করিয়াছিল যে, ইহা কবিতা, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহারা বলিতে লাগিল, না, ইহা কবিতা নহে। বস্তুত কুরআনের এই তুলনাহীন বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপনা রীতি মানবীয় শক্তি ও সামর্থ্যের ঊর্ধ্বের বিষয়। ইহা কুরআনের অন্যতম মু'জিযা (আল-ফাওযুল কাবীর, পৃ. ৩৪)।

(দুই) কুরআনের অলৌকিক বর্ণনাভঙ্গির ও উপস্থাপন রীতির আরও একটি দিক এই যে, ভাষালংকারবিদগণের দৃষ্টিতে মনোভাব ব্যক্ত করার তিনটি ধারা প্রচলিত রহিয়াছে। যথা. ১. খিতাবী, ২. আদাবী (সাহিত্যিক) ও ৩. 'ইলমী (জ্ঞানগত)। এই তিনটি বর্ণনাধারার প্রত্যেকটিরই পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগক্ষেত্র রহিয়াছে। অনুরূপ উহার প্রত্যেকটি ধারারই

রহিয়াছে স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল। তাই একই ক্ষেত্রে সবকয়টি রীতিকে একত্র করা সম্ভব নহে। যেমন একজন বক্তা যখন বক্তৃতা করেন তখন তাহার বর্ণনার ধরন থাকে এক রকম। আর যখন তিনি কোন প্রবন্ধ পাঠ করেন বা লিখেন, তখন তাহার বর্ণনার রীতি হইয়া থাকে ভিন্ন রকম। এমনিভাবে তিনি যখন কোন গ্রন্থ রচনা করিতে বসেন, তখন উহার বর্ণনাভঙ্গি হয় আরেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সুসজ্জিত। এখানেই কুরআন কারীমের অলৌকিকত্বও বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য! তাহা এই যে, কুরআন কারীম একই সাথে বর্ণনারীতির উক্ত তিনটি ধারাকে সমন্বিত করিয়াছে, যাহা মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বের বিষয়। ইহারই ফলে আপনি কুরআন লইয়া চিন্তা-গবেষণা করিলে দেখিবেন যে, কুরআনে কারীমের প্রত্যেকটি আয়াতে, প্রত্যেকটি বাক্যে একদিকে যেমন সম্বোধনসূচক হৃদয় ছোঁয়া প্রাণবন্ত বক্তব্য রহিয়াছে, অপরদিকে উহাতে রহিয়াছে ভাষা ও সাহিত্যের প্রাঞ্জলতা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সজীবতা। এইভাবে কুরআন কারীম সমৃদ্ধ হইয়াছে অসংখ্য গুণ-বৈশিষ্ট্যে আর সৌন্দর্যের সমারোহে।

(তিন) আল-কুরআনের অলৌকিক বর্ণনাভঙ্গির আরও একটি দিক এই যে, মূর্খ, সাধারণ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অতিশিক্ষিত, আলিম, পণ্ডিত, সকলের উদ্দেশ্যেই কুরআন নাযিল হইয়াছে। সমভাবে সকলকে সম্বোধন করা হইয়াছে। আল-কুরআনের একই বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপন ধারা উক্ত সকল প্রকারের পাঠককে একই সাথে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। মূর্খ বা অতি স্বল্প ও সাধারণ শিক্ষিতগণ যেমন আল-কুরআন হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় নসীহত হাসিল করিতেছে এবং অতি সহজ ও সরলভাবে কুরআনের আহ্বান বুঝিয়া লইতেছে, তেমনিভাবে অতি শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও গভীর দৃষ্টিতে কুরআন পাঠ করিয়া উহার মধ্য হইতে জ্ঞানগর্ভ ও বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর সন্ধান পাইতেছে। আল-কুরআনের বর্ণিত বিষয়বস্তুসমূহের সূক্ষ্মতা ও গভীরতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইবে যে, মামুলী জ্ঞান-বুদ্ধির মানুষের জন্য বুঝি কুরআনের ভাব অনুধাবন করা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। উদাহরণস্বরূপ তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, সৃষ্টি, আল্লাহর অস্তিত্ব, পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে অতিশয় জটিল ও সূক্ষ্মতর। অথচ কুরআন শরীফ এই সমস্ত জটিল ও কঠিন বিষয়গুলিকে এমন সরল, সহজ ও সাবলীল আন্দাযে উপস্থাপন করিয়াছে যে, একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও অতি সহজে উহা বুঝিতে পারে।

অপরদিকে দর্শনপ্রিয়, চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তিও উহা অধ্যয়ন করিয়া উহাতে এমন বলিষ্ঠ প্রমাণাদির সন্ধান পায় যাহা তাহাকে সত্য প্রমাণে চরম সফলতা দান করে। সে দেখিবে, আল-কুরআন অতি সহজ ভাষায় কথার বাঁকে বাঁকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এমন এমন সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়াবলীর তথ্য ও সমাধান প্রদান করিয়াছে, যে পর্যন্ত পৌঁছিতে বিজ্ঞান গবেষণার শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল লাগিয়া যাইবে ('উলূমুল কুরআন, পৃ. ২৬৩-২৬৫)

(চার) কুরআনের বিস্ময়কর বর্ণনারীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, আবৃত্তিকারী যতই উচ্চ মানের কবি-সাহিত্যিক হউন না কেন, একটি বিষয়ের বারংবার আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি অতিশয় বিব্রতকর এবং অস্বস্তিকর। কিন্তু কুরআন কারীমের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে একটি বিষয়ের বারংবার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও উহাতে কোন বিস্বাদ ও বিরক্তির

উদ্রেক তো হয়ই না, বরং উহাতে অনুভূত হয় নূতন নূতন রুচি ও মাধুর্য। আল-কুরআনের পাঠক মাত্রই ইহা অনুভব করিয়া থাকেন।

(পাঁচ) ব্যাপক অর্থবাহক সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা কুরআনের বিস্ময়কর বর্ণনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল-কুরআন অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে এত ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছে যে, প্রত্যেক যুগ ও কালেই ইহা হইতে পথনির্দেশনা হাসিল করা যাইবে। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী এমনকি সহস্রাব্দ অতিক্রান্ত হইবার পরও কুরআনের সকল বিষয়বস্তু দীপ্তিমান রহিয়াছে। কুরআনের প্রত্যেকটি আহকাম চির-নূতন রহিয়াছে। পাঠকের নিকট মনে হইবে যেন এইমাত্র বিষয়টি নাযিল হইয়াছে।

ভাষা সংক্ষিপ্ত অথচ মর্ম বিস্তৃত, এই রীতিতে কুরআন কারীম অনেক অনেক বিষয়কে ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ সকলেরই জানা যে, আল-কুরআন কোন ইতিহাসের গ্রন্থ নহে। কিন্তু উহাতে সংক্ষিপ্তাকারে এমন সব ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপিত হইয়াছে, যাহা ইতিহাসের সর্বোচ্চ নির্ভরশীল উৎস। অনুরূপ কুরআন রাজনীতি ও আইনের গ্রন্থ নহে। কিন্তু মাত্র কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে আল-কুরআন রাজনীতি ও আদর্শ মহাবিশ্ব গড়িবার এমন কিছু মূলনীতি ও পদ্ধতি পেশ করিয়াছে যাহা যুগ-যুগান্তরে মহাপ্রলয় পর্যন্ত বিশ্ব মানবতাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিবে।

অনুরূপ আল-কুরআন দর্শন ও বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থ নহে। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানের এমন কিছু জটিল তথ্য কুরআন খুলিয়া দিয়াছে যাহার সমাধানে মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে (উলূমুল কুরআন, পৃ. ২৬৫)।

আয়াতসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্রের অলৌকিকত্ব

কুরআন কারীমের আয়াতসমূহের পারস্পরিক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ যোগসূত্র, উহার অতি সূক্ষ্মতর একটি অলৌকিক ও বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। একজন পাঠক স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আল-কুরআন তিলাওয়াত করিলে তাহার মনে হইবে, উহার আয়াতসমূহের মধ্যে পারস্পরিক কোন সংযোগ নাই। কিন্তু পাঠক যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে আল-কুরআন তিলাওয়াত করেন তাহা হইলে দেখা যাইবে, আল-কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত অপর আয়াতের সহিত সূক্ষ্মভাবে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। আল-কুরআনের একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

"আপনি আমার বান্দাদেরকে জানাইয়া দিন, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু এবং ইহাও যে, আমার শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" (১৫ঃ৪৯-৫০)।

এই আয়াতদ্বয়ের পরবর্তী আয়াত হইলঃ

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ

"আপনি তাহাদেরকে ইব্‌রাহীমের মেহমানদের অবস্থাও শুনাইয়া দিন। যখন তাহারা তাহার গৃহে আগমন করিল এবং বলিল, সালাম। তিনি বলিলেন, আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত" (১৫ঃ৫১-৫২)।

উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে বাহ্যত কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আপনি যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা মূলত পূর্ববর্তী আয়াতেরই সমর্থক। কেননা যে সকল ফেরেশতা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তাহারা দুইটি কাজ আঞ্জাম দিয়াছেন। (এক) তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে একজন নেককার সুসন্তান লাভের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন। (দুই) তাহারা হযরত লূত (আ)-এর বিদ্রোহী জাতিকে আসমানী আযাব দ্বারা ধ্বংস করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। প্রথম কাজটি ছিল আল্লাহ্র ঘোষণা انا الغفور الرحيم (আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু)-এর প্রকাশ এবং দ্বিতীয় কাজটি ছিল وان عذابى هو العذاب الاليم (নিশ্চয় আমার শাস্তিই মর্মন্তুদ শাস্তি)-এর প্রকাশ। এইভাবে আয়াতগুলির মধ্যে গভীর ও সূক্ষ্ম সম্বন্ধ এবং সুসামঞ্জস্যশীল যোগসূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে (ই'জাযুল কুরআন, শিব্বীর আহমাদ উছমানী)।

তৃতীয় কারণ

আল-কুরআনের মু'জিযা ও বিস্ময়কর অলৌকিকতার তৃতীয় কারণ হইল, 'ইহার বিতর্ক মুক্ত হওয়া'। স্বয়ং আল-কুরআনে বিষয়টি এইভাবে বিবৃত হইয়াছে ঃ

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا ·

"তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না ? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আসিত তবে তাহারা উহাতে অনেক অসংগতি পাইত" (৪ ঃ ৮২)।

উক্ত আয়াতে 'ইখতিলাফ (اختلاف) শব্দের অর্থ বৈপরীত্য, অসংলগ্নতা, অসংগতি, পার্থক্য, অসামঞ্জস্যতা ইত্যাদি। বক্তব্যে বৈপরীত্য না থাকা একটি দুর্লভ ব্যাপার। মহান আল্লাহ ছাড়া কাহারও পক্ষে এইরূপ বক্তব্য পেশ করা সম্ভবই নহে। বিতর্কমুক্ত ও সংগতিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করিতে হইলে অবশ্যই বক্তার জ্ঞান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইতে হইবে। মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কেও তাহাকে পূর্ণ জ্ঞানী হইতে হইবে। প্রত্যেক বস্তুর মূল উপাদান ও কাঠামো সম্পর্কেও তাহাকে পারদর্শী হইতে হইবে। তাহার জ্ঞান হইবে সরাসরি, মাধ্যমবিহীন। উপরন্তু তাহার মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকিতে হইবে যাহা সব কিছুর প্রভাবমুক্ত। তিনি কোন জিনিসকে ঠিক সেইভাবে দেখেন, যেইভাবে উহা বাস্তবে রহিয়াছে। এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ কেবল আল্লাহ তা'আলার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে পারে না। ইহাই হইল সেই মূল কারণ যাহার ফলে আল-কুরআন সকল প্রকার বৈপরীত্য এবং অসামঞ্জস্যতা হইতে মুক্ত এবং বহু উর্ধ্বে।

ইখতিলাফ, বৈপরীত্য বা অসংগতি দুই প্রকার ঃ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য বলিতে বুঝায় গ্রন্থের এক অংশ অপর অংশের অথবা এক বর্ণনা অপর বর্ণনার

বিপরীত হওয়া। আর বাহ্যিক বৈপরীত্য বলিতে বুঝায় গ্রন্থের উল্লিখিত কোন বর্ণনা বাস্তব বিশ্বের কোন ঘটনার বিপরীত হওয়া। আল-কুরআন এই উভয় প্রকার বৈপরীত্য হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। ইহা কেবল কুরআনেরই বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব।

আল-কুরআনের এই বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, কোন বাণীতে অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য থাকা মূলত বক্তার অভ্যন্তরীণ অপরিপূর্ণতারই ফলাফল। অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য দুইটি জিনিসের উপস্থিতি অত্যাবশ্যকীয়। ১. জ্ঞানের পূর্ণতা; ২. বস্তুনিষ্ঠতা (Objectivity)। এই দুই গুণে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেহ গুণান্বিত নহে। কাজেই আল্লাহ্‌র বাণী ছাড়া কাহারও বাণী অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য হইতে মুক্ত হইতে পারে না। বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করার জন্য নিম্নের দুইটি উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে ঃ

উদাহরণ-১

উদাহরণ হিসাবে বাইবেলের কথা বলা যায়। বাইবেল প্রথমে মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত কিতাব ছিল। পরে মানব রচনার সংমিশ্রণে বাইবেল উহার স্বচ্ছতা হারাইয়াছে। ফলে উহাতে অনেক বৈপরীত্য, অসংলগ্নতা ও অন্তর্সংঘাতের সৃষ্টি হইয়াছে। বাইবেলের যেই অংশকে নূতন নিয়ম (New Testament) বলা হয়, উহাতে হযরত ঈসা (আ)-এর বংশপরিক্রমার বর্ণনা রহিয়াছে। এই বংশপরিক্রমা মথি লিখিত সুসমাচারে এইভাবে শুরু হইয়াছে ঃ 'ঈসা মসীহ্, পিতা-দাউদ, পিতা আব্রাহাম"। ইহা হইল সংক্ষিপ্ত বংশপরিক্রমা। ইহার পর সুসমাচারে বিস্তারিত বংশপরিক্রমা বিবৃত হইয়াছে যাহার শুরুতে আব্রাহাম এবং শেষে ঈসা মসীহ-এর পূর্বে ইউসুফ নামের জনৈক ব্যক্তির নামে উল্লেখ রহিয়াছে, যিনি বাইবেলের বর্ণনানুসারে হযরত 'মার্‌য়াম (আ)-এর স্বামী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার ঔরসে ঈসা মসীহ-এর জন্ম।

ইহার পর আপনি যদি মার্ক লিখিত সুসমাচার পড়েন, তাহা হইলে তথায় দেখিতে পাইবেন যে, ঈসা মসীহ (আ)-এর বংশপরিক্রমা এইভাবে বিবৃত রহিয়াছে ঃ "ঈসা মসীহ, পিতা-ঈশ্বর" ইহার অর্থ দাঁড়ায়, বাইবেলের এক অধ্যায় অনুসারে ঈসা মসীহ্ ইউসুফ নামক জনৈক ব্যক্তির সন্তান, আবার এই বাইবেলেরই অপর অধ্যায় অনুসারে ঈসা মসীহ স্বয়ং ঈশ্বরের সন্তান। এই হইল মানব রচনার সংমিশ্রণ ঘটিত বাইবেলের বিস্ময়কর অন্তর্সংঘাত, চরম বৈপরীত্য (ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, 'ঈসা মসীহ' শীর্ষক নিবন্ধ)।

উদাহরণ-২

উপরের উদাহরণটি ধর্মীয় বাণীতে অন্তর্সংঘাতের। এবার মানবীয় বক্তব্যে অন্তর্সংঘাতের একটি উদাহরণ দেখা যায়। বর্তমান যুগে কার্ল মার্ক্সের বড়ত্ব সর্বশীর্ষে। প্রখ্যাত বৃটিশ প্রফেসর John Kenneth Galbraith কার্ল মার্কসের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "আমরা যদি মানিয়া লই যে, বাইবেল কয়েকজন লেখকের সম্মিলিত কর্ম, তবে অনুরক্ত, ভক্ত ও অনুসারীদের সংখ্যার বিচারে একমাত্র মুহাম্মাদই হইবেন কার্ল মার্কসের প্রতিদ্বন্দ্বী একক গ্রন্থকার। অবশ্য এই

প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাস্তবে বেশি কাছাকাছি নহে। কারণ কার্ল মার্কসের অনুসারীদের সংখ্যা নবী মুহাম্মাদ এর অনুসারীদের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে (The Age of Uncertainty, British Broadcasting Corporation, London, P. 77)।

কিন্তু কার্ল মার্কসের এই সুবিস্তৃত জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা সত্ত্বেও কঠিন বাস্তবতা এই যে, তাহার বক্তব্যসমূহ অন্তর্সংঘাতে ভরপুর। মার্কসের চিন্তায় এত বেশি অন্তর্বৈপরীত্য যে, মার্কসের রচনা সম্ভারকে অন্তর্সংঘাতময় রচনাসংগ্রহ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উদাহরণস্বরূপ মার্কস বলিয়াছেন, এই মানব পৃথিবীতে সকল কুকীর্তি ও অসৎ কর্মের মূলে রহিয়াছে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উপস্থিতি। তাহার মতানুসারে ব্যক্তিমালিকানা প্রকৃতির অর্থব্যবস্থাই ইহার মূল কারণ। সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদনের সকল মাধ্যমসমূহ কুক্ষিগত করিয়া মেহনতী জনতাকে লুটিয়া খায়, সর্বস্বান্ত করিয়া দেয়। কাজেই এই সমস্যা সমাধানের জন্য পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাত হইতে সম্পদের মালিকানা ছিনাইয়া আনিতে হইবে এবং ইহা মজদূর শ্রেণীকে দিতে হইবে।

এই কার্যক্রমকে তিনি "শ্রেণী শূন্য সমাজ প্রতিষ্ঠা" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু মার্কসের এই থিওরী সম্পূর্ণ অন্তসংঘাতময়। কারণ উল্লিখিত কার্যক্রম দ্বারা যেই জিনিসটি অস্তিত্ব লাভ করিবে তাহা শ্রেণীশূন্য সমাজ নহে, বরং উৎপাদনের কল-কবজার উপর এক শ্রেণীর কর্তৃত্ব খতম হইয়া অপর এক শ্রেণীর কর্তৃত্ব কায়েম হইবে। ইহা শ্রেণীর অবলুপ্তি নহে, বরং কেবল শ্রেণীর হাত বদল। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, প্রথমে এই কর্তৃত্ব মালিকানার নামে চলিত, এখন তাহা চলিবে ব্যবস্থাপনার নামে। শ্রেণীমুক্ত সমাজ বলিতে মার্কস যাহা দাবি করিয়াছেন, তাহা মূলত পুঁজিপতিদের মালিকানার বদলে কমিউনিস্ট শ্রেণীর মালিকানাবিশিষ্ট সমাজ ব্যতীত আর অন্য কিছু নহে। মার্কস একই জিনিসকে এক স্থানে কল্যাণকর বলেন, আবার অন্য স্থানে বলেন অকল্যাণকর। তবে ধনাঢ্যদের বিরুদ্ধে বর্ণনাতীত ঘৃণা ও কঠোর মনোভাবের কারণে তিনি তাহার চিন্তার এই অন্তর্সংঘাতকে আঁচ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি একই প্রকৃতির দুইটি বিষয়ের একটিকে বলিয়াছেন লুণ্ঠন, অপরটিকে কহিয়াছেন সামাজিক ব্যবস্থাপনা।

আল-কুরআন এই ধরনের অন্তর্সংঘাত হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। আল-কুরআনের একটি বর্ণনা অপরটির সহিত কখনও সংঘাতে আসে না। গোটা কুরআনে কারীমের বাণী সম্ভার পরস্পর সমর্থক, একই সূত্রে গাঁথা। এই বিষয়টি আল-কুরআনের সত্যতার জ্বলন্ত দলীল।

বাহ্যিক বৈপরীত্য

দ্বিতীয়টি ছিল বাহ্যিক সংঘাত। বাহ্যিক সংঘাত বলিতে বুঝায় কোন বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থের মধ্যে যেই বক্তব্য রহিয়াছে, উহার সহিত বহির্জগতের কোন বাস্তব বিষয়ের বৈপরীত্য সৃষ্টি হওয়া। এই বহির্সংঘাতের কারণও মূলত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বা অপূর্ণতা। মানুষের জ্ঞান যেহেতু সীমিত, তাই মানবরচিত বক্তব্যে বৈপরীত্য থাকিবেই। মহান আল্লাহর জ্ঞান যেহেতু অসীম, পরিপূর্ণ, তাই তাঁহার কালামে বৈপরীত্য থাকিতে পারে না।

ইহার একটি উদাহরণ এই যে, তদানীন্তন আরবে এই রেওয়াজ প্রচলিত ছিল যে, পরিবারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হইবে। এই আশংকায় কেহ কেহ আপন সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করিত। আল-কুরআন এই ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করিয়া ঘোষণা করিয়াছে :

ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا .

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়া থাকি। উহাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ" (১৭ : ৩১)।

আল-কুরআনের এই নির্দেশের অর্থ ইহাই যে, ভবিষ্যতে পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বর্ধিত হউক, ইহাতে দারিদ্র্যের আশংকা করিবার কিছুই নাই। কারণ মানুষের সংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই রুটি-রুজি সরবরাহ করা হয়। অতীতের মানুষ যেভাবে রিযিক পাইয়াছে, তদ্রূপ আগামী দিনের মানুষও রিযিক পাইতে থাকিবে। বিশ্বাসের দিক হইতে মুসলিম জাতি এই কথা মানিয়া লয়।

কিন্তু আল-কুরআনের এই ঘোষণার এক হাজার বৎসর পর ইংল্যান্ডের রবার্ট ম্যালথাস (খৃ. ১৭৬৬-১৮৩৪) জনসংখ্যার উপর একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটির পূর্ণ নাম An Essay on the Principle of Population as it affects the Future Improvement of Society. ম্যালথাস তাঁহার গ্রন্থে এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন যে, জনসংখ্যা যখন বাধাহীন ছাড়িয়া দেওয়া হয় তখন তাহা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্যসামগ্রীর বর্ধন প্রক্রিয়া হয় গাণিতিক হারে।

ম্যালথাসের থিওরীর সারমর্ম হইল, জনসংখ্যার বর্ধন ও খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন সমানুপাতিক হারে সম্পন্ন হয় না। কারণ জনসংখ্যা জ্যামিতিক তথা ১-২-৪-৮-১৬-৩২-৬৪-১২৮ হারে বাড়িতে থাকে। আর খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক তথা ১-২-৩-৪-৫-৬-৭-৮-৯-১০ হারে। অর্থাৎ জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাড়ে। পক্ষান্তরে খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদনের গতি খুবই মন্থর। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ম্যালথাস পরামর্শ দিয়াছেন যে, পৃথিবীর বুকে মানব জাতিকে বাঁচাইতে হইলে জন্মনিয়ন্ত্রণের আশ্রয় লওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। অতএব, যে কোন মূল্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি রুখিতে হইবে। অন্যথা মানুষ ও খাদ্য সামগ্রীর অসম বর্ধনের কারণে পৃথিবী অতি শীঘ্রই চরম অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হইবে। লক্ষ লক্ষ বনী আদম খাদ্যাভাবে মারা যাইবে।

ম্যালথাসের এই থিওরি বিশ্বে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলিয়াছে। গোটা বিশ্বের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ম্যালথাসের আহবানে সাড়া দিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। ইহার সমর্থনে গড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তি সংস্থা-সংগঠন।

কিন্তু ম্যালথাসের এই থিওরী ও ভবিষ্যদ্বাণী যে নিতান্ত ভুল, অবাস্তব তাহা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার ধারণামতে, পৃথিবীর জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে ঠিক, তবে খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদনও জনসংখ্যার সমানুপাতে, বরং উহার

চাইতেও অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। ম্যালথাসের বক্তব্যে এই বাহ্যিক সংঘাত ও বৈপরীত্যের কারণ কি? কারণ একটিই, তাহার জ্ঞানের অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা। ম্যালথাস গতানুগতিক কৃষিকর্মের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ম্যালথাস ভাবিতেও পারেন নাই যে, অতি শীঘ্রই এমন এক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর কৃষিকর্মের যুগ আসিতেছে, যখন খাদ্য-সামগ্রীর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটিয়া যাইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, অতীতের গতানুগতিক খাদ্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধির তুলনায় আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান নির্ভর কৃষিকর্মের উৎপাদনের হার দশ গুণ বেশী।

হিন্দুস্তান টাইম্স উহার ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ খৃ. সংখ্যায় একটি হিসাব দিয়াছে যে, উন্নত বিশ্বের কৃষকদের সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের হার দশ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অনুন্নত বিশ্বের ভাগে যেই পরিমাণ ভূমি সম্পদ রহিয়াছে উহার উপরই ৩৩ বিলিয়ন মানুষ বসবাস করিতে পারে। যেখানে বর্তমানে রহিয়াছে মাত্র ৩ বিলিয়ন মানুষ। বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা যদি বর্তমানের তুলনায় আরও দশ গুণ বৃদ্ধিও পায়, তথাপি তাহাদের নিজস্ব ভূমি হইতেই তাহাদের খাদ্য সরবরাহ হইবে।

হিন্দুস্তান টাইমসের গবেষক নিবন্ধকার গোয়াইন ডাইয়ার তাহার রিপোর্টের শেষে লিখিয়াছেন, "ম্যালথাস ভুলের মধ্যে ছিলেন। আমাদের ভাগ্যলিপি এমন নহে যে, আমাদের ভবিষ্যত বংশধরকে দুর্ভিক্ষ কবলিত পরিবেশে জন্ম লইতে হইবে"।

মোটকথা ম্যালথাসের থিওরী অপ্রাকৃতিক এবং বহির্জগতের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে আল-কুরআনের সকল বর্ণনা প্রকৃতিসম্মত, বহির্জগতের সহিত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বৈপরীত্যমুক্ত। ইহা কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের অনন্য প্রমাণ।

উদাহরণ-৩

অতীতের পবিত্র গ্রন্থসমূহের বাণীতে বহিসংঘাতের একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। বনী ইসরাঈল মিসরে প্রবেশ করে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর শাসনামলে পরবর্তীতে খৃ. পূ. ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হযরত মূসা (আ)-এর যুগে তাহারা মিসর হইতে বাহির হইয়া সীনাই উপত্যাকায় পৌঁছে। ইতিহাসের এতটুকু বর্ণনা কুরআন ও বাইবেল উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু ইহার পরে বাইবেলের বর্ণনা বহির্সংঘাতে আক্রান্ত, ঐতিহাসিক সত্যতা বিবর্জিত। পক্ষান্তরে আল-কুরআনের বর্ণনাসমূহ আদ্যপান্ত ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত এবং বাস্তব সম্মত। একজন বাইবেল পাঠককে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে যে, সে বাইবেলের বর্ণনা মানিয়া লইবে, না ঐতিহাসিক বর্ণনা মানিয়া লইয়া পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলকে অস্বীকার করিবে? কারণ দুইটি বর্ণনাকে তো আর একই সঙ্গে মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে। ইতিহাস বলে যে, 'ফির'আওন' খেতাবধারী বাদশাহদের শাসন হযরত মূসা (আ)-এর যুগে ছিল। হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বে হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগে মিসরে ছিল Hyksos Kings-দের শাসন। ইহারা আরব বংশোদ্ভূত এবং মিসরে বহিরাগত। ইহাদের শাসনামল খৃষ্টপূর্ব ২০০০ সাল হইতে

খৃস্ট পূর্ব ১৫৮০ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার পর মিসরে বহিরাগত বাদশাহদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাঁধিয়া উঠে এবং Hyksos রাজাদের শাসনামলের পরিসমাপ্তি ঘটে। Hyksos রাজত্বের অবসানের পর মিসরে স্বদেশী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাদের খেতাব ছিল 'ফির'আওন', 'ফির'আওন'-এর শাব্দিক অর্থ 'সূর্য দেবতার সন্তান'। সেকালে মিসরীয় জনগণ সূর্যের পুঁজা করিত। তাই ইহারা ক্ষমতায় আরোহণ করিয়া নিজদেরকে 'সূর্য দেবতার সন্তান' তথা আশীর্বাদপুষ্ট বলিয়া দাবি করিল।

মোটকথা, কুরআনের বর্ণনানুসারে হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগে মিসরের শাসক ছিল Hyksos রাজন্যবর্গ। ফির'আওনের শাসন ছিল হযরত মূসা (আ)-এর যুগে। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনানুসারে হযরত ইউসুফ (আ) ও হযরত মূসা (আ) উভয়ের যুগের শাসন ছিল ফির'আওন। মিসরের ইতিহাসের অতীত ও বর্তমানের গবেষণা এবং ঐতিহাসিক সূত্র উপাত্ত যেমন প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা ইত্যাদি হইতেও কুরআনের বর্ণনার যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বাইবেলের বর্ণনাগুলি সংঘাতপূর্ণ (ইসলামী বিশ্বকোষ, নিবন্ধ ফির'আওন, ইউসুফ (আ), মূসা (আ); দি বাইবেল দি কুরআন এন্ড সাইন্স, পৃ. ২১১-২৪১)।

একটি আপত্তি ও উহার সমাধান

আল-কুরআনের বিরুদ্ধ চারণকারীদের কেহ কেহ একটি আয়াত দ্বারা আল-কুরআনের আত্ম-সংঘাত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া যায়। আয়াতটি এই ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি তাহা হইতে তাহার সংগিনী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দিয়াছেন" (৪ ঃ ১)।

উপরন্তু বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "মানুষ আদম হইতে, আদম মাটি হইতে"। এই দুইটি বাণীতে নারী ও পুরুষের মাঝে সমতা এবং মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই ইহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু বাস্তাবে তাহা হয় নাই। আল-কুরআন একদিকে নারী-পুরুষের সমতার কথা বলে, অপরদিকে আল-কুরআন নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টি রাখে। কারণ সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আল-কুরআন দুইজন নারীকে একজন পুরুষের সমান বলিয়াছে।

উক্ত আপত্তির সমাধান এই যে, দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান সাব্যস্ত করা হইয়াছে, ইহা ঠিক; তবে ইহার ভিত্তি নারী-পুরুষে শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টি করা নহে; বরং ইহার প্রকৃত কারণ অন্যখানে। এই নির্দেশটি আল-কুরআনের যেই আয়াতে আসিয়াছে, সেখানেই ইহার প্রকৃত কারণ বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى

“হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন উহা লিখিয়া রাখিও। তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়। লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না। যেহেতু আল্লাহ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সে যেন লিখে; এবং ঋণগ্রহীতা যেন লিখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লিখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লিখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা রাযী, তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে; যদি দুইজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক সাক্ষী রাখিবে, যাহাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের অপরজন স্মরণ করাইয়া দিবে” (২ : ২৮২)।

এই আয়াতের শব্দগুলি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছে যে, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের এই পার্থক্যের কারণ বৈষম্যমূলক নহে, বরং স্মরণ থাকা না থাকার ভিত্তিতে। নারীর স্মরণশক্তি পুরুষের তুলনায় কম। আধুনিক গবেষণা ও অনুসন্ধান এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে যে, নারীর স্মরণশক্তি তুলনামূলকভাবে পুরুষের চাইতে কম (সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া, ১৮ জানুয়ারী, ১৯৮৫ খৃ.)।

অতএব আল-কুরআনের সাক্ষ্য সংক্রান্ত নির্দেশ ইহাই প্রমাণ করে যে, আল-কুরআন এমন এক স্রষ্টার প্রত্যাদিষ্ট বাণী যিনি সকল বাস্তবতা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।

চতুর্থ কারণ

আল-কুরআন মু'জিযা হওয়ার চতুর্থ কারণ এই যে, ভবিষ্যতে ঘটিবে এমন অনেক ঘটনার আগাম সংবাদ কুরআন কারীমে বিবৃত হইয়াছে, যাহা পরবর্তীতে অবিকল সংঘটিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি নবী-রাসূলগণের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ তাঁহাদের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়াবলীর আগাম সংবাদ প্রকাশ করেন, যাহা যথাসময়ে বাস্তবায়িত হইয়া তাঁহাদের দাবির সত্যতা স্বপ্রমাণ করে। মানবসমাজে গণক ও জ্যোতিষীরাও

উবায়্য ইব্ন খালাফ আবূ বকর (রা)-এর সহিত বাজি ধরিল যে, তিন হইতে নয় বৎসরের মধ্যে যদি রোমকগণ বিজয়ী হইতে সক্ষম হয়, তবে আমি তোমাকে এক শত উট দিব। পক্ষান্তরে রোমকগণ বিজয়ী হইতে না পারিলে তুমি আমাকে এক শত উট দিতে বাধ্য থাকিবে। হযরত আবূ বকর (রা) উবায়্য-এর বাজি গ্রহণ করিলেন। তখন পর্যন্ত ইসলামে বাজি ধরা নিষিদ্ধ ছিল না। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবন কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেন, কুরআনে যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, তখন ইহার চাইতে বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য অপর কোন ভবিষ্যদ্বাণীই হইতে পারে না। কেননা হিরাক্লিয়াসের বার বৎসরের রাষ্ট্র পরিচালনা রোম সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করিতেছিল ('উলূমুল কুরআন, পৃ. ২৬৯)। কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে সত্যে প্রমাণিত হইল এবং রোমক বাহিনী সর্বত্র তাহাদের বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করিতে লাগিল।

আল-কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর ভিতরে আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তাহা এই যে, যে সময় রোমকগণ বিজয়ী হইবে তখন মুসলিমগণও মহান আল্লাহর সাহায্যে কাফিরদের উপর বিজয়ী হওয়ার আনন্দে উৎফুল্ল থাকিবে। ভবিষ্যদ্বাণীর এই অংশেরও সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর সাত বৎসর পর রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনার বদর প্রান্তরে কুরায়শ বাহিনীকে পরাজিত করিয়া ইসলামের বিজয় ঝাণ্ডা উড্ডীন করিলেন, ঠিক তখন মুসলিমগণের নিকট রোমকদের বিজয়ের সংবাদ পৌঁছিল (রূহুল মা'আনী, সূরা রূম-এর তাফসীর দ্র.)।

দৃষ্টান্ত-২ ঃ মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কাবাসীর নির্যাতন, নিপীড়ন ও অন্যায়-অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া মদীনাভিমুখে হিজরত করেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন ঃ

إِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ إِلٰى مَعَادٍ قُلْ رَّبِّىْ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔

"যিনি আপনার জন্য কুরআনকে বিধান করিয়াছেন, তিনি আপনাকে অবশ্যই ফিরাইয়া আনিবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে (মক্কা শরীফে)। বলুন, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন, কে সৎপথের নির্দেশ আনিয়াছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে" (২৮ ঃ ৮৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) যে প্রেক্ষাপটে মক্কা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই হিসাবে মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মাত্র আট বৎসরের মাথায় মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল-কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা প্রকাশিত হয় (দ্র. ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল-কুরআনিল 'আযীম, ৩খ., পৃ. ৩৭৭)।

দৃষ্টান্ত-৩ ঃ কুরআনের অলৌকিক সংরক্ষণ

কুরআনের পূর্বে নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহ এখন অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান নাই। উহাতে বহুবিধ বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। স্বয়ং আহলুল-কিতাব ইয়াহূদী-

নাসারাও এই কথা স্বীকার করে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্ আল-কুরআন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ ٠

"আমিই কুরআন নাযিল করিয়াছি এবং আমিই উহার হিফাজতকারী" (১৪ ঃ ৯)।

আল-কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ চৌদ্দ শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু আল-কুরআনের একটি নুক্‌তা ও বিন্দু পর্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই, বিকৃত হয় নাই উহার একটি যের, যবর ও পেশ।

ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে বিনষ্ট করিবার জন্য সকল প্রকারের অপচেষ্টা ও কৌশল চালাইয়াছে। এতদসত্ত্বেও আল-কুরআন বিকৃত করার শত প্রচেষ্টা প্রয়োগেও উহারা সফল হইতে পারে নাই, এবং কস্মিনকালেও সফল হইতে পারিবে না।

পৃথিবীতে কোন গ্রন্থ আদ্যোপান্ত নির্ভুল মুখস্ত করিবার নজীর নাই। কুরআন কারীমই একমাত্র ব্যতিক্রম। হাজার বা লাখ নহে, বরং কোটি কোটি মুসলিমের বক্ষে এই কুরআন নির্ভুলভাবে মুখস্থ রহিয়াছে। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, চার থেকে সাত বৎসরের মুসলিম শিশুরাও সম্পূর্ণ কুরআনকে নির্ভুল ও সহীহ-শুদ্ধভাবে মুখস্থ করিয়া রাখিতেছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আল-কুরআনের এই অলৌকিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা শুধু উহার শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, বরং উহার অর্থ, মর্ম, তাফসীর ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিও অবিকল সংরক্ষিত আছে এবং সূত্র-পরম্পরায় সংকলিত হইয়া আসিতেছে।

কুরআন কারীমের অলৌকিক সংরক্ষণের আরও বিস্ময়কর দিক এই যে, কালের বিবর্তনে প্রত্যেক ভাষাই পরিবর্তিত হয় এবং এক যুগে একটি শব্দ যেই অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে পরবর্তী কালে উহাতে বিবিধ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা সীমিত হইয়া যাওয়া অথবা সীমিত পরিসরের অর্থবাহী শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হওয়া ইত্যাদি। কখনও এমন হয় যে, কালের বিবর্তনে ভাষাটিই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেমন ইবরানী, সুরয়ানী, কালদানী ইত্যাদি ভাষাসমূহ। অতীতে এই সমস্ত ভাষায় আসমানী কিতাব নাযিলও হইয়াছিল। তথাপি এই ভাষাগুলি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ উহা কেবল ইতিহাস হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কুরআন কারীমের প্রতিটি শব্দও ভাষার এই গতানুগতিক বহুল পরিবর্তন সত্ত্বেও আজও পূর্ণ স্বকীয়তাসহ সংরক্ষিত রহিয়াছে। আজও যদি কোন ব্যক্তি জানিতে চাহে যে, আল-কুরআনের অমুক শব্দটি কুরআন নাযিলকালে কী অর্থে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে অতি সহজেই তাহা জানিবার সুযোগ রহিয়াছে।

ফলকথা, কুরআন কারীমের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী চৌদ্দ শত শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আল-কুরআন সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং উপরিউক্ত ঘোষণার সত্যতা দিন দিন যথার্থ ও সঠিক প্রমাণিত হইতেছে।

হিসেবে ... জোড়া। প্রাণীর প্রজনন প্রক্রিয়ায় ইহাকে আমরা জানি শুক্রকীট ও ডিম্বাণু জোড়া নামে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার পরিচয় দেওয়া হয় পজিটিভ ও নেগেটিভ নামে। প্রাণীদেহের সর্বপ্রথম কোষ ভ্রূণের মধ্যে আছে ক্রোমজমের জোড়া। এইভাবে সৃষ্টির সর্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে জোড়ার খেলা। আল-কুরআনের অপর একটি আয়াতে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আন'আমের (চতুষ্পদ জন্তু) মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের জোড়া। এইভাবে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (৪২ ঃ ১১)।

আল-কুরআনের অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই প্রসঙ্গে আরও তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তোমরা তো কিছু কিছু বস্তুর জোড়ার সন্ধান জানিতে পারিয়াছ। কিন্তু অনেক অনেক বিষয় এমনও রহিয়াছে যাহার জোড়ার সন্ধান মানুষ এখনও পাইতে সক্ষম হয় নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

"পবিত্র ও মহান তিনি যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং উহারা যাহাদিগকে জানে না তাহাদিগের প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়া জোড়া করিয়া" (৩৬ ঃ ৩৬; উলূমুল কুরআন, পৃ. ২৭৬)।

(৩) মানবসৃষ্টি ও প্রজনন প্রক্রিয়া ঃ মানুষের সৃষ্টি, বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া, স্ত্রীলোকের গর্ভে মানব ভ্রূণের ক্রমবিকাশ, ... ভ্রূণ ইত্যাদি এবং মানব প্রজনন ও দেহতত্ত্ব সম্পর্কিত জটিল বিষয়সমূহ আধুনিক যুগের পূর্বে মানুষের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এই সমস্ত বিষয় তৎকালের মানুষের কল্পনায়ও আসিত না। অথচ আল-কুরআন এই প্রসঙ্গে সুবিন্যস্ত আলোচনা পেশ করিয়াছে। ইহা আল-কুরআনের একটি পরম বিস্ময়। ভ্রূণের উৎপত্তি ও উহার ক্রম বৃদ্ধি সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۤءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

"আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তাহার পর শুক্র হইতে, তাহার পর রক্তপিণ্ড হইতে, তাহার পর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হইতে—তোমাদের নিকট

ব্যক্ত করিবার জন্য আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তাহার পর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বাহির করি" (২২ ঃ ৫)।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۔

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে, অতপর আমি উহাকে শুক্র বিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপাদ আধারে, পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি 'আলাকে' (রক্তপিণ্ডে)। অতঃপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি গোশ্‌তপিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে। অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢাকিয়া দেই গোশত দ্বারা; অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান" (২৩ ঃ ১২-১৪)।

মানব সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া এবং মাতৃগর্ভে ইহার বিকাশ সম্বন্ধে আল-কুরআনের বিশ্লেষণ বিস্ময়কর। কারণ আজ হইতে চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে যখন আল-কুরআন নাযিল হইয়াছে, তখন এই তথ্য জানিবার কোন উৎস বর্তমান ছিল না (মরিস বুকায়লী, দ্যা বাইবেল, দ্যা কুরআন এণ্ড সায়েন্স, ইউ. এস. এ., ১৯৭৮ খৃ.)।

ভ্রূণ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ড. কেইথ মূর এই প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধে লিখিয়াছেন, মানব ভ্রূণ-এর ক্রমবর্ধন সম্বন্ধে আল-কুরআনের বর্ণনার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের আশ্চর্যজনক মিল রহিয়াছে। তিনি এই কথা ভাবিয়া হতবিহ্বল হইয়াছেন যে, "আল-কুরআনে কীভাবে এই সমস্ত তথ্যের উপস্থিতি সম্ভব হইল, যাহা পাশ্চাত্যবিশ্বে কেবল ১৯৪০ খৃস্টাব্দে প্রথমবার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ড. মূর আরও লিখিয়াছেন, তের শত বৎসর পূর্বে আল-কুরআনে ভ্রূণের বর্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এত সঠিক তত্ত্ব রহিয়াছে যে, মুসলিমগণ যুক্তিযুক্ত কারণেই আল-কুরআনকে স্রষ্টার পক্ষ হইতে নাযিলকৃত গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বাস করিতে পারেন (সূত্র ঃ দি সিটিজেন, ২২ নভেম্বর, ১৯৮৪ খৃ., কানাডা, হিন্দুস্তান টাইমস, ১০ ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৪ খৃ.)। হিন্দুস্তান টাইমস এই তথ্য নিবন্ধের শিরোনাম দিয়াছিল ঃ Qwran Scores Over Modern Science (আল-কুরআন আধুনিক বিজ্ঞানের উপর বিজয় লাভ করিয়াছে)।

দৃষ্টান্ত-৩ ঃ ফির'আওনের মমি

মিসরেরের স্বৈরাচারী বাদশাহ ফির'আওন যখন সৈন্যসমেত নদীতে ডুবিয়া মরিতেছিল, তখন সে জীবন বাঁচাইবার জন্য মৌখিকভাবে প্রতারণামূলক ঈমান আনয়নের ঘোষণা দিল। তাহার এই শঠতাপূর্ণ ঘোষণার জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন।

اٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۔

"এখন (ঈমান আনয়নের ঘোষণা দিতেছ), ইতোপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করিব, যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্পর্কে গাফিল" (১০ ঃ ৯১-৯২)।

যখন এই আয়াত নাযিল হয় তখন এবং তাহারও কয়েক শতাব্দী পর পর্যন্ত কেহই এই কথা জানিত না যে, ফির'আওনের লাশ এখনও পর্যন্ত অটুট রহিয়াছে। কিন্তু কিছু কাল পূর্বে এই লাশের সন্ধান পাওয়া গেল। প্রফেসর লরেট ১৮৯৮ খৃ. মিসরের একটি পুরাতন কবরস্থানে উল্লিখিত ফির'আওনের মমিকৃত লাশের সর্বপ্রথম সন্ধান পান। ৮ জুলাই, ১৯০৭ খৃ. ইলিওট স্মিথ উক্ত লাশের উপর হইতে চাদর সরান এবং ১৯১২ খৃ. ইহার উপর একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশ করেন যাহার নাম The Royal Mummies। ড. মরিস বুকাইল ১৯৭৫ খৃ. ফির'আওনের এই মমিকৃত লাশটি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখেন এবং ইহার উপর একটি নিবন্ধ রচনা করেন। তিনি তাহার নিবন্ধের উপসংহারে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বাক্যে লিখেন, যাহারা পবিত্র গ্রন্থসমূহের সত্যতার ব্যাপারে নূতন দলীল-প্রমাণ তালাশ করেন তাহারা যেন কায়রোয় অবস্থিত মিসরীয় যাদুঘরের রাজকীয় মমি কক্ষ ঘুরিয়া দেখেন। সেখানে আল- কুরআনের ঐ সমস্ত আয়াতের চমৎকার ব্যাখ্যা পাইবেন যাহাতে ফির'আওনের লাশের ব্যাপারে আলোচনা রহিয়াছে (দি বাইবেল দি কুরআন এণ্ড সাইন্স)।

ফলকথা, সপ্তম শতাব্দীতে আল-কুরআন ঘোষণা দিয়াছে যে, ফির'আওনের দেহটি মানুষের জন্য নিদর্শনরূপে সংরক্ষিত রহিয়াছে। আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া আল-কুরআনের এই ঘোষণার সত্যতা চাক্ষুষভাবে পরিস্ফুটিত হইয়া বিশ্ববাসীকে চমকাইয়া দিয়াছে। ইহা কি আল-কুরআনের সত্যতার প্রমাণ নহে? ইহা কি আল-কুরআনের মু'জিযা ও বিস্ময় নহে?

দৃষ্টান্ত-৪ঃ মহাবিশ্বের সূচনা

মহাবিশ্বের শুরু বা সূচনা প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ٠

"যাহারা কুফরী করে তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পর মিশিয়া (সংযুক্ত) ছিল ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে; তবুও কি উহারা বিশ্বাস করিবে না" (২১ ঃ ৩০)?

রাতকু'ন (رتق) শব্দের অর্থ পরস্পরে সংযুক্ত অংশবিশিষ্ট কোন জিনিস অর্থাৎ কোন জিনিসের বিরাজমান সকল অংশ একটি অপরটির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ও সংযুক্ত থাকা। আর ফাতকুন (فتق) শব্দের অর্থ ইহার বিপরীত, অর্থাৎ সংযুক্ত অংশসমূহকে ছিন্নভিন্ন করিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া (ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩খ., পৃ. ১৬৮)। আল-কুরআনের

এই আয়াতটি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নাযিল হয়। আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশ পরস্পর একটি সত্তার সহিত সংযুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক পৃথক রূপদান করিয়াছেন। কুরআন নাযিল হওয়ার পর হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে, মহাবিশ্বের সহিত কী ধরনের আচরণ করা হইয়াছে, যাহাকে রাত্‌কুন (رتق) ও ফাত্‌কুন (فتق) বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

সর্বপ্রথম ১৯২৭ খৃ. সালে ইহার যথার্থ সামনে আসে যখন বিজ্ঞানী জর্জ লিমায়াত্রে (Georges Lemaitre) বিগ ব্যাং (Big Bang) নামক তত্ত্ব পেশ করেন। এই তত্ত্বের সারাংশ এই যে, মহাবিশ্ব প্রথমে সংকুচিত আকারে ছিল, ইহার এক অংশ অপর অংশের সহিত খুব কঠিনভাবে সংযুক্ত ছিল। এই প্রাথমিক পদার্থকে মহাজাগতিক ডিম্ব অথবা Cosmic Egg অথবা Super Atom বলা হয়। অতঃপর মহাজাগতিক ডিম্বে এক মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। ইহাকে বিজ্ঞানীদের ভাষায় 'বিগ ব্যাং' বলা হয়। ইহার ফলে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। তখন হইতে মহাবিশ্ব প্রতি মুহূর্তে সম্প্রসারিত হইতেছে। এই কারণে মহাবিশ্বকে "প্রসারমান মহাবিশ্ব" (Expanding Universe) বলা হয়। আল-কুরআনে মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ প্রসঙ্গেও আলোকপাত করা হইয়াছে।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

"আর আমি আকাশ সৃষ্টি করিয়াছি আমার নিজ ক্ষমতাবলে এবং আমিই উহাকে সম্প্রসারিত করিতেছি (৫১ঃ ৪৭)।"

আধুনিক বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার এই কথাই প্রমাণ করে যে, কুরআন কারীম এক মহাবিস্ময়। ইহা কোন মানব রচিত গ্রন্থ নহে। ইহা এমন এক সত্তার নাযিলকৃত বাণী যাঁহার নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনাপঞ্জী সমভাবে দৃশ্যমান (ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৯৮৪ খৃ. সংস্করণ, সংশ্লিষ্ট শিরোঃ, দ্যা বাইবেল, দ্যা কুরআন এণ্ড সায়েন্স, মরিস বুকাইলী)।

ষষ্ঠ কারণ

কুরআন কারীম শ্রেষ্ঠ মু'জিযা হওয়ার ষষ্ঠ কারণ এই যে, কুরআন কারীমে পূর্ববর্তী উম্মাত, তাহাদের শরী'আত ও তাহাদের ইতিহাস এমন নিখুঁতভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, সেকালের ইয়াহূদী-নাসারাদের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, যাহাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিশেষজ্ঞ মনে করা হইত, তাহারাও এই পরিমাণ অবগত ছিল না। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) (যাঁহার জীবনে এই কুরআন বিবৃত হইয়াছে) এর কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, তিনি কোন শিক্ষিত লোকের সাহায্যও গ্রহণ করেন নাই, কখনও কোন কিতাবও পড়েন নাই। তিনি ছিলেন উম্মী। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থে পৃথিবীর শুরু হইতে তাঁহার যুগ পর্যন্ত অতীতের সকল জাতি, গোষ্ঠী ও উম্মাতের বিস্তারিত ইতিহাস, তাহাদের শরী'আত ও কর্মতৎপরতার বর্ণনা এবং অন্যান্য

প্রসঙ্গ এমন নিখুঁতভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, উহার একটি ক্ষুদ্রতম তথ্যকেও অসত্য প্রমাণিত করা আজ পর্যন্ত কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই, কস্মিনকালেও সম্ভব হইবে না। ইহাই সত্য, ইহাই বাস্তবতা। আল-কুরআনে স্থান পাইয়াছে হযরত নূহ (আ)-এর জাতির চরম আল্লাহদ্রোহিতা ও তাহাদের উপর মহাপ্লাবনরূপী আযাবের ইতিহাস, মাআরিব বাঁধের ধ্বংসের ইতিহাস, হযরত সুলায়মান (আ) ও রানী বিলকীসের রাজত্বের কাহিনী, 'আদ্, ছামূদ, সাবা, তুব্বা, আসহাবুল আয়কাসহ অপরাপর জাতিসমূহের ইতিহাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার পেশা করা হইল।

দৃষ্টান্ত-১ঃ লূত সাগর বা মৃত সাগর

জর্দান ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং উত্তর ও দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত এই সাগরটি 'লূত সাগর' বা 'মৃত সাগর' নামে বিখ্যাত। সাগরটির একমাত্র সংযোগ হইল জর্দান নদীর সহিত। হযরত লূত (আ)-এর জাতির বসবাস ছিল এই অঞ্চলে। সাগরটির দৈর্ঘ্য ৭৭ কিলোমিটার, প্রস্থে ৫ হইতে ১৮ কিলোমিটার। সমুদ্র সমতল হইতে ইহার অবস্থান প্রায় ৪০০ মিটার নীচে। ইহার পানি অত্যধিক লবণাক্ত। সাধারণত সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা প্রতি হাজার গ্রামে ৩.৫ ভাগ। কিন্তু লূত সাগরের পানির লবণাক্ততার পরিমাণ প্রতি হাজার গ্রামে ২৩৮ ভাগ। এই অস্বাভাবিক লবণাক্ততার কারণে উহার পানির ঘনত্বও অনেক অনেক বেশী। ফলে উহাতে কোন প্রাণী ডুবে না। উহার পানি এতই বিষাক্ত যে, উহাতে কোন প্রাণী বাঁচেও না। সাম্প্রতিক কালে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, উহার পানিতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম সালফেট রহিয়াছে। এই সমস্ত রাসায়নিক উপাদানের সামান্য পরিমাণই কোন কিছু বিষাক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। পৃথিবীতে এইরূপ বৈশিষ্ট্যের সমুদ্র দ্বিতীয়টি নাই। ইহার কারণ ও রহস্য কি?

কুরআন কারীম ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছে। বস্তুত এখানে কোন সমুদ্র ছিল না, এখানে ছিল হযরত লূত (আ)-এর জাতির বাসস্থান। তাহারা যখন আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করিয়া চরম পাপাচারে লিপ্ত হইল, এমনকি সমকামিতার ন্যায় ঘৃণ্য অপরাধে নিজদেরকে অভ্যস্ত করিয়া তুলিল, তখন মহান রাব্বুল 'আলামীন তাহাদেরকে কঠিন শাস্তি দিলেন। তাহাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষিত হইল। তাহাদের বসতীসহ তাহাদের ভূখণ্ডকে উল্টাইয়া দেওয়া হইল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۔ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اِلاَّ امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۔ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۔

"এবং লূতকেও পাঠাইলাম। সে তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। তোমরা তো কামতৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন করিতেছ ! তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, ইহাদেরকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত কর। ইহারা তো এমন লোক, যাহারা অতি পবিত্র হইতে চাহে। অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। তাহার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের উপর বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর" (৭ ঃ ৮০-৮৪)।

সূরায়ে হূদে আরও স্পষ্ট ভাষায় তাহাদের জনপদ উল্টাইয়া ধ্বংস করিবার কথা বিবৃত হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ . مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ .

"অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিল তখন আমি জনপদকে উল্টাইয়া দিলাম এবং উহাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম প্রস্তর কংকর যাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। ইহা জালিমদের হইতে দূরে নহে" (১১ ঃ ৮২-৮৩)।

অভিশপ্ত লূত জাতির ধ্বংসের পর আল্লাহ তা'আলা ইহাকে ভবিষ্যত মানুষের নিকট দৃষ্টান্ত স্থল হিসাবে চিরস্থায়ী করিয়াছেন। ইহাই আজকের লূত সাগর বা মৃত সাগর (দ্র. তাফসীর গ্রন্থসমূহে সূরা হূদ ও সূরা আ'রাফ-এর সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর)।

দৃষ্টান্ত-২ ঃ মাআরিব বাঁধ

কুরআন কারীম ইয়ামানের 'সাবা' সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক 'মাআরিব বাঁধ' সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান করিয়াছে। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার কালে ইহা ছিল মানুষের অজানা। সাম্প্রতিক কালের প্রখ্যাত ইউরোপীয় পর্যটক আর্নাড মাআরিব বাঁধ প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, কুরআন কারীমে বর্ণিত স্থানে যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ মাআরিব বাঁধ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কালের বিবর্তনে এখনও বাঁধটির এক-তৃতীয়াংশ দেওয়াল টিকিয়া রহিয়াছে (দ্র. তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ, ফাওয়ায়িদে উছমানী, পৃ. ৫৫৭)।

দৃষ্টান্ত-৩ ঃ হযরত নূহ (আ)-এর জাতির পরিণতি

হযরত নূহ (আ)-এর জাতি তাঁহার দাওয়াত অস্বীকার করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে মহাপ্লাবনের আযাব দ্বারা ধ্বংস করিয়াছেন। ঈমানদারগণকে রক্ষার জন্য আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ)-কে বিশালাকৃতির একটি নৌযান তৈরীর নির্দেশ দেন। নির্ধারিত সময়ে প্লাবন আরম্ভ হয়। হযরত নূহ (আ) ঈমানদারগণকে লইয়া নৌযানে আরোহণ করেন। মহাপ্লাবনের অথৈ

পানিতে নৌযান ভাসিয়া চলিল। অবশেষে প্লাবন অপসৃত হইলে তাঁহার নৌযানটি জুদী পর্বতের শীর্ষচূড়ায় গিয়া থামিল (সূরা হূদ ঃ ৪৪)।

কুরআন কারীমে হযরত নূহ (আ)-এর জাতির ধ্বংস এবং তাঁহার ও তাঁহার ঈমানদার সহচরবৃন্দের নৌযানে নিরাপদ থাকার এই ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক কালে আল-কুরআনের এই ঐতিহাসিক তথ্য বাস্তবে প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯৫০ সালে নাসার বিজ্ঞানীগণ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তুরস্কের একটি পর্বত শৃঙ্গের নিকটবর্তী ভূতলে মানব চক্ষু সদৃশ্য একটি চিত্রের সন্ধান পান। তৎপর বিজ্ঞানিগণ উহার রহস্য উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের পর তাহারা আল-কুরআনে বর্ণিত জুদী পর্বতের নিকটবর্তী ভূতলে একটি বিশালাকৃতির নৌযানের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন। এই দীর্ঘ গবেষণা ও অনুসন্ধান কর্মে প্রধান ভূমিকা পালন করেন ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী মি. জোন্স। মি. জোন্স তাহার মন্তব্যে বলিয়াছেন, 'তাহার শতভাগ বিশ্বাস, ইহা সেই নূহ (আ)-এর নৌযানেরই অংশবিশেষ। আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত এই ধ্বংসাবশেষের অবিকল মিল রহিয়াছে (সূত্র ঃ বিদেশী পত্রিকা অবলম্বনে সাপ্তাহিক মেঘনা, ২০ জুলাই, ১৯৯৪ খৃ. সংখ্যা)।

সপ্তম কারণ

কুরআন কারীম মু'জিযা হওয়ার সপ্তম কারণ এই যে, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তরে নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কে এমন সব তথ্য প্রদান করা হইয়াছে যাহা পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তিতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 'মানুষের অন্তরে নিহিত বিষয়াদি জানা এবং তাহা যথাযথভাবে ব্যক্ত করা' একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ। কোন মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে।

দৃষ্টান্ত ঃ ১

তাবূক অভিযানকালে কতিপয় মুনাফিক অভিযানে না যাওয়ার জন্য নানা ছল-চাতুরী ও ফন্দি-ফিকির আঁটিতেছিল। তাহাদের কেহ কেহ মনে মনে বলিল, এখন গ্রীষ্মের সময়, প্রচণ্ড খরা, উত্তপ্ত লু-হাওয়া। উপরন্তু চরম অভাব-অনটন। এই সময় ঘর হইতে বাহির হওয়া সমীচীন হইবে না। জা'দ ইব্ন কায়স নামক জনৈক মুনাফিককে ডাকাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, জা'দ! তুমি কি অভিযানে যাইবে না? জা'দ উত্তরে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! খৃস্টানদের দেশে আমাকে ফ্যাসাদে ফেলিবেন না। কারণ আমি হইলাম কামুক মানুষ। রূপবতী খৃস্টান নারীদিগকে দেখিয়া নিজকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইব না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যাইও না। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি বলিল, এমন দুর্দিনে এত দূরদেশে অভিযানে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া কিছুই নহে। কাল শুনিতে পাইবে, মুহাম্মাদ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দকে খৃস্টানগণ শক্ত রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অপর এক মুনাফিক বলিল, শুধু বাঁধিয়া কেন? তাহাদের প্রত্যেককে এক শত করিয়া চাবুক মারিলে ভাল হইবে। মুনাফিকরা তাহাদের মনের লুকায়িত এই সমস্ত কথাবার্তা ও ছল-চাতুরী সম্পর্কে খুব-ই ভীত ও আতংকিত ছিল, না

জানি কুরআন আমাদের মনের এই লুকায়িত বিষয় ফাঁস করিয়া দেয়। তবে তো সর্বনাশ হইবে। অবশেষে তাহাদের আশংকাই সত্য হইল। আল-কুরআন তাহাদের সকল গোপন বিষয় ফাঁস করিয়া দিল।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْاْ اَنْ يُّجَاهِدُوْاْ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْاْ لاَ تَنْفِرُوْاْ فِى الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًا لَوْ كَانُوْاْ يَفْقَهُوْنَ ٠

"যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিয়া থাকাতেই আনন্দ লাভ করিল এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপছন্দ করিল এবং তাহারা বলিল, তোমরা গরমের মধ্যে অভিযানে বাহির হইও না। হে রাসূল! বলুন, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম, যদি তাহারা বুঝিত" (৯ঃ ৮১)।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ٠ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ٠

"মুনাফিকরা ভয় করে, এমন এক সূরা না অবতীর্ণ হয়, যাহা তাহাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করিয়া দিবে। আপনি বলুন, বিদ্রুপ করিতে থাক, তোমরা যাহা ভয় কর আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন। আপনি উহাদেরকে প্রশ্ন করিলে উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে বিদ্রুপ করিতেছিলে" (৯ঃ ৬৪-৬৫)?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلاَ تَفْتِنِّيْ اَلاَ فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْاْ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ٠

"উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন, আমাকে ফেতনায় ফেলিবেন না। সাবধান! উহারাই ফেতনায় পড়িয়া আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে বেষ্টন করিয়াই আছে" (৯ঃ ৪৯)।

কুরআন কারীম যখন তাহাদের অন্তর্নিহিত এই সমস্ত কুমতলব ফাঁস করিয়া দিল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আম্মার (রা)-কে বলিলেন, তুমি যাইয়া তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা কি কি কথা বলিয়াছে? রাসূলুল্লাহ (স) 'আম্মারকে কথাগুলি জানাইয়া দিলেন। হযরত 'আম্মার (রা) যখন তাহাদেরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাহারা প্রমাদ গণিল। হায়, সর্বনাশ! গত্যন্তর না দেখিয়া তাহারা দ্রুত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে হাজির হইল এবং বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আসলে হাসি-তামাসা করিয়া এই সমস্ত বলিয়াছি, আপনার

প্রতি শত্রুতা করিয়া বলি নাই (ইবনুল কায়্যিম, আল-জওজিয়্যা, ৩খ., পৃ. ৫২৯; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩২১)।

দৃষ্টান্ত ঃ ২

নবূওয়াতের চতুর্দশ বৎসরের মুহাররমে কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতী তৎপরতা প্রতিরোধ করিবার জন্য একটা কার্যকর উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এক গোপন বৈঠকে সমবেত হয়। কুরায়শদের প্রসিদ্ধ নেতৃবৃন্দ এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিল। বৈঠকে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ আলোচিত হয়।

১. মুহাম্মাদের হাতে-পায়ে বেড়ী লাগাইয়া কারাবাসে নিক্ষেপ করা হউক।

২. তাহাকে একটি পাগলা উটের পিঠে বসাইয়া দেশান্তর করা হউক।

৩. তাহাকে হত্যা করা হউক।

দীর্ঘ আলোচনার পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। কুরায়শগণ এই বৈঠকটি অতি গোপনে করিয়াছিল এবং বৈঠকের বিষয়বস্তুও যথাসাধ্য গোপন রাখিয়াছিল। কিন্তু আল-কুরআন তাহাদের এই অতি গোপনীয় বৈঠকের যাবতীয় কার্যক্রম ফাঁস করিয়া দিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.

"স্মরণ কর, কাফিরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করিবার জন্য, হত্যা করিবার জন্য অথবা নির্বাসিত করিবার জন্য এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আর আল্লাহ কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" (৮ ঃ ৩০; ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৪৮০)।

দৃষ্টান্ত ঃ ৩

মদীনার মুনাফিকরা সর্বদা এই চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল যে, কি উপায়ে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করা যায়। এই কুমতলবে তাহারা কুবা মসজিদের নিকটবর্তী মহল্লায় একটি মসজিদ তৈয়ার করিল। রাসূলে কারীম (স) তাবূক অভিযানে রওয়ানার প্রাক্কালে তাহারা তাঁহার খিদমতে হাজির হইয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! পীড়িত, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকেরা মসজিদে নববীতে কিংবা কুবা মসজিদে যাইতে পারে না। তাহাদের জামা'আতে নামায আদায়ের সুবিধার জন্য আমরা একটি মসজিদ তৈয়ার করিয়াছি। মেহেরবানী করিয়া আপনি উক্ত মসজিদে একবার নামায পড়িয়া উদ্বোধন করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এখন তো আমি তাবুকে রওয়ানা হইয়াছি। ফিরিবার পর দেখা যাইবে। রাসূলে করীম (স) তাবূক হইতে ফিরিবার পথে তাহাদের মসজিদে গমনের ইচ্ছা করিলেন। তখন আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে তাহাদের গোপন উদ্দেশ্য ফাঁস করিয়া দেওয়া হয় এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে সেখানে যাইতে নিষেধ করা হয়।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۔ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ۔ اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۔ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۔

"যাহারা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতোপূর্বে আল্লাহ ও তাহার রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করিয়াছে তাহার গোপন ঘাটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাহারা অবশ্যই শপথ করিয়া বলিবে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই ইহা করিয়াছি। আল্লাহ সাক্ষী, তাহারা তো মিথ্যাবাদী। তুমি ইহাতে কখনও দাঁড়াইও না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হইতেই স্থাপিত হইয়াছে তাকওয়ার উপর, উহাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। তথায় এমন লোক আছে যাহারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন। যে ব্যক্তি তাহার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্ভীতি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তাহার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাতের ধ্বংসোন্মুখ কিনারায়, ফলে যাহা উহাকেসহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। উহাদের গৃহ যাহা উহারা নির্মাণ করিয়াছে তাহা উহাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হইয়া থাকিবে যে পর্যন্ত না উহাদের অন্তর ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়" (৯ঃ ১০৭-১১০)।

উক্ত আয়াতগুলি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তথাকথিত মসজিদ নামক কাফিরদের আড্ডাখানা ধ্বংস করিবার জন্য একদল সাহাবীকে প্রেরণ করেন। তাহারা আগুন লাগাইয়া উহাকে ভস্মীভূত করিয়া দেন (ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৫২৯)।

এইভাবে আল-কুরআন মানুষের অন্তরে নিহিত বিষয়কে প্রকাশ করিয়া শ্রেষ্ঠতম মু'জিযার আসন অলংকৃত করিয়াছে।

অষ্টম কারণ

আল-কুরআনে এমন কতিপয় আয়াত রহিয়াছে, যাহার মধ্যে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সম্পর্কে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, অমুকের দ্বারা অমুক কাজটি হইবে না বা তাহারা অমুক কাজটি করিতে পারিবে না। আল-কুরআন অস্বীকারকারীদের পক্ষে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

করিয়া উক্ত কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কুরআন কারীমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অতি সহজ ছিল। অথচ কাফিরদের কেহই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আগাইয়া আসে নাই। ইহাতে আল-কুরআনের সত্যতাই প্রমাণিত হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত-১ ঃ ইয়াহূদীদের প্রতি মৃত কামনার চ্যালেঞ্জ

আল-কুরআনে ইয়াহূদীদের সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۔ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۔

"বলুন, যদি আল্লাহ্‌র নিকট আখিরাতের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর— যদি সত্যবাদী হও। কিন্তু তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না এবং আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে অবহিত। আপনি নিশ্চয় তাহাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমনকি মুশরিক অপেক্ষা অধিক লোভী দেখিতে পাইবেন। তাহাদের প্রত্যেকে সহস্র বৎসর বাঁচিবার আকাঙক্ষা করে, কিন্তু দীর্ঘায়ু তাহাদেরকে শাস্তি হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। তাহারা যাহা করে আল্লাহ উহার দ্রষ্টা" (২ ঃ ৯৪-৯৬)।

এই একই প্রসঙ্গে সূরা জুমু'আয় ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۔ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۔

"বলুন, হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নহে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তাহারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। বলুন, তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন কর সেই মৃত্যু তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাত করিবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে" (৬২ ঃ ৬-৮)।

আলোচ্য চ্যালেঞ্জের সারাংশ এই যে, যদি ইয়াহূদীরা নিজদেরকে মহান আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র ও পছন্দনীয় বান্দা হওয়ার দাবি করে এবং তাহারা যদি মনে করে যে, এই দাবিতে তাহারা সত্যবাদী , তবে তো তাহারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট যাইতে অধিক পছন্দ করিবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তাহাদের পক্ষে নিজেদের জন্য মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় হইতে পারে না। কিন্তু কখনও তাহারা ইহা কামনা করে নাই।

দৃষ্টান্ত-২ ঃ খৃস্টানদের প্রতি মুবাহালার চ্যালেঞ্জ

নাজরানের খৃস্টান পাদ্রীদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মাদ! ঈসা (আ) সম্বন্ধে আপনার মত কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা আমার এখানে কিছু সময় অপেক্ষা কর। এই সম্বন্ধে মহান আল্লাহ আমাকে যাহা জানাইবেন আমি তোমাদেরকে তাহা জানাইয়া দিব। কিছুক্ষণ পর নাযিল হইল ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۔ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۔

"আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলাম। অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলাম, হও, ফলে সে হইয়া গেল। এই সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে। সুতরাং তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না" (৩ ঃ ৫৯-৬০)।

হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধে কুরআনের এই ব্যাখ্যা নাজরানের খৃস্টান পাদ্রীগণ মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল। তখন কুরআন তাহাদেরকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়া বলিল ঃ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۔ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

"তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর যে কেহ এই বিষয়ে তোমার সহিত তর্কে লিপ্ত হয় তাহাকে বল, আইস! আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারিগণকে ও তোমাদের নারিগণকে, আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে। অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র লা'নত। নিশ্চয় ইহা সত্য বৃত্তান্ত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম প্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়" (৩ ঃ ৬১-৬২)।

এই মুবাহালার চ্যালেঞ্জের পর খৃস্টানগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করিল এবং জিযয়া প্রদানের শর্তে নিরাপত্তা চুক্তি করিতে বাধ্য হইল (ইবন কাছীর, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ১০৬)।

فَانْ تَوَلَّوْا فَانَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ·

"যদি তাঁহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবগত" (৩ ঃ ৬৩)।

এইভাবে কুরআনের ঘোষণাই সত্য হইল যে, ইহারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী। ইহারা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আগাইয়া আসিবে না।

দৃষ্টান্ত-৩ ঃ আবূ লাহাব ও তাহার স্ত্রীর ধ্বংসযজ্ঞ

আবূ লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে অন্যতম। সে ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরম শত্রু। সে নানাভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-কে কষ্ট দিত। নবূওয়াতের তৃতীয় বৎসরে যখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ·

"আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন" (২৬ ঃ ২১৪) তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাফা পর্বতে আরোহণ করিয়া কুরায়শ গোত্রকে আহবান করেন এবং তাহাদেরকে শিরক ও কুফরের কারণে কঠিন আযাবের মুখামুখি হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করেন। পিতৃব্য আবূ লাহাব এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল ঃ تبا لك الهذا جمعتنا 'ধ্বংস হউক তোমার ! এইজন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্র করিয়াছ"? অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (স)–কে পাথর মারিতে উদ্যত হইল। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন ঃ

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ · مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ · سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ·

"ধ্বংস হউক আবূ লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও। তাহার ধন-সম্পদ ও তাহার উপার্জন তাহার কোন কাজে আসে নাই। অচিরেই সে দগ্ধ হইবে লেলিহান অগ্নিতে" (১১১ ঃ ১-৩)।

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করিত। সেও তাহার স্বামীর সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরোধিতায় সমভাবে জড়িত ছিল। সূরার শেষাংশে তাহার পরিণতির কথাও ব্যক্ত হইয়াছে।

وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ·

"এবং তাহার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে, তাহার গলদেশে পাকানো রশি" (১১১ ঃ ৪-৫)।

আল-কুরআনে বর্ণিত আবূ লাহাব ও তাহার স্ত্রীর এই করুণ পরিণতি এক শতভাগ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। তাহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাহাদের কোন উপকারে আসে নাই। আবূ লাহাব প্লেগে আক্রান্ত হয়। সংক্রমণের ভয়ে তাহার পরিবারের লোকজন তাহাকে বিজন ভূমিতে রাখিয়া আসে। শেষ পর্যন্ত এই করুণ অসহায়ত্বের মধ্যে সে মারা যায়। অনুরূপ তাহার

স্ত্রী পাহাড় হইতে লাকড়ীর বোঝা বহনকালে বোঝা ফসকাইয়া গলায় ফাঁস খায় এবং এই অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয় (ফাওয়াইদে উছমানী, পৃ. ৭৯০-৭৯১)।

নবম কারণ

কুরআনুল কারীমের একটি অন্যতম মু'জিযা এই যে, কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করিলে কিংবা উহার তিলাওয়াত শ্রবণ করিলে মুসলিম-কাফির, সাধারণ-অসাধারণ, মানব-দানব নির্বিশেষে সকলের উপরই একটি বিশেষ ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হয়। কুরআন কারীম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের তিলাওয়াতে বা শ্রবণে ইহা পরিলক্ষিত হয় না। এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ٠

"মু'মিন তো তাহারাই যাহাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন উহা তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে" (৮ ঃ ২)।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ٠

"আল্লাহ নাযিল করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব, যাহা সুসামঞ্জস্য এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাতে, যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাহাদের দেহ-মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই" (৩৯ ঃ ২৩)।

জিন জাতির উপর কুরআন শ্রবণের প্রভাব সম্বন্ধে স্বয়ং জিনদের ভাষ্য আল-কুরআনে বিবৃত হইয়াছে ঃ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ٠ يَّهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ٠

"বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হইয়াছে যে, জিনদিগের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি যাহা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা ইহাতে ঈমান আনিয়াছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের শরীক স্থির করিব না" (৭২ ঃ ১-২)।

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۔ قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔

"স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জিনকে, যাহারা কুরআন পাঠ শুনিতেছিল। যখন তাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন একে অপরকে বলিতে লাগিল, তোমরা চুপ করিয়া শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হইল তখন তাহারা উহাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপে। তাহারা বলিল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা নাযিল করা হইয়াছে মূসার পরে। ইহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন" (৪৬ ঃ ২৯-৩০)।

মুশরিক ও কাফির শ্রবণকারীর উপর আল-কুরআন তিলাওয়াতের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার অসংখ্য ঘটনা হাদীছ গ্রন্থসমূহে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কয়েকটি ঘটনা পেশ করা হইল।

(এক) হযরত যুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা) তাহার ইসলাম গ্রহণের পূর্বের একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পাঠ করিতেছিলেন। আমি শুনিতেছিলাম। মনে হইল যেন আমার হৃদয় উড়িয়া যাইতেছে। তিনি বলেন, সেই দিনের কুরআন তিলাওয়াতই আমার উপর প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আয়াতগুলি ছিল এই ঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۔ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۔ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۔ اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۔

"উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে, না উহারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি উহারা আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং উহারা তো অবিশ্বাসী। তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি উহাদের নিকট রহিয়াছে, না উহারা এই সমুদয়ের নিয়ন্তা? নাকি উহাদের কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া উহারা শ্রবণ করে? থাকিলে উহাদের সেই শ্রোতা স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করুক" (৫২ ঃ ৩৫-৩৮)।

অপর একদিনের ঘটনা। রাসূলে কারীম (স) সূরা তূর তিলাওয়াত করিতেছিলেন। যুবায়র শুনিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) যখন إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ . "তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী" (৫২ ঃ ৭) আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন তখন যুবায়রের মনে হইতেছিল, সেই শাস্তি যেন তাহার উপরই আপতিত হইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলেন (যারকাশী, আল-বুরহান, ২খ., পৃ. ১১৪)।

(দুই) হিজরতের পূর্বে মক্কার কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইসলাম প্রচার কার্য বন্ধ করিবার জন্য সাধ্যমত সকল চেষ্টাই করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। শেষ পর্যন্ত তাহারা ভাবিল, সম্ভবত মুহাম্মাদ (স)-এর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকিত পারে। অন্যথা সে এই ইসলামের জন্য এত কষ্ট-ক্লেশ কেন সহ্য করিতেছে। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন, জড়বাদী, দুনিয়া প্রেমিক মুশরিকদের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শানে এইরূপ চিন্তার চাইতে ভাল কিছু চিন্তা করিবার অবকাশ ছিল কোথায়? তাহারা পরামর্শ করিয়া 'উৎবা ইবন রবী'আকে রাসূলুল্লাহ (স) সমীপে প্রেরণ করিল। উদ্দেশ্য, রাসূলুল্লাহ (স)-কে দাওয়াতী মিশন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য কতিপয় লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করা। 'উৎবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে হাযির হইয়া বলিল, মুহাম্মাদ! আমি কিছু প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছি। আপনি যাহা পছন্দ করিবেন, আমরা তাহাই পূরণ করিব। তবুও আপনাকে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা ছাড়িতে হইবে এবং নূতন ধর্মাদর্শের প্রচার বন্ধ করিতে হইবে। আমাদের প্রস্তাবগুলি এই ঃ

১. আপনি গোটা আরবের নেতৃত্ব করিতে চাহিলে আমরা আপনাকে নেতা মানিয়া লইতে রাজি আছি।

২. অথবা আপনি বিশাল ধনৈশ্বর্যের মালিক হইতে চাহিলে আমরা আপনার জন্য উহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

৩. অথবা আপনি কোন পরমা সুন্দরী মহিলার পাণি গ্রহণ করিতে চাহিলে আমরা আপনার জন্য উহার বন্দোবস্ত করিতেও রাজি আছি।

'উৎবার বক্তব্য সমাপ্ত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহার কোন উত্তর না দিয়া বরং কুরআন কারীম হইতে দুইটি আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .

"বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে" (১৮ ঃ ১১০)।

আয়াতটির শ্রবণ 'উৎবাকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করিল যে, সে আর কিছু না বলিয়া সোজা কুরায়শদিগের নিকট ফিরিয়া গেল এবং বলিল, মুহাম্মাদ যাহা পাঠ করে তাহা কস্মিনকালেও কবিতা নহে। ইহা অন্য কিছু। আমার মতে তোমরা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা পরিত্যাগ কর। তাঁহাকে স্বাধীনভাবে তাঁহার ধর্মাদর্শ প্রচার করিতে দাও। তিনি যদি সফল হন, ইহাতে তোমাদেরই মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। অন্যথা আরবদের হাতে তিনি নিহত ও ধ্বংস হইবেন (ইবন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৯৩)।

(তিন) হযরত উমার ফারূক (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘোরতর শত্রু ছিলেন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, একদিন রাত্রিকালে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে ব্যঙ্গোক্তি ও বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। তখন তিনি কা'বা গৃহে নামায পড়িতেছিলেন। আমি তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়া শুনিলাম, তিনি সূরা আল-হাক্কাহ তিলাওয়াত করিতেছেন। আমি নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার তিলাওয়াত শুনিতে থাকিলাম। মুহূর্তে মুহূর্তে আমার হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল। আমি মনে মনে বলিলাম, কুরায়শরা যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক। 'ইনি একজন মস্তবড় কবি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) পড়িতে লাগিলেন ঃ

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ. وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ .

"নিশ্চয় এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা। ইহা কোন কবির রচনা নহে। তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর" (৬৯ ঃ ৪০-৪১)।

আমি মনে মনে বলিলাম, ইনি একজন মন্ত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অন্যথা আমার মনের ভাব তিনি কিভাবে জানিলেন? তৎক্ষণাত তিনি পড়িতে লাগিলেন ঃ

وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ. تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

"ইহা কোন গণকের কথাও নহে। তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে নাযিলকৃত" (৬৯ ঃ ৪২-৪৩)।

এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স) সূরাটির তিলাওয়াত শেষ করিলেন। ইহাতে আমার অন্তরে ইসলাম যথেষ্ট স্থান করিয়া লইল" (আহমাদ, মুসনাদ, ১খ., পৃ. ১৭)।

এই ঘটনার কিছু দিন পর তিনি কাফিরদের প্ররোচনায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার জন্য রওয়ানা হন। পথে নু'আয়ম ইবন আবদুল্লাহ তাহাকে বলিল, উমার! প্রথমে নিজের ঘর সামলাও। দেখ, তোমার ভগ্নি ফাতিমা ও তোমার ভগ্নিপতি সা'ঈদ ইতোমধ্যে ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছে। এই সংবাদে হযরত 'উমার অগ্নিসম হইয়া উঠিলেন। তিনি দ্রুত ফাতিমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন ফাতিমা ও তাঁহার স্বামী গৃহাভ্যন্তরে অতি গোপনে সূরা তাহা তিলাওয়াত করিতেছিলেন। উমারকে দেখিয়া ফাতিমা আয়াতগুলি লুকাইয়া ফেলিলেন। উমার তাঁহাদের উভয়কে আঘাত করিলেন। কিন্তু ফাতিমা ও তাঁহার স্বামী তাঁহাদের ঈমানের উপর অটল রহিলেন। তাঁহাদের নির্ভীকতা ও ইসলামের জন্য নিষ্ঠা উমারকে ভাবাইয়া তুলিল। উমার

বলিলেন, এতক্ষণ তোমরা যাহা পড়িতেছিলে তাহা আমার সামনে পেশ কর। ফাতিমা লিখিত সূরা 'তাহা'র আয়াতগুলি উমারের সামনে পেশ করিলে উমার একমনে আয়াতগুলি পাঠ করিলেন। তিনি যখন এই আয়াতে পৌঁছিলেন ঃ

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ·

"আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত আদায় কর" (২০ ঃ ১৪) তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আল-কুরআনের আলৌকিক প্রভাব তাঁহার দেহ-মনকে শিহরিত করিয়া তুলিল। তিনি এক নূতন আলোর সন্ধান পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ·

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল" (ইবনুল জাওযিয়্যা, তারীখ উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ১০-১১)।

দশম কারণ ঃ কুরআন কারীম শ্রেষ্ঠ মু'জিযা হওয়ার দশম কারণ এই যে, কুরআন শরীফ বারংবার পাঠ করিলেও উহার স্বাদ শেষ হয় না, বরং উহার প্রতি আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাকে যতই পাঠ করা হয় বা শ্রবণ করা হয়, কখনও ইহার প্রতি বিতৃষ্ণাভাব সৃষ্টি হয় না, বরং প্রত্যেকবারই এক অনাবিল আনন্দ ও নূতন এক অভাবনীয় পুলক অনুভূত হয়। ইহা আল-কুরআনেরই বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে যত ভাল ও আকর্ষণীয় পুস্তকই হউক এবং উহার সাবলীলতা ও অলংকারপূর্ণতা যতই সমৃদ্ধ হউক না কেন, মানুষ উহা একবার বাড়নের দুইবার পাঠ বা শ্রবণ করিবার পর পুনরায় উহাকে পাঠ করিতে বা শ্রবণ করিতে আগ্রহ অনুভব করে না। কিন্তু পৃথিবীতে একমাত্র গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম যাহা যত বেশী পাঠ করা হয় ততই উহার প্রতি মনের আগ্রহ, আবেগ ও উচ্ছ্বাস বাড়িতে থাকে। আল-কুরআনের পাঠ বা শ্রবণ কত যে আনন্দদায়ক, কত যে মধুময়, কত যে আত্মার প্রশান্তিদায়ক! রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) কুরআন নাযিলের সূচনা কালে সারা রাত নামাযে কুরআন তিলাওয়াতে কাটাইয়া দিতেন। তাঁহারা এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিতেন যে, তাঁহাদের পা ফুলিয়া যাইত (মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত, পৃ. ৮৪৪)।

যুগ যুগ ধরিয়া আল-কুরআন পঠিত হইতেছে। সূরা ফাতিহার কথাই ধরুন। প্রত্যেক মুসলিম প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি রাক'আতে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। ফরয, সুন্নাত ও নফল নামাযে তিনি কতবার এই সূরাটি পাঠ করিতেছেন? কিন্তু কেহ কি কোন দিন শুনিয়াছে যে, কাহারও নিকট ইহার বারবার আবৃত্তি বিরক্তিকর মনে হইয়াছে।

অতএব কুরআন কারীম এক মহাগ্রন্থ, মহাবিস্ময়, একটি মু'জিযা। মু'জিযার যত দিক ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে উহার সকল দিক বিচারেই ইহা মু'জিযা; বরং ইহার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই এক একটি পূর্ণ মু'জিযা। আল-কুরআন অসংখ্য মু'জিযার কেন্দ্রবিন্দু।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, মাতবা'আ আসাহ্হুল-মাতাবি', দিল্লী তা.বি.; (২) ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, মাতবা'আ. মুস্তাফা বাবিল-হালাবী, মিসর ১৯৫৫ খৃ.; (৩) ইবন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ঈসাল বাবিল-হালাবী, কায়রো ১৯৬৪ খৃ.; (৪) ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ.; (৫) ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, মাকতাবাতুশ শারকিল ইসলামিয়্যা, কায়রো ১৯৭৭ খৃ.; (৬) মুফতী মুহাম্মাদ শফী' মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত খাদেমুল হারামাঈন শরীফাঈন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, সৌদী আরব, তা. বি.; (৭) যারকাশী, আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, ঈসাল বাবিল হালাবী, ১৩৭৬ হি.; (৮) কাযী সুলায়মান সালমান মনসূর পূরী, রাহমাতুললিল-'আলামীন, হানীফ বুক ডিপো, দিল্লী ১৯৫৩ খৃ.; (৯) 'আল্লামা তাকী 'উছমানী, 'উলূমুল কুরআন, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, তা.বি.; (১০) মুফতী মুহাম্মাদ 'উবায়দুল্লাহ, কুরআন সংকলনের ইতিহাস, দারুল কিতাব, ঢাকা ২০০০ খৃ.; (১১) আল-বাকিল্লানী, ই'জাযুল কুরআন, মাতবা'আ হিজাযী, কাহিরা ১৩৬৮ হি.; (১২) শায়খ ইউসুফ বিন্নুরী, ইয়াতীমাতুল বায়ান লি মুশকিলাতিল কুরআন, মজলিসে 'ইলমী, ডাভেল, হিন্দ, ১৩৫৭ হি; (১৩) শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলাভী, আল-ফাওযুল কাবীর, মাকতাবাই তায়্যিবাহ, সাহারানপুর, তা.বি.; (১৪) শায়খ আবদুল হক হাক্কানী, আল-বায়ান ফী-'উলূমিল কুরআন, মাতবা'আ না'ঈমিয়্যা, দেওবন্দ, তা. বি.; (১৫) মরিস বুকায়লী, দ্যা বাইবেল দ্যা কুরআন এণ্ড সায়েন্স, ইউ. এস. এ. ১৯৭৮ খৃ.; (১৬) শাব্বীর আহমাদ 'উসমানী, তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ, দারুত-তাসনীফ, করাচী, তা.বি.; (১৭) ইবনুল জাওযিয়্যা, তারীখু উমার ইবনুল খাত্তাব, মাতাবা'আতুত তাওফীকিল আসরিয়্যা, মিসর ১৯৫৯ খৃ.; (১৮) 'আল্লামা সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, কাহিরা ১৩৬৮ হি.।

মাসঊদুল করীম

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে রাব্বুল ‘আলামীন হিদায়াতের অনুপম বাণী ও সত্য দীনসহ এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি উহাকে সত্যায়ন করিবার জন্য তাঁহাকে যেই সকল অকাট্য দলীল ও দীপ্তিমান মু‘জিযা প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অনন্য মু‘জিযা হইল ‘ইন্‌শিকাকুল কামার’ বা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা। ইহা ঐ সকল মু‘জিযার অন্তর্ভুক্ত যাহার মুকাবিলা করা গোটা মানবজাতি তথা সৃষ্টিজগতের কাহারও পক্ষে অসম্ভব। ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সংঘটিত হইয়াছে। আল-কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ এই প্রসঙ্গটি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ . وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ . وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ . وَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ .

“কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে। উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, ইহা তো চিরাচরিত জাদু। উহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছিবে। উহাদের নিকট আসিয়াছে সুসংবাদ, যাহাতে আছে সাবধান বাণী” (৫৪ ঃ ১-৪)।

চন্দ্র বিদীর্ণকরণ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কুরআন গবেষকগণ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। উল্লিখিত আয়াতগুলির শুভ সূচনা মহান রাব্বুল ‘আলামীন কিয়ামত আসন্ন হওয়ার সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার পর তিনি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনন্য মু‘জিযা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার বিষয়ে এক সংক্ষিপ্ততম অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত চাঁদ প্রদর্শন সন্দেহাতীতভাবে যেমন একটি অনন্য মু‘জিযা, তেমনি ইহা আসন্ন কিয়ামতের একটি বড় আলামতও বটে। কেননা মহান আল্লাহ্‌র সীমাহীন কুদরতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রদর্শিত হওয়াটাই প্রমাণ করে যে, কিয়ামতে সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাওয়া তেমন কোন অসম্ভব ব্যাপার নহে।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন, মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিল, তুমি যদি তোমার দাবিতে সত্যবাদী হও তাহা হইলে আমাদের সামনে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাও। তাহারা সকলেই এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল যে, তিনি যদি এই মু‘জিযা প্রদর্শন করিতে পাবেন তবে তাহারা ঈমান আনয়ন করিবে। তখন ছিল

পূর্ণিমার রাত। ঈমান গ্রহণ করার শর্তে কাফির-মুশরিকদের দাবি পূর্ণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) মহান আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে চন্দ্রকে বিদীর্ণ করেন। ইহার অর্ধেক সাফা পর্বতে এবং বাকী অর্ধেক সাফার ঠিক বিপরীতে কু'আয়কি'আন (قعيقعان) পাহাড়ে পতিত হয়। এই সময় তাহারা দ্বিখণ্ডিত চাঁদের মধ্য দিয়া হেরা পর্বত দেখিতে পাইতেছিলেন।

তারপর তাহারা বলিল, মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাদু করিয়াছে। কিছুক্ষণ পর তাহারা আবারও বলাবলি করিতে লাগিল, মুহাম্মাদ যদিও আমাদেরকে যাদু করিয়াছে তবে সে সকল মানুষকে তো আর যাদু করিতে পারে নাই। ইহার পর কাফির সর্দার আবূ জাহ্ল তাহাদেরকে বলিল, আমাদের কাছে 'আহলুল বাওয়াদী (اهل البوادى) অর্থাৎ গ্রাম্য বেদুঈনদের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা কর এবং তাহারা কি বলে শুনিয়া লও। তাহারা যদি চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার অনুরূপ সংবাদ প্রদান করে তবে উহা নিশ্চয়ই সঠিক, অন্যথা মুহাম্মাদ আমাদের চোখে যাদু করিয়াছে। ইহার পর তাহারা যখন আগমন করিল এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার অনুরূপ সংবাদ প্রদান করিল তখন আবূ জাহ্ল ও উপস্থিত মুশরিকরা বলিল, هٰذا سحر مستمر "ইহা তো চিরায়ত যাদু"। অবশেষে মহান আল্লাহ এই প্রসঙ্গে নাযিল করেন ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ . وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ .

(মুহাম্মাদ 'আলী সাবূনী, সাফ্‌ওয়াতুত তাফাসীর, ৩খ., পৃ. ২৮২)।

সূরা আল-কামারের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত وَانْشَقَّ الْقَمَرُ শীর্ষক পদবাচ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আন-নাহ্‌হাস "قد" শব্দটি বৃদ্ধি করেন এবং এই আয়াতের অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, وَقَدْ انْشَقَّ الْقَمَرُ "নিশ্চয়ই চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে"। এই ছাড়া হুযায়ফা (রা)-ও স্বীয় কিরাআতে অনুরূপ "قَدْ" শব্দটি বৃদ্ধি করিয়া উক্ত আয়াত اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَقَد انْشَقَّ الْقَمَرُ-কে এইভাবে তিলাওয়াত করিয়াছেন (আল-কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন, ১৭খ., পৃ. ১২৫)। তাফসীরে কুরতুবীতে আল-কায়সান-এর উদ্ধৃতি উল্লিখিত হইয়াছে যে, সূরা কামারে বর্ণিত শুরুর পদবাচ্য দুইটি মূলত তাক্‌দীম-তা'খীর অর্থাৎ চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গটি প্রথমে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার প্রসঙ্গটি পরে এভাবে انْشَقَّ الْقَمَرُ وَاقْتَرَبَ السَّاعَةُ উল্লিখিত হইবে (প্রাগুক্ত, ১৭খ., পৃ. ১২৭)। ইমাম আল-ফাররা এই প্রসঙ্গটি সমর্থন করিয়া বলেন, পাশাপাশি দুইটি ক্রিয়াপদ যখন কাছাকাছি অর্থ প্রদান করে তখন উহাকে তাক্‌দীম-তা'খীর করিয়া ব্যবহার করা যায় (প্রাগুক্ত, ১৭খ., পৃ. ১২৭)।

কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত শুরুর পদবাচ্য দুইটির কোনটিতে শব্দ বৃদ্ধি অথবা আগে ও পরে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাফসীরবিদগদের কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ছ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সকল মুফাসসির এক ও অভিন্ন০মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আল্লামা সাবূনী বলেন, "নিশ্চয় চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে", ইহাই হল অধিকাংশ তফ্সিীরকারের অভিমত। ইহার সপক্ষে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার,

আনাস (রা) প্রমুখের বিভিন্ন রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে (সাফ্‌ওয়াতুত তাফাসীর, ৩খ., টীকা নং ১, পৃ. ২৮৪)।

তবে কেহ কেহ এই কথার দাবি করেন যে, "ইনশিকাকুল কামার" অর্থাৎ চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি এখনও সংঘটিত হয় নাই বরং ইহা অচিরেই সংঘটিত হইবে। তাঁহাদের মতে উক্ত আয়াতের অর্থ হইল ঃ

أى إقترب قيام الساعة وإنشقاق القمر وأن الساعة إذا قامت إنشقت السماء بمافيها من القمر وغيره .

"কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া খুবই আসন্ন। যখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে তখন আসমান এবং উহার মাঝে যাহা কিছু আছে, যেমন চন্দ্র বা অন্যান্য কিছু তাহা সবই বিদীর্ণ হইবে" (কুরতুবী, ১৭খ., পৃ. ১২৬)।

মুফাসসিরদের কেহ কেহ আবার রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ইনশিকাকুল কামার-এর অর্থ হইল ঃ

هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه فى أثنائها كما يسمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه وقد يعبر عن انفلاقه بانشقاقه .

"কিয়ামত আসন্ন এবং আকাশে চন্দ্র উদিত হওয়ার মাধ্যমে সকল অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে; যেমন প্রভাতের শুভ সূচনার মাধ্যমে অন্ধকার দূরীভূত হইলে বলা হইয়া থাকে, ভোরই অন্ধকার দূর করিয়াছে। এখানে ইনশিকাক (انشقاق) শব্দটি ইনফিলাক(انفلاق) অর্থাৎ বিদূরিত করা বা দূরীভূত হওয়া অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে" (কুরতুবী, ১৭খ., পৃ. ১২৬)।

যাহারা দাবি করেন, "কিয়ামত দিবসেই চন্দ্র বিদীর্ণ হইবে" তাহাদের মতকে প্রত্যাখ্যান করিয়া 'আল্লামা সাবূনী বলেন, সন্দেহাতীতভাবে ইহা একটি ভ্রান্ত মত, যাহা আদৌ সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে—এই মর্মে সকল মুফাসসির ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত وانشق القمر শীর্ষক পদবাচ্যটি মহান আল্লাহ অতীত কালের ক্রিয়াবাচক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন । উক্ত শব্দ দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ক্রিয়াটি অতীতেই সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মুফাসসিরীনে কিরাম মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। আর আরবী ভাষাতে অতীত ক্রিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে কখনও মুস্‌তাক'বিল তথা ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই (সাফ্‌ওয়াতুত তাফাসীর, ৩খ., পৃ. ২৮৪)।

'আল্লামা ইবনুল জাওযীও তাহাদের মতকে অর্থাৎ "চন্দ্র অচিরেই কিয়ামত দিবসে বিদীর্ণ হইবে" প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা হইল একটা দুর্বল মত মাত্র, যাহা মুসলমানদের ইজ্‌মা' (ঐকমত্যের) মুকাবিলা করিতে পারে না (সাবূনী, টীকা নং ১, পৃ. ১৮৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া প্রদর্শিত হয় নাই-এই মর্মে যাহারা দাবি করেন তাহাদের প্রসঙ্গে এক চমৎকার জবাব প্রদান করা হইয়াছে "সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ" গ্রন্থে। গ্রন্থকার মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اقتربت الساعة وانشق القمر ·

"কিয়ামাত আসন্ন এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে" শীর্ষক আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন, সন্দেহাতীতভাবে চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে, যাহার অকাট্য প্রমাণ সূরা কামারের পরবর্তী আয়াতে ঃ

وَاِنْ يَرَوْا اٰيَةً يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ·

"তাহারা যদি কোন মু'জিযা দেখে তবে মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং বলে, ইহা তো চিরায়ত যাদু"। কেননা কাফির-মুশরিকরা কখনই কিয়ামতের দিন প্রসঙ্গে "সিহ্‌রুম- মুসতামিররুন" (سحرٌ مُستمرٌّ) ইহা-তো চিরায়ত যাদু, এই ধরনের কোন কথা বলে নাই বা দাবি করে নাই বরং রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত চন্দ্র প্রদর্শিত হওয়ার ঘটনাটি স্বচক্ষে দর্শনের পর তাহারা এইরূপ মতামত ব্যক্ত করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের এই বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, চন্দ্র বিদীর্ণ হইবার ঘটনাটি দুনিয়াতেই সংঘটিত হইয়াছে। আর তাহাদের ধারণানুযায়ী আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ঘটনাটি হইল "সুস্পষ্ট যাদু বা চিরায়ত যাদু ছাড়া আর কিছুই নহে" (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ৯খ., পৃ. ৪৩০)।

আল-হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা

প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্য হইতে জানা যায়, যাঁহাদের রিওয়ায়াত হইতে আমরা 'ইনশিকাকুল কামার' অর্থাৎ চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার বর্ণনাগুলি পাই তাঁহাদের মধ্যে অনন্য হইলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস, যুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)। হাদীছের গ্রন্থাবলীতে 'ইনশিকাকুল কামার' প্রসঙ্গীয় যাঁহাদের রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে তাহার এক চমৎকার তথ্যনির্যাস তুলিয়া ধরা হইয়াছে "সুবুলুল হুদা ওয়ার- রাশাদ" গ্রন্থে। 'ইনশিকাকুল কামার' বা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম তিনি সহীহুল বুখারীতে উল্লিখিত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-এর রিওয়ায়ত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

خمس قد مضين اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان ·

"পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। আল-লিযাম বা অনিবার্য শাস্তি, রোম বিজয়, আল-বাত্‌শা বা প্রবল পাকড়াও যাহা বদর যুদ্ধে হইয়া গিয়াছে, আল-কামার বা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া এবং আদ-দুখান বা মক্কার ভীষণ ধুম্র" (বুখারী, ৪খ., হাদীছ নং ও বাব ৪৫৪৮, পৃ. ১৮২৫)।

অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন, বিভিন্ন সন পরম্পরায় কখনও ইমাম আহমাদ, শায়খায়ন, বায়হাকী এবং আবূ নু'আয়ম প্রমুখ স্বীয় কিতাবসমূহে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা)-এর এ সম্পর্কীয় রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেন। আবার কখনও বা শায়খায়ন ও ইমাম বায়হাকী (রা) উভয়েই চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে যুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) হইতেও রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন। ইহা ছাড়া হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-এর রিওয়ায়াত হইতেও 'ইনশিকাকুল কামার' প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার তথ্য জানা যায়, যাহা ইমাম আহমাদ, বায়হাকী, ইমাম তিরমিযী, ইব্ন জারীর, তাবারী এবং হাকেম প্রমুখ স্বীয় কিতাবসমূহে বিভিন্ন সনদ-পরম্পরায় হুযায়ফা (রা) হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম ইবন আবী শায়বা, 'আবদ ইব্ন হুমায়দ, ইব্ন জারীর তাবারী ও আবূ নু'আয়ম প্রমুখ উল্লেখিত মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইমাম আহমাদ, শায়খায়ন ও আবূ নু'আয়ম স্বীয় কিতাবসমূহে বিভিন্ন সনদ-পরম্পরায় আনাস ইবন মালিক (রা)-এর রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মোটকথা, বিভিন্ন রাবীর রিওয়ায়াতগুলি গভীরভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ রিওয়ায়াত একটি অপরটির কাছাকাছি, শব্দাবলী ও মর্মার্থও প্রায় এক ও অভিন্ন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৪৩০)। ইমাম তাহাবী ও ইব্ন কাছীর এই মু'জিযা সম্পর্কিত সকল রিওয়ায়াতকে মুতাওয়াতির বলিয়াছেন। তাই এই মু'জিযার বাস্তবতা অকাট্যরূপে প্রমাণিত ('তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত সং., সম্পাদনা পৃ. ১৩১১)। অবশ্য নাদরাতুন না'ঈমে ইব্ন কাছীরের অভিমত এভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে: "আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) এই মর্মে ইজমা' নকল করিয়াছেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগেই সংঘটিত হইয়াছে এবং ইহা একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা ও এতদসম্পর্কে যে সকল হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে সেগুলি অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন" (নাদরাতুন না'ঈম, বঙ্গানু., ১খ., পৃ. ৬৬০)।

রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট কাহারা মু'জিযা দাবি করিয়াছিল

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যাহারা এসে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ বিষয়ক মু'জিযা প্রদর্শনের দাবী করিয়াছিল তাহাদের পরিচয় প্রসঙ্গে আল-কুরআনুল কারীমের কোথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি বলে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কুরআন গবেষকগণ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে সূরা আল-কামারে বর্ণিত "ইনশিকাকুল কামার" বা চন্দ্র বিদীর্ণ বিষয়ক বর্ণনা সম্বলিত আয়াতগুলিতে তাহাদের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিচয় ব্যক্ত করা হইয়াছে সেগুলির তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণে এই কথা জানা যায় যে, তাহারা আর কেই নন-তাহারা হলেন ঐ সকল মক্কাবাসী কাফির-মুশরিক যাহারা রাসূলে কারীম (স) -এর সত্য দীন ও হিদায়াতের কলেমাকে অস্বীকার করিয়াছিল, মিথ্যা মনে করিয়াছিল তাঁহার আনীত বাণীসমূহকে, অহংকারের বশবর্তী হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও উপেক্ষা করিয়াছিল রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত সকল মু'জিযাকে। এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনের ভাষ্য হইল ঃ

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

"তাহারা যদি কোন মু'জিযা দেখে তবে মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং বলে, ইহা তো চিরায়ত যাদু" (৫৪ ঃ ২)।

নির্ভরযোগ্য আল-কুরআনের ভাষ্য গ্রন্থাবলী, সীরাত ও হাদীছ গ্রন্থাবলীর প্রাপ্ত উৎসসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে যাহারা মু'জিযার দাবি করিয়াছিল তাহাদের পরিচয় সম্পর্কে আরও কিছু মতামত লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে ইবন কাছীর স্বীয় সীরাত গ্রন্থ "আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া"-তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঈমান আনয়ন করিবার শর্তে রাসূলুল্লাহ (স) -এর কাছে যাহারা মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি উত্থাপন করিয়াছিল তাহারা ছিল মুশরিক সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১১৮)। আবূ নু'আয়ম -এর উদ্ধৃতিতে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর আরও একটি রিওয়ায়াত ইবন কাছীর বর্ণনা করেন যাহাতে রাসূল কারীম (স)-এর কাছে মুশরিকদের আগমন ও মু'জিযা প্রদর্শনের প্রসঙ্গটি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে (আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ১১৭)।

ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতিতে মুশরিকদের আগমন ও মু'জিযা প্রদর্শনের দাবির অনুরূপ প্রসঙ্গটি ব্যক্ত করিয়াছেন (কুরতুবী, ১৭খ., পৃ. ১২৭)। ইবন জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি করিয়াছিল তাহারা "কুফ্ফার আহলে মাক্কা" (তাফসীর তাবারী, ২৮খ., পৃ. ৮৪)।

এই প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আনাস (রা)-এর রিওয়ায়াত হইতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট যাহারা মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি করিয়াছিল, তাহারা ছিল মক্কাবাসী (সহীহ বুখারী, কিতাবুত-তাফসীর, পৃ. ১০৪৪)। অনুরূপ বর্ণনার জন্য আরও দ্রষ্টব্য আন-নাসাঈ, তাফসীর ইবন কাছীর, পৃ. ২৬২; তাফসীর তাবারী, ২৭খ., পৃ. ৮৫ ও ৮৮; কুরতুবী, তাফসীর, ১৭খ., পৃ. ১২৬, হাদীছ নং ৩২৮৬, ৫খ., পৃ. ৩৯৭)।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কাল

রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত চাঁদ প্রদর্শন সম্পর্কীয় মু'জিযার সময় প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সীরাত গবেষকদের মাঝে যৎসামান্য মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই সম্পর্কীয় বর্ণনাগুলির মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নাই। কেননা অধিকাংশ বর্ণনাই পরস্পর বিরোধী নয়, বরং সম্পূরক। আল-কুরআনুল কারীমে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের সময় সম্পর্কে তেমন কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। যেহেতু সূরা আল-কামার নাযিলের সময়পর্ব ছিল মাক্কী যুগেই অর্থাৎ হিজরতের পূর্বেই, সেইহেতু ধরিয়া নেওয়া যায় যে, এ যুগেই রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক উল্লিখিত মু'জিযা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সুতরাং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কুরআন গবেষকদের দাবি অনুযায়ী চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের সময়পর্ব ছিল মক্কী যুগেই অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে।

প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীছ, সীরাত ও আল-কুরআনের ভাষ্য গ্রন্থাবলীতে রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক উক্ত মু'জিযা প্রদর্শনের সময়পর্ব সম্পর্কে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা নিম্নরূপ ঃ তাবারী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন যে, হিজরতের পূর্বেই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল (তাবারী, তাফসীর, ২৭খ., পৃ. ৮৬)। দ্বিখণ্ডিত চাঁদ প্রদর্শন সম্পর্কিত মু'জিযাটি যে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হিজরত-পূর্ব যুগেই সংঘটিত হইয়াছিল— এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের হাদীছ ও সীরাত গবেষকেরা অভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন (তু. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১১৬)।

সহীহুল বুখারীতে এই প্রসঙ্গটি 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা), সুনান আত-তিরমিযীতে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদসহ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার, যুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম হইতে উল্লিখিত হইয়াছে (সহীহুল বুখরী, কিতাবুত তাফসীরিল কুরআন, হাদীছ নং ৪৮৬৪, ৪৮৬৫, ৪৮৬৬ এবং ৪৮৬৭, পৃ. ১০৪৩-৪৪; সুনান আত-তিরমিযী, হাদীছ নং ৩২৮৭, ৩২৮৮, ৩২৮৯, ৫খ., পৃ৩৯৮.)। চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার যে মু'জিযাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরত-পূর্ব যুগেই সংঘটিত হইয়াছিল এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. আবুল হাসান 'আলী ইব্ন আহমাদ আল-ওয়াহিদী আন-নিশাপূরী, আসবাবুন নুযূল, কুরতুবী, তাফসীর, ১৭খ., পৃ. ১২৭; তাবারী, তাফসীর, ২৭খ., পৃ. ৮৫; ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৪খ., পৃ. ২৬২-২৬৩; আন-নাসাঈ, হাদীছ নং ১১৫৫৩, ৬খ., পৃ. ৪৭৬)।

চাঁদ কখন দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল এবং কতক্ষণ তাহা দৃশ্যমান ছিল এই প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে তেমন কোন বর্ণনা লক্ষ্য করা যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য সীরাত ও হাদীছ গ্রন্থাবলীতে এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য লক্ষ্য করা যায়। আবূ নু'আয়ম ইস্পাহানী স্বীয় দালাইলুন নুবূওয়াহ্ গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন যাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় যখন প্রদর্শিত হইয়াছিল তখন ছিল পূর্ণিমার রজনী (আবূ নু'আয়ম ইসপাহানী, দালাইলুন নুবূওয়া, পৃ. ২৩৪-২৩৫)। এই প্রসঙ্গে ইবন কাছীর স্বীয় সীরাতে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর আরও একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন যাহাতে কখন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল তাহা চমৎকারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উহা ছিল চাঁদের ১৪ রজনী (আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ১১৮)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত চাঁদ আসমানে কতক্ষণ দৃশ্যমান ছিল এই প্রসঙ্গে দালাইলুন নুবূওয়া গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা 'আসর হইতে রাত্র পর্যন্ত সময়ব্যাপী দৃশ্যমান ছিল (তু. আবূ নু'আয়ম ইসপাহানী, দালাইলুন নুবূওয়া, পৃ. ২৩৫)। অনুরূপ বর্ণনার জন্য আরও দ্রষ্টব্য ইবন কাছীর, আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ১১৮; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ গ্রন্থে প্রথম দিকে চাঁদের কথা উল্লেখ আছে (৯খ., পৃ. ৪৩২)।

মু'জিযা সংঘটিত হওয়ার স্থান

দ্বিখণ্ডিত চাঁদ প্রদর্শনের স্থান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য হাদীছ এবং সীরাত গ্রন্থাবলীর প্রাপ্ত তথ্যে বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে একটি স্থান হইল "মিনা"।

সুনান আত-তিরমিযীতে 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) -এর রিওয়ায়াতে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক চাঁদ যখন বিদীর্ণ হইয়াছিল তখন আমরা তাঁহার সঙ্গে মিনাতেই অবস্থান করিয়াছিলাম। অতঃপর চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়া দুই খণ্ড হইয়া গেল। একখণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলিয়া গেল এবং অন্য খণ্ড অপর দিকে চলিয়া গেল। এই সময় তিনি আমাদেরকে বলিলেন, তোমরা সাক্ষ্য দাও (সুনান আত-তিরমিযী, হাদীছ নং ৩২৮৫, ৫খ., পৃ. ৩৯৭)। কোন কোন বর্ণনায় মক্কাভূমিতেই এ মু'জিযা সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে (সুনান আত- তিরমিযী, হাদীছ নং ৩২৮৬, ৫খ., পৃ. ৩৯৭)।

দ্বিখণ্ডিত চাঁদ কোথায় প্রদর্শিত হইয়াছিল এ প্রসঙ্গে হাদীছের গ্রন্থাবলীতে যে সকল রিওয়ায়াত পাওয়া যায় তন্মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতে কিছুটা বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ কোন কোন রিওয়ায়াতে তিনি মক্কাভূমিতেই এই মু'জিযা সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৪খ., পৃ. ২৬৩)। আবার কোন কোন বর্ণনায় এই ঘটনা যে মিনাতেই সংঘটিত হইয়াছিল এই মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে "সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ" গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত উভয় রিওয়ায়াতের এক চমৎকার সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক চাঁদ যখন দ্বিখণ্ডিত হইয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল তখন তিনি মিনাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই সময় মিনা-এর কোন সুউচ্চ পাহাড় হইতে দ্বিখণ্ডিত চাঁদকে অবলোকন করিয়াছিলেন। আর সেখান হইতে মিনার অনতিদূরে মক্কায় অবস্থিত আবূ কুবায়স (ابو قبيس) পাহাড়ের চূড়াও ভালভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অথবা রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক যখন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছিল তখন তিনি মিনাতেই অবস্থান করিতেছিলেন, ইহার পর উক্ত মু'জিযা দেখামাত্র সম্ভবত তিনি মিনা হইতে মক্কায় চলিয়া আসেন এবং অনুরূপ দ্বিখণ্ডিত চাঁদ দেখিতে পান। সুতরাং উভয় বর্ণনার মাঝে তেমন কোন বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায় না (৯খ., পৃ. ৪৩২)।

যে সকল পর্বতমালার মধ্য দিয়া দ্বিখণ্ডিত চাঁদ প্রদর্শিত হইয়াছিল

রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত চাঁদ বিভিন্ন পর্বতমালার মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল বলিয়া প্রামাণ্য ও নির্ভযোগ্য হাদীছ গ্রন্থাবলী এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সীরাত গবেষকদের মতামত হইতে জানা যায়। এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) কর্তৃক উদ্ধৃত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর রিওয়ায়াতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মক্কাবাসীদের কোন একটি নিদর্শন দেখানোর দাবি জানানোর প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে এমনভাবে দ্বিখণ্ডিত চাঁদ প্রদর্শন করেন যে, উভয় খণ্ডের মাঝে 'হেরা' (حراء) পর্বত দেখিতে পাইতেছিলেন (নাদরাতুন না'ঈম, বঙ্গানু. ১খ., পৃ. ৬৫৯)। তবে বেশ কিছু বর্ণনায় আবূ কুবায়স (ابو قبيس) ও কু'আয়কি'আন (قعيقعان) পাহাড়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে (আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ১১৭; আল-ওয়াফা বি-আহ্ওয়ালিল মুসতাফা, ১খ., পৃ. ২৭২)। তবে ইবনুল জাওযী স্বীয় গ্রন্থে কু'আয়কি'আন-এর পরিবর্তে

কী'আন (قيعان) শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন (আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ২৭৩)। ইহা ছাড়া তিনি স্বীয় কিতাবে মুজাহিদ-এর একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেন যাহাতে নির্দিষ্ট কোন পাহাড়ের নাম উল্লেখ করা হয় নাই; বরং তাহাতে বলা হইয়াছে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর একখণ্ড কোন এক পাহাড়ের উপর দেখা গেল এবং অন্য খণ্ডটি পাহাড়ের পশ্চাতে দেখা গেল (আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ২৭২)। ইবন কাছীরও স্বীয় তাফসীরে কয়েকটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন যাহাতে নির্দিষ্ট কোন পাহাড়ের নাম উল্লেখ করা হয় নাই (ইবন কাছীর, তাফসীর, ৪খ., পৃ. ২৬৩; অনুরূপ বর্ণনার জন্য আরো বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আন-নাসাঈ, ৬খ., পৃ. ২৬৩)। ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর সনদ-পরম্পরায় ইব্ন কাছীর স্বীয় সীরাত-এ সাফা (صفا) এবং মারওয়া (مروة) পাহাড়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ১১৮; আবূ নু'আয়ম, দালাইলুন নুবূওয়াহ, পৃ. ২৩৫)।

প্রদর্শিত চাঁদের টুকরার সংখ্যা

প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীছ গ্রন্থাবলীর প্রাপ্ত তথ্যে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক প্রদর্শিত চাঁদের টুকরার সংখ্যা ছিল দুইটি। এই প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিমে 'আবদুল্লাহ (রা) -এর রিওয়ায়াত এভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যুগেই চন্দ্র দ্বিখণ্ডে খণ্ডিত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে বলেন, তোমরা সাক্ষ্য দাও (সাহীহ্ মুসলিম, বাব ইনশিকাকিল কামার, হাদীছ নং ২৮০০, ৪খ., পৃ. ২১৫৮; রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক বিদীর্ণকৃত চাঁদের টুকরার সংখ্যা যে দুইটি ছিল সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আরও দ্রষ্টব্য সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ২৮০২, ৪খ., পৃ. ২১৫৯; সুনান আত-তিরমিযী, হাদীছ নং ৩২৮৫, ৩২৮৯, ৫খ., পৃ. ৩৯৭; কুরতুবী, তাফসীর, ১৭খ., পৃ. ১২৭; তাবারী, তাফসীর, ২৭খ., পৃ. ৮৫; ইবন কাছীর, তাফসীর, ৪খ., পৃ. ২৬২-২৬৩; আন-নাসাঈ, হাদীছ নং ১১৫৫২, ১১৫৫৩, ৬খ., পৃ. ৪৭৬; তাফসীরুল জালালায়ন, ১খ., পৃ. ৭০৪)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক মু'জিযা প্রদর্শন ও উহার সাক্ষ্য

মক্কাবাসী কাফির-মুশরিকদের দাবির প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে প্রদর্শন করেন তখন তাহারা এই সুস্পষ্ট মু'জিযা দর্শন করিয়াও প্রতিহিংসা ও অহংকারের বশবর্তী হইয়া অস্বীকার করিতে না পারে সম্ভবত এজন্য তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত সকলকেই তিনি সাক্ষী রাখেন বা সাক্ষ্য দিতে বলেন। উক্ত মু'জিযাকে সাক্ষী রাখা বা সাক্ষ্য প্রদান প্রসঙ্গে আল-কুরআনুল কারীমের কোথাও এ বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখ বা সমান্যতম ইঙ্গিতও করা হয় নাই বলিয়া বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কুরআন গবেষকগণ মনে করেন। তবে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে প্রসঙ্গটি চমৎকারভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

বিভিন্ন হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (স) মহান আল্লাহ্র সীমাহীন কুদরতে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রদর্শিত করিবার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত সকলকেই সাক্ষ্য দিতে বা সাক্ষী থাকিতে আদেশ করেন। তিনি সাক্ষী থাকা বা সাক্ষ্য দেয়া প্রসঙ্গে আদেশ

ও দু'আসূচক বিভিন্ন পদবাচ্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কখনও তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ اِشْهدوا "তোমরা সকলেই সাক্ষ্য দাও বা তোমরা উক্ত মু'জিযা সম্পর্কে সাক্ষী থাক" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, হাদীছ নং ৪৮৬৪, পৃ. ১০৪৩; সহীহ মুসলিম, বাব ইনশিকাকিল কামার, হাদীছ নং ২৮০০, ৪খ., পৃ. ২১৫৮; সুনান আত- তিরমিযী, হাদীছ নং ৩২৮৫, ৩২৮৭, ৫খ., পৃ. ৩৯৬-৩৯৭; তাবারী, তাফসীর, প্রাগুক্ত, ২৭খ., পৃ. ৮৫-৮৭. ; আন-নাসাঈ, হাদীছ নং ১১৫৫৩, ৬খ., পৃ. ৪৭৬; তাফসীর জালালায়ন, ১খ., পৃ. ৭০৪.)।

ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, يا فلان يافلان "ওহে অমুক! ওহে অমুক! তোমরা সকলেই সাক্ষী থাক" (কুরতুবী, তাফসীর, ১৭খ., পৃ. ১২৭)।

ইবন কাছীর স্বীয় তারীখে আবূ নু'আয়ম-এর উদ্ধৃতিতে ইবন 'আব্বাস (রা) -এর আরও একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আবূ সালামা ইব্‌ন 'আবদুল আসাদ এবং আল-আরকাম ইবনুল আরকামকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ উক্ত মু'জিযা প্রসঙ্গে তোমরা সাক্ষ্য দাও (আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ১১৭)।

হাদীছ ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহ হইতে আরো জানা যায়, মহান আল্লাহ্‌র সীমাহীন কুদরতে উক্ত মু'জিযা প্রদর্শনের পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স) উপস্থিত সকলের সামনে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখেন এবং বলেন, اللهم إشهد "আয় আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক" (সহীহ মুসলিম, বাবু ইনশিকাকিল কামার, হাদীছ নং ২৮০০, ৪খ., পৃ. ২১৫৮; ইবন কাছীর, তাফসীর, ৪খ., পৃ. ২৬৩; তাবারী, তাফসীর, ২৭খ., পৃ. ৮৫; আন-নাসায়ী, হাদীছ নং ১১৫৫২, ৬খ., পৃ. ৪৭৬)। তাবারী স্বীয় তাফসীরে মুজাহিদ-এর উদ্ধৃতিতে একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন যাহাতে আবূ বকর (রা)-কে সাক্ষী থাকার বিষয়টি উল্লিখিত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স) আবূ বকর (রা)-কে বলেন ঃ إشهد يا أبابكر "হে আবূবকর! তুমি সাক্ষী থাক" (তাবারী, তাফসীর, ২৭খ., পৃ. ৮৭; আরও দ্র. ইবন কাছীর, তাফসীর, ৪খ., পৃ. ২৬৪)।

দ্বিখণ্ডিত চাঁদ দর্শনে মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া

মুশরিকদের মু'জিযা প্রদর্শনের দাবির চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইলে তাহাদের মধ্যে যে সকল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহা আল-কুরআনুল কারীম প্রকাশ করিয়াছে ঃ

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ .

"তাহারা যদি কোন মু'জিযা দেখে তবে মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং বলে, এটা তো চিরায়ত যাদু। তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে, প্রত্যেক বিষয়ে যথা সময়েই স্থিরীকৃত হয়" (৫৪ ঃ ২-৩)।

কুরআন গবেষকগণ মনে করেন, কুরআন মজীদের সূরা আল-কামারে বর্ণিত উল্লিখিত আয়াতে একদিকে যেমন মুশরিকদের স্বভাব- চরিত্রের পরিচয় তুলিয়া ধরা হইয়াছে, অন্যদিকে উক্ত মু'জিযা দর্শনে তাহাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল বা সত্যকে প্রত্যাখ্যানের যে স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার চিত্র ও তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এই মু'জিযাটি চাক্ষুষভাবে দেখিয়াও তাহারা হিংসাপরায়ণতার বশবর্তী হইয়া মুখ ফিরাইয়া নিয়াছিল, এমনকি তাহারা বলিয়াছিল, মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাদু করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ স্বীয় কিতাবে জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা)-এর রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যুগেই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। খণ্ডিত চাঁদের এক অংশ এই পাহাড়ে এবং অন্য অংশ এই পহাড়ে (ভিন্ন পাহাড়ে)-এর উপর দেখা গিয়াছিল। ইহারপর মক্কাবাসী কাফিররা বলিল যে, মুহাম্মাদ আমাদের সকলের উপর যাদু করিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ আবার বলিতে লাগিল, যদিও মুহাম্মদ আমাদের উপর যাদু করিয়াছে কখনও সে সকল মানুষের উপর যাদু করিতে সক্ষম হইবে না (আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ১১৭)।

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সময় সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতি

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা কত ছিল সে সম্পর্কে তেমন কোন সংখ্যার কথা জানা যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক উক্ত মু'জিযা প্রদর্শনের সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন। এই সম্পর্কীয় বর্ণনার জন্য দ্র. সাহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, হাদীছ নং ৪৯৬৫, পৃ. ১০৪৩; সহীহ মুসলিম, বাবু ইনশিকাকিল কামার, হাদীছ নং ২৮০০, ৪খ., পৃ. ২১৫৮; সুনান আত-তিরমিযী, হাদীছ নং ৩২৮৫, ৩২৮৭, ৫খ., পৃ. ৩৯৭-৩৯৮; তাবারী, তাফসীর, ২৭ খ., পৃ. ৮৫; ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৪খ., পৃ. ২৬৩)।

চাঁদ কতবার দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল ?

রাসূলুল্লাহ (স) একবারই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু আনাস ইব্ন মালিক (র)-এর রিওয়ায়াত হইতে জানা যায়, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা মক্কাভূমিতে দুইবার সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি করে। তিনি মক্কাভূমিতেই দুইবার চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করেন। অতঃপর এতদসংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিল হয় (সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ৩২৮৬, ৫খ., পৃ. ৭৩৯; কুরতুবী, তাফসীর, ১৭ খ., পৃ. ১২৬; তাবারী, তাফসীর, ২৭ খৃ., পৃ. ৮৪, ৮৫ ও ৮৭; আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ১১৬-১১৭)। এই হাদীছে দুইবার (مَرَّتَيْنِ) চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল কথাটি চন্দ্রের দুই খণ্ডকে দুইবার (فلقتين) বলিয়া রাবী বর্ণনা করিয়াছেন (সহীহ বুখারী, ১খ,. পৃ. ৫১৩, পাদটীকা নং ১০)।

উপসংহার ঃ 'ইনশিকাকুল কামার' বা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি অনন্য মু'জিযা। মূলত আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাধ্যমে এই মু'জিযা সংঘটিত হইয়াছিল। আল-কুরআনুল কারীমে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া সম্পর্কে যেসব তথ্য ও তত্ত্ব প্রদান করা

হইয়াছে তাহা এবং প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও সীরাতের যে সকল বর্ণনা আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মু'জিযা সন্দেহাতীতভাবে সত্য এবং অকাট্যরূপে স্বীকৃত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) মুহাম্মাদ 'আলী সাবূনী, সাফওয়াতুত তাফাসীর (মাকতাবা মাদানিয়্যা, লাহোর, ৩খ., পৃ. ২৮২, ২৮৪); (৩) আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন (দারুশ শি'ব, কায়রো ১৩৭২ হি. / ২য় সং. ১৭খ., পৃ. ১২৫); (৪) মুহাম্মাদ ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল 'ইবাদ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৪ হি. / ১৯৯৩ খৃ., ১ম সং.), ৯খ., পৃ. ৪৩০, ৪৩২); (৫) আল-বুখারী, আল- জামি' আস-সাহীহ, দারু ইব্ন কাছির, আল-ইয়ামামা ১৪০৭ হি. / ১৯৮৭ খৃ., ৩য় সং. ৪খ., হাদীস নং ও বাব-৪৫৪৮, পৃ. ১৮২৫; (৬) মুফতী মুহাম্মাদ শাফী', তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পা. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১৩১১, ১৩১২; (৭) সম্পাদক মণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত, নাদরাতুন নাঈম, মহানবী (স)-এর জীবনী বিশ্বকোষ, (পরিবেশনায় আল-আকসা প্রকাশনী, ঢাকা ২০০১ খৃ.), ১খ., পৃ. ৬৫৯, ৬৬০; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুর রায়্যান লিত-তুরাছ, ১ম সং.,কায়রো ১৪০৮ হি. / ১৯৯৮ খৃ.), ৩খ., পৃ. ১১৬, ১১৭, ১১৮; (৯) ইব্ন জারীর আত-তাবারী জামি'উল বায়ান আন তাবীলে আযিল কুরআন (দারুল ফিকর, বৈরূত ১৪০৫ হি.), ২৮খ., পৃ. ৮৪-৮৭; (১০) সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, (দারুস সালাম, রিয়াদ, ১৪১৭হি./১৯৯৭ খৃ.), সূরা আল-কামার, হাদীছ নং ৪৮৬৪, ৪৮৬৫, ৪৮৬৭, পৃ. ১০৪৩-১০৪৪; (১১) আবূ আবদির রহমান আন-নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হি.), আস-সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১১ হি. / ১৯৯১ খৃ., ১ম সং) হাদীছ নং- ১১৫৫২, ১১৫৫৩, ১১৫৫৪, ৬খ., পৃ. ৪৭৬; (১২) ইব্ন কাছীর তাফসীরুল কুরআনিল আযীম দারুল ফিকর, বৈরূত ১৪০১ হি., ৪খ., পৃ. ২৬২-২৬৪; (১৩) আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত-তিরমিযী, আল-জামিউস সাহীহ সুনানুত তিরমিযী, তাহকীক আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির প্রমুখ (দারু ইহ্য়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, তা. বি.), হাদীস নং-৩২৮৫, ৩২৮৬, ৩২৮৭, ৩২৮৮, ৩২৮৯, ৫খ., পৃ. ৩৯৬-৩৯৮; (১৪) আবুল হাসান আলী ইব্ন আহমাদ আল-ওয়াহিদী আন-নিশাপূরী, আসবাবুন নুযূল (মুসতাফা আল-বাবী আল-হালাবী, মিসর ১৩৭৯ হি. / ১৯৫৯ খৃ., ১ম সং), পৃ. ২২৭-২২৮; (১৫) আবূ নু'আয়ম ইসপাহানী, দালাইলুন-নুবূওয়্যা, দারুল ওয়াঈ, হালাব ১৩৯৭ হি. / ১৯৭৭ খৃ., পৃ. ২৩৪-২৩৫; (১৬) ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুসতাফা, তাহকীক, মুসতাফা আবদুল ওয়াহিদ, আল- মাকতাবাতুন নূরিয়্যা আর-রিদাবিয়্যা, ২য় সং, ১৩৯৭ হি. / ১৯৭৭ খৃ.) ১খ., পৃ. ২৭২-২৭৩; (১৭) সাহীহ মুসলিম, দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, বাবু ইনশিকাকিল কামার, হাদীছ নং ২৮০০- ২৮০২, ৪খ. পৃ. ২১৫৮-২১৫৯; (১৮) তাফসীরুল জালালায়ন, দারুল হাদীছ, কায়রো, ১খ., পৃ. ৭০৪।

মো. আমিনুল ইসলাম

ঘৃতে বরকত হওয়ার ঘটনা

ঘৃতে বরকত হওয়ার ঘটনাও ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি মু'জিযা। অবশ্য এই মু'জিযা অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়া সংক্রান্ত মু'জিযা হইতে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ার কোনটি ছিল দু'আর বরকতে, আবার কোনটি ছিল তাঁহার পবিত্র সংশ্রবের বরকতে। কিন্তু "ঘৃত বৃদ্ধি" না ছিল দু'আর বরকতে, আর না ছিল তাঁহার পবিত্র সংশ্রবের বরকতে বরং রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্মানিত করিবার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাহা বাড়াইয়া দেন। যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن انس عن امه قال كانت لها شاة فجمعت من سمنها فى عكة فملات العكة ثم بعثت بها مع ربيبة فقالت يا ربيبة ابلغى هذه العكة رسول الله ﷺ يائدم بها فانطلقت بها ربيبة حتى اتت رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله هذه عكة سمن بعثت بها اليك ام سليم قال افرغوا لها عكتها ففرغت العكة فدفعت اليها فانطلقت بها وجاءت وام سليم ليست فى البيت فعلقت العكة على وتد فجاءت ام سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر فقالت ام سليم يا ربيبة اليس امرتك ان تنطلقى بها الى رسول الله ﷺ فقال قد فعلت قد جاءت قالت والذى بعثك بالحق و دين الحق انها لممتلئة تقطر سمنا قال فقال لها رسول الله ﷺ يا ام سليم اتعجبين ان كان الله اطعمك كما اطعمت نبيه كلى واطعمى قالت فجئت الى البيت فقسمت فى قعب لنا كذا وكذا وشركت فيها ما ائتدمنا به شهرا او شهرين.

"হযরত আনাস (রা) বলেন, তাঁহার মায়ের একটি বকরী ছিল। তিনি ইহার দুধ হইতে প্রাপ্ত ঘি একটি চামড়ার পাত্রে জমাইতেন। ঘি জমিতে জমিতে এক সময় পাত্র পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তারপর তিনি ইহা (পালিতা কন্যা) মারফতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পাঠাইলেন এবং বলিলেন, হে রবীবা! এই পাত্রটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছাইয়া দাও যেন তিনি উহা দ্বারা তরকারী রান্না করিতে পারেন। তারপর রবীবা ইহা লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত

হইল এবং বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ঘি-এর পাত্র উম্মু সুলায়ম আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ঘরের লোকজনকে বলিলেন, তোমরা তাহার পাত্রটি খালি করিয়া দাও। তাহারা পাত্রটি খালি করিয়া তাহাকে ফেরত দিল। সে তাহা লইয়া ফিরিয়া আসিল কিন্তু তখন উম্মু সুলায়ম বাড়িতে ছিলেন না। সে পাত্রটি একটি পেরেকের সহিত ঝুলাইয়া রাখিল। উম্মু সুলায়ম বাড়িতে আসিয়া দেখিলেন, পাত্রটি "ঘি"-এ পরিপূর্ণ হইয়া টপটপ করিয়া ঘি পড়িতেছে। তিনি রবীবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রবীবা! আমি কি তোমাকে এই পাত্রটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হুকুম করি নাই? সে বলিল, আমি তো আপনার কথামত তাহা পৌঁছাইয়া দিয়াছি। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য এবং সত্য দীনসহ পাঠাইয়াছেন! ইহা যে "ঘি"-এ পরিপূর্ণ হইয়া উপচাইয়া টপটপ করিয়া পড়িতেছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে উম্মু সুলায়ম! তুমি কি ইহাতে অবাক হইবে, যদি আল্লাহ তোমাকে সেইভাবে খাওয়ান, যেইভাবে তিনি তাঁহার রাসূল (স)-কে খাওয়ান? বরং তুমি তাহা নিজেও খাও এবং অপরকেও খাওয়াও। উম্মু সুলায়ম বলিলেন, আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম এবং ঘি অমুক অমুক পাত্র যাহা ছিল তাহাতে ভাগ করিয়া রাখিলাম। আর উহাতেও কিছু বাকি রাখিলাম যাহা আমাদের এক মাস অথবা দুই মাস তরকারীর সাথে ব্যবহার করিতে পারি" (আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ৩২০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১১৩; হাযাল হাবীব, পৃ. ৫০৩)।

وزاد فى رواية اخرى ... فاهديته رسول الله ﷺ فقبله وترك فى العكة قليلا ونفخ فيها ودعا بالبركة. ثم قال ردوا عليها عكها. فردوها عليها وهى مملؤة سمنا. فاكلت بقية عمر النبى ﷺ وولاية ابى بكر وولاية عمروولاية عثمان. حتى كان من امر على ومعاوية ماكان.

"অপর একটি বর্ণনায় এই কথাও বলা হইয়াছে যে, আমি তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-কে হাদিয়া দিলাম এবং তিনি তাহা কবুলও করিলেন, তবে তিনি পাত্রে কিছু ঘি রাখিয়া দিলেন এবং তাহাতে বরকতের জন্য দু'আ করিয়া ফুঁক দিলেন। তারপর বলিলেন, তাহার পাত্র তাহাকে ফেরত দাও। অতএব তাহা তাহার নিকট ফেরত দেওয়া হইল। আর উহা ছিল ঘি-এ পরিপূর্ণ। উম্মু সুলায়ম (রা) বলেন, আমি তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাকি জীবন, আবূ বকর (রা)-এর খেলাফত, 'উমার (রা)-এর খেলাফত এবং 'উছমান (রা)-এর খেলাফত পর্যন্ত ব্যবহার করিয়াছি। অবশেষে তাহা 'আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর যুদ্ধের সময় শেষ হয়" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১১৩-১১৪)।

عن جابر ان ام مالك البهزية كانت تهدى فى عكة لها سمنا للنبى ﷺ فبينما بنوها يسألونها الادم وليس عندها شئ. فعمدت الى عكتها التى تهدى فيها الى النبى ﷺ فقال اعصرتيه ؟ فقلت نعم. قال لو تركتيه ما زال قائما.

"হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। উম্মে মালিক আল-বাহযিয়া (রা) একটি বরতনে করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে ঘি হাদিয়া দিতেন। যখন তাঁহার সন্তান তরকারী চাইতো এবং তাহার নিকট তরকারী বলিতে কিছু না থাকিত, তখন তিনি সেই বরতনটি, যাহাতে করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে ঘি হাদিয়া পাঠাইতেন, উঠাইয়া দেখিতেন যে, উহাতে প্রয়োজনীয় ঘি রহিয়াছে। অবশেষে একদিন তিনি বরতনটি নিংড়াইয়া লইলেন। ফলে বরকত বন্ধ হইয়া গেল। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অভিযোগ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহা নিংড়াইয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, যদি না নিংড়াইয়া স্বাভাবিকভাবেই রাখিয়া দিতে তবে তাহা কোন দিন বন্ধ হইত না" (ইমাম আহমদ, মুসনাদ, হা. ১৪২৫৪, ৪খ., পৃ. ২৯৯; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৫৯-৬০; মিশকাতুল মাসাবীহ, হা. ৫৯০৭, ৩খ., পৃ. ১২৫৮; আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ৫৭৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, আল-ইসাবা, দারু সাদের, তা. বি.; (২) ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-বাগাবী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, দামিশক ১৯৭৯ খৃ.; (৩) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ দারু ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৩; (৪) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, মাওসূআতু তিরাযিল 'আরাবী, বৈরূত ১৪১২/ ১৯৯৩; (৫) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, দারুল মা'রিফা, বৈরূত তা.বি.; (৬) আল-কাসতাল্লানী, আল- মাওয়াহিবুল- লাদুন্নিয়্যা, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১২ হিজরী; (৭) আবূ বকর জাবির আল-জাযাইরী, হাযাল-হাবীব, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল-হিকাম, আল-মদীনা আল-মুনাওওয়ারা ১৪১৭ হিজরী।

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

পানিতে বরকত হওয়ার ঘটনা

উষর-ধূসর মরুভূমির উষ্ণতা, তাহার উপর পানির স্বল্পতা এক দুর্বিসহ জীবনের প্রতিচ্ছবি। এমনি দুর্বিসহ জীবনের সঞ্জীবনী সুধা হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেওয়া হইয়াছিল পানি বৃদ্ধির অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মু'জিযা। পানি স্বল্পতায় বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ (স) মু'জিযার মাধ্যমে পানি বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা করিতেন। পানি প্রাপ্তির এই সকল ঘটনার বিবরণ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কিছু মু'জিযার বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হইল।

অল্প পানিতে প্রচুর বরকত

عن انس بن مالك انه قال رايت رسول الله ﷺ وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه فاتى رسول الله ﷺ بوضوء فوضع رسول الله ﷺ يده فى ذلك الاناء فامر الناس ان يتوضوءا منه فرايت ينبع من تحت اصابعه فتوضا الناس حتى توضؤا من عند اخرهم.

"হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিয়াছি, অপরদিকে আসরের নামাযের সময় হইয়াছে, আর লোকজন পানি তালাশ করিতেছে, কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া যাইতেছে না। অবশেষে সামান্য পানি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া আসা হইল। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় হস্ত মোবারক উক্ত পাত্রে রাখিলেন এবং লোকজনকে নামাযের উযূ করিতে আদেশ করিলেন। রাবী বলেন, আমি দেখিলাম, তাহার আঙ্গুলসমূহের নীচ হইতে পানি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। লোকজন তাহা হইতে উযূ করিল এবং তাহাদের সর্বশেষ ব্যক্তিও তাহা হইতে উযূ করিল" (আল-বুখারী, হাদীছ নং ৩৫৭৩, পৃ. ৭৩২; মুসলিম, ৭খ., পৃ. ৫৯)।

হুদায়বিয়ার শুষ্ক কূপে পানির প্রবাহ

عن جابر بن عبد الله قال عطش الناس يوم الحديبية والنبى ﷺ وبين يديه ركوة فتوضا جهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب الا ما بين يديك فوضع يديه فى الركوة فجعل الماء يثور بين اصابعه

كالمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت كم كنتم قال لو كنا مائة الف لكفانا كنا خمس عشرة مائة ·

"হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হুদায়বিয়ার দিন লোকজন তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িল। নবী (স)-এর নিকট চামড়ার একটি পাত্রে অতি সামান্য পানি ছিল। তিনি তাহা হইতে উযূ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন লোকজন দ্রুত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে? তাহারা বলিল, আমাদের নিকট পান করার বা উযূ করার মত পানি নাই। তবে এতটুকুই আছে যাহা আপনার সামনে রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার হাত পাত্রের মধ্যে রাখিলেন। দেখা গেল, তাঁহার আঙ্গুলসমূহের মধ্য হইতে পানি প্রবাহিত হইতেছে, যেমন ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। তাহা হইতে আমরা পান করিলাম এবং উযূ করিলাম। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কত জন ছিলেন? তিনি বলেন, যদি আমরা এক লক্ষও হইতাম, তাহা হইলেও আমাদের জন্য উহা যথেষ্ট হইত। তবে আমরা সংখ্যায় ছিলাম পনের শত (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, হাদীছ নং ৩৫৭৬, পৃ. ৭৩৩; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং ৫৮৮২, ৩খ., পৃ. ১৬৪৭)।

عن البراء قال كنا يوم الحديبية اربع عشرة مائة والحديبية بئر ننزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبى ﷺ على شفيرالبئر فدعا بماء فمضمض ومج فى البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت او صدرت ركائبنا ·

"হযরত আল-বারাআ (রা) বলেন, হুদায়বিয়ার দিন আমরা চৌদ্দ শত লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। হুদায়বিয়া একটি কূপের নাম। আমরা উহার সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিলাম, এমনকি এক বিন্দু পানিও অবশিষ্ট ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) কূপের পাদদেশে বসিলেন এবং কিছু পানি নিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। তিনি সেই পানি হইতে কুলি করিলেন এবং কূপের ভিতর তাহা নিক্ষেপ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতেই সহসা কূপের পানি উথলাইয়া উঠিল। তারপর আমরা পান করিলাম এবং আমাদের সমস্ত উটের প্রয়োজন পূর্ণ হইল" (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, হাদীছ নং ৩৫৭৭, পৃ. ৭৩৩; কিতাবুল মানাকিব, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং ৫৮৮৩, ৩খ., পৃ. ১৩৪৭)।

তাবূক অভিযানে পানির দুর্ভিক্ষ

عن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله ﷺ عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى اذا كان يوما اخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال انكم ستاتون غداعين تبوك انشاء الله وانكم لن تاتوها حتى

يضحى النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من ماءها شيئا حتى اتى فجئناها وقد سبقنا اليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشئ من ماء قال فسالهما رسول الله ﷺ هل مسستما من مائها شيئا قالا نعم فسبهما النبى ﷺ وقال لهما ماشاء الله ان يقول قال ثم غرفوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى اجمع فى شئ قال وغسل رسول الله ﷺ فيه يديه و وجهه ثم اعاده فيها فجرت العين بماء منهمر او قال غزير حتى استقى الناس ثم قال يا معاذ ان طالت بك حياة اوترى ما ههنا قد ملئ جنانا .

"হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বলেন, তাবূক যুদ্ধের বৎসর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাথে সফরে রওয়ানা হইলাম। এই সফরে তিনি দুই নামায একত্র করিয়া পড়িতেন। তিনি যুহর ও আসরের নামায একসাথে আদায় করিলেন এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করিলেন। পরদিনও তিনি নামায বিলম্বে আদায় করিলেন। অতঃপর আবার রওয়ানা হইলেন। অবশেষে যুহর ও আসরের নামায একসাথে আদায় করিলেন। অতঃপর একটু বিশ্রাম নিলেন। আবার রওয়ানা হইলেন। অবশেষে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করিলেন। অতঃপর বলিলেন, ইনশাআল্লাহ আগামী কাল তোমারা তাবূক পৌঁছিয়া যাইবে, অবশ্য পৌঁছিতে দুপুর হইয়া যাইবে। সুতরাং আমি না পৌঁছা পর্যন্ত তোমাদের কেউ যেন পানি স্পর্শ না করে। অতঃপর আমরা সেখানে পৌঁছিলাম। অবশ্য আমাদের পূর্বে দুইজন লোক সেখানে পৌঁছিয়াছিল। সেখানে অবস্থিত খালটি ছিল শুষ্ক, ফিতার ন্যায় সংকীর্ণ, পানি প্রবাহও ছিল অতি ক্ষীণ। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি উহার পানি স্পর্শ করিয়াছ? তাহারা বলিল, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং যাহা বলিবার তাহাই বলিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি অঞ্জলী দ্বারা খাল হইতে অল্প অল্প পানি জমা করিতে লাগিলেন। দেখা গেল কিছু পানি জমা হইয়া গেল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাতে স্বীয় হাত ও চেহারা মোবারক ধুইলেন। পরে সেই পানি পুনরায় খালে ফেলিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে পানি উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল অথবা প্রচুর পানি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন লোকজন উহা হইতে পানি পান করিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে মু'আয! আশা করা যায় যদি তুমি দীর্ঘজীবি হও, তাহা হইলে দেখিবে এলাকাটি উদ্যানরাজিতে ভরিয়া গিয়াছে" (মুসলিম, ৭খ., পৃ. ৬০-৬১)।

সামান্য পানিতে অনেক বরকত

عن انس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقى قوم فاتى النبى ﷺ بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب ان

يبسط فيه كفه فضم اصابعه فوضعها فى المخضب فتوضا القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا قال ثمانون رجلا.

"হযরত আনাস (রা) বলেন, নামাযের সময় উপস্থিত হইল। যাহাদের ঘর মসজিদের নিকটে ছিল তাহারা নিজেদের ঘরে উযূ করিতে চলিয়া গেল। কিন্তু যাহাদের সেই সুযোগ ছিল না, তাহাদের উযূ বাকী রহিয়া গেল। তারপর পাথরের একটি মগ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে নিয়া আসা হইল যাহাতে অতি সামান্য পানি ছিল। তিনি তাহাতে হাত রাখিলেন। কিন্তু উহার মুখ এতই সংকীর্ণ ছিল যে, তাঁহার কব্জি তাহাতে বিস্তার করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় আঙ্গুলসমূহ তাহাতে প্রবেশ করাইলেন। ফলে পানি এতই বৃদ্ধি পাইল যে, সকল লোক সেই পানি দ্বারা উযূ করিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা সংখ্যায় কতজন ছিল? তিনি বলিলেন, তাহারা ছিল আশিজন" (বুখারী, হাদীছ নং ৩৫৭৫, পৃ. ৭৩৩; কিতাবুল মানাকিব)।

যুল-মাজাযে আবূ তালিবের তৃষ্ণা

عن عمرو بن شيعب ان ابا طالب قال كنت مع ابن اخى يعنى النبى ﷺ بذي المجاز فادركنى العطش فشكوت اليه فقلت يا ابن اخى عطشت وما قلت له ذلك وانا ارى عنده شيئا الا الجوع فثنى وركه ثم نزل وقال يا عم اعطشت قلت نعم فاهوى بعقبه الى الارض فاذا بالماء فقال اشرب ياعم فشربت.

"হযরত 'আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) হইতে বর্ণিত। আবূ তালিব বলিয়াছেন, একদা আমি যুল-মাজায নামক স্থানে আমার ভাতিজা [নবী কারীম (স)]-এর সাথে ছিলাম। আমি খুব তৃষ্ণার্ত হইলাম এবং তাহাকে আমার পিপাসার কথা জানাইলাম। আমি তাহার নিকট ক্ষুধা ব্যতীত আর কিছুই দেখিলাম না, তারপরও তাহাকে পানির কথা বলিলাম। আমি জানিতাম, আফসোস করা ছাড়া তাহার আর কিছুই করার নাই। তারপর সে অবতরণ করিল এবং বলিল, চাচা আপনি কি পিপাসার্ত? আমি বলিলাম, হাঁ। তারপর সে পিছনের মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। হঠাৎ পানি দেখা গেল। সে বলিল, হে চাচা! আপনি পানি পান করুন। তখন আমি পানি পান করিলাম" (কাযী 'ইয়ায, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৫৬০)।

এক নারী ও তাহার দুই কলস পানি

عن عمران بن حصين انهم كانوا مع النبى ﷺ فى مسير..وجعلنى رسول الله ﷺ فى ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير اذا نحن بامراة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها اين الماء فقالت ايه لا ماء قلنا كم بين اهلك

وبين الماء قالت يوم وليلة فقلنا انطلقى الي رسول الله ﷺ قالت وما رسول الله فلم نملكها من امرها حتى استقبلنا بها النبى ﷺ فحدثته بمثل الذى حدثتنا غير انها حدثته انها مؤتمة قامر بمزادتيها فمسح بالعزلاوين فشربنا عطاشا اربعون رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا واداوة غير انه لم نسق بعيرا وهى تكاد تبض من الملء ثم قال هاتوا ماعندكم فجمع لها من الكسر والتمر حتى اتت اهلها . قالت اتيت اسحر الناس او هو نبى كما زعموا . فهدى الله ذاك الصرم بتلك المراة فاسلمت واسلموا .

"হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণিত। এক সফরে তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (স) কতিপয় আরোহীর সাথে আগে পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে আমরা ভীষণ পিপাসার্ত হইয়া পড়িলাম। এমন সময় আমাদের নজরে পড়িল, একজন স্ত্রীলোক সওয়ারীর উপর দুইটি বড় মশকের মাঝখানে নিজের পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পানি কোথায়? সে বলিল, পানি নাই। আমরা তাহাকে বলিলাম, তোমার বাসস্থান ও পানির অবস্থান এই দুইয়ের মাঝে দূরত্ব কতটুকু? সে বলিল, একদিন এক রাত্রের পথ। আমরা বলিলাম, তুমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চল। সে বলিল, কেমন রাসূল? অতঃপর আমরা তাহাকে খানিকটা জোর করিয়াই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়াও সে তাহাই বলিল যাহা আমাদের নিকট বলিয়াছিল। সে ইহাও বলিল যে, সে একজন ইয়াতীম সন্তানের মা। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহার মশক দুইটি খুলিতে আদেশ করিলেন এবং মশকের মুখে হাত মোবারক বুলাইলেন। ফলে পানি বাড়িয়া গেল। আমরা চল্লিশজন পিপাসার্ত লোক অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পানি পান করিলাম এবং আমাদের সাথে যত মশক ছিল সবই ভরিয়া লইলাম, তবে উটগুলিকে পানি পান করাইলাম না। তারপরও স্ত্রীলোকটির মশক পানিতে ভর্তি ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাদের যাহা কিছু খাবার আছে তাহা লইয়া আস। তখন মহিলার জন্য কয়েক খণ্ড রুটি ও কিছু খেজুর জমা করা হইল। তারপর সে এইগুলি লইয়া বাড়ি ফিরিল। সে ফিরিয়া গিয়া বলিল, আমি একজন শ্রেষ্ঠ যাদুকরের দেখা পাইয়াছি। অবশ্য লোকেরা মনে করে যে, তিনি একজন নবী। এইভাবে স্ত্রীলোকটির মাধ্যমে আল্লাহ ঐ গ্রামবাসীকে হেদায়াত দান করিলেন। সে নিজেও মুসলমান হইল এবং সকল গ্রামবাসীও ইসলাম গ্রহণ করিল" (আল-বুখারী, হাদীছ নং ৩৫৭১, পৃ. ৭৩২; কিতাবুল মানাবিক, বাব আলামাতিন নুবূওয়াত)।

এক সফরের ঘটনা

عن انس بن مالك قال خرج النبى ﷺ فى بعض مخارجه ومعه ناس من اصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤن فانطلق رجل من

القوم فجاء بقدح ماء يسير فاخذه النبي ﷺ فتوضا ثم مد اصابعه الاربع على القدح ثم قال قوموا فتوضؤا فتوضا القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا سبعين اونحوه·

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এক সফরে রওয়ানা হইলেন। তাঁহার সাথে ছিলেন তাঁহার সাহাবীগণের একটি জামাআত। পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল, কিন্তু উযু করিবার জন্য তাঁহারা কোন পানি পাইলেন না। অবশেষে তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন পানির খোঁজে চলিয়া গেলেন এবং একটি পাত্রে করিয়া সামান্য পানি লইয়া হাজির হইলেন। নবী কারীম (স) সেই পানির দ্বারা উযু করিলেন, তারপর নিজ হাতের চারটি আঙ্গুল ঐ পাত্রের উপর সোজা করিয়া রাখিলেন এবং লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা উঠিয়া আস এবং উযূ কর। তাঁহারা উযূ করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত যতজনের ইচ্ছা হইল তাঁহারা সকলেই উযু করিল। আর তাঁহারা সংখ্যায় ছিল প্রায় ৭০ জন (আল-বুখারী, হাদীছ নং ৩৫৭৪, পৃ. ৭৩২; কিতাবুল মানাকিব)।

পবিত্র ও বরকতময় পানি

عن عبد الله قال كنا نعد الايات بركة وانتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله ﷺ فى سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاؤا باناء فيه ماء قليل فادخل يده في الاناء ثم قال حى على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين اصابع رسول الله ﷺ ولقد كنا نسمع تبسيح الطعام وهو يوكل·

"হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন, আমরা অলৌকিক ঘটনাবলীকে বরকতের ব্যাপার মনে করিতাম। কিন্তু তোমরা ঐগুলিকে কেবল ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপার বলিয়া মনে কর। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ পানির অভাব দেখা দিল। তিনি বলিলেন, কোথাও কিছু পানি থাকিয়া থাকিলে উহার সন্ধান কর। তাঁহার সঙ্গীগণ সামান্য পানি সমেত একটি পাত্র নিয়া আসিলেন। তিনি নিজ হাতখানা পাত্রটিতে প্রবেশ করাইলেন, তারপর বলিলেন, পবিত্র ও বরকতময় পানি নিতে আগাইয়া আস। এই বরকত আল্লাহ্র পক্ষ হইতে। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পানি উপচাইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। আল্লাহ্র কসম! তিনি খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার খাদ্যের তাসবীহ্ পাঠ শুনিতে পাইতাম" (আদ-দারিমী, আস-সুনান, ১খ., পৃ. ১৫; আল-বুখারী, হাদীছ নং ৩৫৭৯, পৃ. ৭৩৪; কিতাবুল মানাকিব)।

আয-যাওরা নামক স্থানের ঘটনা

عن انس بن مالك قال اتى النبى ﷺ باناء وهو بالزوراء فوضع يده في الاناء فجعل الماء ينبع من بين اصابعه فتوضا القوم قال قتادة قلت لانس كم كنتم قال ثلاث مائة او زهاء ثلاث مائة.

"হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি পানির পাত্র আনা হইল। তখন তিনি আয-যাওরা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ঐ পাত্রে স্বীয় হাত মোবারক রাখিলেন। তাঁহার আঙ্গুলগুলির ফাঁক হইতে পানি উত্থিত হইতে লাগিল এবং লোকজন ঐ পানি দ্বারা উযূ করিল। হযরত কাতাদা (রা) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিনি বলিলেন, প্রায় তিন শতজন" (আল-বুখারী, হাদীছ নং ৩৫৭২, পৃ. ৭৩২; কিতাবুল মানাকিব)।

খালি কলসে পানির প্রবাহ

عن ابن عباس قال دعا النبي ﷺ بلالا فطلب بلال الماء ثم جاء فقال لا والله ما وجدت الماء فقال النبى ﷺ فهل من شن فاتاه بشن فبسط كفيه فيه فابنعث تحت يديه عين قال فكان ابن مسعود يشرب وغيره يتوضأ.

"হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বিলাল (রা)-কে পানির জন্য ডাকিলেন। বিলাল (রা) পানির খোঁজ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! পানি পাইলাম না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, চামড়ার তৈরি কোন মশক আছে কি? অতএব একটি মশক তাঁহার নিকট লইয়া আসা হইলে তিনি উহার মধ্যে তাঁহার হাত বিছাইয়া দিলেন। ফলে তাঁহার হাতের নীচ হইতে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বর্ণনাকারী বলেন, ইব্ন মাস'উদ (রা) পানি পান করিলেন এবং অন্যরা উযূ করিলেন" (আদ-দারিমী, ১খ., পৃ. ১৩)।

মদীনায় অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির ঘটনা

عن انس قال اصاب اهل المدينة قحط على عهد رسول الله ﷺ فبينا هو يخطب يوم جمعة اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاء فادع الله يسقينا فمد يديه ودعا قال انس ان السماء كمثل الزجاجة فهاجت ريح انشأت سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى اتينا منازلنا فلم نزل نمطر الى الجمعة الاخرى فقام اليه ذلك الرجل اوغيره فقال يا رسول الله

تهدمت البيوت فادع الله يحسبه قتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت الى السحاب تصدع حول المدينة كانه اكليل. وفى رواية اخرى قال اللهم حوالينا ولاعلينا اللهم على الانعام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر فاقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس.

"হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মদীনাবাসিগণ অনাবৃষ্টির দরুন খরা কবলিত হইয়াছিলেন। কোন এক জুমু'আ বারে রাসূলুল্লাহ (স) খুতবা দিতেছিলেন। এমন সময় একব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঘোড়াগুলি মারা গেল, বকরীগুলো ধ্বংস হইয়া গেল। আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন তিনি যেন আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মহানবী (স) দুই হাত তুলিয়া আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন। আনাস (রা) বলেন, আকাশ ছিল তখন কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার (কোন মেঘ ছিল না)। হঠাৎ বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল এবং মেঘের আবির্ভাব ঘটিল। অতঃপর মেঘগুলি একত্র হইয়া গেল। তারপর আকাশ তাহার মুখ খুলিয়া দিল। বর্ষণ শুরু হইল। এত বৃষ্টি হইল যে, আমরা মসজিদ হইতে বাহির হইয়া সাতরাইয়া বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম। এইভাবে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হইল। পরবর্তী শুক্রবার আবার সেই ব্যক্তি অথবা অন্য কেহ দাঁড়াইয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! অতি বৃষ্টিতে বাড়ি-ঘরসমূহ ধ্বংস হইয়া গেল। এইবার আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন ঃ আমাদের উপর নয়, আমাদের চারিপাশে বর্ষণ করুন। আনাস (রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, মেঘগুলি তৎক্ষণাৎ মদীনার আশেপাশে সরিয়া গেল। মদীনাকে মনে হইল যেন এক মুকুট। অপর একটি বর্ণনায় আসিয়াছে ঃ তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের চারিপাশে বর্ষণ হউক, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, ময়দান এবং বনাঞ্চলের উপর বর্ষণ করুন। অতঃপর ইহাতে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। আমরা রৌদ্রে চলাফেরা করিতে লাগিলাম" (আল-বুখারী, হাদীছ নং ৩৫৮২, পৃ. ৭৩৫; কিতাবুল মানাকিব এবং কিতাবুল ইস্তিসকা, বাব-আল ইস্তিসকা, হাদীছ নং ১০১৩; ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, হাদীছ নং ১২৬০৪, ৪খ., পৃ. ৪৭)।

حدثنا جابر بن عبد الله قال اشتكى اصحاب رسول الله ﷺ الي رسول ﷺ العطش فدعا بعس فصب فيه ماء ووضع رسول الله ﷺ يده فيه قال فجعلت انظر الي الماء ينبع عيونا من بين اصابع رسول الله ﷺ والناس يستقون حتى استقي الناس كلهم.

"হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সাহাবা-ই কিরাম রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পিপাসার অভিযোগ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) একটি বড় পেয়ালা আনিতে আদেশ করিলেন। তিনি উহাতে পানি ঢালিয়া দিলেন এবং স্বীয় হস্ত তাহাতে রাখিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি

দেখিতে লাগিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আঙ্গুলসমূহ হইতে পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হইতেছে। আর লোকজন পানি পান করিতেছে, এমনকি সকলে পান করিল" (সুনান আদ-দারিমী, ১খ., পৃ. ১৪)।

عن انس ان النبى ﷺ دعا بماء قاتى بقدح رحراح فجعل القوم يتوضاون فحزرت ما بين الستين الى الثمانين قال فجعلت انظرالى الماء ينبع من بين اصابعه.

"হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) পানি আনিতে আদেশ করিলেন। অপ্রশস্ত তলাবিশিষ্ট অগভীর একটি পেয়ালা আনা হইলে তিনি তাহাতে হাত রাখিয়া বরকতের জন্য দু'আ করিলেন। লোকেরা উহা হইতে উযূ করিতে লাগিল। আমি অনুমান করিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা ষাট হইতে আশির মধ্যে হইবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি পানির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, তাঁহার আঙ্গুলসমূহের মধ্য হইতে পানি উথলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে" (মুসলিম, আস-সাহীহ ৭খ., পৃ. ৫৯; কিতাবুল ফাদাইল, বাব ফী মু'জিযাতিন- নাবী; ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, হাদীছ নং ১২০৮৮, ৩খ., পৃ. ১৫)।

যিয়াদ ইব্নুল হারিছের কূপ

عن زياد بن الحارث الصدائ ... ثم قلنا يا رسول الله ﷺ ان لنا بئرا اذا كان الشتاء وسعتنا ماءها فاجتمعنا عليها واذا كان الصيف قل ماءها فتفرقنا على مياه حولنا قد اسلمنا وكل من حولنا لنا عدو فادع الله لنا فى بئرنا ان يسعنا ماءها فنجتمع عليها ولانتفرق قال فدعا بسبع حصيات فعركهن في يده ودعا فيهن ثم قال اذهبوا اسم الله قال الصدائ ففعلنا بها استعصنا بعر ذلك ان تنظر فى تعرها يصنى البئر.

"হযরত যিয়াদ ইব্নুল হারিছ আস-সুদায়ী হইতে বর্ণিত ..... অতঃপর আমরা বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের একটি কূপ আছে যাহাতে শীতকালে প্রচুর পানি থাকে। আমরা সকলেই তাহা হইতে পানি সংগ্রহ করি। কিন্তু গ্রীষ্মকালে উহার পানি কমিয়া যায়। তখন আমরা পাশের অন্যান্য কূপ হইতে পানি সংগ্রহ করিতে যাই। আর আমরা ইসলাম কবুল করিয়াছি। অথচ আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের শত্রু। সুতরাং আপনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ আমাদের কূপে পানি বৃদ্ধি করিয়া দেন। তাহা হইলে আমরা সেখান হইতেই পানি সংগ্রহ করিতে পারিব এবং অন্যত্র যাইতে হইবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সাতটি কংকর লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। কংকর আনা হইলে তিনি সেইগুলি নিজ হাতে ঘষিয়া

মুছিয়া লইলেন এবং তাহাতে বরকতের দু'আ করিলেন। তারপর বলিলেন, এইগুলি লইয়া যাও। যখন তোমরা কূপে পানি আনিতে যাইবে তখন এইগুলিই একটা একটা করিয়া বিসমিল্লাহ বলিয়া কূপে নিক্ষেপ করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাহাই করিলাম যেমন করিতে তিনি আদেশ করিয়াছেন। তারপর আমরা আর কখনও কূপের তলদেশ দেখিতে পাই নাই" (তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৯, ১খ., পৃ. ৩৮৮; কিতাবুস-সালাত, বাব ঃ যে আযান দিবে, সেই ইকামত দিবে)।

সেনাশিবিরে পানির হাহাকার

عن ابن عباس اصبح رسول الله ﷺ ذات يوم وليس فى العسكر ماء فاتاه رجل فقال يارسول الله ليس فى العسكر ماء قال هل عندك شيئ قال نعم قال فاتنى به قال فاتاه باناء فيه شيئ من ماء قليل قال فجعل رسول الله ﷺ اصابعه فى فم الاناء وفتح اصابعه قال فانفجرت من بين اصابعه عيون وامر بلالا فقال ناد فى الناس الوضؤ المبارك.

"হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স) এমন অবস্থায় ভোরে উপনীত হইলেন যখন সেনাছাউনীতে পানি ছিল না। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেনাছাউনীতে পানি নাই। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কি কিছু পানি আছে? সে বলিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, যাও, তাহাই আমার নিকট লইয়া আস। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁহার নিকট একটি পাত্র লইয়া আসা হইল যাহাতে অতি সামান্য পানি ছিল। বর্ণনাকারী আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) পাত্রের মুখে তাঁহার আঙ্গুলসমূহ রাখিলেন এবং তাহা প্রশস্ত করিলেন। রাবী বলেন, তাঁহার আঙ্গুলসমূহ হইতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তিনি বিলাল (রা)-কে লোকজনের মাঝে ঘোষণা করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর বিলাল মানুষের মাঝে الوضؤ المبارك (পবিত্র বরকতময় পানি দ্বারা উযূ করিতে আস) বলিয়া ঘোষণা করিয় দিলেন" (ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, হাদীছ নং ২২৬৮, ১খ., পৃ. ৪১৬)।

পানি বৃদ্ধির অপর একটি ঘটনা ইমাম ইব্ন কাছীর বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) মুশরিকদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বলিলেন, তোমরা খুব দ্রুত গমন করিবে। কারণ তোমাদের আর শত্রু সৈন্যদের মাঝে রহিয়াছে পানির সুব্যবস্থা। যদি মুশরিক বাহিনী তোমাদের পূর্বেই উক্ত স্থানে পৌঁছিয়া যায় তবে তোমরা প্রচণ্ড পিপাসায় পতিত হইবে। এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স) কয়েকজনকে লইয়া পিছনে রহিয়া গেলেন। পথ চলিতে চলিতে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সামান্য বিশ্রামের জন্য নিদ্রা গেলেন। এক সময় সূর্যের প্রচণ্ড তাপে তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ঘুম হইতে জাগিয়া তিনি বলিলেন, তোমাদের

কাহারও নিকট পানি আছে কি? এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আছে, তবে খুব সামান্য। তিনি বলিলেন, তাহাই লইয়া আস। পানি লইয়া আসার পর তিনি পাত্রের গায়ে হাত বুলাইয়া বরকতের জন্য দু'আ করিলেন। তারপর বলিলেন, তোমরা আস এবং উযূ কর। তারপর সকলেই উযূ করিলেন। উযূ শেষে তিনি পাত্রের মালিককে পাত্রটি সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে বলিলেন। তারপর তাঁহারা রওয়ানা হইলেন। যাইয়া দেখিলেন, শত্রুসৈন্য অনেক আগেই আসিয়া উক্ত স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া আছে। ফলে তাঁহারা পানির অভাবে প্রচণ্ড পিপাসায় পতিত হইলেন। তখন তিনি পাত্রের মালিককে বলিলেন, তোমার পাত্রটি লাইয়া আস। পাত্র লইয়া আসিলে তিনি বলিলেন, তোমরা সকলে আস এবং পানি পান কর। তাঁহারা সকলেই পানি পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত যত পাত্র ছিল তাহা সবই পানিতে ভর্তি করিয়া রাখিলেন" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১০৯)।

বিভিন্ন সময় একান্ত প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (স) এই জাতীয় মু'জিযা প্রদর্শন করিয়াছেন। আর পানি বৃদ্ধি ছিল তাঁহার দু'আর বরকতের বহিঃপ্রকাশ যাহা অন্য কোন নবীর সময় ঘটে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, দারুস সালাম, রিয়াদ ১৪১৭ হি./১৯১৭ খৃ.; (২) ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, দারুল মা'রিফা, বৈরূত তা. বি.; (৩) 'আবদুর রাহমান আদ-দারিমী, সুনান আদ-দারিমী, দারু ইহ্য়াইস-সুন্নাহ, আল-মারীয়া, তা. বি.; (৪) ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-খাতীব আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, দামিশক ১৩৮১ হি.; (৫) কাযী ইয়ায, আশ-শিফা, মাকতাবাতুল ফারাবী, দামিশ্‌ক, তা. বি.; (৬) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, দারু ইহয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খৃ.; (৭) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারু ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত ১৪১২ হি. / ১৯৯২ খৃ.; (৮) ইমাম তিরমিযী, আল-জামে, দারু ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত, তা. বি.।

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

খাদ্যদ্রব্যে বরকত হওয়ার ঘটনা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম মু'জিযা হইল খাদ্যদ্রব্যে বরকত হওয়ার ঘটনা। এক পাত্র আহার বৃদ্ধি পাইয়া দুই পাত্রে পরিণত হওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং অল্প খাদ্যে অধিক ক্ষুধার্ত ও অভুক্ত লোকের পরিতৃপ্ত হওয়া, যে খাদ্যে কোনক্রমেই তাহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এই জাতীয় খাদ্য বৃদ্ধি বা বরকত বৃদ্ধির কথা অনেক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছবেত্তাগণ স্ব স্ব হাদীছ গ্রন্থে এই জাতীয় ঘটনা সম্বলিত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ তালহা ও উম্মু সুলায়ম (রা)-এর ঘটনা

عن اسحاق بن عبد الله بن ابى طلحة انه سمع أنس بن مالك ام يقول قال ابو طلحة لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله ﷺ ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شئ قالت نعم فاخرجت اقرصا من شعير ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه. ثم دسته تحت ثوبى وردتنى ببعضه ثم ارسلنى الى رسول الله ﷺ قال فذهبت به فوجدت رسول الله ﷺ فى المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله ﷺ ارسلك ابو طلحة فقلت نعم قال بطعام قلت نعم فقال رسول الله ﷺ لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحة فاخبرته فقال ابو طلحة يا ام سليم قد جاء رسول الله ﷺ والناس وليس عندنا مانطعمهم فقالت الله ورسوله اعلم فانطلق ابو طلحة حتى لقى رسول الله ﷺ فاقبل رسول الله ﷺ وابو طلحة معه فقال رسول الله ﷺ هلم يا ام سليم ما عندك فاتت بذلك الخبز فامر به رسول الله ﷺ ففت وعصرت ام سليم عكة فادمته ثم قال فيه رسول الله ﷺ ما شاء الله. ان يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجو ثم قال أذن لعشرة فاذن لهم فاكلو حتى شبعوا ثم خرجو اثم اذن لعشرة فاكلوا القوم كلهم وشبعوا والقوم ثمانون رجلا .

وفى رواية للبخارى ....ثم اكل النبى ﷺ فجعلت انظر هل نقص منها شئ .

"হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, আবূ তালহা (রা) উম্মে সুলায়ম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গলার আওয়াজ দুর্বল শুনিতে পাইয়াছি। আমার

মনে হয় তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। তারপর তিনি কয়েকটি যবের রুটির টুকরা বাহির করিলেন এবং একটি কাপড়ও বাহির করিলেন। ইহার পর কাপড়ের এক অংশে রুটিগুলি জড়াইলেন এবং অপর অংশ আমার মাথায় জড়াইয়া দিলেন। তারপর আমাকে রাসূলুল্লাহ (র)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আনাস (রা) বলেন, ইহা লইয়া আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলাম। রাসুলুল্লাহ (স)-কে লোকজনসহ মসজিদে উপবিষ্ট পাইলাম। আমি তাহাদের সামনে দাঁড়াইলাম। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, আবূ তালহা তোমাকে পাঠাইয়াছে, তাই না? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, খাবারের জন্য? আমি বলিলাম, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (স৯ উপস্থিত সাহাবীদিগকে বলিলেন, তোমরা উঠ। এই বলিয়ছ তিনি রওয়ানা হইলেন। আনাস (রা) বলেন, আমিও তাহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে আবূ তালহা (রা)-এর নিকট আসিয়া পৌছিলাম। আবূ তালহা বলিলেন-হে উম্মে সুলায়ম! রাসুলুল্লাহ (স)-তো অনেক লোকজন নিয়া আসিয়াছেন। আর আমাদের নিকট-তো এত অধিক খাবার নাই যাহা দ্বারা তাহাদিগকে আপ্যায়ন করিতে পারি। উম্মে সুলায়ম বলিলেন, কি হইবে, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। আনাস (রা) বলেন, আবূ তালহা বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিলেন। ইহার পর তাঁহারা উভয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে উম্মে সুলায়ম! তোমার নিকট যাহা আছে তাহাই পেশ কর। অতএব তিনি সেই রুটি কয়টিই পেশ করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) উহা টুকরা টুকরা করিতে আদেশ করিলেন। কথামত টুকরা টুকরা করা হইল। উম্মে সুলায়ম উহাতে ঘৃত ঢালিয়া দিলেন, তারপর দিলেন তরকারী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী দু'আ করিলেন। তারপর বলিলেন, দশজনকে আসিবার অনুমতি দাও। অতঃপর দশজনকে প্রবেশানুমতি দেওয়া হইল। তাহারা খাইলেন এবং পরিতৃপ্ত হইলেন, তারপর বাহির হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, অপর দশজনকে আসিবার অনুমতি দাও। তাহাদিগকেও অনুমতি দেওয়া হইল। তাহারা খাইলেন এবং পরিতৃপ্ত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, দশজনকে অনুমতি দাও। এইভাবে সম্প্রদায়ের সকল লোকজনই খাইলেন এবং পরিতৃপ্ত হইলেন। সম্প্রদায়ের লোক ছিল সংখ্যায় আশিজন"। বুখারী শরীফের অন্য বর্ণনায় আসিয়াছেন, "তারপর রাসূলুল্লাহ (স) খাইলেন। রাবী বলেন, তারপর আমি দেখিতে লাগিলাম যে, উহাতে খাবার কমে নাই" (বুখারী, হাদীছ নং ৫৩৮১, পৃ. ১১৬৬, কিতাবুল আত'ইমা; আল-মুওয়াত্তা, হাদীছ নং ১৯, ২খ., পৃ. ১৯; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং ৫৯০৮, ৩খ., পৃ. ১৬৫৮, বাবুন ফিল-মু'জিযাত; সুনান আদ-দারিমী ১খ., পৃ. ২২)।

জাবির (রা) ও তাঁহার স্ত্রীর ঘটনা

عن جابر بن عبد الله قال لما حفر الخندق رأيت برسول الله ﷺ خمصا شديدا فانكفيت الى امرأتي فقلت هل عندك شئ فاني رأيت برسول الله ﷺ خمصا شديدا

فاخرجت الى جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذهبتها وطحنت الشعير ففرغت الى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت الى رسول الله ﷺ فقالت لا تفضحني برسول الله ﷺ وبمن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال انت ونفرمعك فصاح النبى ﷺ فقال يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع سُوْرًا فَحَيَّهَلًاَبكم . فقال رسول الله ﷺ و لاتنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى اجئ فجئت وجاء رسول الله ﷺ يقدم الناس حتى جئت امرتى فقالت بك وباك فقلت قد فعلت الذى قلت فاخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد الى برمتنا فبصك وبرك ثم قال ادع خابزة فلتخبز معك واقدحى من برمتكم ولا تنزلوها وهم الف فاقسم بالله لقد اكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لَتَغِطُّ كما هي وان عَجِيْنَنَا لَيُخْبَزُ كما هو.

"হযরত জাবির (রা) বলেন, পরিখা খননের সময় আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখিয়াছি। আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নিকট কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখিয়াছি। তখন তিনি চামড়ার থলিয়া বাহির করিলেন যাহাতে প্রায় দুই কেজি পরিমাণ যব ছিল। আর আমাদের ছিল একটি গৃহপালিত দুগ্ধবতি ছাগল। আমি উহা যবেহ করিলাম এবং যবগুলি পিষিলাম। আমি অবসর থাকায় সে আমাকেও কিছু দায়িত্ব দিল। আমি যবেহ করা পশুটিকে টুকরা টুকরা করিয়া ডেকচিতে রাখিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট রওয়ানা হইলাম। স্ত্রী আমাকে বলিল, দেখিও, রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁহার সঙ্গীদের দ্বারা আমাকে লজ্জিত করিও না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া গোপনে তাঁহাকে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একটি দুম্বা আমরা যবেহ করিয়াছি। আর প্রায় দুই কেজি যব যা আমাদের ছিল সেইগুলি পিষিয়া আটা বানাইয়াছি। সুতরাং আপনি এবং আপনার সাথে কয়েকজনকে লইয়া আসুন। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) সজোরে বলিলেন, হে পরিখাবাসী! জাবির খাবার তৈরী করিয়াছে। তোমরা আস এবং তাড়াতাড়ি আস। রাসূলুল্লাহ (স) জাবিরকে বলিলেন, আমি না আসা পর্যন্ত ডেকচি চুলা হইতে নামাইবে না এবং রুটিও তৈরী করিবে না । জাবির (রা) বলেন, আমি ফিরিয়া আসিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) আসিলেন এবং লোকজনও আসিতে লাগিল। জাবির (রা) বলেন, আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসিলাম। সব শুনিয়া সে রাগ করিয়া বলিল, তুমি উৎসন্নে যাও, তোমার ধ্বংস হউক! আমি বলিলাম, আমি-তো তোমার কথা মতই কাজ করিয়াছি। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ

(স)-এর সামনে খামীরগুলি পেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) উহাতে স্বীয় মুখের লালা মিশাইলেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করিলেন। অতঃপর ডেকচির দিকে অগ্রসর হইলেন এবং উহাতেও মুখের লালা মিশাইলেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করিলেন। তারপর বলিলেন, একজন রুটি প্রস্তুতকারিনীকে ডাক যে তোমার সহিত রুটি তৈরী করিবে এবং ডেকচি না নামাইয়া তরকারী পরিবেশন করিবে। লোকসংখ্যা ছিল এক হাজার। অতপর তিনি আল্লাহর নামে তাঁহাদের মাঝে খাদ্য বণ্টন করিয়া দিলেন। তাঁহারা খাইলেন, তারপরও খাদ্য অবশিষ্ট রহিয়া গেল। আর আমাদের ডেকচি আগের মতই টগবগ করতেছিল এবং আটা হইতে আগের মতই রুটি তৈরী হইতেছিল" (সহীহ আল-বুখারী, হাদীছ নং ৪১০১, ৪১০২, পৃ. ৮৪৫; সুনান আদ-দারিমী, ১খ, পৃ. ২০; সহীহ মুসলিম, ৬খ., পৃ. ১১৭-১১৮, হাদীছ নং ৫৮৭৭, ৩খ., পৃ. ১৬৪৫)।

অপর একটি বর্ণনায় আসিয়াছে ঃ

عن جابر ان رجلا اتى النبى ﷺ يستطعمه فاطعمه شطر وسق شعير فمازال الرجل ياكل منه وإمرأته وضيفها حتى كاله فاتى النبى ﷺ فقال لولم تكله لا كلتم منه ولقام لكم .

"হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু খাবার প্রার্থনা করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে প্রায় ৬০ কেজি (অর্ধ ওয়াসাক) যব দিলেন। সে প্রতিদিন উহা হইতে নিজের জন্য, নিজের স্ত্রী এবং মেহমানের জন্য ব্যয় করিত। তারপরও উহাতে কোন কমতি হয় নাই। অবশেষে একদিন লোকটি অবশিষ্ট যবগুলি মাপিয়া দেখিল, ফলে বরকত কমিয়া গেল। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাজির হইয়া ঘটনা বর্ণনা করিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যদি তুমি উহা না মাপিতে তবে উহা হইতে তুমি চিরকাল খাইতে পারিতে এবং উহা তোমাদের জন্য স্থায়ী হইত" (সহীহ মুসলিম, ফাদাইল, ৭খ., পৃ. ৬০, নং ৯)।

খাদ্য বৃদ্ধির বর্ণনা অপর একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابى هريرة قال كنا مع رسول الله ﷺ فى غزوة غزاها وهى غزوة تبوك فارمل فيها المسلمون واحتاجوا الى الطعام فاستاذنوا رسول الله ﷺ فى نحر الابل فاذن لهم فبلغ ذلك عمر فجاء الى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ ابلهم حملهم وتبلغهم علوهم ينهرونها ادع يا رسول الله عز وجل فيها بالبركة . قال اجل فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل ازوادهم فجاء الناس بما بقى معهم فجمعت ثم دعا الله عز وجل فيها بالبركة ودعاهم باوعيتهم فملاءها وفضل كثير. فقال رسول الله ﷺ عند ذلك

اشهد ان الا اله الا الله واشهد ان عبد الله ورسوله. ومن لقى الله عز وجل بها غير شاك دخل الجنة.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত এক যুদ্ধে ছিলাম। আর উহা ছিল তাবূকের যুদ্ধ। মুসলমানগণ সেই যুদ্ধে দারুণ অভাবে পড়িয়াছিল। ফলে তাহারা রাসূলুল্লাহ-এর নিকট সওয়ারীর পশু যবেহ করিবার অনুমতি চাহিল, আর রাসূলুল্লাহ (স) অনুমতিও দিলেন। এই সংবাদ হযরত উমার (রা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহাদের উট তাহাদিগকে বহন করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করিয়া থাকে। অথচ আপনি তাহাদিগকে সেই উট যবেহ করিবার অনুমতি দিয়াছেন! ইয়া রাসূলাল্লাহ! বরং তাহাদিগের অবশিষ্ট পাথেয় চাহিয়া পাঠান এবং তাহাতে বরকতের জন্য দু'আ করুন। তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহাই করা হইবে। অতঃপর সকলের অবশিষ্ট পাথেয় জমা করিতে আহবান করিলেন। তারপর লোকজন তাহাদের নিকট যাহা কিছু ছিল লইয়া আসিতে লাগিল। ফলে কিছু পাথেয় জমা হইল। রাসূলুল্লাহ (স) উহাতে বরকতের জন্য দু'আ করিলেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের পাত্রসমূহ লইয়া আসিতে আহবান করিলেন। তাহারা নিজেদের পাত্রসমূহ লইয়া আসিলেন এবং উহা হইতে পাত্র ভর্তি করিয়া লইলেন। তারপরও প্রচুর খাবার অবশিষ্ট রহিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। যে ব্যক্তি সন্দেহমুক্ত হইয়া আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে" (অনুরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. মুসলিম, ঈমান, বাব ১০, নং ১৩৯/৪৫; মিশকাত, হাদীছ নং ৫৯১২, ৩খ., পৃ. ৮৬৬, কিতাবুল ফাদাইল, বাবুন ফিল-মু'জিযাত; আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৫৫৬-৭)।

অপর একটি বর্ণনায় অনুরূপ খাদ্য বৃদ্ধি কথা বর্ণিত হইয়াছে এইভাবে ঃ

عن ابى عبيد انه طبخ للنبى ﷺ قدرا فقال له ناولنى الذراع . وكان يعجبه الذراع . فناوله الذراع ثم قال ناولنى الذراع فناوله ذراعا ثم قال ناولنى الذراع فقلت يا نبى الله وكم للشاة من دزاع فقال والذى نفسى بيده ان لو سكت لا عطيت اذرعا ما دعوت به.

"হযরত আবূ 'উবায়দ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর জন্য ডেকচিতে গোশ্ত রান্না করিলেন। খাদ্য পরিবেশন করা হইল রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, আমাকে সামনের পা দাও। রাসূলুল্লাহ (স) ছাগলের সামনের পা অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। অতএব তাঁহাকে সামনের পা পরিবেশন করা হইল। অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, আমাকে সামনের পা দাও। তারপর তাঁহাকে আরেকটি সামনের পা পরিবেশন করা হইল। তিনি আবার বলিলেন, আমাকে সামনের পা দাও। তখন রাবী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছাগলের কয়টি সামনের পা

থাকে? তিনি তাহাকে বলিলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁহার হাতে আমার জীবন! তুমি যদি চুপ থাকিতে তাহা হইলে আমি যতবার সামনের পা চাহিতাম, তুমি ততবার সামনের পা দিতে সক্ষম হইতে" (সুনান আদ-দারিমী, ১খ., পৃ. ২২, হা. নং ৪৪)।

অপর একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابى بعلاء سمرة بن جندب قال كنا مع النبى ﷺ نتتنا ول من قصعة من غدوة حتى الليل يقوم عشرة ويقعد عشرة قلنا فمما كانت تمد قال من اى شئ تعجب ما كانت تمد الا من ههنا واشار بيده الى السماء ·

"হযরত সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট রক্ষিত একটি পাত্র হইতে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করিতেছিলাম। দশজন দাঁড়াইয়া আর দশজন বসিয়া অর্থাৎ যখন দশজন বসিয়া খাইতেন তখন অপর দশজন অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। আমরা বলিলাম, এক পাত্র খাবার এত বেশী হইতে পারে কি করিয়া? তিনি বলিলেন, তুমি কিসে আশ্চর্যবোধ করিয়াছ! বৃদ্ধি-তো হয় একমাত্র সেই মহান আল্লাহ হইতে। এই বলিয়া তিনি স্বীয় হাত দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করিলেন" (সুনান আদ-দারিমী, ১খ., পৃ. ৩০; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং ৫৯২৮, ৩খ., পৃ. ১৬৬৭)।

অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে ঃ

عن انس قال كان رسول الله ﷺ عروسا بزينب فعمدت امى ام سليم الى تمر وسمن واقط فصنعت حيسا فجعلته فى تور فقالت يا انس اذهب بهذا الى رسول الله ﷺ فقل بعثت بهذا اليك امى وهى تقرئك السلام فقال رسول الله ﷺ ضعه ثم قال اذهب فادع لى فلانا فلانا وفلانا رجالا سماهم وادع لى من لقيت فدعوث من سمى ومن لقيت فرجعت فاذا البيت غاص باهله قيل لانس عددكم كم كانوا قال زهاء ثلاث مائة فرايت النبى ﷺ وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال فاكلوا حتى شبعوا فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى اكلوا كلهم قال لى يا انس ارفع فرفعت فما ادرى حين وضعت كان اكثر ام حين رفعت.

"হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত যয়নবকে বিবাহ করেন। বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমার মাতা উম্মু সুলায়ম (রা) খেজুর, ঘি ও পনিরযোগে হায়স (এক

প্রকার মিষ্টি জাতীয় খাবার) তৈরি করিলেন এবং একটি থালায় রাখিলেন। তারপর আমাকে বলিলেন, হে আনাস! ইহা লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাও এবং বল, আমার মাতা ইহা আপনাকে দেওয়ার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন এবং তিনি আপনাকে সালামও জানাইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, রাখো। তারপর বলিলেন, যাও, অমুক অমুককে আমার নিকট ডাকিয়া পাঠাও এবং তিনি তাহাদের নামও বলিয়া দিলেন। তিনি আরো বলিলেন, তাহা ছাড়া তোমার সহিত যাহাদের দেখা হইবে তাহাদিগকেও ডাকিয়া আনিবে। তারপর যাহাদের নাম বলা হইল এবং আমার সহিত সাক্ষাত হইল আমি তাহাদের দাওয়াত দিলাম। ইহার পর আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বাড়ী ভর্তি লোকজন। আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমাদের সংখ্যা কত? তিনি উত্তর দিলেন, তিন শত প্রায়। আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় হস্ত উক্ত হায়সে রাখিলেন এবং কি যেন বলিলেন, ইহার পর দশজন দশজন করিয়া খাইতে আহবান করিলেন। সকলে উহা হইতে খাইল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহর নাম নিয়া প্রত্যেকেই নিজের সামনে রক্ষিত খাবার হইতে খাইবে। আনাস বলেন, সকলে খাইল এবং পরিতৃপ্ত হইল। এইভাবে সকলেই একের পর এক খাইয়া বাহির হইয়া গেল এবং কেহ অবশিষ্ট রহিল না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, হে আনাস! তুলিয়া রাখ। আনাস বলেন, আমি তুলিয়া রাখিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম না, খাবার যখন রাখা হইয়াছিল তখন অধিক ছিল না, তুলিয়া রাখা হইয়াছিল তখন অধিক ছিল" (মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং ৫৯১৩, ৩খ., পৃ. ১৬৬১)।

অপর একটি বর্ণনায় আসিয়াছে ঃ

عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال كنا مع رسول الله ﷺ ثلاثين ومائة . فقال النبى ﷺ هل مع احد منكم طعام فاذا مع رجل صاع من طعام او نحوه فعجن . ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبى ﷺ ابيع ام عطية او قال ام هبة قال لا بل بيع قال فاشترى منه شاة . فصنعت وامر رسول الله ﷺ بسواد البطن ان يشوى . قال ايم الله ما من الثلاثين ومائة الأ حز له رسول الله ﷺ حزة حزة من سواد بطنها ان كان شاهدا اعطاه وان كان غائبا خبأها له وجعل فيها قصعتين . فاكلنا منها اجمعون وشبعنا وفضل فى القصعتين . فحملته على البعير او كما قال .

"হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) বলেন, আমরা এক শত ত্রিশজন লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাদের কাহারো নিকট খাবার আছে কি? দেখা গেল, এক ব্যক্তির নিকট এক সা (প্রায় ২ কেজি) পরিমাণ যব আছে অথবা এই

জাতীয় অন্য কোন খাবার। তারপর উহা গুলিয়া খামীর তৈরী করা হইল। তারপর দীর্ঘদেহী, দীর্ঘকেশী এক মুশরিক একপাল ছাগল হাঁকাইয়া লইয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এইগুলি বিক্রয়ের, না কি উপঢৌকন অথবা দানের জন্য? সে বলিল না, বরং আমি উহা বিক্রয় করিব। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার নিকট হইতে একটা ছাগল কিনিলেন। পরে উহা যবেহ করা হইল এবং টুকরা টুকরা করা হইল। রাসূলুল্লাহ (স) কলিজা ইত্যাদি ভুনা করিতে নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর কসম! তিনি এক শত ত্রিশজনের প্রত্যেককেই এক টুকরা করিয়া কলিজা ভুনা দিলেন। যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে তো দিলেনই আর যাহারা অনুপস্থিত ছিল তাহাদের জন্যও তুলিয়া রাখিলেন। তারপর দুই প্রকারের খাবার দুইটি পেয়ালায় রাখিলেন। আমরা প্রত্যেকেই তৃপ্তি সহকারে আহার করিলাম। তারপরও যথারীতি উভয় বেলায়ই পর্যাপ্ত খাবার অবশিষ্ট রহিয়া গেল। রাবী বলেন, আমি উহা উটের পিঠে তুলিয়া রাখিলাম অথবা রাবী যেমন বর্ণনা করিয়াছেন" (বুখারী, হাদীছ নং ৫৩৮২, পৃ. ১১৬৭; মুসলিম, ৬খ., পৃ. ১২৯-১৩০)।

অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن انس ان ام سليم امه عمدت الى مد من شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها ثم بعثتنى الى النبى ﷺ فاتيته وهو فى اصحابه فدعوته قال ومن معى فجئت فقلت انه يقول ومن معى فخرج اليه ابو طلحة قال يا رسول الله انما هو شيئ صنعته ام سليم فدخل فجئ به وقال ادخل على عشرة فدخلوا فاكلوا حتى شبعوا ثم قال ادخل على عشرة فد خلوا فا كلوا حتى شبعوا ثم قال ادخل على عشرة حتى عد اربعين ثم اكل النبى ﷺ ثم قام فجعلت انظرهل نقص منهاشيئ .

"হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তাহার মা উম্মে সুলায়ম এক মুদ্দ (প্রায় ১৮ লিটার) যব পিষিলেন এবং উহা দ্বারা খতীফা (দুধ ও আটা মিশ্রিত খাবার) তৈরী করিলেন। তারপর ঘি-এর পাত্র নিংড়াইয়া দিলেন। অতঃপর আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট পাঠাইলেন। আমি তাঁহার নিকট আসিলাম। তিনি সাহাবীদের মাঝে বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দাওয়াত দিলাম। তিনি বলিলেন ঃ আর যাঁহারা আমার সঙ্গে আছে ? আমি বাড়ি আসিয়া বলিলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সঙ্গে যাহারা আছে? তারপর আবূ তালহা তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, এতো সামান্য খাবার, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহা উম্মে সুলায়ম তৈরী করিয়াছে। তারপর তিনি আসিলেন, তাঁহার সামনে সেইগুলিই পেশ করা হইল। তিনি বলিলেন, দশজন করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। তাহারা আসিয়া তৃপ্তি সহকারে খাইল। তারপর তিনি পুনরায় বলিলেন, দশজন আমার নিকট পাঠাও। তারপর তাহারাও আসিয়া তৃপ্তি সহকারে খাইল। পুনরায় তিনি বলিলেন, আরো দশজনকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। এইভাবে তিনি চল্লিশজন পর্যন্ত গণনা করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) নিজে খাইলেন। আমি দেখিতে

লাগিলাম, তাহা হইতে কিছু কমিয়াছে কিনা" (সহীহ আল-বুখারী, হাদীছ নং ৫৪৫০, পৃ. ১১৭৯, কিতাবুল আতইমা)।

অপর একটি হাদীছে আসিয়াছে ঃ

عن عبد الرحمن بن ابى بكر ان اصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء وان رسول الله ﷺ قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث . ومن كان عنده طعام اربعة فليذهب بخامس بسادس او كما قال وان ابا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبى الله ﷺ بعشرة وابو بكر و ثلاثة قال فهو انا وابى وامى ولا ادرى هل قال امراتى وخادمى بين بيتنا وبين وبيت ابى بكر وان ابا بكر تعشى عند النبى ﷺ ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله ﷺ فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امراته ما حبسك عن اضيافك قال اوما عشيتهم قالت ابوا حتى تجئ قد عرضوا عليهم فغلبوهم قال فذهبت انا فاختبأت وقال ياغنثر فجدع وسب وقال كلوا وقال لا اطعمه ابدا قال وايم الله ما كنا نأخذ من لقمة الا ربا من اسفلها اكثر مما قبل ذلك بثلاثة مرار قال فاكل منها ابو بكر وقال انما كان ذلك من الشيطان يعنى يمينه ثم اكل منها لقمة ثم حملها الى رسول الله ﷺ فاصبحت عنده قال كان بيننا وبين قوم عهد فمضى الاجل فتفرقنا اثنا عشر رجالا مع كل رجل منهم اناس الله اعلم كم مع كل رجل . قال الا انه بعث معهم فاكلوا منها اجمعون او كما قال .

"হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত । আসহাবে সুফ্ফার লোকজন ছিলেন দরিদ্র। তাই রাসূলুল্লাহ (স) একদা বলিলেন, যাহার নিকট দুইজনের খাবার আছে সে যেন তৃতীয় জনকে সঙ্গে লইয়া যায়। আর যাহার নিকট চারজনের খাবার আছে সে যেন পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যায় অথবা বর্ণনাকারী যেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রাবী বলেন, আবূ বকর (রা) তিনজনকে সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইলেন। আর আল্লাহ্‌র রাসূল (স) দশজনকে লইয়া রওয়ানা হইলেন। আবূ বকর (রা) বলিলেন, আমাদের পরিবারে আমরা ছিলাম তিনজন ঃ আমি, আমার পিতা ও আমার মাতা। বর্ণনাকারী বলেন, আমার স্ত্রী এবং আমাদের ও আবূ বকরের বাড়ীতে শরীক খাদিম এই কথা বলিয়াছিলেন কিনা জানিনা। রাবী বলেন, আবূ বকর (রা) নবী কারীম (স)-এর গৃহে রাতের খাবার খাইলেন, তারপর অপেক্ষা করিলেন।

অবশেষে এশার নামায আদায় করা হইল। সালাতশেষে তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। তারপর রাতের কিয়দংশ অতিবাহিত হইলে তিনি গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, মেহমান রাখিয়া দেরী করিলেন কেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, তুমি কি তাহাদিগকে রাতের খাবার খাওয়াও নাই? তিনি উত্তর দিলেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তাহারা আহার করিতে কিছুতেই রাজি হয় নাই। কয়েকবারই খাবার পেশ করা হইয়াছে কিন্তু তাহারা তাহাদের কথায়ই অনড়। আবদুর রহমান বলিলেন, আমি গিয়া লুকাইয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, হে নির্বোধ! তারপর তিনি আমাকে বকাবকিও করিলেন। আর মেহমানদের বলিলেন, কাজটি ভাল হইল না। এইবার আপনারা আহার করুন। তিনি আরো বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমরা যেই লোকমাই গ্রহণ করিতেছিলাম তাহার নীচে তাহারও অধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছিল। এমনকি আমরা পরিতৃপ্ত হইলেও আমাদের খাদ্য পূর্বের ন্যায়ই রহিল, বরং তাহা হইতে অনেক বেশী রহিয়া গেল। আবূ বকর (রা) খাবারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, খাবার যেমন ছিল তেমনি আছে বা তাহা হইতেও অধিক হইয়াছে। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, হে উখ্‌তে বনী ফিরাস! ব্যপার কি? তিনি বলিলেন, না কিছু না, আমার চোখের প্রশান্তি। এইগুলি পূর্বে যাহা ছিল, উহা হইতে তিন গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আবদুর রহমান বলেন, ইহার পর আবূ বকর (রা) কিছু খাইলেন এবং বলিলেন, ওটা অর্থাৎ (শপথ) শয়তানের পক্ষ হইতে। তারপর আরও এক লোকমা খাইলেন। তারপর সেইগুলি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট লইয়া গেলেন। আমিও তাঁহার নিকট সকাল পর্যন্ত ছিলাম। তিনি বলিলেন, আমাদের এবং কোন এক গোত্রের মাঝে চুক্তি ছিল। মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে আমরা বারজন লোক নিযুক্ত করিলাম। তাহাদের প্রত্যেকের সাথে আরো অনেক লোক ছিল। তবে আল্লাহই ভাল জানেন, প্রত্যেকের সাথে কতজন ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট সেই খাবার পাঠানো হইল আর তাহারা সকলেই সেই খাবার খাইলেন অথবা বর্ণনাকারী যেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন" (মুসলিম, ৬খ., পৃ. ১৩০; সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু 'আলামাতিন নুবূওয়াত, হাদীছ নং ৩৫৮১, পৃ. ৭৩৪)।

অপর একটি হাদীছে আসিয়াছে ঃ

عن ابى هريرة قال لما كان يوم غزوة تبوك اصاب الناس مجاعة فقال عمر يا رسول الله ! ادعهم بفضل ازوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة فقال نعم فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل ازوادهم فجعل الرجل يجئ بكف ذرة ويجئ الاخر بكف تمر حتى اجتمع على النطع شئ يسير فدعا رسول الله ﷺ بالبركة ثم قال خذوا فى اوعيتكم فاخذوا فى اوعيتهم حتى ماتركوا فى العسكر وعاء الا ملؤوه قال فاكلوا حتى شبعوا و فضلت فضلة .

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তাবূক যুদ্ধে সাহাবীগণের খাদ্যাভাব হইল। তখন হযরত 'উমার (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহাদিগকে তাহাদের অবশিষ্ট পাথেয় নিয়া আসিতে আদেশ করুন। তারপর তাহাতে আল্লাহ্‌র নিকট বরকতের জন্য দু'আ করুন। তখন তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহাই করা হইবে। তারপর একটি চাদর আনিতে আদেশ করিলেন। চাদর আনা হইলে তিনি তাহা বিছাইয়া দিলেন। তারপর তাহাদের অবশিষ্ট পাথেয় নিয়া আসিতে বলিলেন। তারপর লোকজন নিয়া আসিতে লাগিল। কেহ নিয়া আসিল সামান্য ভুট্টা, কেহ নিয়া আসিল সামান্য খেজুর, আবার কেহ নিয়া আসিল সামান্য খাবার। অবশেষে দেখা গেল যে, চাদরের উপর অতি সামান্য খাবার জমিয়াছে। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বরকতের জন্য দু'আ করিলেন। শেষে বলিলেন, তোমাদের পাত্রসমূহ তাহা হইতে ভরিয়া লও। অতএব তাহারা তাহাদের পাত্রসমূহ ভরিয়া লইলেন। দেখা গেল সৈনিকদের এমন কোন পাত্র ছিল না যাহা তাহারা ভরে নাই। তারপর তাহারা লইল এবং পরিতৃপ্ত হইল। তৎপরও খাবার অবশিষ্ট রহিয়া গেল" (মিশকাতুল মাসাবীহ্, হাদীছ নং ৫৯১২, ৩খ., পৃ. ১৬৬০, বাবুন ফিল-মু'জিযাত)।

আর একটি হাদীছে আসিয়াছে ঃ "হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি কিছু খেজুর লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলাম। তারপর তিনি বলিলেন, ইহাতে বরকতের জন্য দু'আ করুন। তিনি বলিলেন, অতঃপর খেজুরগুলি তিনি তাঁহার সামনে সাজাইয়া রাখিলেন, তারপর দু'আ করিলেন। তারপর বলিলেন, এইগুলি পাত্রে রাখিয়া দাও। যখন তাহা হইতে বাহির করিবার প্রয়োজন হয় তখন তোমার হাত ঢুকাইবে, কিন্তু তাহা খুলিবে না। রাবী বলেন, আমি তাহা হইতে এইরূপ এইরূপ গ্রহণ করিয়াছি এবং আল্লাহর রাস্তায় দানও করিয়াছি। আমরা তাহা হইতে খাইয়াছি এবং খাওয়াইয়াছিও, অথচ রসদ ব্যাগ আমা হইতে পৃথক হয় নাই। আর যখন হযরত 'উছমান (রা)-কে হত্যা করা হইয়াছিল তখন তাহা শেষ হইয়া যায়। অপর একটি বর্ণনায় আসিয়াছে, তিনি বলেন, আমি তাহা হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় খাইয়াছি এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগেও খাইয়াছি। আর হযরত 'উছমান (রা)-এর যুগ পুরোটাতেই খাইয়াছি। তারপর যখন 'উছমান (রা)-কে হত্যা করা হইল আমার হাতে যাহা ছিল তাহা কাড়িয়া লওয়া হইল এবং রসদ পাত্রটিও কাড়িয়া লওয়া হইল। রাবী বলেন, আমি কি তোমাদিগকে সংবাদ দিব যে, কতদিন তাহা হইতে খাইয়াছি ? আমি তাহা হইতে দুই শত ওয়াসাক-এর চেয়েও বেশী খাইয়াছি (ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, হাদীছ নং ৮৪১৪, ৩খ., পৃ. ৩১; আল- বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১০১-১০২)।

অপর একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমার সাথী সুফ্ফাবাসীদিগকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তিনি বলেন, আমি তাহাদের প্রত্যেককে এক এক করিয়া সংবাদ দিলাম এবং একত্র করিলাম, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে আসিলাম। আমরা অনুমতি চাহিলাম। তিনি আমাদিগকে

অনুমতি দিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমাদের সামনে একটি পাত্র রাখা হইল। রাবী বলেন, আমার মনে হইল ইহা এক মুঠ পরিমাণ যব হইবে। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার হস্ত তাহাতে রাখিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্র নাম লইয়া খাও। রাবী বলে, আমরা ইচ্ছামত খাইলাম, অতঃপর হাত উঠাইয়া নিলাম। আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমরা যখন খাওয়া শেষ করিয়াছিলে তখন তাহার পরিমাণ কত ছিল? তিনি উত্তর দিলেন, সেই পরিমাণই ছিল যেই পরিমাণ রাখা হইয়াছিল। তবে তাহাতে আঙ্গুলসমূহের দাগ পড়িয়াছিল মাত্র" (আল- বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ৯৬)।

আর একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "হযরত দুকায়ন ইব্ন সা'ঈদ আল-খাছ'আমী (রা) বলেন, আমরা চার শত চল্লিশজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আসিলাম এবং খাদ্য প্রার্থনা করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) হযরত 'উমার (রা)-কে বলিলেন, যাও তাহাদিগকে খাইতে দাও। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (স)! আমার নিকট যেই খাবার আছে তাহা শুধু আমার পরিবার-পরিজনের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। তিনি বলিলেন, যাও, তাহাদিগকে খাইতে দাও। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (স)! আপনি যেই কথা বলিলেন তাহাই করিব। রাবী বলেন, তারপর হযরত 'উমার দাঁড়াইলেন, আমরাও তাঁহার সহিত দাঁড়াইলাম। তারপর আমাদিগকে তাঁহার একটি কামরাতে লইয়া গেলেন। তারপর তাঁহার ঘর হইতে চাবী বাহির করিলেন এবং দরজা খুলিলেন। দুকায়ন (রা) বলেন, ঘরে দেখিলাম অতি সামান্যই খেজুর আছে। তিনি বলিলেন, তোমরা কি চাও? রাবী বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই তাহার প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ করিলাম। তারপর আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, তাহার একটি খেজুরও কমে নাই" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১০৭)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর খাদ্য বৃদ্ধিসংক্রান্ত মু'জিযা সম্বলিত আরও অনেক বর্ণনা রহিয়াছে। এই জাতীয় কিছু বর্ণনা কাযী 'ইয়ায স্বীয় গ্রন্থ আশ-শিফা-য় সূত্রবিহীনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইতে কিছু বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একদা হযরত আবূ আয়্যূব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স) এবং হযরত আবূ বকর (রা) এই দুইজনের উপযোগী খাদ্য তৈরী করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, আনসারদের মধ্য হইতে ৪০ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে খাবারের জন্য আহ্বান কর। তাহাদেরকে ডাকা হইল। দুইজনের জন্য তৈরী খাদ্য দ্বারাই তাঁহাদেরকে আপ্যায়ন করা হইল। তাঁহারা খাওয়ার পরও খাদ্য যথারীতি অবশিষ্ট রহিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, এইবার ৬০ জনকে ডাক। ডাকা হইলে তাঁহারাও পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিলেন। তারপরও খাদ্য অবশিষ্ট রহিল। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এইবার ৭০ জনকে ডাক। তারপর তাঁহারাও আসিয়া খাইয়া গেলেন। এতলোক খাওয়ার পরও খাদ্য শেষ হয় নাই। এই বিস্ময়কর অবস্থা দেখিয়া আপ্যায়িত ব্যক্তিবর্গ ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করিলেন। দুইজনের জন্য তৈরী খাদ্যে এত বরকত হইয়াছিল যে, তাহা দ্বারা এক শত আশিজন পর্যন্ত খাইয়া ছিলেন (কাযী 'ইয়ায, আশ-শিফা,

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলিতে পারি, খাদ্য বৃদ্ধি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মু'জিযা। কেননা ক্ষুধার্ত অনাহারী একজন বা দুইজনের জন্য তৈরী খাবার একজন বা দুই জনকেই পরিতৃপ্ত করিতে পারে। সেই খাদ্য কোনক্রমেই একাধিক লোকের ক্ষুধা নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। আর ইহাই স্বাভাবিক এবং বিশ্বাস্য। অথচ মু'জিযা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অলৌকিক ব্যাপার।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আল-সাহীহ, দারুস সালাম, রিয়াদ ১৪১৭ হি. / ১৯৯৭ খৃ.; (২) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, দারুল মা'রিফা, বেরূত তা. বি.; (৩) ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র), মুওয়াত্তা, দারুল হাদীছ, ২য় সংস্করণ, কায়রো ১৪১৩ হি. / ১৯৯৩ খৃ.; (৪) ইমাম আবদুর রাহমান আদ-দারিমী, আস-সুনান, দারু ইহ্য়াইস সুন্নাহ আল-নাবাবিয়্যা, তা.বি.; (৫) ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ আল-খাতীব আত্- তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, দামিশক, ১৩৮১ হি.; (৬) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, দারু ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত ১৪১৪/ ১৯৯৩; (৭) কাযী 'ইয়ায, আশ-শিফা, দারুল ফিকর, বৈরূত, তা. বি.।

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

খেজুরে বরকত হওয়ার ঘটনা

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তাবূকের যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কিরাম খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতে থাকিলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের সওয়ারী উট যবেহ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারি। ইহাতে রাসূলে কারীম (স) সম্মতি জ্ঞাপন করিলে হযরত 'উমার ফারূক (রা) আসিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি তাহাই করা হয় তবে সওয়ারীর উট কমিয়া যাইবে। বরং কাফেলার লোকদের নিকট অবশিষ্ট যেই খাদ্য রহিয়াছে উহা একত্র করিয়া আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে বরকতের জন্য দু'আ করুন। হয়ত আল্লাহ্ পাক ইহাতেই বরকত দিবেন।

রাসূলে কারীম (স) একটি দস্তরখান বিছাইয়া উহাতে অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী একত্র করার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘোষণার পর কেহ এক মুষ্টি যব, কেহ এক মুষ্টি খেজুর, আবার কেহ সামান্য কয়েকটি রুটির টুকরা লইয়া দস্তরখানে রাখিতে লাগিলেন। অতঃপর নবী কারীম (স) সেই খাদ্যে বরকতের দু'আ করিয়া সকলকে স্ব স্ব পাত্র ভরিয়া লইতে আদেশ দিলে প্রত্যেকেই পাত্র পূর্ণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিলেন। কিন্তু আল্লাহ্র কি মহিমা। ইহার পরও খাদ্য অবশিষ্ট রহিয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং নিশ্চয় আমি তাঁহার রাসূল। যেই ব্যক্তি অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করত এই কলেমা মুখে উচ্চারণ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে (সহীহ মুসলিম, ১খ., পৃ. ৪২-৪৩; ২খ., পৃ. ৮১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১১৭-১১৮; আশ্-শিফা, ১খ., পৃ. ৫৬৪-৫৬৫; আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ২৭৫-২৭৬; শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন-নবী, ৩খ., পৃ. ৩৫৫)।

আল-ওয়াকিদীর বর্ণনায় আছে, "বনী সা'দ ইব্ন হুসায়মের এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) তাবূকের এক স্থানে অবস্থানকালে আমি তাঁহার খেদমতে হাযির হইলাম। সেই সময় তাঁহার সহিত আরও ছয় ব্যক্তি অবস্থান করিতেছিলেন। আমি সেইখানে পৌঁছিয়া তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি বসিয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আপনি আল্লাহ্র সত্য রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তুমি মুক্তি পাইয়াছ। অতঃপর বিলাল (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, "আমাদেরকে খাবার দাও।" বিলাল (রা) একটি দস্তরখান বিছাইয়া একটি থলিয়া হইতে

খেজুর, ঘি ও পনীরের তৈরী পাঞ্জেরী বাহির করিলেন। অতঃপর নবী কারীম (স) আমাদেরকে খাওয়ার নির্দেশ দিলে আমরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! খাবারের পরিমাণ দেখিয়া প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম, সম্পূর্ণ খাবার একাই খাইয়া ফেলিব। এই কথা শুনিয়া মহানবী (স) বলিলেন, কাফের সাত অন্ত্রে ভক্ষণ করিয়া থাকে, আর মু'মিন ভক্ষণ করে এক অন্ত্রে। পরের দিন মধ্যাহ্ন ভোজে আহার গ্রহণ ও ইসলামের প্রতি আমার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করণার্থে আমি মহানবী (স)-এর খেদমতে হাযির হইয়া দেখিতে পাইলাম, তাঁহার নিকট আরও দশজন মানুষ উপস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বিলাল (রা)-কে খাবার আনিতে বলিলে তিনি একটি দস্তরখান বিছাইয়া একটি থলিয়া হইতে মুষ্টি ভরিয়া খেজুর বাহির করিতে থাকিলেন। নবী কারীম (স) বলিলেন, "বিলাল! আরশের অধিপতির উপর ভরসা রাখিয়া উদারমনে খেজুর এখানে রাখ এবং এই ভীতি অন্তরে স্থান দিও না যে, সেইখানে বখিলী করা হইবে।"

বিলাল (রা) সমস্ত খেজুর থলিয়া হইতে বাহির করিয়া রাখিলে আমি অনুমান করিলাম, সেই খেজুর দুই মুদ্দ (প্রায় দেড় সের) হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) আপন হস্ত মুবারক সেই খেজুরের উপর রাখিয়া আমাদেরকে বিসমিল্লাহ বলিয়া খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমরা সকলেই তাহা হইতে পেট ভরিয়া খাইলাম। আমি নিজে খেজুর উৎপাদন করিতাম বিধায় বেশী খাওয়ার অভ্যাস সত্ত্বেও আর খাওয়ার মত অবস্থা ছিল না। সকলের খাওয়া শেষ হইলে আমি দেখিতে পাইলাম, দস্তরখানে কম-বেশী তত খেজুরই পড়িয়া রহিয়াছে যতগুলি বিলাল (রা) রাখিয়াছিলেন যেন তাহা হইতে একটি খেজুরও আমরা খাই নাই।

পরের দিন আসিয়াও আমি দশ বা তাহার চাইতে এক/দুইজন বেশী মানুষ দেখিতে পাইলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বিলাল (রা)-কে খাবার দিতে বলিলে তিনি পূর্বের সেই থলিটিই নিয়া আসিলেন। উহা আমি দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। দস্তরখানে খেজুর রাখা হইলে মহানবী (স) তাহার উপরে হাত রাখিবার পর আমাদেরকে বিসমিল্লাহ বলিয়া খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমরা পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও পূর্বের সমপরিমাণই রহিয়া গেল। পরপর তিন দিন একই অবস্থা হইল (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ১০১৭-১০১৮)।

ইয়াস ইব্ন সালামা (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, খায়বার অভিযানে আমরা মহানবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। একদিন তিনি আমাদের নিকট থাকা অবশিষ্ট পাথেয় তথা খেজুরসমূহ একত্র করার নির্দেশ দিয়া একটি দস্তরখান বিছাইলেন। আমরা সকলে আমাদের পাথেয়সমূহ উহাতে রাখিয়া দিলাম। খাদ্যের স্তূপ দেখিয়া আমি অনুমান করিলাম যে, উহা বকরীর পিঠ পরিমাণ উঁচু হইবে। আমরা সংখ্যায় ছিলাম চার শত জন। আমাদের প্রত্যেকেই তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর আমি আবারও দেখিয়া ধারণা করিলাম, খাদ্যের স্তূপ বকরীর পিঠের সমানই রহিয়া গিয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১২০)।

• হযরত জাবির (রা) বলেন, আমার পিতা ইয়াহূদীদের অনেক ঋণ রাখিয়া শাহাদাত বরণ করেন। পাওনাদাররা আসিয়া ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিলে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলাম, খেজুর ব্যতীত এই মুহূর্তে আমার নিকট ঋণ পরিশোধের জন্য আর কোন বস্তুই নাই। আর শুধু খেজুরের ফলনে কয়েক বৎসরেও ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তাই মেহেরবানী করিয়া আপনি আমার সঙ্গে চলুন যেন ঋণদাতাগণ আমার উপর কঠোরতা আরোপ না করে।

তাই নবী কারীম (স) তাশরীফ আনিয়া খেজুরের স্তূপসমূহের চতুস্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করিবার পর বরকতের দু'আ করিলেন। অতঃপর একটি স্তূপের উপর বসিয়া বলিলেন, "ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধ করিতে থাক"। মহানবী (স)-এর দু'আয় ঐ খেজুরে এত বরকত হইল যে, ঋণদাতাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করার পরও সমপরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রহিয়া গেল (সহীহুল বুখারী, ১খ., পৃ. ৫০৫-৫০৬; আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৫৬৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১২০-১২১; আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ২৭৫; শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী, ৩খ., পৃ. ৩৫৩; দালাইলুন-নুবূওয়াত, পৃ. ১৫৫)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী কারীম (স) এক যুদ্ধে গমন করিলেন। পথিমধ্যে খাদ্যসংকট দেখা দিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আবূ হুরায়রা! তোমার নিকট খাবার আছে কি ? আমি বলিলাম, কয়েকটি খেজুর ব্যতীত আমার নিকট আর কিছু নাই। তাঁহার নির্দেশে আমি খেজুরগুলি হাজির করিলে তিনি একটি দস্তরখান আনিতে বলিলেন। তাহা আনিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) সবগুলি খেজুর মুঠির ভিতর লইলেন। খেজুর ছিল একুশটি। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ পড়িয়া প্রতিটি খেজুর দস্তরখানে রাখিবার পর পুনর্বার সবগুলি খেজুর হাতের মুঠিতে চাপ দিয়া বলিলেন ঃ যাও, অমুককে তাহার সঙ্গীসহ ডাকিয়া আন। সেইমতে তাহারা আসিয়া খেজুর ভক্ষণ করিয়া চলিয়া গেল। মহানবী (স) পুনরায় বলিলেন ঃ যাও, অমুককে তাহার সঙ্গীসহ ডাকিয়া আন। তাহারা আসিয়া তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া চলিয়া যাইবার পরও কিছু খেজুর অবশিষ্ট রহিয়া গেল। অতঃপর নবী কারীম (স)-এর নির্দেশে তাঁহার সহিত বসিয়া আমি খেজুর খাইলাম। উহার পরও কিছু খেজুর বাঁচিয়া গেল। তিনি সেইগুলি আমার থলিতে ভরিয়া দিয়া বলিলেন, আবূ হুরায়রা! তুমি কিছু নিতে চাহিলে এই থলিতে হাত ঢুকাইয়া বাহির করিয়া লইবে। কিন্তু কখনও থলি উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিও না। তাহা হইলে বরকত শেষ হইয়া যাইবে।

ঐ ঘটনার পর হইতে যখনই প্রয়োজন হইত আমি থলির ভিতর হাত ঢুকাইয়া খেজুর বাহির করিয়া লইতাম। ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি ঐ থলি হইতে আহার করিয়াছি এবং পঞ্চাশ ওয়াসাক খেজুর আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিয়াছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আর বরকতে কোনদিন ঐ থলিটি খেজুরশূন্য হয় নাই। থলিটি আমার কোমরের পিছনে ঝুলান থাকিত। হযরত 'উছমান (রা)-এর শাহাদাতের দিন থলিটি আমার বাহনের পশ্চাতে লটকাইয়া

রাখিয়াছিলাম তখন উহা হারাইয়া যায় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১২১-১২২; আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৫৬৯; আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ২৮২; শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী, ৩খ., পৃ. ৩৬৬; আল-খাসাইসুল কুবরা, উর্দূ অনুবাদ, ২খ., পৃ. ১২৯)।

সা'ঈদ ইব্ন মীনার উদ্ধৃতিতে ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় নু'মান ইব্ন বশীরের ভগ্নি এবং বশীর ইব্ন সা'দের কন্যা এই প্রসঙ্গে বলেন, আমার মা 'উরওয়া বিনত রাওয়াহা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, এই খেজুরগুলি তোমার পিতা ও মামা 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে দিয়া আস। এক মুষ্ঠির মত খেজুর একটি কাপড়ে জড়াইয়া আমি খন্দকের দিকে চলিলাম যাহা আমার আব্বা ও মামার দ্বিপ্রহরের খাবার ছিল।

আমি আমার পিতা ও মামাকে খুঁজিতেছিলাম। এক পর্যায়ে হযরত রাসূল কারীম (স) আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বেটি! তোমার কাছে কি? আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইগুলি খেজুর যাহা আমার আম্মা, আমার পিতা ও মামার দুপুরের খাবারের জন্য পাঠাইয়াছেন। অতঃপর তিনি চাহিলে আমি খেজুরগুলি তাঁহার হাতে দিলাম, কিন্তু তাঁহার হাত সেই খেজুরে পূর্ণ হইল না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে দস্তরখান বিছানোর পর সেই খেজুরগুলি তিনি তাহার উপর ছড়াইয়া দিয়া সকলকে খাওয়ার জন্য ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

বশীরের কন্যা বলেন, খন্দকবাসী দস্তরখানে একত্র হইতে লাগিলেন। একদল খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া যাইবার পর দ্বিতীয় দল আসিয়া খাইতে আরম্ভ করিতেন। এইভাবে সকল খন্দকবাসী পেট ভরিয়া আহার করিবার পরও খেজুর শেষ হইল না। আল্লাহ্র কসম! দস্তরখানে তখনও খেজুর মওজুদ ছিল যাহা কিনার দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১২০; আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ২৮৪)।

ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, আমাকে রাসূলে আকরাম (স) বলিয়াছেন ঃ "সালমান! নিজ মালিকের সঙ্গে আযাদীর জন্য শর্তাবলী ঠিক করিয়া চুক্তি করিয়া নাও"। আমি তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে তাহাকে চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ প্রদান ও তিন শত খেজুর গাছ লাগাইয়া তাহাতে ফল আসিবার পর আমি মুক্তি লাভ করিব। মহানবী (স) সাহাবীগণকে (রা) উৎসাহ দিয়া বলিলেন ঃ তোমরা সালমানকে খেজুরের চারা দিয়া সাহায্য কর। ফলে আমাকে কেহ ৩০টি, কেহ ২০টি, কেহ ১৫টি, আবার কেহ ১০টি খেজুরের চারা দ্বারা সাহায্য করিলেন। এইভাবে তিন শত চারা পূর্ণ হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে গর্ত খুঁড়িবার নির্দেশ দিলেন। আমি সঙ্গীদেরকে সঙ্গে লইয়া গর্ত খুঁড়িবার পর মহানবী (স) আপন হস্তে চারাগুলি রোপণ করিয়া দিয়া বরকতের দু'আ করিলেন। সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে সালমানের জীবন! একটি বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে সকল গাছেই ফল আসিয়া গেল। একটি চারাও শুকায় নাই কিংবা মরিয়াও যায় নাই।

সবগুলিই খুব তরতাজা হইয়া প্রচুর ফল দিয়াছিল (ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১৭খ., পৃ. ৯৯-১০০; ইবন হিশাম, সীরাতুন-নবী, ১খ., পৃ. ২৪৪; সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৪২৪)।

মহানবী (স) মদীনায় আগমনের পর হযরত আনাস (রা)-এর আম্মা তাহাকে চাদরে জড়াইয়া খাদেম হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত করিবার পর তাঁহার জন্য দু'আর দরখাস্ত করিলেন। মহানবী (স) তাহার সম্পদ ও সন্তানের উন্নতির জন্য দু'আ করিলেন। হযরত আনাস (রা)-এর উক্তি এই যে, সেই দু'আর বরকতে আজ তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক এবং তাহার ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনীর সংখ্যা এক শতের কাছাকাছি পৌছিয়া গিয়াছে। মহানবী (সা)-এর দু'আয় হযরত আনাস (রা) এমন বরকত লাভ করিলেন যে, তাঁহার বাগানে বৎসরে দুইবার ফল হইত (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী, ৩খ., পৃ. ৩৪৮)।

দুকায়ন ইব্ন সা'ঈদ খাছ'আমী ও নু'মান ইব্ন মুকাররিন বলেন, আমরা চারি শত চল্লিশজন লোক একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আসিয়া খাদ্যসামগ্রীর আবেদন করিলাম। তিনি হযরত 'উমার (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, যাও, ইহাদেরকে খাদ্যসামগ্রী দিয়া দাও। হযরত উমার (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বর্তমানে কয়েক সা' খেজুর ছাড়া আর কিছুই নাই, গ্রীষ্মকালে যাহা আমার সন্তানদের জন্যও যথেষ্ট হইবে না। রাসূলুল্লাহ (স) আবারও বলিলেন, যাও, ইহাদেরকে খাদ্যসামগ্রী দিয়া দাও। এইবার হযরত 'উমার (রা) যখন দরজা খুলিলেন তখন সেইখানে খেজুরের এত বড় স্তূপ দেখিতে পাইলেন যেন দুগ্ধপোষ্য উটের বাচ্চা বসিয়া আছে। তিনি আমাদেরকে নেওয়ার নির্দেশ দিলে আমরা সকলে ইচ্ছামত খেজুর লইবার পর খেজুরের স্তূপের দিকে তাকাইয়া আমার মনে হইল যেন আমরা কেহই তথা হইতে একটি খেজুরও গ্রহণ করি নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১২৭; আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৫৬৭; শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন-নবী, ৩খ., পৃ. ৩৫৮)।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, মহানবী (স) হযরত যয়নব (রা)-কে বিবাহ করার পর আমাকে কিছু নির্দিষ্ট লোক ও উপস্থিত অন্যান্য লোককে ডাকিয়া আনিবার নির্দেশ দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘর লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। তাহাদের সম্মুখে এক মুদ্দ পরিমাণ খেজুরের তৈরি এক পেয়ালা হায়েস পেশ করা হইলে মহানবী (স) তাহাতে হাত রাখিয়া তিনটি আঙ্গুল ডুবাইয়া দিলেন। সকলে তৃপ্তি সহকারে লই পান করিবার পরও পেয়ালাটি পূর্বের ন্যায়ই ভরপুর রহিয়া গেল। অথচ লোকসংখ্যা ছিল একাত্তর থেকে বাহাত্তর জন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১১৪; আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৫৬৬-৫৬৭)।

হযরত ইব্ন সা'দ সালিম ইব্নুল জা'দ হইতে বর্ণনা করেন, একবার নবী কারীম (স) সাহাবায়ে কিরামকে সফরের পাথেয় হিসাবে মুখ বন্ধ করিয়া এক মশক পানি দিলেন এবং সাথে সাথে দু'আও করিয়া দিলেন। নামাযের সময় সাহাবীগণ মশক খুলিয়া দেখিতে পাইলেন, উহা

দুধে পরিপূর্ণ এবং উপরে সর জমিয়া আছে (বিশ্বনবীর তিনশত মো'জেযা, পৃ. ১৮৬, মো'জেযা নং ১৯৬, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সহীহ আল-বুখারী, কুতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ, তা. বি.; (২) সহীহ মুসলিম, কুতুবখানা রাহীমিয়া, দেওবন্দ, তা. বি.; (৩) মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার ইব্ন ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, সম্পা. ড. মারসিদন জোন্স, বৈরূত, আলামুল-কুতুব, ১৪০৪ হি. /১৯৮৪ খৃ.; (৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল আ'য়ান লিত-তুরাছ, ১৪০৮ হি./১৯৮৪ খৃ.; (৫) কাযী ইয়াদ, আশ-শিফা, দামেশক, তা. বি.; (৬) ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা, মিসর ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ ঈ.; (৭) শিবলী নু'মানী ও সাইয়েদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী, ৩খ., ১৪০৮ হি.; (৮) আবূ না'ঈম ইস্পাহানী, দালায়িলুন নুবূওয়াত, বৈরূত, তা. বি.; (৯) জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, উর্দূ অনুবাদ ঃ মুফতী গোলাম মুঈনুদ্দীন সা'দী, দিল্লী ১৯৮৮ খৃ.; (১০) ইবন হিশাম, আস -সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দিল্লী, তা. বি.; (১১) ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা (স), সিলেট বাংলাদেশ তা.বি.; (১২) বিশ্বনবীর তিন শত মো'জেযা, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা।

আহমাদ হোসাইন

দুধে বরকত হওয়ার ঘটনা

ইমাম বুখারী (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, সেই আল্লাহ্‌র কসম যিনি ব্যতীত আর কোন প্রতিপালক নাই! ক্ষুধার তাড়নায় কয়েকবার আমি অস্থির হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলাম এবং প্রচণ্ড ক্ষুধায় পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। এমন অসহায় অবস্থায় একদিন আমি হযরত রাসূল কারীম (স) ও সাহাবায়ে কিরাম-এর যাতায়াতের পথে বসিয়া পড়িলাম। সেই পথে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যাইতে থাকিলে আমি তাঁহাকে কুরআন মাজীদের একটি আয়াত সম্পর্কে শুধু এই উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিলাম যেন তিনি আমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু তিনি আমার ব্যাপারে কিছু না করিয়াই চলিয়া গেলেন। অতঃপর হযরত 'উমাব (রা) আমার পাশ দিয়া যাইতে থাকিলে আমি তাঁহাকেও একই উদ্দেশ্যে কুরআন মাজীদের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনিও আমাকে এড়াইয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে হযরত রাসূল কারীম (স) ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় আমাকে দেখিয়া মুচকি হাসিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন, ক্ষুধার তাড়নায় আমার মনের চাহিদা কি ও কিসের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে আমার চেহারায়। তাই তিনি বলিলেন, "আবূ হুরায়রা "! তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া আমি বলিলাম, লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ" (হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া নবীজী (স) আমাকে অনুমতি দিলে আমিও প্রবেশ করিলাম। তিনি এক পেয়ালা দুধ দেখিতে পাইয়া তাহা কোথা হইতে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে ঘরের লোকজন বলিলেন, অমুক পুরুষ বা মহিলা হাদিয়া পাঠাইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে আবারও আবূ হুরায়রা বলিয়া ডাক দিলে উত্তরে আমি বলিলাম, "লাব্বায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহ!" তিনি বলিলেন, আসহাবে সুফ্‌ফার সকলকে ডাকিয়া আন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আসহাবে সুফ্‌ফা ছিলেন ইসলামের সিপাহী এবং আল্লাহ্‌র মেহমান। তাঁহাদের কোন বাড়ি-ঘর ছিল না, পরিবার-পরিজনও ছিল না। তাঁহারা দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা করিতেন না। সম্পদের প্রতি কোন মোহ তাঁহাদের ছিল না। মহানবী (স)-এর নিকট কখনও সাদাকার মাল আসিলে নিজের জন্য তাহা হইতে কিছুই গ্রহণ না করিয়া উহার সম্পূর্ণটাই ব্যয় করিতেন আহলে সুফ্‌ফার জন্য। আর যদি কোথাও হইতে হাদিয়া আসিত তাহা হইতে আহলে সুফ্‌ফার জন্য যেমন ব্যয় করিতেন তেমন নিজেও তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করিতেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নির্দেশমত আমি আহলে সুফ্‌ফাকে ডাকিতে গেলেও আমি হতাশ হইলাম এই জন্য যে, এতটুকু দুধে আহলে সুফ্‌ফার কী হইবে? এতটুকু দুধ আমার জন্যই যথেষ্ট

ছিল যাহা পান করিয়া আমি শরীরের শক্তি ফিরিয়া পাইতাম। রাসূলুল্লাহ (স)-এরা আদেশে আমি তাঁহাদেরে মধ্যে এই দুধ বিতরণ করিয়া দিলে আমার জন্য তখন আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা মান্য করা ছাড়া কোন উপায় নাই বিধায় আমি তাঁহাদেরকে ডাকিয়া আনিলাম। অনুমতি লইয়া তাঁহাদের প্রত্যেকে ঘরে প্রবেশ করিবার পর নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) "আবূ হির" বলিয়া আমাকে ডাক দিলে আমি "লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ!" বলিয়া সাড়া দিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ঐ দুধ সকলের মধ্যে বণ্টন করিবার নির্দেশ দিলেন। পেয়ালা হাতে লইয়া আমি বণ্টনের শুরুতে তাহা এক ব্যক্তির হাতে দিলে সে তৃপ্তির সাথে পান করিয়া আমার হাতে উহা ফেরৎ দিল। দ্বিতীয়জনকে দিলে সেও পরিতৃপ্ত হইয়া ফেরৎ দিল।

এইভাবে একের পর এক সকলেই পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে পেয়ালা হাতে রাসূলুল্লাহ (স) আমার দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিয়া ডাক দিলেন, "আবূ হির"। জবাবে আমি "লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলিলাম। তিনি বলিলেন, এখন আমি আর তুমি অবশিষ্ট রহিয়াছি। আমি তাঁহার কথায় সত্যতার সাক্ষ্য দিলে তিনি আমাকে বসিয়া পান করিবার নির্দেশ দিলেন। আমি যথেষ্ট পরিমাণে পান করিবার পর তিনি আমাকে আরও পান করিতে নির্দেশ দিলেন। আমি আরও পান করিবার পর তিনি নির্দেশ দিতেই থাকিলেন। এক পর্যায়ে আমি বলিলাম, সেই আল্লাহ্র কসম যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন! আমার পেটে আর একটুও জায়গা নাই। তাঁহার নির্দেশে আমি তাঁহাকে পেয়ালা ফেরৎ দিবার পর তিনি প্রশংসার সাথে আল্লাহ্র নাম লইয়া অবশিষ্ট দুধ পান করিলেন (সহীহুল বুখারী, ২খ., পৃ. ৯৫৫-৯৫৬; আল-মুসতাদ্রাক লিল-হাকেম, ৩খ., পৃ. ১৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১০৫; আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ২৯৪; আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৫৭০; সীরাতুন-নবী, ৩খ.)।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) বলেন, শৈশবে আমি উকবা ইব্ন মু'ইতের বকরী চরাইতাম। একদিন হযরত রাসূল কারীম (স) ও হযরত আবূ বকর (রা) আমার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট দুধ আছে কি? আমি আরয করিলাম, দুধ আছে বটে, উহা অন্য মানুষের। আমি তো রক্ষক মাত্র। অতঃপর রাসূল কারীম (স) আমার নিকট দুগ্ধবতী নয় এমন কোন বকরী আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে তেমন একটি বকরী আনিয়া দিলাম। তিনি উহার স্তনে হস্ত বুলাইয়া দিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করিলে তাহা দুধে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ইহার পর একটি বড় পেয়ালায় উহার দুধ দোহন করিয়া উভয়ে তৃপ্তি সহকারে পান করিবার পর স্তনকে উদ্দেশ্য করিয়া "আগের মত চুপসাইয়া যাও" বলিয়া নির্দেশ দিলে উহা পূর্বের ন্যায় হইয়া গেল। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এই কথাগুলি শিখাইয়া দিন। রাসূলে পাক (স) আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দু'আ করিলেন, আল্লাহ পাক তোমার প্রতি দয়া করুন, তুমি একজন বুদ্ধিমান কিশোর (ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩খ., পৃ. ৫০৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ.

১০৫; শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী (স), ৩খ., পৃ. ৩৩৬–৩৩৭; আত-তাবাকাত, ১খ., পৃ. ১২২)।

হযরত 'আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকদেরকে দাওয়াত করিলেন (যাহাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশের মত)। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন এমন স্বাস্থ্যবান ছিলেন যাহারা একাই পূর্ণ একটি বকরী ও আট সের দুধ আহার করিতে পারিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের জন্য আধা সের পরিমাণ আটা রান্না করাইলেন। অতঃপর ঐ খাবারই তাহারা সকলে পেট ভরিয়া আহার করিবার পরও এই পরিমাণ খাবার উদ্বৃত্ত থাকিয়া গেল যেন তাহা স্পর্শই করা হয় নাই। আহারশেষে মহানবী (স) একটি ছোট পেয়ালায় দুধ আনাইলে সকলে পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিবার পরও সেই পরিমাণ দুধ অবশিষ্ট রহিয়া গেল যেন তাহা স্পর্শ কিংবা পান করা হয় নাই (মুসনাদ আহমাদ, ২খ., পৃ. ১৬৪–১৬৫; আল-খাসায়েসুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩; সীরাতুল মুস্তাফা হইতে সংগৃহীত, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৫৬৫–৫৬৬; আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ২৭৯-২৮০; সীরাতুল-মুস্তাফা (স), ১খ., পৃ. ১৭৩)।

হযরত যায়দ ইব্‌ন খালিদ উম্মে মা'বাদের ভাই হইতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম (স) মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিবার সময় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং তাঁহার আযাদকৃত গোলাম 'আমের ইব্‌ন ফুহায়রা। আর তৃতীয় ব্যক্তিটি ছিল 'আবদুল্লাহ আল-লায়ছী, যাহাকে পথ প্রদর্শনের জন্য অর্থের বিনিময়ে সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। সফরের এক পর্যায়ে ক্ষুদ্র কাফেলাটি উম্মে মা'বাদের আবাসের নিকট পৌঁছিলে নবী কারীম (স) তাহার নিকট হইতে কিছু গোশত ও খেজুর ক্রয় করিতে চাহিলেন। কিন্তু উম্মে মা'বাদের নিকট মহানবী (স)- এর কাঙ্ক্ষিত বস্তু দুইটি ছিল না। কারণ ঐ সময় এতদঞ্চলে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছিল।

তাহার কুটিরে একটি বকরী দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) উহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে উম্মে মা'বাদ জানাইল বকরীটি এতই দুর্বল যে, পালের সহিত চারণভূমি পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে পারে না বিধায় উহাকে এখানে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি সামান্য দুধও দেয় না? উম্মে মা'বাদ জানাইল, দুর্বলতার কারণে সে এখন আর দুধ দিতে পারে না। রাসূল পাক (স) বলিলেন, তুমি সম্মত হইলে আমি উহা হইতে দুধ দোহন করিব। উম্মে মা'বাদ রাযী হইয়া বলিল, যদি উহাতে দুধ থাকে তবে দোহন করুন।

রাসূলুল্লাহ (স) উহার স্তনে হাত বুলাইয়া বিসমিল্লাহ পড়িয়া দু'আ করিলেন। সহসা বকরীটির শুষ্ক স্তন দুধে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং বকরীর স্বভাব অনুযায়ী সে রোমন্থন করিতে লাগিল। অতঃপর সে স্বতস্ফূর্তভাবে দুই পা ফাঁক করিয়া দুধ দোহনের সুযোগ করিয়া দিল। মহানবী (স) একটি পাত্র চাহিলে আট-নয়জন পান করিবার মত একটি বৃহৎ পাত্র আনা হইল। তিনি স্বহস্তে বকরীটি দোহন করিয়া পাত্রটি ভরিলেন। দোহনশেষে সর্বপ্রথম তিনি উম্মে মা'বাদকে তৃপ্তির সহিত পান করাইলেন, অতঃপর সাথী-সঙ্গীগণকে এবং সবশেষে নিজে পান করিয়া পুনরায় দোহন করিয়া পাত্রটি ভরিয়া দিলেন। এই বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া উম্মে মা'বাদ তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ৬০; আল-বিদায়া

ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৬ষ্ঠ অধ্যায় পৃ. ৩১; আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ২৪২; সীরাতুল-মুস্তাফা (স), ১খ., পৃ. ৩৮৭–৩৮৮; আত-তাবাকাত, ১খ., পৃ. ১৫৫)।

হযরত মিকদাদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি এবং আমার দুইজন সাথী এমন অনাহারের শিকার হইলাম যে, ক্ষুধার তাড়নায় আমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছিল। আমরা হযরত রাসূল কারীম (স)-এর সাহাবীগণের নিকট নিজেদের অবস্থা ব্যক্ত করিলেও কেহই আমাদেরকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে আমরা রাসূল কারীম (স)-এর শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাদেরকে ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরে ছিল তিনটি ছাগল। রাসূল পাক (স) সেইগুলির দুধ দোহন করিয়া নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিবার নির্দেশ দিলে আমরা প্রতিদিন ঐ ছাগলের দুধ দোহন করিয়া সকলে পান করিতাম এবং রাসূলে পাক (স)-এর অংশের দুধ তাঁহার জন্য রাখিয়া দিতাম। রাত্রিবেলা তিনি গৃহে আসিয়া ঘুমন্ত ব্যক্তি যেন জাগ্রত না হয় এবং জাগ্রত ব্যক্তি যেন শুনিতে পায় এমন নিম্ন আওয়াজে সালাম করিয়া মসজিদে যাইয়া নামায আদায়ের পর ঘরে ফিরিয়া নিজের অংশের দুধ পান করিতেন।

এক রাত্রে আমি আমার নিজের অংশের দুধ পান করিবার পর শয়তান আমাকে কুমন্ত্রণা দিল যে, রাসূল পাক (স) তো আনসারদের নিকট গমন করেন। তাহারা নিশ্চয় তাঁহার খাবারের আয়োজন করেন এবং তিনি তথায় আহারও করেন। সুতরাং এই সামান্য দুধে তাঁহার কি প্রয়োজন? শয়তানের প্রলোভনে পড়িয়া আমি তাঁহার অংশের দুধও পান করিয়া ফেলিলাম। এইবার শয়তান আমাকে লজ্জা দিয়া বলিতে লাগিল, হতভাগ্য! এইটা তুমি কি করিলে! তুমি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অংশের দুধ পান করিয়া ফেলিলে? রাসূলুল্লাহ (স) ফিরিয়া আসিয়া যখন নিজের অংশের দুধ পাইবেন না তখন তোমার জন্য বদদোয়া করিলে তোমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হইয়া যাইবে।

আমি ছিলাম একটি ছোট চাদরে আবৃত, যাহা দ্বারা মাথা ঢাকিলে পা খোলা থাকিত, আর পা ঢাকিলে মাথা খোলা থাকিত। তাই আমার ভাল ঘুম হইত না। আমার সঙ্গীদ্বয় ছিলেন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন যাহারা আমার ন্যায় অপরাধ করেন নাই। এই সময় মহানবী (স) আসিয়া সালাম দিয়া নামায আদায় করিতে মসজিদে চলিয়া গেলেন। নামাযান্তে তিনি ঘরে ফিরিয়া নিজের অংশের দুধ পান করিবার উদ্দেশে পাত্র খুলিয়া দেখিতে পাইলেন, পাত্র শূন্য। তিনি মাথা তুলিয়া আকাশের দিকে তাকাইলে, আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই বুঝি তিনি আমার জন্য বদদু'আ করিলেন, আর আমি ধ্বংস হইয়া গেলাম। কিন্তু তিনি দু'আ করিলেন ঃ হে আল্লাহ! "যে আমাকে আহার করাইবে তুমি তাহাকে আহার করাও এবং যে আমাকে পান করাইবে তুমি তাহাকে পান করাও"।

এই দু'আ শুনিবামাত্র আমি চাদর গুটাইয়া গাত্রোত্থান করত ছুরি হাতে সর্বাধিক মোটা তাজা ছাগলটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য যবেহ করিতে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু আমি সবগুলি ছাগলের স্তনই দুধে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলাম। আমি বড় একটি পাত্র লইলাম যাহাতে দোহন করিবার মত দুধ হইবে বলিয়া তাঁহার পরিবারের কেহ কল্পনাও করিতেন না। আমি দোহন

করিলে পাত্রটি পরিপূর্ণ হইয়া উপরে ফেনা ভাসিতে লাগিল। পাত্রটি লইয়া আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাযির হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা তোমাদের অংশের দুধ পান করিয়াছ কি ? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি পান করুন। তিনি কিছু পান করিয়া আমাকে দিয়া দিলে দ্বিতীয়বার আমার অনুরোধে তিনি আরও কিছু পান করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিলেন। আমি যখন দেখিলাম, তিনি পূর্ণ তৃপ্তির সাথে পান করিয়াছেন এবং আমার উপর তাঁহার দু'আ লাগিয়াছে, তখন আমি আনন্দে হাসিতে হাসিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলাম।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া মহানবী (স) বলিলেন ঃ মিকদাদ কি অশোভন আচরণ করিতেছে ? অতঃপর আমি আমার আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ দিলে তিনি বলিলেন ঃ এই বরকত আল্লাহ পাকের রহমত বৈ কিছুই নহে। ঘটনা সম্পর্কে তুমি আমাকে পূর্বেই অবহিত করিলে তোমার সঙ্গীদ্বয়কে জাগাইয়া দিতাম। ফলে তাহারাও এই বরকতে শরীক হইতে পারিত। উত্তরে আমি বলিলাম, সেই আল্লাহ্র কসম যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন। যখন আপনি এই বরকত প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনাদের উসীলায় আমিও উহা লাভ করিয়াছি তখন অন্য কেহ তাহা পাইল কি পাইল না, তাহাতে আমার কিছুই যায় আসে না (সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৮৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১০৬; শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী, ৩খ., পৃ . ৩৫৭)।

ইমাম বায়হাকী হযরত নাফে' (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে এক সফরে চার শতজন ছিলাম। আমাদের অবস্থানস্থল ও তাহার আশেপাশে কোন পানি না থাকায় সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িলাম। রাসূলুল্লাহ (স) ও এই ব্যাপারে অবগত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর দুই শিংবিশিষ্ট একটি বকরী আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেল। উহাকে দোহন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-সহ আমরা সকলে দুধ পান করিয়া তৃপ্ত হইলাম। অতঃপর আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "হে নাফে' ! রাত্রে ইহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমার। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, তুমি তাহা পারিবে না।" আমি তাই উহাকে ধরিয়া একটি রশি দ্বারা মযবুত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলাম। কিন্তু মধ্য রাত্রে আমি জাগ্রত হইয়া অবাক বিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিলাম, সেখানে বকরীর কোন চিহ্ন নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই আমি ব্যাপারটা তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "হে নাফে'। বকরীটি যেইভাবে আসিয়াছিল সেইভাবেই চলিয়া গিয়াছে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৬ষ্ট অধ্যায়, পৃ. ১০৬; আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ২৯৫)।

ইমাম বায়হাকী আবুল 'আলিয়ার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বেশ কিছু সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিছু খাবারের উদ্দেশ্যে আপন নয় স্ত্রীর নিকট খাদেমকে পাঠাইলেও কোন খাবার পাওয়া যায় নাই। এরই মাঝে একটি ছোট বকরীর উপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃষ্টি পড়িল যাহা এখনও পর্যন্ত বাচ্চা দেয় নাই। রাসূলুল্লাহ (স) উহার ওলানে হাত দিতেই উহা দুধে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি একটি পাত্র আনাইয়া প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে এক এক পেয়ালা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর ঐ বকরী হইতে পুনরায় দুধ

বাহির করিয়া উপস্থিত সকলেই পান করিলেন (মাওলানা হাবীবুর রহমান, লামিয়াতুল মু'জিযাত-এর উর্দূ শরাহ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়া'কূব অনূদিত "আলিয়াতুল মুদিহাত", পৃ. ২৫৯; মু'জিযা নং ৭৮)।

হযরত হালীমা সা'দিয়া (রা) বর্ণনা করেন, সেই ভাগ্যবান শিশুটিকে হযরত মুহাম্মাদ (স)] কোলে নিতেই আমার শুষ্ক স্তন দুধে পরিপূর্ণ হইয়া গেল যাহা রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে এবং তাঁহার দুধ ভাই দুইজনেই পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া গেলেন। উটনীর দুধ দোহন করিতে যাইয়া অবাক বিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন তাহার শুষ্ক ওলানও দুধে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার স্বামী তৃপ্তি সহকারে পান করিয়া রাত্রে আরামে ঘুমাইলেন। সকালে জাগ্রত হইতেই তাহার স্বামী বলিতে লাগিলেন, "তুমি ভাল করিয়া জানিয়া রাখিও হে হালীমা ! আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি, তুমি একটি অত্যন্ত বরকতময় শিশু আনিয়াছ" (সীরাতুল-মুস্তফা, ১খ., পৃ. ৭১; আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ১০৮; ইবন হিশাম, সীরাতুন-নবী, ১খ., পৃ. ১৮৪; শরহে 'আল্লামা যুরকানী, 'আলাল মাওয়াহিবিল-লাদুন্নিয়্যা লিল-কাসতাল্লানী, ১খ., পৃ. ১৪৪)।

হযরত হালীমা সা'দিয়া (রা) যখন নবী কারীম (স)-কে দুধ পান করাইবার জন্য নিজ গ্রামে লইয়া গেলেন তখন বানূ সা'দ গোত্রের চেয়ে বেশী দুর্ভিক্ষ আর কোন গোত্রে ছিল না। আর মাঠ গুলিও ছিল ঘাসশূন্য। কিন্তু নবী কারীম (স)-এর বরকতে হালিমা সা'দিয়া (রা)-এর বকরীগুলি সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিত তখন সেইগুলির ওলান থাকিত দুধে পরিপূর্ণ। অথচ অন্যদের বকরীগুলি মাঠ হইতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিত, আর উহাদের ওলানে এক ফোঁটা দুধও থাকিত না (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৭২৮; আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ১০৯; ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন-নবী, ১খ., পৃ. ১৮৪-১৮৫; সীরাতুল মুস্তাফা (স), ১খ., পৃ. ৭২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সহীহ বুখারী, কুতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ, তা. বি.; (২) সহীহ মুসলিম, কতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ, তা. বি.; (৩) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দারুল 'ইয়ান লিত-তুরাছ, ১৪০৮/১৯৮৮; (৪) ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা মিসর ১৩৮৬/১৯৬৬; (৫) কাযী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, দামিশক, তা. বি.; (৬) ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা (স), দিল্লী, তা. বি.; (৭) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী, লাহোর ১৪০৮ হি.; (৮) ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, দারুল-হাদীছ, কায়রো ১৪১৬/১৯৯৫; (৯) জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, উর্দূ অনুবাদ, মুফতী গোলাম মুঈনুদ্দীন সা'দী, দিল্লী ১৯৮৮ খৃ.; (১০) ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, মিসর ১৩৯০/১৯৭০; (১১) ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দিল্লী তা. বি.; (১২) আল-কাসতাল্লানী, আল- মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.।

আহমাদ হোসাইন

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বৃক্ষের আগমন

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা আমরা মহানবী (স)-এর সহগামী হইয়া ভ্রমণ ব্যাপদেশে একটি বিশাল উপত্যকায় পৌঁছিলাম। মহানবী (স) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে প্রস্থান করিলেন। পানির পাত্র সহ আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি এমন কোন গোপন স্থান পাইলেন না যেখানে তিনি তাঁহার প্রয়োজন সমাধা করিতে পারেন। উপত্যকার শেষ সীমান্তে দুইটি বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল। মহানবী (স) একটি বৃক্ষের নিকটবর্তী হইয়া উহার শাখা ধরিয়া বলিলেন, "ওহে বৃক্ষ শাখা। আল্লাহ্‌র আদেশে তুমি আমার প্রতি অবনমিত হও"।

লাগাম পরা উষ্ট্র যেমন চালকের ইঙ্গিতে অবনমিত হয়, তেমনই বৃক্ষটি মহানবী (স)-এর প্রতি অবনমিত হইল। এইরূপে তিনি দ্বিতীয় বৃক্ষটির নিকট গমন করিয়া উহার শাখা ধরিয়া উহাকেও অবনমিত করিলেন। বৃক্ষ দুইটি পরস্পর বন্ধন কৃত অবস্থায় একত্র মনে হইলে অতঃপর তিনি বলিলেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশে একত্র হইয়া যাও।" উহারা একত্র হইল। একটি অন্তরালের সৃষ্টি হইল। হযরত জাবির বলেন, আমি দূরে সরিয়া গিয়া বসিয়া বসিয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, দেখি মহানবী (স) আমার সম্মুখে উপস্থিত। বৃক্ষ দুইটিকে দেখিলাম, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পৃথক হইয়া গিয়াছে। আরও দেখিলাম, মহানবী (স) সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন এবং নিজের শির মুবারক ডাইনে বামে দোলাইলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১৩৫; দালাইলুন নুবূওয়াহ, পৃ., ৩৩৪; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৪৯৬; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ৩খ., পৃ. ৬১৯)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, মক্কার জনৈক পাষণ্ড কর্তৃক প্রহৃত হইয়া রক্তরঞ্জিত দেহে দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে মহানবী (স) নিভৃতে বসিয়া ছিলেন। ইত্যবসরে হযরত জিবরাঈল (আ) তথায় আগমন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নবী! আপনার কী হইয়াছে? তিনি বলিলেন, মক্কাবাসীরা আমার এই অবস্থা করিয়াছে। হযরত জিবরাঈল বলিলেন, "আপনি কি আনন্দিত হইবেন, যদি আমি এখনই একটি নিদর্শন প্রদর্শন করি? তিনি সম্মতি দান করেন। হযরত জাবির (রা) বলেন, হযরত জিবরাঈল উপত্যকার পশ্চাতে একটি বৃক্ষ দেখাইয়া মহানবী (স)-কে বলিলেন, হে নবী! আপনি ঐ বৃক্ষটিকে আহ্বান করুন। তিনি বৃক্ষটিকে ডাক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি হাঁটিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল বলিলেন, হে নবী! আপনি বৃক্ষটিকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করুন। তিনি আদেশ করিলে গাছটি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। অনন্তর মহানবী (স) বলিলেন, ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট (প্রাগুক্ত)।

ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেন, মহানবী (স) এক সময় পৌত্তলিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মনঃক্ষুণ্ন হৃদয়ে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। তিনি আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করিলেন, "হে পালনকর্তা! তুমি অদ্য আমাকে এখনই একটি নিদর্শন প্রদর্শন কর, যাহার পরে আর কেহ আমার প্রতি অসত্যারোপ করিতে সক্ষম হইবে না"। হযরত 'উমার (রা) বলেন অতঃপর মহানবী (স) আল্লাহ পাকের নির্দেশে মদীনার গিরিপ্রান্তর হইতে একটি বৃক্ষকে ডাক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি ভূমি আঁচড়াইয়া মহানবী (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইল। অনন্তর গাছটি তাঁহার পুনর্নির্দেশানুসারে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "ইহার পর আমার স্বজাতি আমার প্রতি অসত্যারোপ করিতে আর সক্ষম হইবে না" (প্রাগুক্ত; কানযুল-উম্মাল, ১২খ., পৃ. ৩৫৪; সুবুলুন হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৫০০;, দালাইলুন-নুবূওয়াহ, পৃ. ৩৩২)।

হাসান (র) সূত্রে ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন, মহানবী (স)-এর প্রতি তাঁহার স্বজাতির অসত্যারোপ তাঁহাকে ব্যথিত ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। দুঃখ জর্জরিত ও ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে তিনি মক্কা নগরীর গিরি-উপত্যকায় বিচরণ করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করিলেন, ইলাহী! তুমি আমাকে এখন একটি বিষয় প্রদর্শন কর যাহাতে আমার অশান্ত হৃদয় প্রশান্ত হয় ও দুঃখ-ক্লেশ প্রশমিত হয়। ইহাতে আল্লাহ পাক তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলেন, হে আমার প্রিয়তম রাসূল! ঐ বৃক্ষগুলি হইতে আপনার ইচ্ছামত শাখাসমূহকে আপনার প্রতি আহবান করুন। তিনি তাহাই করিলেন। শাখাগুলি বৃক্ষ হইতে পৃথক হইয়া মাটি দলিত মথিত করিয়া তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইল। তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি আদেশ করিলেন, তোমরা স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। শাখাগুলি স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১৩৭; কানযুল 'উম্মাল, ১২খ., পৃ. ৩৫৪; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৫০০)।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) সূত্রে ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন, হযরত ইব্ন 'আব্বাস বলেন, একদা বানূ আমেরের জনৈক ব্যক্তি মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, হে মহান নবী! আপনার গ্রীবাদ্বয়ের মধ্যস্থিত মোহরে নুবূওয়্যতটি কি আমাকে দেখাইবেন? যেহেতু আমি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে একটি নিদর্শন দেখাইব? সে বলিল, অবশ্যই। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, মহানবী (স) একটি খেজুর গাছের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বলিলেন, ঐ শাখা-প্রশাখাহীন নাঙ্গা গাছটিকে ডাক দাও। তখন সে বৃক্ষটিকে ডাক দিল। মাটি আঁচড়াইয়া বৃক্ষটি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। অতঃপর মহানবী (স) উহাকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ বৃক্ষটি স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অতঃপর আমিরী তাহার স্বজাতিকে আহবান করিয়া বলিল, হে আমের গোত্রের জনগণ! আমি অদ্যাবধি এই লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাদুকর দেখি নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১৩৭, হাদীছটি আবূ নু'আয়ম সূত্রে ইমাম

আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী ও হাকেম বর্ণনা করিয়াছেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৪৯৯; দালাইলুন- নুবূওয়াহ, পৃ. ৩৩৫)।

মুহাম্মাদ ইব্ন আবী 'উবায়দা সূত্রে ইমাম বায়হাকী হইতে বর্ণিত। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, একদা আমের গোত্রের এক ব্যক্তি মহানবী (স)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি! তাহাতে আপনার কি কোন অভিযোগ আছে? আর আপনি মানুষকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান করিতেছেন, সে ব্যাপারে আপনার নিকট দৃষ্টান্তমূলক কোন প্রমাণ আছে? তিনি বলিলেন, আমি মানুষকে আল্লাহ এবং ইসলামের প্রতি আহবান করি। সে বলিল, আপনি সঠিক করিতেছেন না। আপনার দাবির সমর্থনে আপনার নিকট কি কোন নিদর্শন আছে? তিনি বলিলেন, অবশ্যই আছে। তোমার বাসনা থাকিলে আমি তোমাকে নিদর্শন দেখাইতে পারি। তাহাদের সম্মুখে ছিল একটি বৃক্ষ। মহানবী (স) বৃক্ষটির শাখার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, ওহে বৃক্ষশাখা! তুমি শীঘ্র আমার নিকট আইস। সঙ্গে সঙ্গে পল্লবিত শাখা বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূপাতিত হইল এবং ভূমি আছড়াইতে আছড়াইতে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অতঃপর তিনি শাখাটিকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে বলিলে উহা স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এই ঘটনার পর আমেরী তাহার গোত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে আমের ইব্ন সা' সা' সম্প্রদায়! মুহাম্মাদ বা তাঁহার মতাদর্শ সম্পর্কে আমি আর কোন দিনই তোমাদেরকে তিরস্কার করিব না" (প্রাগুক্ত, বায়হাকীর, দালাইল, ৬খ., পৃ. ১৬; দালাইলুন-নুবূওয়াহ, ৩৩৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৪৯৯)।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) সূত্রে ইমাম বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি মহানবী (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনার সহচরবৃন্দ আপনার সম্পর্কে এইসব কি বলেন? হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, সেই সময় মহানবী (স) পল্লবিত শাখাবিশিষ্ট ও শাখাহীন তরুলতার মধ্যখানে ছিলেন। তিনি লোকটিকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে কোন নিদর্শন প্রদর্শন করিব ? সে বলিল, নিশ্চয়। তখন তিনি একটি শাখাহীন বৃক্ষকে আহবান করিলেন। বৃক্ষটি মাটি ছেদ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং সিজদা করিল, মস্তক উঠাইল, দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (স) উহাকে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বলিলে উহা প্রস্থান করিল। অনন্তর লোকটি তাহার স্বজাতিকে বলিল, ভাই আমের ইব্ন সা' সা' গোত্র! আমি আর কোন দিন মুহাম্মাদের প্রতি অসত্যারোপ করিব না। তাহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে তোমাদেরকেও আর তিরস্কার করিব না" (প্রাগুক্ত; বায়হাকীর দালাইল, ৬খ., পৃ. ১৭)।

অপর একটি সূত্রে ইমাম বায়হাকী (রা) বলেন, হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক বেদুঈন মহানবী (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট নিবেদন জানাইল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব যে, আপনি আল্লাহর রাসূল? তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি কি চাও, আমি ঐ খেজুর বীথি হইতে একটি শাখাহীন খেজুর গাছ ডাকিয়া লইয়া আসি। তাহা হইলেই কি তুমি বুঝিবে যে, আমি আল্লাহর রাসূল এবং তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আমি নিশ্চয়

আল্লাহর রাসূল? লোকটি বলিল, হাঁ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মহানবী (স) একটি শাখাহীন গাছকে ডাক দিলেন। গাছটি খেজুর বাগান হইতে নিক্রান্ত হইয়া ভূমিতে অবনমিত হইল এবং ভূমি দলিত মথিত করিয়া মহানবী (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইল। অতপর তিনি উহাকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে বলিলেন, তৎক্ষণাৎ উহা স্বস্থানে প্রস্থান করিল। বেদুঈন লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য প্রদান করিল, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। সে ঈমান গ্রহণ করিল (প্রাগুক্ত; ৬খ., পৃ. ১৩৭; হাদীছটি ইমাম বুখারী তদীয় ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ., ৪৯৯; বায়হাকীর দালাইল, ৬খ., পৃ. ১৫)।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) বলেন, এক ভ্রমণে আমরা মহানবী (স)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। পথে এক বেদুঈনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে আমাদের নিকটবর্তী হইলে মহানবী (স) তাহাকে শুধাইলেন, কোথায় যাও। সে বলিল, আমার পরিবারের নিকট। তিনি বলিলেন, তোমার নিকট কল্যাণজনক কিছু আছে কি? সে বলিল, সেইটা আবার কি! তিনি বলিলেন, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই আর মুহাম্মদ তাঁহার দাস ও রাসূল। সে বলিল, আপনার কথার সমর্থনে কোন প্রমাণ আছে? তিনি বলিলেন, ঐ গাছটিই তাহার প্রমাণ দিবে। গাছটি ছিল উপত্যকার শেষ প্রান্তে। তিনি উহাকে ডাক দিলেন। মাটি আছড়াইতে আছড়াইতে উহা মহানবী (স)-এর প্রতি অগ্রসর হইল। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আল্লাহ পাকের একত্ব ও মহানবী (স)-এর নবূওয়াতের উপর তিনবার সাক্ষ্য প্রদান করিল। অতঃপর মহানবী (স)-এর নির্দেশানুসারে উহা স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আর বেদুঈন লোকটি তাহার স্বজাতির নিকট গমন করিল এবং বলিল, তাহার গোত্রের লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিলে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবে। অন্যথা সে একাই তাঁহার নিকট আসিবে এবং তাঁহার অনুগামী হইবে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১৩৮; ইব্ন হিব্বান ও হাকেমও হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাকেম কর্তৃক উহা প্রত্যয়িত হইয়াছে। যাহাবী বলেন, হাদীছটির বর্ণনা-পরম্পরা অতি উত্তম। সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৮৯৯)।

হযরত গায়লান ইব্ন সালামা আছ-ছাকাফী (রা), যিনি তায়েফ বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বলেন, একবার আমরা নবী করীম (স)-এর সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইলাম। পথিমধ্যে আমরা প্রভূত অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। এক সময় আমরা বিক্ষিপ্ত নাতিদীর্ঘ খেজুর বাগানের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম। মহানবী (স) আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, গায়লান! ঐ ছোট খেজুর গাছ দুইটিকে ডাক দাও, উহাদেরকে পরস্পর মিলিত হইবার নির্দেশ প্রদান কর, যেন উহাকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করিয়া আমি প্রয়োজন সমাধা করিতে পারি। আমি গাছ দুইটির নিকট গেলাম। উহাদিগকে বলিলাম, আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে পরস্পর মিলিত হইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে একটি গাছ ভূমিতে অবনমিত হইয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে অপরটির নিকট গমন করিল। পরস্পর মিলিত হইলে মহানবী (স) বাহন হইতে অবতরণ করিলেন। উহাদের পশ্চাতে গমন করিয়া

স্বীয় প্রয়োজন সমাধা করিলেন। অতঃপর গাছ দুইটিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ববৎ স্বস্থানে অবস্থান লইল (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৪৯৭; আবূ নু'আয়ম, দালাইলুন- নুবূওয়াহ, পৃ. ৩৩৪)।

হযরত উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) হইতে খারিজা ইব্ন যায়দ কর্তৃক বর্ণিত। হযরত উসামা বিদায় হজ্জে মহানবী (স)-এর সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে মহানবী (স)-এর দুইটি অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে তিনি বলেন, মহানবী (স) আমাকে বলিলেন, 'উসামা! তুমি বাহিরে যাও। দেখতো কোন গোপন স্থান পাও কিনা? আমি ইসতিনজা করিব। আমি তাঁবুর বাহির হইলাম। দেখিতে পাইলাম, সম্মুখে বিশাল জনসমাগম। কোনরূপ আড়াল দেখিতে পাইলাম না। সংবাদটি মহানবী (স)-কে জানাইলে তিনি বলিলেন, কোথাও কোন বৃক্ষলতা অথবা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডও কি নাই? আমি বলিলাম, হাঁ, নাতিদীর্ঘ খেজুর গাছ ও বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড দেখা যায়। তিনি বলিলেন, আসীম! তুমি পুনরায় যাও। বিচ্ছিন্ন খেজুর গাছগুলিকে বল, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদিগকে পরস্পর একত্র হইতে বলিয়াছেন, আর বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডগুলিকে বল, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদিগকে একত্র হইয়া আড়াল সৃষ্টি করিতে বলিয়াছেন।

আমি তাহাই করিলাম। সে কি বিস্ময়! যিনি তাঁহাকে সত্য নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, গাছগুলি কিভাবে মূলসহ পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া একত্র হইল। মনে হইল যেন একটি গাছ। অনুরূপ প্রস্তর খণ্ডগুলি পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া পরস্পর গ্রথিত হইল, মনে হইল যেন একটি প্রাচীর। আমি ফিরিয়া গিয়া মহানবী (স)-কে বিষয়টি অবগত করিলাম। তিনি বলিলেন, পানির পাত্র লও। আমি পানির পাত্রসহ তাঁহার সহিত চলিলাম। আড়ালকৃত স্থানটির নিকটে গিয়া পানির পাত্র রাখিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম। তিনি অগ্রসর হইয়া তাঁহার প্রয়োজন সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিলে আমি তাঁহার হস্ত হইতে পানির পাত্র লইয়া তাঁহার সহিত তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম।

এইবার মহানবী (স) আমাকে বলিলেন, আসীম! তুমি আবার যাও। গাছগুলি ও প্রস্তর খণ্ডগুলিকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে বল। আমি তাহাই করিলাম। পূর্বের মতই উহারা প্রতিযোগিতা করত বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। আমিও প্রত্যাবর্তন করিয়া মহানবী (স)-কে বিষয়টি অবহিত করিলাম (কানযুল উম্মাল, ১২খ., ৪০৩; ইব্ন কাছীর, জামি'উল মাসানীদ ওয়াস-সুনান, ১খ., পৃ. ২২২; সুবুলুল হুদা ওয়ার- রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৪৯৭; আবূ নু'আয়ম, দালাইলুন-নুবূওয়াহ, পৃ. ৩৩৬)।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) সূত্রে আবূ নু'আয়ম (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন, আমরা খায়বার অভিযানে মহানবী (স)-এর সহগামী হইয়াছিলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে মনস্থ করিয়া বলিলেন, 'আবদুল্লাহ! তুমি একটু দেখ কোন আড়াল পাওয়া যায় কি না, আমি প্রয়োজন সারিব। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, মাত্র একটি গাছ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আমি একথা তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "ভাল করিয়া দেখ। আরও কিছু দেখা যায় কিনা?" আমি লক্ষ্য করিলাম, বিস্তর

ব্যবধানে আরও একটি গাছ দণ্ডায়মান। এই সংবাদটিও আমি তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আবদুল্লাহ! তুমি উহাদিগকে বল, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদিগকে একত্র হইতে বলিয়াছেন। আমি তাহাই করিলাম। উহারা পরস্পর মিলিত হইল। মহানবী (স) তাঁহাদের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন সুন্দর একটি আড়াল সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি প্রয়োজন সারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আমরা ফিরিয়া আসিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলাম, গাছ দুইটি স্বস্থানে দণ্ডায়মান (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৪৯৬)।

হযরত ইয়া'লা ইব্ন মুররা (রা) হইতে ইমাম আহমাদ ইব্ন সা'দ এবং ইব্ন আবী শায়বা বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ বর্ণনাকারিগণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম হাকেম কর্তৃক প্রত্যয়িতও হইয়াছে। হযরত ইয়া'লা বলেন, আমরা এক ভ্রমণে মহানবী (স)-এর সহযাত্রী ছিলাম। এক স্থানে আমরা যাত্রাবিরতি করিয়া বাহন হইতে অবতরণ করিলাম। মহানবী (স) আমাকে বলিলেন, ঐ ছোট ছোট খেজুর গাছগুলির নিকট যাও এবং বল, মহানবী (স) তোমাদেরকে একত্র হইতে বলিয়াছেন। আমি উহাদের নিকট গিয়া উহাদিগকে মহানবী (স)-এর কথা জানাইলাম। তখন উহারা হুড়াহুড়ি করিয়া একত্র হইল। মহানবী (স) উহার অন্তরালে প্রয়োজন সারিয়া প্রত্যাবর্তন করিলে গাছগুলি যথাস্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইল (প্রাগুক্ত; দালাইলুন-নুবূওয়াত, পৃ. ৩৩৩)।

হযরত বুরায়দা (রা) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, একদা এক বেদুঈন মহানবী (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। এখন আপনি আমাকে এমন বিস্ময়কর কিছু প্রদর্শন করুন যাহাতে আমার প্রতীতি সুদৃঢ় হয়। তিনি বলিলেন, তুমি কিরূপ নিদর্শন দেখিতে চাও? লোকটি বলিল, আপনি ঐ গাছটিকে ডাক দিন, উহা আপনার নিকট উপস্থিত হউক। তিনি বলিলেন, তুমি যাও, উহাকে ডাক দাও। লোকটি গাছের নিকট গিয়া বলিল, হে গাছ! মহানবীর ডাকে সাড়া দাও। গাছটি সম্বোধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমূলে উৎপাটিত হইল, অতঃপর মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম জানাইল।

বেদুঈন লোকটি তখন মহানবী (স)-কে বলিল, ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট, ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট, হে মহানবী (স)! এইবার গাছটিকে উদ্দেশ্য করিয়া মহানবী (স) বলিলেন, প্রত্যাবর্তন কর। গাছটি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল ও শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। এইবার লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি সদয় অনুমতি দিলে আমি আপনার শির মুবারক ও চরণ দুইখানি চুম্বন করিতাম। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া লোকটি তাহাই করিল। অতঃপর সিজদা করিবার অনুমতি কামনা করিলে তাহাকে মহানবী (স) বলিলেন, কেহ কাহাকেও সিজদা করিবে না। আমি যদি কাহাকেও সিজদা করিবার অনুমতি প্রদান করিতাম তাহা হইলে স্বামীকে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে অনুমতি প্রদান করিতাম (দালাইলুন-নুবূওয়াহ, পৃ. ৩৩২)।

হযরত 'আলী (রা) বলেন, আমি মহানবী (স)-এর সঙ্গে মক্কা নগরীতে বসবাস করিতাম। একদা তাঁহার সহিত মক্কার পার্শ্বে গিরিউপত্যাকায় ভ্রমণে বাহির হইলাম। আমরা যখনই কোন

বৃক্ষ, পাথর বা পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিতাম, তখনই প্রত্যেকেই বলিত, আস্‌সালামু 'আলায়কুম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (প্রাগুক্ত)।

হযরত ইয়া'লা ইব্‌ন মুররা ছাকাফী (রা) বর্ণনা করেন, একবার আমরা মহানবী (স)-এর সহিত ভ্রমণ করিতেছিলাম। এক স্থানে যাত্রাবিরতি করিলাম। মহানবী (স) নিদ্রা গেলেন। হঠাৎ করিয়া একটি বৃক্ষ ভূমি বিদীর্ণ করিয়া আসিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলিল, অতঃপর ফিরিয়া গেল। মহানবী (স) জাগরিত হইলে বিষয়টি তাঁহাকে জানান হইল। তিনি বলিলেন, "আমাকে সালাম জানাইবার জন্য গাছটি উহার পালনকর্তার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিল। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া উহা আমাকে সালাম জানাইতে আগমন করিয়াছিল" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮)।

রুকানার সহিত কুস্তি লড়াই

হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন, তৎকালীন আরব বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসীর নাম ছিল রুকানা। সে নরঘাতক ছিল। ইদম উপত্যকা তাহার একক দখলে ছিল। প্রচণ্ড দাপটে সে তথায় তাহার মেষ-ছাগলগুলি চরাইত। একদা মহানবী (স) ইদম উপত্যকায় যাওয়ার উদ্দেশ্য 'আইশা (রা)-র গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কেহই তাঁহার সফরসঙ্গী ছিল না। তিনি ইদমে উপনীত হইলে রুকানা সদম্ভে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, মুহাম্মাদ! তুমিই তো আমাদের উপাস্য দেব-দেবী লাত ও 'উয্‌যাকে মন্দ বল। আবার তুমিই এক মহাপরাক্রান্ত কুশলী প্রভুর প্রতি মানুষকে আমন্ত্রণ জানাও। আমাদের মধ্যে যদি আত্মীয়তার বন্ধন না থাকিত, তবে তোমার সহিত কথা বলিবার পূর্বেই তোমার ভবলীলা সাঙ্গ করিতাম। ঠিক আছে, এখনই জানা যাইবে কাহার প্রভু শ্রেষ্ঠ; অজেয়, মহাপরাক্রমশালী।

আমি কুস্তি প্রতিযোগিতা অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান করিতেছি। তুমি তোমার মহাপরাক্রান্ত কুশলী প্রভুর নিকট সাহায্যের আবেদন জানাও, আমিও আমার প্রভু লাত ও 'উয্‌যার নিকট সাহায্য কামনা করি। যদি তুমি আমাকে পরাজিত করিতে পার তাহা হইলে আমার ছাগলগুলি হইতে তোমার জন্য দশটি ছাগল পুরস্কার রহিল। মহানবী (স) বলিলেন, ঠিক আছে, আমি তোমার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে প্রস্তুত। তুমি প্রস্তুত হও।

এই বলিয়া মহানবী (স) রুকানার উপর জয়ী হওয়ার জন্য মহামহিম আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করিলেন। রুকানাও লাত-উয্‌যার নিকট প্রার্থনা জানাইল। এইবার পরস্পর মুখামুখি দাঁড়াইলে প্রথম আক্রমণেই মহানবী (স) রুকানাকে ধরাশায়ী করিলেন, চড়িয়া বসিলেন তাহার বুকের উপর। বিস্ময়াভিভূত হইয়া রুকানা বলিল, "না, না, তুমি আমাকে পরাজিত করিতে পার না। এইরূপ কর্ম সম্ভব হইয়াছে তোমার মহাশক্তিধর প্রভুর দ্বারা। আর আমার প্রভু আমাকে লাথি মারিয়া লাঞ্ছিত করিয়াছে। তোমার পূর্বে আমার পার্শ্বদেশ কেহই হেলাইতে পারে নাই। অদ্য তুমি আমাকে পরাজিত করিয়াছ বলিয়া আমার ছাগলগুলি হইতে দশটি ছাগল গ্রহণ কর।"

অতঃপর রুকানা পুনর্বার মহানবী (স)-কে দশটি ছাগলের বিনিময়ে কুস্তি লড়িবার জন্য আহবান জানাইল। মহানবী (স) তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তাহার উপর বিজয়ী হওয়ার

জন্য মহান আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করিয়া রুকানাকে এক আছাড়ে ধরাশায়ী করত তাহার বক্ষোপরি বসিলেন। এই বারও রুকানা একই মন্তব্য করিল। সে বলিল, আমাকে পরাজিত করা তোমার কাজ নহে, বরং এ কর্মটি তোমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপালক করিয়াছেন। আর আমার প্রভু লাত ও উয্যা আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে। ঠিক আছে, শর্তানুসারে তুমি আরও দশটি ছাগল গ্রহণ কর।

রুকানা পুনরূপ তাঁহাকে কুস্তি প্রতিযোগিতার আমন্ত্রণ জানাইয়া বলিল "মুহাম্মাদ! আইস, পুনরায় আমরা কুস্তি লড়িব। এইবারও যদি তুমি সফলকাম হও, তাহা হইলে, পুনরায় দশটি ছাগল পুরস্কার পাইবে। মহানবী (স) তাহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। মহানবী (স) মহান আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে সাহায্য কামনা করিলেন। রুকানাও লাত ও উয্যার নিকট সাহায্যের প্রত্যাশী হইল। অতঃপর পরস্পর সামনা-সামনি হইলে মহানবী (স) তাহাকে এক আঘাতেই কুপোকাত করিয়া ফেলিলেন। আশ্চর্যান্বিত হইয়া রুকানা বলিল, মুহাম্মাদ! আমাকে বিজিত করা তোমার কর্ম নহে। ইহা অবশ্যই করিয়াছে তোমার মহা প্রতাপশালী প্রভু। আর আমার প্রভু লাত ও উযযা আমাকে হেনস্থা কারিয়াছে। ভাল কথা, এখন তুমি তোমার পসন্দ মত ত্রিশটি ছাগল আমার ছাগ পাল হইতে গ্রহণ কর।

ইহাতে মহানবী (স) বলিলেন, রুকানা! তোমার ছাগল গ্রহণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, বরং আমি চাই তুমি ইসলামে দীক্ষিত হও। ইহাতে শান্তি পাইবে। তোমাকে চিরস্থায়ী নরক যন্ত্রণা হইতে আমি অব্যাহতি দিতে চাই। মুসলমান হইলে তুমি শান্তি পাইবে। রুকানা বলিল, না, না, উহা সম্ভব নহে; বরং তুমি আমাকে অলৌকিক কিছু দেখাও। তিনি বলিলেন, রুকানা! মহান আল্লাহ্ তোমার উপর নজরদারি করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট চাহিলে আর তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে অলৌকিক ঘটনা দেখাইবেন। অতঃপর তোমাকে ইসলামে দীক্ষিত হইতে হইবে। প্রত্যুত্তরে সে বলিল, তাহাই হইবে।

নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল ঝাড় শাখাবিশিষ্ট একটি বাবলা গাছ। মহানবী (স) উহার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমূলে ও শাখা-প্রশাখাসহ গাছটি দ্বিধাবিভক্ত হইল। সেই অবস্থায় অগ্রসর হইয়া মহানবী ও রুকানার মধ্যখানে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে রুকানা চমৎকৃত হইয়া বলিল, তুমি আমাকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখাইলে! এখন উহাকে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বল। মহানবী (স) উহাকে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। গাছটি তখন উহার ডালপালাসহ সস্থানে প্রত্যাবর্তন করত পূর্বেকার অর্ধেকের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ববৎ দণ্ডায়মান রহিল।

এইবার মহানবী (স) তাহাকে বলিলেন, এখন ইসলাম গ্রহণ কর। সে বলিল, দেখ মুহাম্মাদ! কেহ আমাকে কোন দিন পরাজিত করিতে পারে নাই কিম্বা কেহ কোন দিন আমার মনে ভীতি প্রবেশ করাইতেও পারে নাই। অদ্য যদি মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ঘটনাটি জানিতে পারে তাহা হইলে আমার অপমানের আর সীমা থাকিবে না। সুতরাং তুমি তোমার ছাগল লইয়া প্রস্থান কর। সেইটাই হইবে উত্তম। মহানবী (স) বলিলেন, তোমার ছাগলে আমার কোনই প্রয়োজন নাই, এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন (প্রাগুক্ত)।

বর্ণিত ঘটনাপঞ্জী জীবন্ত বৃক্ষলতার। জীবন্ত ফলমূল শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের কথা বলা, চলাফেরা করা হয়তবা কিছুটা স্বাভাবিক হইতেও পারে। বিজ্ঞান উহার সমর্থন করে। পক্ষান্তরে শুকনা কাঠের গুঁড়ি কিভাবে রোদন করিতে পারে, উহাও আমাদের ভাবিয়া দেখা দরকার। দেখা গিয়াছে মহানবী (স)-এর মসজিদে খুৎবা দানের সময় তিনি হেলান দিতেন একটি খেজুর গাছের গুঁড়িতে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিচ্ছেদ ব্যথায় সেই শুকনা কাঠের গুঁড়ি কিরূপ করুণ সুরে বিলাপ করিয়াছিল উহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

হযরত জাবির বলেন, মহানবী (স) শুকনা একটি খেজুরের গুঁড়িতে হেলান দিয়া খুৎবা প্রদান করিতেন। তাঁহার জন্য একটি নূতন মিম্বর নির্মাণ করা হইলে খুৎবা প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি উহাতে দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুকনা খেজুরের গুঁড়ি করুণ সুরে কাঁদিতে লাগিল। মহানবী (স) নামিয়া আসিয়া উহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলে তবেই উহা আশ্বস্ত হইল। হযরত জাবির (রা) বলেন, গুঁড়িটির করুণ রোদনের সাক্ষ্য আমি নিজেই। অতঃপর মহানবী (স) বলিলেন, আমি যদি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ইহাকে আশ্বস্ত না করিতাম তাহা হইলে কিয়ামত পর্যন্ত এইভাবে উহা করুণ বিলাপ করিতে থাকিত (যাদুল মা'আদ, আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ৩খ,. পৃ. ৬১৪; কানযুল-উম্মাল, ১২খ., পৃ. ৪১১; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৪৯৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারু ইহ্য়াইত-তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, ১৯৯২ খৃ.; (২) আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী, কানযুল-উম্মাল, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.; (৩) ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.; (৪) ইব্ন কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, মাকতাবা-ই বুরহান, উর্দু বাজার, দিল্লী ১৯৭৮ খৃ.; (৫) ইব্ন কাছীর, জামি'উল মাসানীদ ওয়াস-সুনান, দারুল- কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.; (৬) আবূ নু'আয়ম আহমাদ ইস্পাহানী, দালাইলুন- নুবূওয়াহ, দাইরাতুল মা'আরিফিল উছমানিয়া, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ভারত, তা. বি.; (৭) আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, মা'আরিফ প্রকাশনী, আযমগড় ১৯৭৮ খৃ.।

তালেব আলী

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর্বতারোহণে উহার কম্পমান অবস্থা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াত ও রিসালাত শুধু প্রাণীজগত কর্তৃক নয়, বরং উদ্ভিদ ও জড়জগত দ্বারাও স্বীকৃত ছিল। ইহাদের প্রত্যেকেই তাঁহার মান-মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিল। ইহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্মান করিত এবং তাঁহার যে কোন নির্দেশ অবনত মস্তকে মানিয়া লইত। এমন দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ভুরিভুরি। একবার তিনি উহুদ অথবা হেরা পর্বতের উপর আরোহণ করিলেন এবং পর্বত প্রকম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার নির্দেশে শান্ত হইল। যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن انس بن مالك قال صعد النبي ﷺ الى احد ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله وقال اثبت احد فانما عليك نبي و صديق وشهيدان .

"হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা), হযরত 'উমার (রা) ও হযরত 'উছমান (রা)। অতঃপর পাহাড় প্রকম্পিত হইতে লাগিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় পা দ্বারা পাহাড়ে মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন, স্থির হও। কেননা তোমার উপর রহিয়াছেন একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুইজন শহীদ" (বুখারী, হাদীছ নং ৩৬৭৫ ও ৩৬৮৬, পৃ. ৭৫০ এবং ৭৫৩; তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৬৯৭, ৫খ., পৃ. ৬২৪)।

অপর একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ كان على حراء هو و ابو بكر وعمر وعلى وعثمان وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي ﷺ اهداء انما عليك نبي او صديق او شهيدان .

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) হেরা পর্বতের উপর ছিলেন। তাঁহার সাথে আরো ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা), হযরত 'উমার (রা), হযরত 'আলী (রা), হযরত 'উছমান (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা)। তখন পাহাড় কাঁপিয়া উঠিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, শান্ত হও। কারণ তোমার উপর রহিয়াছে একজন নবী অথবা একজন সিদ্দীক অথবা দুইজন শহীদ" (তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৬৯৭, ৫খ., পৃ. ৬২৪)।

وفى حديث سعيد بن زيد مثله لكن عدهم رسول الله ﷺ وابو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير و سعد وابن عوف وسعيد ابن زيد .

"আর সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা)-এর হাদীছেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাঁহাদের সংখ্যা দশ জন গণনা করা হইয়াছে। তাঁহারা হইলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স), আবূ বকর (রা), 'উমার (রা), 'উছমান (রা), 'আলী (রা), তালহা (রা), যুবায়র (রা), সা'দ (রা), ইব্ন 'আওফ (রা) ও সা'ঈদ ইব্ন যায়দ (রা)" (সুনান ইব্ন মাজা', হাদীছ নং ১৩৪, ১খ., পৃ. ৪৮)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে কে কে ছিলেন এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। কোন কোন রিওয়ায়াতে "او" (অথবা) শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে কতজন ছিলেন সেই সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন মাজা শরীফে সর্বোচ্চ দশজনের কথা বলা হইয়াছে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, এই পাহাড় ছিল উহুদ আর মুসনাদে আহমাদ ও সুনান ইব্ন মাজাতে হেরা পর্বতের কথা বলা হইয়াছে, তবে তিরমিযীতে উভয় পর্বতের কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবু ফাদাইলি আসহাবিন নাবী, দারুস-সালাম, রিয়াদ ১৪১৭ হি.; (২) আবূ 'ঈসা আত-তিরমিযী, আল-জামি', দারু ইহয়াইত- তুরাছ আল-আরাবী, ১৩৯৫ হি. / ১৯৭৫ খৃ.)।

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

চতুষ্পদ জন্তুর সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথোপকথন

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে অসংখ্য মু'জিযা সংঘটিত হইয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা প্রাণীকুলকেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুগত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য ব্যতীত শরীয়ত পালনের আর কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুষ্পদ জন্তুরাও তাহাদের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করিত।

হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় একটি উট ছুটিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে মাথা নত করিল এবং বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই উট বলিতেছে যে, ইহার মালিক ইহাকে পিতার জন্য ভোজ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যবেহ করিতে চাহে। অতঃপর তিনি উটের মালিকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হাঁ, আমি ইহাকে যবেহ করিতে চাহিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহাকে যবেহ করিও না। সেমতে মালিক উহাকে যবেহ করিল না (আল-খাসাইসুল-কুবরা, ২খ., পৃ. ৫৭)।

ইয়া'লা ইবন মুররা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন বাহিরে গেলেন। দেখিলেন, একটি উট চীৎকার করিতেছে। উট তাঁহাকে দেখিবামাত্র সিজদা করিল। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, আমরাও আপনাকে সিজদা করার অধিকার রাখি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তবে নারীকে আদেশ দিতাম তাহার স্বামীকে সিজদা করিতে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই উট কি বলিতেছে জান? সে বলিতেছে, আমি আমার মালিকদের চল্লিশ বৎসর সেবা করিয়াছি। এখন আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। তাহারা আমার ঘাসপানি কমাইয়া দিয়াছে এবং কাজ বেশী লইতে শুরু করিয়াছে, আর বিবাহ উপলক্ষে আমাকে যবেহ করিতে চাহে। রাসূলুল্লাহ (স) উটের মালিকের নিকট লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া উটের অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, সত্য। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উটটি আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দাও (আল-খাসাইসুল-কুবরা, ২ খ., পৃ. ৫৭)।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আনসার গোত্রের প্রত্যেকেই উট পালন করিত। এক বাড়ীওয়ালা নবী কারীম (স)-এর নিকট আরয করিল, আমার একটি উট রহিয়াছে যাহার পিঠে করিয়া আমি পানি বহন করিয়া থাকি। উটটি বড় বেয়াড়া হইয়া গিয়াছে, বোঝা বহন করিতে চাহে না। আর আমার খেজুর বাগান পানির অভাবে শুকাইয়া যাইতেছে।

এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কিরামকে সঙ্গে লইয়া উটটির নিকট গেলেন। তিনি বাগানে পৌঁছিয়া এক স্থানে দাঁড়াইলেন। বাগানের এক কোণে ছিল উটটি। আনসারী লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহাই সেই উট। যে কুকুরের মতো মানুষকে কামড়াইতে চায়। আমার ভয় হইতেছে, না জানি আপনাকেও সে কামড় দেয়। তিনি বলিলেন, আমার ব্যাপারে ভয় করিও না। রাসূলুল্লাহ (স) উটটির সামনে গেলেন। উটটি তাঁহাকে দেখিবামাত্র মাথা উঠাইল এবং তাঁহার সম্মুখে গিয়া কদম মুবারকের নিকট মাথা নত করিয়া সিজদা করিল। রাসূলুল্লাহ (স) উটটির মাথার পশম ধরিয়া টান দিয়া কাজে লাগাইয়া দিলেন।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে, উটটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে আসিয়া গর্দান নত করিয়া উহার নিজের ভাষায় ফরিয়াদ করিয়াছিল। তাহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) উহার মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইলেন এবং তাহার মালিককে বলিলেন, উটটি আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দাও। লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খিদমতে হাজির। কিন্তু উটটি আমার পরিবারের প্রয়োজন মিটায়। জীবিকার জন্য এই উটটি ছাড়া আমার আর কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উটটি অভিযোগ করিতেছে যে, তুমি উহার দ্বারা বেশী কাজ করাও আর খাইতে দাও কম। তুমি উহার অধিকারের দিকে খেয়াল রাখ না। সুতরাং এখন হইতে উহার অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখিও (আল-খাসাইসুল-কুবরা, ২খ., পৃ. ৫৬; মাদারিজুন নুবূওয়াত, ১খ., পৃ. ৩৪২-৪৩)।

হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন, এক যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি দেখিতে পাইলাম, জনৈক বেদুঈন একটি উটের রশি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উটটি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম করিল। তিনি সালামের জওয়াব দিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, এই লোকটি আমার উট চুরি করিয়া নিয়া আসিয়াছে। এই কথা শুনিবার পর উটটি চিৎকার করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রতিবাদ করিল। রাসূলুল্লাহ (স) উটটির অভিযোগ শুনিয়া দাবিদারকে বলিলেন, উটটি আমার নিকট অভিযোগ করিতেছে যে, তুমি মিথ্যাবাদী (আশ-শিফা, পৃ. ৬০৫; নাসীমুর রিয়াদ, ৩খ., পৃ. ৮৭)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, অমুক গোত্রের পানিবাহী উট অবাধ্য হইয়া পালাইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সহিত আমরাও দাঁড়াইলাম। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই উটের নিকট যাইবেন না। কিন্তু তিনি উটের নিকট গেলেন। উট তাহাকে দেখিয়া সিজদা করিল। তিনি উহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, লাগাম আন। লাগাম আনা হইলে তিনি উটের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, উটের মালিককে ডাক। মালিক আসিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহাকে উত্তমরূপে ঘাসপানি দিবে এবং কঠোর আচরণ করিবে না (আল-খাসাইসুল-কুবরা, ২ খ., পৃ. ৫৬)।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাদের উট বাগান দখল করিয়া লইয়াছে, সেখান হইতে কোন অবস্থাতে বাহির হইতেছে না। রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে গেলেন এবং উটকে আওয়ায দিলেন। উট মাথা নত

করিয়া তাঁহার নিকট চলিয়া আসিল। তিনি উটের লাগাম বাঁধিয়া মালিকের হাতে দিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন, এই উট জানে যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, কাফের জিন ও কাফের মানব ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন বস্তু নাই, যে জানে না যে, আমি আল্লাহ্‌র নবী (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭)।

একদা একটি উট রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া তাহার কওমের লোকদের সম্পর্কে অভিযোগ করিল যে, তাহারা ইশার সালাত আদায় না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে। আমার ভয় হইতেছে যে, না জানি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর আযাব নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ (স) ঐ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ডাকিয়া বলিলেন, তাহারা যেন ইশার সালাত আদায়ের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে (মাদারিজুন নুবূওয়াত, ১খ., পৃ. ৩)।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন, আমাদের ঘরে একটি বকরী ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) যখন ঘরে থাকিতেন তখন উহা চুপচাপ শুইয়া থাকিত। আর তিনি ঘর হইতে বাহির হইলে পেরেশান হইয়া এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করিত (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩)।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবূ বকর ও হযরত 'উমার (রা)-কে সঙ্গে লইয়া জনৈক আনসারীর বাগানে গেলেন। সেখানে একটি বকরী ছিল। বকরীটি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সিজদা করিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাও তো আপনাকে সিজদা করার অধিকার রাখি। তিনি বলিলেন, এক মানুষের জন্য অন্য মানুষকে সিজদা করা বৈধ নয় (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩)।

এক বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন উট কুরবানী করিতে উদ্যত হইলেন, তখন উটগুলি একে অপরকে সরাইয়া দিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে দাঁড়াইয়া যাইত (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪)।

উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) মরুভূমি অতিক্রম করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি "ইয়া রাসূলাল্লাহ" এই রকম তিনটি আওয়ায শুনিতে পাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) সেই আওয়াযের দিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, একটি হরিণী বাঁধা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কাছেই এক বেদুঈন চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। তিনি হরিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বল, কি প্রয়োজন তোমার? হরিণী বলিল, আমাকে এই লোক শিকার করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমার দুইটি বাচ্চা এই পাহাড়ের গর্তের ভিতর রহিয়াছে। আপনি যদি আমাকে মুক্ত করিয়া দেন তাহা হইলে বাচ্চা দুইটিকে দুধ পান করাইয়া আমি আবার ফিরিয়া আসিব। তিনি বলিলেন, তুমি কি আবার ফিরিয়া আসিবে? হরিণী বলিল, ফিরিয়া না আসিলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে যেন ঐ শাস্তি প্রদান করেন যে শাস্তি তিনি যাকাত আত্মসাৎকারীর জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (স) উহাকে মুক্ত করিয়া দিলে উহা চলিয়া গেল, অল্পক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) উহাকে আগের মত বাঁধিয়া রাখিলেন। বেদুঈন লোকটি জাগিয়া উঠিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি কোন উদ্দেশ্য আছে? তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা তুমি

হরিণীকে মুক্তি দাও। লোকটি হরিণীকে ছাড়িয়া দিল। উহা মনের আনন্দে চক্কর দিয়া দৌড়িয়া পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় উহা সাক্ষ্য দিতেছিল, আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (আল-খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬০; মাদারিজুন-নুবূওয়াত, ১ খ., পৃ. ৩৪৬)।

আরেকটি ঘটনা, রাসূলুল্লাহ (স) এক সেনাবাহিনীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। সেনাদল ছিল তৃষ্ণার্ত। এক সময় দেখা গেল একটি জলাশয়। এমন সময় একটি হরিণী নবী কারীম (স)-এর নিকটে আসিল। তিনি হরিণের দুধ দোহন করিলেন এবং বাহিনীর সমস্ত সৈন্যকে দুধ পান করাইলেন। সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় তিন শত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মুক্তদাস রাফে' (রা)-কে বলিলেন, তুমি হরিণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিও। তিনি হরিণীকে বাঁধিয়া রাখিলেন। কিছুক্ষণ পর দেখিলেন, হরিণীটি নাই। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যিনি উহাকে পাঠাইয়াছিলেন তিনিই উহাকে লইয়া গিয়াছেন (মাদারিজুন নুবূওয়াত, ১খ., পৃ. ৩৪৬)।

যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী কারীম (স)-এর সঙ্গে মদীনার গলিপথ দিয়া যাইতেছিলাম। জনৈক বেদুঈনের তাঁবুতে পৌঁছিয়া আমরা একটি হরিণীকে বাঁধা অবস্থায় দেখিলাম। হরিণী বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বেদুঈন আমাকে শিকার করিয়াছে। জঙ্গলে আমার দুইটি বাচ্চা ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে। আর স্তনে দুধ জমা হওয়ার কারণে আমিও নিদারুণ যাতনা অনুভব করিতেছি। বেদুঈন আমাকে যবেহ করিলে আমি এই যাতনা হইতে রেহাই পাইতাম, আর ছাড়িয়া দিলে বাচ্চাদের নিকট চলিয়া যাইতাম। কিন্তু সে কিছুই করিতেছে না। রাসূলুল্লাহ (স) হরিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আমি তোমাকে ছাড়িয়া দেই তাহা হইলে তুমি কি ফিরিয়া আসিবে? সে বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে কিছুক্ষণের মধ্যে জিহ্বা চাটিতে চাটিতে ফিরিয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) উহাকে বাঁধিয়া রাখিলেন। ইতোমধ্যে বেদুঈন আসিয়া পড়িল। তাহার সহিত ছিল পানির একটি মশক। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি হরিণীটি বিক্রয় করিবে কি? সে বলিল, হরিণীটি আপনারই। তখন রাসূলুল্লাহ (স) উহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন, হরিণীটি কালেমা তায়্যিবা উচ্চারণ করিতে করিতে জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১)।

মুত্তালিব ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় এক বাঘ আসিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে শুরু করিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাদের নিকট বাঘদের এই দূত আসিয়াছে। তোমরা ইচ্ছা করিলে তাহার জন্য কিছু ভাতা নির্দিষ্ট করিয়া দাও। সে ইহার বেশী লইবে না। আর তাহা না হইলে এমনিতেই ছাড়িয়া দাও। সে যাহা পাইবে নিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় তোমাদের ভয় থাকিয়া যাইবে। সে যাহা কিছু নিবে তাহা তাহার রিযিক হইবে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইহার জন্য কিছু নির্দিষ্ট করিয়া দিতে সম্মত না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তিন আঙ্গুল দিয়া বাঘের দিকে ইশারা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তুই তাহাদের ছাগল ছোঁ মারিয়া লইয়া যা। ইহাতে বাঘটি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া মাথা নাড়িয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেল (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩)।

ইব্‌ন মানযূর বর্ণনা করেন, খায়বার বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (স) একটি কালো গাধা পাইলেন। তিনি ঐ গাধার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর নাম কি? সে বলিল, ইয়াযীদ ইব্‌ন শিহাব। আমার দাদার বংশ হইতে আল্লাহ তা'আলা ষাটটি গাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইগুলির সকলের পিঠে পয়গাম্বরগণ সওয়ার হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি আমার পিঠে সওয়ার হইবেন। কেননা এখন আমার দাদার বংশে আমি ছাড়া কেহ বাঁচিয়া নাই। আর পয়গাম্বরগণের মধ্যে আপনি ছাড়া কেহ অবশিষ্ট নাই। ইহা আরও বলিল, আপনার নিকট আসার পূর্বে আমি এক ইয়াহূদীর অধীনে ছিলাম। সে আমার পিঠে উঠিতে চাহিলে আমি ইচ্ছা করিয়া লাফালাফি করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিতাম। আমার পিঠে তাহাকে উঠিতেই দিতাম না। এজন্য সে আমার পেটে ও পিঠে আঘাত করিত, আমাকে অনাহারে রাখিত।

এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আজ হইতে তোমার নাম ইয়া গাফূর। এই ইয়া গাফূর নামক গাধাটি সর্বদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির থাকিত। তিনি কাহাকেও ডাকিয়া আনার জন্য ইহাকে পাঠাইলে সে সেই লোকের বাড়ির দরজায় উপস্থিত হইয়া মাথা ঠুকিতে থাকিত। গৃহকর্তা বাহির হইয়া আসিলে তাহাকে ইশারায় বুঝাইয়া দিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ডাকিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর ইয়া গাফূর নামক গাধাটি তাঁহার বিরহব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া আবুল হায়ছাম ইব্‌ন তাহিয়ানের কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল (আল-খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬৪; মাদারিজুন নুবুওয়াত, ১ খ., পৃ. ৩৪৬-৪৭)।

প্রাণীকুল ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তাহাদের দুঃখ-কষ্টের কথা ব্যক্ত করিয়া বিভিন্ন জনের উপর অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে। আর আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) সেইগুলির অভিযোগ শুনিতেন এবং উহাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস-সুয়ূতী (র), আল-খাসাইসুল-কুবরা, দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.; (২) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দিহ্‌লবী (র), মাদারিজুন নুবূওয়াত, অনু. মুফতী গোলাম মঈন উদ্দীন, দিল্লী ১৯৯২ খৃ.; (৩) কাযী ইয়ায (র), আশ-শিফা, মাকতাবা ফারাবী, বৈরূত, তা. বি.; (৪) আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী (র), সীরাতুন-নবী, ৪খ., দারুল ইশা'আত, উর্দূ বাজার, করাচী ১৯৮৪ খৃ.।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

কাফিরদের প্রতি এক মুষ্ঠি মাটি নিক্ষেপ এবং তাহাদের সকলের চোখে পতিত হওয়া

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মু'জিযাসমূহের মধ্যে ইহাও অন্যতম যে, তিনি এক মুষ্ঠি মাটি লইয়া কাফিরদের প্রতি তাহা নিক্ষেপ করেন। ফলে তাহাদের সকলের চোখে তাহা পতিত হয়। একজন কাফিরও ইহা হইতে নিস্তার পায় নাই। মাটি নিক্ষেপের এই ঘটনাটি দুইটি ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল—এক. দ্বিতীয় হিজরী বদর যুদ্ধের সময় এবং দুই. ৮ম হিজরী হুনায়ন যুদ্ধের সময়।

বদর যুদ্ধের ঘটনা ঃ কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে হক ও বাতিলের ফয়সালাকারী যুদ্ধ হইল বদর যুদ্ধ। তাই এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) মহান আল্লাহর নিকট খুবই কাকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করেন যাহাতে মুসলমানগণ বিজয়ী হয়। ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স) উভয় হাত উত্তোলন করিয়া খুবই কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করিতেছিলেন। আর বলিতেছিলেন ঃ

يا رب ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الارض ابدا ٠

"হে আমার প্রতিপালক! এই দলটি যদি ধ্বংস হইয়া যায় তবে পৃথিবীতে আর কখনও তোমার ইবাদত করা হইবে না।" তখন জিবরীল (আ) তাঁহাকে বলিলেন, একমুষ্ঠি মাটি লইয়া তাহাদের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কথা অনুযায়ী এক মুষ্ঠি মাটি লইয়া কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন কাফির মুশরিকদের এমন একজন লোকও অবশিষ্ট রহিলনা যাহার চক্ষুতে, নাকে ও মুখে উক্ত মাটি গিয়া না পৌছিল। অতঃপর তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ২খ., পৃ. ৩৯৫; আল-বিদায় ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮৩; ছানাউল্লাহ পানিপতি, আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৪খ., পৃ. ৩৮)।

সুদ্দীর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) বদর যুদ্ধের দিন 'আলী (রা)-কে বলিলেন, আমাকে এক মুষ্ঠি কঙ্কর দাও। 'আলী (রা) তাঁহাকে একমুষ্ঠি কঙ্কর আনিয়া দিলেন যাহাতে মাটি মিশ্রিত ছিল। অতঃপর তিনি উক্ত মাটি মিশ্রিত কঙ্কর কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ফলে মুশরিকদের প্রত্যেকের চক্ষুতে, মুখে ও নাকে গিয়া উহা পতিত হয়। অতঃপর মুসলমানগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে হত্যা ও বন্দী করিতে লাগিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى.

"তোমরা তাহাদেরকে হত্যা কর নাই, আল্লাহই তাহাদেরকে হত্যা করিয়াছেন এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহই নিক্ষেপ করিয়াছেন" (৮ ঃ ১৭; প্রাগুক্ত)।

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-কুরাজীর বর্ণনামতে, উভয়দল যখন পরস্পর পরস্পরের মুখামুখি হইল তখন রাসূলুল্লাহ (স) এক মুষ্ঠি মাটি লইয়া কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, شاهت الوجوه "মুখমণ্ডলসমূহ কদাকার হউক" ফলে কাফিরদের প্রত্যেকের ক্ষতে তাহা লাগিল আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে হত্যা ও বন্দী করিতে লাগিলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই মাটি নিক্ষেপের ফলে তাহাদের পরাজয় হইয়াছিল। তাই লোকের এই ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য আয়াত নাযিল করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের চক্ষুতে আল্লাহই এই মাটি পৌঁছাইয়া দেন। আয়াতটি হইল ঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

(ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ২খ., পৃ. ২৯৫)।

এক বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ (স) তিনটি কঙ্কর লইয়া একটি শত্রু সৈন্যের দিকে একটি বাম দিকে এবং একটি তাহাদের সম্মুখ ভাগে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, شاهت الوجوه (প্রাগুক্ত; আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়া, ১খ., পৃ. ৩৬৪; আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল-উনুফ, ৫খ., পৃ. ১০৬)।

হুনায়ন যুদ্ধের ঘটনা

কাফিরদের প্রতি মাটি নিক্ষেপের অপর ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ৮ম হি. হুনায়ন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধ যখন চরম আকার ধারণ করিয়াছিল তখন রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় খচ্চর হইতে অবতরণ করত যমীন হইতে এক মুষ্ঠি মাটি লইলেন এবং شاهت الوجوه বলিয়া কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতে মুশরিকদের প্রত্যেকের চক্ষুতেই তাহা পতিত হইল। ফলে তাহাদের শক্তিতে ভাটা পড়িল এবং অবস্থার পরিবর্তন হইয়া গেল। তাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩৩০; সাফিয়্যুর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৬)।

ইবনুল আছীরের বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার দুলদুল নামক সাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁহার খচ্চরকে মাটিতে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। খচ্চরটি তাহার পেট মাটির সহিত লাগাইলে তিনি এক মুষ্ঠি মাটি লইয়া কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন (ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২খ., পৃ. ২৬৪)। আত-তাবারীর বর্ণনামতে মাটি নিক্ষেপকালে তিনি বলিয়াছিলেন حم لا ينصرون "হা-মীম, তাহারা সাহায্য

প্রাপ্ত হইবে না।" অতঃপর মুশরিকরা পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের প্রতি তীর-তরবারি ও বল্লমের দ্বারা তেমন আঘাত করিতে হইল না (আত-তাবারী, তারীখুল-উমাম ওয়াল-মূলক, ৩খ., পৃ. ৭৮; ইব্‌নুল-জাওযী, আল-ওয়াদা, ১খ., পৃ. ৩০৪; ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ৩৩০-৩১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, মাকতাবা দারুত তুরাছ, কায়রো, তা.বি. ২খ.; (৩) ছানাউল্লাহ পানিপাতী, আত-তাফসীরুল মাজহারী, মাকতাবা রাশীদিয়্যা, কোয়েটা, পাকিস্তান, ১৪১২/১৯৯১, ৪খ.; (৪) ইব্‌ন কাছীর, আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকর আল-আরাবী, জীযা, মিসর তা. বি., ৩খ., ৪খ.; (৫) আত-তাবারী, তারীখুল-উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত-লেবানন তা. বি. ৩খ; (৬) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত লেবানন ১৪০৭/১৯৮৭, ১ম সং. ২খ.; (৭) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরূত লেবানন ১৪১২/১৯৯১, ১খ.; (৮) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, বৈরূত লেবানন ১৪১২/১৯৯২, ১ম সং. ৫খ.; (৯) ইবনুল-জাওযী, আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল-মুসতাফা, মাকতাবা নূরিয়্যা রিদাবিয়্যা, ফয়সাল আবাদ, পাকিস্তান ১৩৯৭/১৯৭৭, ২য় সং., ১খ.; (১০) সাফিয়্যুর রাহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, দারুস সালাম, রিয়াদ ১৪১৪/১৯৯৪।

ড. আবদুল জলীল

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইঙ্গিতে কা'বা ঘরের মূর্তি ভূলুণ্ঠিত হইল

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অসংখ্য মু'জিযার মধ্যে তাঁহার অঙ্গুলীর ইশারায় কা'বা ঘরের মূর্তিসমূহ ধ্বসিয়া পড়ার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয়ের দিন স্বীয় সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া মক্কায় প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রথম কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেন। তখনও কা'বার চারপাশে সীসা দ্বারা মজবুতভাবে আটকানো মূর্তিসমূহ স্থাপিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার হাতের লাঠি দ্বারা মূর্তিগুলির দিকে ইংগিত করিয়া পাঠ করিলেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

"সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; মিথ্যা বিলুপ্ত হইবারই" (১৭ ঃ ৮১)।

এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স) যেই মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন, তাহা চিৎ বা উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। এইভাবে একে একে সব কয়টি মূর্তিই ধরাশায়ী হইল (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪৪)।

হযরত 'আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) কা'বা ঘরের ছাদে উঠিলেন এবং আমাকে উঠিতে বলিলে আমিও উঠিলাম। ছাদের উপরে ছিল আর একটি বড় প্রতিমা। রাসূলুল্লাহ (স) সেইটির দিকে ইঙ্গিত করিলেন, আমি উহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে হারামে প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রথম হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করিলেন। ইহার পর সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া তাওয়াফ করিলেন। তাওয়াফরত অবস্থায় ধনুক তাঁহার হাতেই ছিল। তিনি মূর্তিগুলির পাশ দিয়া অতিক্রমকালে ধনুক দিয়া সেইগুলির দিকে ইশারা করিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

"সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই" (১৭ ঃ ৮১)।

তিনি মূর্তির পিঠের দিকে ইশারা করিলে সেই মূর্তিটি মুখের উপর উপুড় হইয়া পড়িল আর সম্মুখে দিয়া ইশারা করিলে পিছন দিকে গড়াইয়া পড়িল। কোন কোন বর্ণনায় আসিয়াছে, সেই দিন মক্কার অপরাপর বিগ্রহগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। মক্কায় আর একটি বড় মূর্তি ছিল হুবলের। সেইটিও সেই দিনই ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

কা'বা প্রাচীরের গায়ে সবচেয়ে উপরে ঝুলন্ত মূর্তিটি এতো উচ্চে ছিল যে, হাতের নাগালের বাহিরে ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'আলী (রা)-কে তাহার নিজ কাঁধের উপর দাঁড় করাইয়া দিলেন আর হযরত আলী (রা) উহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন।

কা'বার প্রাচীরে ইবরাহীম (রা)-ও ইসমা'ঈল (আ)-এর বিশাল দুইটি ছবি শোভা পাইতেছিল। তাঁহাদের দুইজনের হাতেই ভাগ্য নির্ধারণকারী (জুয়ার) তীর ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহ এই কাফিরদিগকে ধ্বংস করুন। তাঁহারা দুইজনই বিশিষ্ট নবী। তাঁহারা কখনও জুয়া খেলেন নাই। সেখানে কাষ্ঠ নির্মিত দুইটি কবুতরের মূর্তিও ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) নিজে সেইগুলি বিনষ্ট করিলেন এবং ছবিগুলি মিটাইয়া ফেলিতে নির্দেশ দেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নির্দেশ প্রতিপালিত হয় (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৩২-২৩৩)।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কুঠারের সাহায্যে মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলার সম্মান দান করিয়াছিলেন, আর আমাদের নবী করীম (স)-কে অত্যন্ত কঠিন ও মজবুত মূর্তি যাহা কা'বা শরীফের দেওয়ালের পার্শ্বে ছিল, তাহা সামান্য এক খণ্ড কাঠের ইশারায় ভাঙ্গিয়া ফেলার গৌরব দান করিয়াছিলেন (মাদারিজুন-নুবূওয়াত, ১খ., পৃ. ২১২)। রাসূলুল্লাহ (স) হস্তস্থিত ধনুক দ্বারা হোবলের চক্ষুদ্বয়ে খোঁচা দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

"সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে, মিথ্যাতো বিলুপ্ত হইবারই" (১৭ ঃ ৮১)।

রাসূলুল্লাহ (স) আল-কুরআনের উল্লিখিত আয়াত পাঠ করিতে করিতে ধনুক দ্বারা প্রত্যেকটি বিগ্রহের প্রতি ইংগিত করিতেই সবগুলিই ভাঙ্গিয়া খানখান হইয়া যাইতে লাগিল (সাইয়্যেদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ৮৮২)।

রাসূলুল্লাহ (স) কা'বা শরীফে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিল ধারণের মত খালি স্থান নাই। কা'বা শরীফের দেওয়ালে খোদাই করাছিল ফেরেশতা ও নবীদের প্রতীকী মূর্তি। তিনি দেখিলেন, ইবরাহীম (আ)-এর মূর্তি ভাগ্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর তাঁহার হাতে। ইহার পাশেই রহিয়াছে কাঠের তৈরি একটি ময়ূর। ফেরেশতাদেরকে রূপায়িত করা হইয়াছে মহিলার বেশে। অট্টালিকার প্রত্যেক কোণায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে মূর্তি। সবার মাঝে রহিয়াছে আকীক পাথরের তৈরীর 'হুবল মূর্তি'। হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহার লাঠি উঠাইয়া হুবল ও ময়ূরকে আঘাত করা মাত্রই সেইগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল (যাইনুল আবেদীন রাহনুমা, অনু., আবূ জাফর, পৃ. ৪১৬)।

কা'বায় হুবল দেবতার মূর্তি ছিল; ইহাকে মক্কা ও কা'বার দেবতা বলা হইত। কা'বা প্রাঙ্গণে রক্ষিত অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে 'আল-লাত', 'আল-'উযযা' এবং 'আল-মানাতের' উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হইয়াছে ঃ

اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى .

"তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ 'লাত' ও 'উয্যা' সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে" (৫৩ ঃ ১৯)?

ইহারা ব্যতীত কা'বা প্রাঙ্গণে রক্ষিত আরও অনেক দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, কা'বা প্রাঙ্গণে ৩৬০টি প্রতিমা রক্ষিত ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (স) আপন হস্তের লাঠি দ্বারা মূর্তিগুলিকে আঘাত করেন এবং পাঠ করেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

"সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই" (১৭ : ৮), তখনই উহা ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

কা'বার অভ্যন্তরে 'হুবল' দেবের যে প্রতিমূর্তি আমর ইব্ন লুহাই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা এবং নবীগণের প্রতিকৃতিগুলিও তখনই অপসারিত হইল (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৮২৩, কিতাবুল আসনাম)।

কাষ্ঠ নির্মিত কবুতরের প্রতিমূর্তিও কা'বায় রক্ষিত ছিল, তাহাও মহানবী (স)-এর আদেশে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ.)।

'আল-লাত' প্রাচীন আরবের একটি দেবী। প্রাচীন নাবাতীয় ও পামীরীয় শিলালিপিতেও এই নাম দেখা যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বেদুঈন গোত্র ইহার পূজা করিত (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা)।

তায়েফের নিকট ওয়াজ্জ উপত্যকায় এই দেবীর প্রধান মন্দির ছিল। মু'আত্তিব ইব্ন মালিক ইব্ন কা'ব ইহার পুরোহিত ছিলেন। একটি সুসজ্জিত ঝুলন্ত শ্বেত প্রস্তরই ছিল এই তিন দেবীর প্রতীক। কুরায়শগণ লাত, মানাত এবং উয্যা এই তিন দেবীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে তায়েফে 'আল-লাত' এবং উহার মন্দির আল-মুগীরা (রা) ধ্বংস করিয়াছিলেন (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ., পৃ. ৪০৩)।

আল-উয্যা একটি পুরাকালের আরবদেশীয় দেবীর নাম। এই নামের অর্থ শক্তিশালীনি ও ক্ষমতাধারিণী। ইহাকে বিশেষ করিয়া গাতাফান গোত্রের সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রধান মন্দির ছিল নাখলা উপত্যকায়, মক্কা হইতে তায়িফের পথে। হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেইখানে তিনটি বাবলা গাছ ছিল, উহাদের একটিতে উয্যা অবতীর্ণ হইত।

তৃতীয় হিজরী সনে আবূ সুফয়ান হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রাকালে আল-উয্যা ও আল-লাতের প্রতিমূর্তি সঙ্গে লইয়াছিল। এই দুইটি প্রতিমূর্তির মধ্যে আল-উয্যা প্রধান ছিল। ইহাকে মক্কার রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে গণ্য করা হইত। কেননা আবূ সুফয়ান 'আল-উয্যা আমাদের পক্ষে, তোমাদের পক্ষে নহে' এই বলিয়া রণ-ধ্বনি দিত। আর অপর ধ্বনি ছিল 'উ'লূ হুবল' (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ২৩৩)।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত মুহাম্মাদ (স) খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে উয্যার মন্দির ধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন। ওয়াকিদীর মতে উহার শেষ পুরোহিত ছিল আফলাহ্ ইব্ন নাসর আশ-শায়বানী এবং ইব্ন কালবীর মতে দুবায়্যা ইব্ন হারূন। ইহার পর আল-উয্যার পূজা তিরোহিত হয় (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম সং, ১খ., পৃ. ২৩৩)।

'আল-মানাত' প্রাচীন আরবের আরাধ্য এক দেবী। এই নামটি বহুবচনরূপে আরামাইক ও হিব্রু ভাষায় ব্যবহৃত ভাগ্য দেবীর নামের সহিত সম্পর্কযুক্ত মনে হয়। আরামাইকে 'মেনাতা' বহু বচনে 'মেনা ওয়াত্তা' অর্থ অংশ বা ভাগ্য। হিব্রুতে 'ম্যানা' বহুবচনে 'মানোত' বা অদৃষ্ট দেব (Is. IXV. II; তু. IXX)।

আল-মানাত-এর বেদী 'কাদীদ' যাহা হুযায়ল গোত্রের এলাকা, মক্কার অনতিদূরে মদীনাগামী পথের ধারে মুশাল্লাল নামক এক পাহাড়ের নিকট। সেই বেদীতে এই দেবী একটি কৃষ্ণকায় প্রস্তরের রূপে অধিষ্ঠিত ছিল। অনেক আরব গোত্র; প্রধানত ইয়াছরিবের আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় ইহার পূজা করিত। মক্কায় আল-লাত ও আল-উয্যা দেবীদ্বয়ের সঙ্গে আল-মানাতও অতি জনপ্রিয় ছিল। ইবনুল-কালবীর মতানুসারে আল-মানাত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দেবী। ইবন হিশামের কবিতায় আল-মানাত ও আল-লাতকে আল-উয্যার দুইটি কন্যারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কতিপয় লেখক আল-মানাতকে হজ্জের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। তাহাদের মতে এক সময় আওস ও খাযরাজসহ অনেক গোত্র আল-মানাতের মন্দিরে হজ্জের ইহরাম করিত এবং অনুষ্ঠানশেষে তাহার পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া চুল কাটিয়া ইহরাম হইতে মুক্ত হইত (ইবন হিশামের কবিতা, পৃ. ১৪৫)

ইব্ন হিশামের বর্ণনায় সুস্পষ্টরূপে জানা যায়, আল-মানাত গৃহদেবীও ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে কাদীদের বিরাট মন্দির বিধ্বস্ত করা হয় (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ., পৃ. ২১৪)।

আল্লামা শিবলী নো'মানী সীরাতুন নবীতে উল্লেখ করেন যে, কা'বা শরীফে বহু দেবমূর্তি ছিল। তন্মধ্যে 'হুবল' দেবতা ছিল মূর্তিপূজকদের প্রধান দেবতা। ইহা ছিল গাঢ় রক্ত বর্ণের মূল্যবান ইয়াকূত পাথরে প্রস্তুত, মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট। আদনানের প্রপৌত্র ও মুদারের পৌত্র খুযায়মা ইব্ন মুদরিকা সর্বপ্রথম এই দেব মূর্তিকে কা'বা গৃহে আনিয়া স্থাপন করে। হুবলের সম্মুখে সাতটা তীর থাকিত। এই সমস্ত তীরের উপর 'হাঁ' ও 'না' লেখা ছিল। আরবেরা যখন কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করিত, তখন ঐ সমস্ত তীর দ্বারা লটারী করিত। লটারীতে 'হাঁ' অথবা 'না' যাহা উঠিত সেই মুতাবিক কর্ম করিত। উহুদের যুদ্ধে আবূ সুফয়ান এই হুবল দেবতারই জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন। উহা কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে স্থাপিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) যখন কা'বা গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন অন্যান্য দেবমূর্তির সহিত উহাকেও উৎপাটিত করা হয়।

মক্কার আনাচে-কানাচে ও পথে-প্রান্তরে আরও অনেক বড় বড় মূর্তি বিদ্যমান ছিল। উহাদের জন্য হজ্জের অনুষ্ঠান পালন করা হইত। উহাদের মধ্যে লাত, মানাত ও উয্যা ছিল সর্ববৃহৎ। উয্যা কুরায়শদের এবং লাত তায়েফবাসীর পূজ্য দেবতা ছিল। মক্কা নগরী হইতে এক মনযিল দূরে 'নাখলা' নামক স্থানে উয্যা দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বনূ শায়বা গোত্র এই দেবতার পুরোহিত বা সেবায়েত ছিল। আরবদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ শীতকালে লাত দেবতার নিকট এবং গ্রীষ্মকালে উয্যা দেবতার নিকট অবস্থান করেন। আরবরা কা'বা ঘরে যে সব অনুষ্ঠান পালন করিত ও কুরবানী করিত উয্যা দেবতার সম্মুখেও তদসমুদয় আচার- অনুষ্ঠানই পালন করিত। তাহারা উহাকে প্রদক্ষিণ করিত এবং উহার নামে কুরবানী করিত।

মদীনা মুনাওয়ারা হইতে মক্কার পথে সাত মাইল দূরে কাদীদ নামক স্থানের নিকটবর্তী মুশাল্লালে মানাতের দেব মন্দির অবস্থিত ছিল। ইহা ছিল কারুকার্যবিহীন এক প্রস্তর খণ্ড। আয্দ, গাসসান, আওস ও খাযরাজ গোত্রসমূহ উহার নিকট হজ্জের ইহরাম বাঁধিত এবং হজ্জ

সমাপ্ত করিয়া ইহ্রাম খুলিত। আমর ইব্ন লুহাই যে সমস্ত মূর্তি স্থাপন করিয়াছিল ইহা ছিল তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা কা'বা শরীফে হজ্জ সমাপনান্তে মস্তক মুণ্ডন পূর্বক ইহ্রাম ভংগের অনুষ্ঠান এই দেবতার সম্মুখে পালন করিত।

হুযায়ল গোত্রের দেবতা ছিল 'সুওয়া'। উহা ইয়ামবায়ের পার্শ্ববর্তী রাহাত নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। উহা ছিল এক খণ্ড প্রস্তর। বনূ লিহ্য়ান গোত্র ছিল ইহার পুরোহিত বা সেবায়েত।

মূর্তি পূজার এই কুহকে সমগ্র আরব জাতি নিমজ্জিত ছিল। যখন মক্কা বিজয় হইল তখন উহাদের ধ্বংসের সময় আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) সকল মূর্তি ও মূর্তি গৃহ ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন (নদবী, সীরাতুন-নবী, ১খ., পৃ. ৩০৪)।

কাতাদা বর্ণনা করিয়াছেন, তায়েফের বনী ছাকীফের একটি প্রতিমার নাম ছিল লাত। ইব্ন যায়দ বলিয়াছেন, নাখলা নামক স্থানে ছিল লাত নামের একটি কুঠরি। কুরায়শরা ওই কুঠরিটির পূজা করিত। মুজাহিদ বলিয়াছেন, উয্যা ছিল গাতাফান গোত্রের আবাসভূমিতে অবস্থিত একটি বৃক্ষের নাম। গাতাফানীরা ওই বৃক্ষের পূজা করিত। ইব্ন ইসহাক বলিয়াছেন, নাখলার একটি কুঠুরির নাম ছিল উয্যা। কুঠুরিটি রক্ষণাবেক্ষণ করিত বনী শায়বানের লোকেরা। শায়বানীরা ছিল কুরায়শদের সহিত সন্ধিবদ্ধ। কুরায়শ ও বনী কিনানাদের ইহাই ছিল সর্ববৃহৎ মূর্তি। আমর ইব্ন লুহাই বনী কিনানা ও কুরায়শদেরকে বলিয়াছিল, তোমাদের প্রভু শীতকালে তায়েফে আসিয়া লাতের সহিত এবং গ্রীষ্মকালে উয্যার সহিত কাল যাপন করে। লোকেরা তাই প্রতিমা দুইটিকেই সম্মান করিত এবং প্রতিমা দুইটির জন্য তাহারা কক্ষ নির্মাণ করিয়াছিল। সেই কালে কা'বা গৃহের উদ্দেশ্যে যেমন কুরবানীর পশু প্রেরণ করা হইত, তেমনি তাহারা কুরবানীর পশু প্রেরণ করিত ওই প্রতিমা দুইটির জন্যও (তাফসীর মাযহারী, ৯খ., পৃ. ১১৬)।

হযরত আবুত তুফায়ল (রা) সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে গাতাফান জনপদে পাঠাইলেন। তিনি সেইখানে পৌঁছিয়া সেখানকার বাবলা বৃক্ষগুলিকে কাটিয়া ফেলিলেন এবং উয্যা প্রতিমাটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, তাহার পর রাসূলুল্লাহ (স) সকাশে ফিরিয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেইখানে তুমি কি কিছু দেখিতে পাইয়াছ? খালিদ (রা) বলিলেন, না। তিনি বলিলেন, তবে তো তুমি কিছুই ভাঙ্গিতে পার নাই। খালিদ (রা) পুনরায় সেইখানে গেলেন। দেখিলেন, প্রতিমা রক্ষণাবেক্ষণকারীরা সেখানে জড়ো হইয়া কি যেন শলাপরামর্শ করিতেছে। খালিদ (রা)-কে দেখিয়া তাহারা পাহাড়ের দিকে পালাইয়া গেল। তাহারা চিৎকার দিয়া বলিতে লাগিল, ওহে উয্যা! ওকে ধর, হত্যা কর, নচেৎ অপদস্থ হইয়া মরিয়া যাও। তাহাদের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে মাথা ও মুখে ধুলি উড়াইতে উড়াইতে সম্মুখে আগাইয়া আসিল আলুথালু কেশবিশিষ্ট এক বিরাট নারী মূর্তি। খালিদ (রা) অসি উত্তোলন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমি তোমাকে মানি না। তোমাকে পবিত্রও মনে করি না। আমি দেখিতে পাইতেছি, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। এই কথা বলিয়াই তিনি তাহার হাতের অসি দ্বারা ওই কু-দর্শনা নারীকে দুই টুকরা করিয়া ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি সবকিছু খুলিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন, ওইটাই ছিল উয্যা। তোমাদের শহরে উহার উপাসনা আর

হইবে না জানিয়া আজ হইতে সে চির দিনের জন্য নিরাশ হইয়া গেল (তাফসীর মাযহারী, ৯খ., পৃ. ১১৬)।

দাহহাক বর্ণনা করিয়াছেন, উয্যা ছিল বনী গাতাফান জনপদের একটি প্রতিমার নাম। প্রতিমাটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল সা'ঈদ ইব্ন সালেম গাতাফানী নামক এক ব্যক্তি। সে একবার মক্কা শরীফে দেখিতে পাইল, লোকজন সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুইটির মাঝে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। আপন জনপদে ফিরিয়া আসিয়া সে তাহাদের গোত্রের লোকদিগকে বলিল, মক্কাবাসীদের রহিয়াছে সাফা ও মারওয়া। তোমাদের সেই রকম কিছুই নাই। তাহারা একজনের উপাসনা করে। তোমাদের তো কোন উপাস্য নাই। লোকেরা বলিল, তবে আমরা কি করিতে পারি ? সা'ঈদ বলিল, আমিই সবকিছু ঠিকঠাক করিয়া দিব। এই কথা বলিয়া সে সাফা ও মারওয়া পাহাড় হইতে একটি করিয়া পাথর আনিল। কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখিয়া পাথর দুইটি স্থাপন করিল একটি খোলা ময়দানে। সা'ঈদ বলিল, এই দুইটি পাথরই তোমাদের সাফা ও মারওয়া। ইহার পর মধ্যবর্তী এক বৃক্ষের নীচে তিনটি বৃহৎ পাথর সাজাইয়া দিয়া বলিল, আর ইহা হইল তোমাদের প্রভু। তখন হইতে লোকেরা সেইখানে দৌড়াদৌড়ি করিতে শুরু করিল এবং মধ্যবর্তী পাথর তিনটির পূজা করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কা জয় করিলেন, তখন খালিদ (রা)-কে সেখানে প্রেরণ করিয়া তাহাদের সবকিছু ধ্বংস করিয়া দিলেন (তাফসীর মাযহারী, ৯খ., পৃ. ১১৬)।

কাতাদা বলিয়াছেন, মানাত ছিল কাদীদ নামক স্থানে রক্ষিত বনী খুযা'আ গোত্রের একটি বিগ্রহ। 'আইশা (রা) বলিয়াছেন, মানাত ছিল আনসারদের প্রতিমা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আনসাররা মানাতকে সম্মান করিত। আর মানাত ছিল কাদীদের নিকট। ইব্ন যায়দ বলিয়াছেন, মানাত ছিল মুশাল্লাল নামক স্থানের একটি প্রকোষ্ঠ। কা'ব গোত্রের লোকেরা তাহার পূজা-অর্চনা করিত। দাহহাক বলিয়াছেন, বনূ খুযা'আ এবং বনূ হুযায়লের একটি প্রতিমা ছিল। মক্কাবাসীরা তাহার পূজা করিত। কেহ কেহ বলিয়াছেন, "লাত, উয্যা ও মানাত" তিনটি বিগ্রহ মূর্তিই ছিল মক্কার কা'বা প্রাঙ্গণে। মুশরিকরা সেইগুলির পূজা করিত। মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ সালিহী তাঁহার সুবুলুল হুদা পুস্তকে লিখিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে সা'দ ইব্ন যায়দ আশহালীকে মানাত প্রতিমা ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রতিমাটি ছিল মুশাল্লাল পাহাড়ে। আর মুশাল্লাল হইতেছে ওই পাহাড়, যাহা অতিক্রম করিয়া কাদীদ উপত্যকায় যাইতে হয়। মদীনার আওস, খাযরাজ ও গাসসান গোত্রের প্রতিমার নামও ছিল মানাত। একজন পুরোহিতের উপরে ছিল প্রতিমাটির দেখাশোনার ভার। সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) বিশজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সেখানে পৌঁছিলেন। পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি চাও ? সা'দ (রা) বলিলেন, মানাতকে ধ্বংস করিতে চাই। পুরোহিত বলিল, তুমি জান আর সে জানে। সা'দ (রা) পায়ে হাঁটিয়া মানাত প্রতিমাটির দিকে আগাইয়া গেলেন। দেখিলেন কৃষ্ণমুখী বিবস্ত্র এলোকেশী এক কুৎসিত রমণী বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে মৃত্যু কামনা করিতে করিতে আগাইয়া আসিতেছে। সা'দ (রা) তাহার তলোয়ার দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। সাথে সাথে সে ধ্বংস হইয়া গেল (তাফসীর মাযহারী, ৯খ., পৃ. ১১৬-১১৭)।

কিতাবুল আসনাম প্রণেতা ইবনুল কালবী বলিয়াছেন, মক্কার মুশরিকরা তাহাদের পূজনীয় প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ্র কন্যা মনে করিত (তাফসীর মাযহারী, ৯খ., পৃ. ১১৭)।

জারীর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, তুমি কি আমাকে যুল-খালাসা হইতে মুক্তি দিবে না? আমি বলিলাম, হাঁ, অবশ্যই মুক্তি দিব। ইহার পর আমি রওয়ানা দিলাম আহমাস গোত্রের এক শত পঞ্চাশজন সওয়ারী নিয়া। তাহারা সবাই ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। আমি ঘোড়ার পিঠে মজবুতভাবে বসিতে পারিতেছিলাম না। রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই কথা বলিলে তিনি আমার বুকে হাত রাখিলেন। এমনকি আমি নিজের বুকে তাঁহার হাতের স্পর্শ অনুভব করিলাম। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! ইহাকে ঘোড়ার পিঠে মজবুতভাবে কায়েম রাখিও, ইহাকে হেদায়াত দানকারী ও হেদায়াত গ্রহণকারীতে পরিণত করিও। জারীর বলেন, ইহার পর আমি কখনও ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাই নাই। তিনি বলেন, যুল-খালাসা ছিল য়ামানের খাস'আম ও বাজীলা গোত্রের মূর্তিগৃহ। এই গৃহে তাহারা মূর্তিপূজা করিত। ইহাকে কা'বাও বলা হইত। তিনি সেইখানে পৌঁছিয়া ওই গৃহে আগুন লাগাইয়া দিলেন এবং উহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৬২৪)।

য়ামানের একটি কবিলার নাম খাওলান। দশজনের একটি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমরা কবিলার প্রতিনিধি। তাহাদের বিগ্রহের নাম ছিল 'আম্মু আনাস'। রাসূলুল্লাহ (স) জানিতে চাহিলেন, উহার কি করা হইয়াছে? উত্তরে বলা হইল, একজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও তাহাদের সাংগপাংগ ছাড়া আর সকলেই উহা বর্জন করিয়াছে। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া উহা ধ্বংস করিবেন বলিয়া তাহারা মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তাহারা বলিলেন, আমরা এতকাল উহার প্রতারণা জালে আবদ্ধ ছিলাম ও ফেৎনায় ডুবিয়া ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) উহার সর্ববৃহৎ ফেতনা অবগত হইতে চাহিলেন। তাহারা বলিলেন, এক বৎসর অনাবৃষ্টি দেখা দিল। গৃহে যাহা সঞ্চিত ছিল খাইয়া ফেলিলাম, অর্থ যাহা কিছু ছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া এক শত ষাঁড় ক্রয় করিয়া উহার উদ্দেশ্যে কুরবানী করিলাম। আমরা ক্ষুধায় কাতর এবং তাহা ভক্ষণের আবশ্যকতা আমাদেরই অধিক ছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা তাহা স্পর্শ করিলাম না। হিংস্র জন্তুরা তাহাতে তাহাদের উদর পূর্ণ করিল। ঐ মুহূর্তেই মেঘ দেখা দিল ও বারিপাত হইল। আমাদের উক্তিকারী ঘোষণা করিল, "ইহা আম্মু আনাসের অনুগ্রহ"। মাল এবং পশুও উহার জন্য ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। শস্য হইলে মাঠের উৎকৃষ্ট অংশ উহার নামে এবং বাকী অংশ আল্লাহর নামে উৎসর্গীকৃত হইত।" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ .

"আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে তাহারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, ইহা আল্লাহ্র জন্য এবং ইহা আমাদের

দেবতার জন্য। যাহা তাহাদের দেবতাদের অংশ তাহা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায় না এবং যাহা আল্লাহ্র অংশ তাহা তাহাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়; তাহারা যাহা মীমাংসা করে তাহা নিকৃষ্ট।" (৬ ঃ ১৩৬)।

তাহারা বলিলেন, আমরা আম্মু আনাসের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, শয়তানের দলই তোমাদের সহিত কথা বলিত। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে ফরয সংক্রান্ত বিষয়াদি উপদেশ দিলেন। বিদায়ের পূর্বে প্রত্যেকে বিশ উকিয়া রৌপ্য লাভ করিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তল্পীতল্পার বন্ধন মোচন করিবার পূর্বেই তাহারা আম্মু আনাসকে ধ্বংস করিয়া দিলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৮৩; সাইয়্যেদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ১০৬৯-১০৭১)।

যুল-কাফ্ফায়ন দাওস কবিলার একটি কাষ্ঠ বিগ্রহ। তায়েফ অভিযানের পূর্ব মুহূর্তে তাহা ধ্বংস করিবার জন্য একটি সারিয়্যা প্রেরিত হইল। আমীর ছিলেন হযরত তুফায়ল ইবন আমর দাওসী (রা)। কার্যশেষে সৈন্য লইয়া তায়েফে গিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার প্রতি নির্দেশ ছিল। সেইখানে উপস্থিত হইয়া তিনি উক্ত কাষ্ঠমূর্তি ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। তারপর দাওস কবিলার চারি শত—মতান্তরে বার শত লোকসহ তিনি তায়েফে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিলিত হইলেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৫৩)।

'সুওয়া' বিগ্রহের উপাসক ছিল বানূ হুযায়ল। তাহা ধ্বংস করিবার জন্য কতিপয় সাহাবীসহ হযরত আমর (রা) প্রেরিত হইলেন। 'সুওয়া'-এর তত্ত্বাবধায়ক বলিল, তোমরা ইহা ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ সে আত্মরক্ষা করিবে। হযরত আমর (রা) বলিলেন, এখন পর্যন্ত অসত্যকে আকড়াইয়া আছ! উহা কি দেখিতে ও শুনিতে পায়? এই বলিয়া তিনি তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন এবং তত্ত্বাবধায়ককে বলিলেন, মূর্তি পূজার অসারতা কি বুঝিতে পারিলে? সে বলিয়া উঠিল, আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে ইসলাম গ্রহণ করিলাম (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৩৯)।

দানবীর হাতেম তাঈ'র কবিলার নাম তাঈ। তাহাদের বিগ্রহের নাম 'ফুলস' বা 'কালাস' অথবা 'কালিসা'। তাহা ধ্বংস করিবার জন্য হযরত আলী (রা)-কে প্রেরণ করা হইয়াছিল। বাহিনীতে মুজাহিদ ছিলেন এক শত পঞ্চাশজন। তাহাদের বাহন ছিল এক শত উষ্ট্র ও পঞ্চাশটি অশ্ব। তিনি প্রভাতে অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া 'ফুলস' বা 'কালাস' মূর্তি ধ্বংস ও ভস্মীভূত করিলেন (যাদুল মাআদ, ২খ., পৃ. ২০৪)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হুনায়ন হইতে রওয়ানা হইয়া নাখলা, ইয়ামানিয়া, কারণ ও মালীহ হইয়া 'বাহরাৎ-রুগা' আসিয়া পৌঁছেন। ইহা 'লিয়া' এলাকায় অবস্থিত। এইখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই 'লিয়া'য় ছিল মালিক ইব্ন আওফের দুর্গ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে তাহা ধ্বংস করা হয়। তারপর সেইখান হইতে তায়েফে গিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবাগণ কিল্লার পার্শে অবস্থান গ্রহণ করেন।

মাওলানা শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দিহলাভী (র) বলেন, এই অবরোধ চলাকালে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে আশেপাশের ছাকীফ গোত্রীয়দের দেবমন্দিরসমূহ ধ্বংস

করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি কয়েক দিনের মধ্যে সকল দেবমন্দির ও তাহাতে সংস্থাপিত মূর্তিগুলি ধ্বংস করিয়া দেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২৫৫)।

وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ الِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَ سُوَاعًا وَّلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.

"এবং তাহারা বলিয়াছিল, তোমরা কখনও পরিত্যাগ করিও না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাসরকে" (৭১ ঃ ২৩)।

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'বের উক্তি উল্লেখ করিয়া বাগাবী লিখিয়াছেন, তাহাদের উপাস্যগুলি ছিল তাহাদের সজ্জন পিতৃপুরুষদের কাল্পনিক মূর্তি, যাহারা অতীত হইয়াছিল হযরত আদম ও হযরত নূহ (আ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে। শয়তান তাহাদেরকে এইমর্মে প্ররোচণা দিয়াছিল যে, ওই সকল সাধু পুরুষদের বিগ্রহ সম্মুখে রাখিয়া যদি তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাহা হইলে তোমাদের ইবাদত হইবে অত্যধিক গ্রহণীয়। এইভাবে সে সক্ষম হইল পরের প্রজন্মকে আগের প্রজন্মের সাধু পুরুষদের বিগ্রহ মূর্তির অনুরাগী হইতে। এইভাবে বংশানুক্রমিকভাবে চলিতে লাগিল পিতৃ পুরুষদের বিগ্রহ মূর্তির উপাসনা। ঐ মূর্তিগুলিকেই তাহারা বলিত দেব-দেবী (তাফসীরে মাযহারী, ১০খ., পৃ. ৭৬)।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, কিছু সংখ্যক পুণ্যবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ। তাহাদের তিরোধানের পর শয়তান তাহাদেরকে বুঝাইল, তোমাদের উচিৎ তাহারা যেইখানে উপবেশন করিতেন সেইখানে তাহাদের প্রতিমা বানাইয়া তাহাদের পুণ্যময় স্মৃতি রক্ষা করা। তাহাই করিল তাহারা। কিন্তু মূর্তিগুলির আরাধনা তাহারা করিত না। আরাধনা করিত তাহাদের পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা। তাহারা ধরিয়াই নিল যে, সেই মূর্তিগুলিই তাহাদের দেবতা।

তিনি আরও বলিয়াছেন, মহাপ্লাবনে ঐ মূর্তিগুলি জলমগ্ন হইয়াছিল, চাপা পড়িয়াছিল মাটির তলায়। পরে শয়তান সেইগুলিকে মক্কাবাসীদের জন্য পুনরুদ্ধার করে। এইভাবে দূমাতুল জান্দালের কিলাব গোত্রের লোকেরা পূজা করিতে শুরু করে 'ওয়াদ্দা' প্রতিমাটির। সুওয়া'আ হইয়া যায় হুযায়ল গোত্রের দেবতা। 'ইয়াগূছ' প্রথমে পূজিত হয় বনী মুররা গোত্রের লোকদের দ্বারা। পরে তাহার পূজারী হয় বনী আতফেরা। তাহারা প্রতিমাটিকে লইয়া যায় সাবা অঞ্চলে। ইয়া'উকের উপাসনা করিত হামাদান গোত্র এবং বনী হুযায়ল ভক্ত ছিল 'নাসর' প্রতিমার (তাফসীরে মাযহারী, ১০খ., পৃ. ৭৭)।

ইসমাঈল (আ) বংশীয় ও অন্যান্য গোত্রের যাহারা দীনে ইসমাঈলকে বর্জনকালে বিভিন্ন দেবদেবী গ্রহণ করিয়াছিল এবং নিজেদের নামে সেইগুলির নামকরণ করিয়াছিল তাহারা হইল ঃ হুযায়ল ইব্ন মুদরিকা ইব্ন ইলয়াস ইব্ন মুদার-এর বংশধর। ইহারা 'সুওয়া'কে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের দেবমূর্তি রুহাতে ছিল। কুরআন উপগোত্র কালব ইব্ন ওয়াবুরা। তাহারা দূমাতুল জান্দাল অঞ্চলে ওয়াদ্দ দেবমূর্তি স্থাপন করিয়াছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন, কা'ব ইব্ন মালিক আনসারী (রা) তাহার কবিতায় বলিয়াছেন, আমরা লাত, উয্যা, ওয়াদ্দ মূর্তিগুলি ভুলিয়া যাইব এবং সেইগুলির গলার ও কানের গয়নাগুলি

ছিনাইয়া লইব। ইসলামী আমলে ওয়াদ্দ মূর্তির বিনাশ সাধন করা হয় (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৮৪)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বনী তাঈ-এর আন'উম আর বনী মাযহিজ গোত্রের জুরাশবাসীরা জুরাশে 'ইয়াগূছ' মূর্তি স্থাপন করিয়াছিল (আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৮৪)।

ইব্ন ইসহাক আরও বলেন, হাম্মাদানের শাখাগোত্র খাওয়ানরা ইয়ামানের হামাদান এলাকায় ইয়া'উক নামক মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৮৪)।

হিময়ার গোত্রের শাখাগোত্র যুলকিলা হিময়ারী অঞ্চলে 'নাসর' নামক মূর্তি স্থাপন করিয়াছিল। ইসলামী যুগে এই সকল মূর্তির ধ্বংসসাধন করা হয় (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৮৪)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বনূ মিলকাম ইবন কিনানা ইবন খুযায়মা ইবন মুদরিকা ইব্ন ইলয়াস ইব্ন মুদার-এর সা'দ নামক একটি উপাস্য মূর্তি ছিল। উহাছিল তাহাদের এলাকার এক মরু প্রান্তরে বিদ্যমান দীর্ঘ প্রস্তর খণ্ড। এই প্রস্তর খণ্ডটির উপর পশু বলি দেওয়া হইত। ইসলামী যুগে এই সকল মূর্তির ধ্বংসসাধন করা হয় (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৮৫)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, সান'আ এলাকায় রিআম নামে হিময়ারী ও ইয়ামানীদের একটি উপসনালয় ছিল। ঐ ঘরে নানা রকমের বলি দেওয়া হইত। ইসলামী যুগে তাহাও ধসাইয়া দেওয়া হয় (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৯১)।

ইবন ইসহাক আরও বলেন, বনূ রবীআ ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীম-এর 'রুযা' নামক একটি উপাসনালয় ছিল। ইসলামী যুগে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

সেই উপলক্ষে মুসতাওগীর ইব্ন রবী'আ ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ বলেন, 'রুযা' উপাসনালয়ে এমন আঘাত হানিয়াছিলাম যে, তাহা বিরান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে (আস-সীরাতুন- নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৯১)।

যুল-কা'আবাত ও উহার সেবায়েত

ইব্ন ইসহাক বলেন, সানদাদ এলাকায় ওয়াইল ও ইয়াদেব-এর দুই ছেলে বকর ও তাগলিব- এর যুল-কা'আবাত নামে একটি উপাসনালয় ছিল।

এই উপাসনালয় সম্পর্কেই বনূ কায়স ইব্ন ছা'লাবা গোত্রের আ'শা বলেন, 'খাওয়ারনাক', 'সাদীর' ও বারিক নামক এলাকার মাঝে সানদাদ এলাকার চার কোণবিশিষ্ট ঘরের শপথ।

ইব্ন হিশাম বলেন, এই পংক্তিটি আসওয়াদ ইব্ন ইয়া'ফুর আন-নাহশালীর একটি কবিতার অংশ।

আবূ মুহরিয খালাফ আহমার-এর নিকট পংক্তিটি ছিল এইরূপ ঃ তারা খাওয়ারনাক, সাদীর, বারিক ও সিন্দাদ এলাকার সম্মানিত ঘরের মালিক। ইসলামী যুগে এই সকল গৃহের বিনাশ সাধন করা হয় (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৯২)।

ইসাফ ও নাইলা

ইব্ন ইসহাক বলেন, আরবরা যমযম কূপের নিকট ইসাফ ও নাইলা নামক দুইটি মূর্তি স্থাপন করিয়াছিল। সেইখানে তাহারা কুরবানী করিত। আরবদের পৌরণিক কাহিনীমতে ইসাফ ও নাইলা ছিল জুরহুম গোত্রের দুই নারী-পুরুষ। ইসাফ হইল বাগঈ-এর পুত্র আর নাইলা হইল 'দীক'-এর মেয়ে। ইসাফ কা'বা গৃহের ভিতরে নাইলার সহিত অপকর্মে লিপ্ত হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে পাথরে পরিণত করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমরাহ বিনত আবদুর-রাহমান ইব্ন সা'দ ইব্ন যুরারাহ বলিয়াছেন, হযরত আইশা (রা)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি, আমরা তো ইহাই শুনিয়া আসিতেছি যে, ইসাফ ও নাইলা বনূ জুরহুমের একজোড়া নারী-পুরুষ। তাহারা কা'বা শরীফে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে পাথরে রূপান্তরিত করেন। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আবূ তালিব বলিয়াছেন, ইসাফ ও নাইলা নিকটস্থ জলস্রোত প্রবাহিত হওয়ার স্থানে অবস্থিত, যেখানে আশআরী সম্প্রদায় নিজেদের উট বসায়। ইসলামী যুগে সকল মূর্তি ও অপরীতির বিনাশ সাধন করা হয় (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৮৭)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আরবদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়িতে একটি করিয়া মূর্তি স্থাপন করিত এবং তাহার পূজা-অর্চনা করিত। তাহারা যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করিত তখন তাহারা বাহনে আরোহণ করার সময় মূর্তিটি স্পর্শ করিত। সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ইহাই ছিল তাহাদের শেষ কাজ। ফিরিয়া আসিয়াও ঘরে প্রবেশের পূর্বে ইহাই ছিল তাহাদের প্রথম কাজ। অতঃপর আল্লাহ যখন তাঁহার রাসূল মুহাম্মাদ (স)-কে তাওহীদসহ প্রেরণ করিলেন, তখন কুরায়শরা বলাবলি করিত—

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

"সে কি বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানাইয়া লইয়াছে? ইহা তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার" (৩৮ : ৫)।

আবরবরা কা'বা শরীফের পাশাপাশি কয়েকটি 'তাগূত' তথা মূর্তিঘর স্থাপন করিয়া এইগুলিকে তাহারা কা'বা শরীফের মতো সম্মান করিত। এইগুলির সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিত। কা'বা শরীফের ন্যায় সেই গুলিরও তাওয়াফ করিত এবং সেখানেও পশু বলি দিত। অবশ্য সেগুলির উপর কা'বার শ্রেষ্ঠত্ব তাহারা স্বীকার করিত। কেননা তাহারা জানিত যে, কা'বা শরীফ হইতেছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নির্মিত ঘর এবং তাঁহার মসজিদ (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৮৮)।

বর্ণিত রহিয়াছে, বনী আসরারের এক প্রতিমার ভিতর হইতে লোকেরা অদ্ভুত কথাবার্তা শুনিতে পাইত। অতঃপর সমল ইব্ন আমর আমরা গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। প্রতিমার মুখে তাহারা যাহা শুনিয়া ছিল তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, সেই প্রতিমায় একটি জিন

ছিল। সে বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ করিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সে (উক্ত জিন) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, ঐ প্রতিমা হইতে আর কোন অওয়াজ হইবে না (খাসাইসুল-কুবরা, ২খ., পৃ. ২৪)।

আবূ নু'আয়মের বর্ণনায় রাশিদ ইব্ন আবদে রববিহি বলেন, বনূ যুফার নৈবেদ্য দিয়া আমাকে 'সুওয়া'র নিকট প্রেরণ করেন। আমি 'সুওয়া'র পূর্বে আরও একটি প্রতিমার নিকট পৌঁছিলাম। আমি উহার পেট হইতে অদ্ভুত আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মূর্তির পেট হইতেও অনুরূপ আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। মক্কা বিজয়ের পর এই সকল মূর্তির বিনাশ সাধন করা হয় (খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ইফাবা, ১৯শ মুদ্রণ ১৯৯৭ খৃ.; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, আসাহহুল মাতাবি, দেওবন্দ ১৯৮৫ খৃ.; কিতাবুল মাগাযী, ২খ.; (৩) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ১খ.-৪খ.; (৪) কাযী ছানাউল্লাহ পানি-পত্তী, আত-তাফসীরুল মাযহারী, মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা ১২২৫ হি., ১০খ.; (৫) আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহ. (র), অনু. মুফতি গোলাম মঈনউদ্দিন, দিল্লী ১৯৯২ খৃ., ১খ.; (৬) আবদুল খালেক এম. এ., সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইফাবা, ২খ.; (৭) যাইনুল আবেদীন রাহনুমা, অনু., আবু জাফর, ওয়াদুদ পাবলিকেশ, ঢাকা ১৯৮৪ খৃ.; (৮) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, কুতুবখানা মাহমুদীয়া, দেওবন্দ ১৩৫১/১৯৩২; (৯) হিশাম ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাইব আল-কালবী, কিতাবুল আসনাম, ৭১৯ হি.; (১০) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ. ও ২খ., ইফাবা; (১১) মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), মা'আরেফুল-কুরআন, ৮খ., ২০৮, ইদারাতুল মা'আরিফ, করাচী, ১৩৯৪ হি.; (১২) শিবলী নো'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী, দারুল ইশাআত, উরদু বাজার, করাচী, ১ খ., পৃ. ৩০৪, ১৯৮৫ খৃ.; (১৩) হাফিজ ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ২খ., দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.; (১৪) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল-কুবরা, দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

মহানবী (স) ও গায়বী জ্ঞান

কুরআন মজীদের শুরুতেই গায়ব-এর প্রতি ঈমান আনার আহবান জানানো হইয়াছে (দ্র. ২ ঃ ৩)। শব্দটির আভিধানিক অর্থ ঃ অনুপস্থিত, অদৃশ্য, দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে, গোপন বিষয়। কুরআন মজীদে প্রধানত এসব অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কুরআন মজীদের মোট ৪৯ স্থানে শব্দটি মা'রিফা (নির্দিষ্টবাচক) হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, নাকিরা (অনির্দিষ্টবাচক) হিসাবে কোথায়ও ব্যবহৃত হয় নাই, শুধু এক স্থানে সর্বনামসহ (গায়বিহি) ব্যবহৃত হইয়াছে (৭২ ঃ ২৬)।

'আলিমুল গায়ব' বা 'আল্লামুল গুয়ূব' আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক বৈশিষ্ট্য। কুরআন মজীদে গায়ব (অদৃশ্য)-এ ঈমান আনার প্রতি যে আহ্বান জানানো হইয়াছে, আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ সর্বাবস্থায় মানবীয় দৃষ্টিসীমার বাহিরে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ·

"দৃষ্টিসমূহ তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি" (৬ ঃ ১০৩)।

কুরআন মজীদের সর্বত্র বলা হইয়াছে যে, গায়ব-এর জ্ঞান আল্লাহ্র নিকট সীমাবদ্ধ। মানুষকে এই জ্ঞানের ধারক বানানো হয় নাই।

قُلْ لاَيَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ الاَّ اللّٰهُ ·

"বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না" (২৭ ঃ ৬৫)।

فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ ·

"অতএব বল, অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই আছে" (১০ ঃ ২০; আরও দ্র. ১১ ঃ ১২৩; ১৬ ঃ ৭৭; ১৮ ঃ ২৬; ৪৯ ঃ ১৮ ইত্যাদি)।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا الاَّ هُوَ ·

"অদৃশ্যের চাবি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অপর কেহ তাহা জানে না" (৬ ঃ ৫৯)।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ·

"অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে অবহিত করার নহেন" (৩ ঃ ১৭৯)।

অতএব আল্লাহ তা'আলার গায়বী জগত সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নাই। মানুষ হিসাবে নবী-রাসূলগণেরও গায়বী জগত সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। এই সত্যটি মহান আল্লাহ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে প্রকাশ্যে ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়াছেন যে, তিনি গায়ব সম্পর্কে অবহিত নহেন।

قُلْ لاَ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ ٠

"বল, আমি তোমাদেরকে ইহা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার আছে এবং গায়ব (অদৃশ্য) সম্পর্কেও আমি অবহিত নহি" (৬ ঃ ৫০; আরও দ্র. ১১ ঃ ৩১)।

وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ ٠

"আমি যদি গায়ব (অদৃশ্যের খবর) জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না" (৭ ঃ ১৮৮)।

উপরিউক্ত দুইটি আয়াত হইতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) গায়ব জানিতেন না। তাঁহার নিকট কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে লোকজন ইহা জিজ্ঞাসা করিত। কারণ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় কাল ও দিনক্ষণ একটি গায়বী বিষয়, যাহার জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত কাহারও নাই। কুরআনের ভাষায় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لاَيُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ ٠

"তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে উহা কখন ঘটিবে। বল, এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে উহা প্রকাশ করিবেন" (৭ ঃ ১৮৭)।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ٠ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ٠ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ٠

"তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে, উহা কখন ঘটিবে? উহার আলোচনার সহিত তোমার কি সম্পর্ক! উহার পরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট" (৭৯ ঃ ৪২-৪৪)।

উপরিউক্ত আয়াত কয়টি হইতে আরও স্পষ্ট হইয়া গেল যে, গায়ব (অদৃশ্য বিষয়) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স) অবহিত ছিলেন না। তবে নবূওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব অত্যন্ত ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এই দায়িত্ব পালন করিতে নবী-রাসূলগণের ব্যাপক ও বিচিত্রমুখী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন ছিল। যেহেতু তাঁহারা মানবজাতির নিকট আল্লাহ্র প্রতিনিধি, তাই উপরিউক্ত দায়িত্ব পালনে তাহাদের অপরিমিত যোগ্যতা, সাহস ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে মাঝে-মধ্যে তাঁহার গায়বী রাজত্ব পরিভ্রমণ করান এবং নবূওয়াতী দায়িত্ব পালনে যতখানি প্রয়োজন গায়ব সম্পর্কিত জ্ঞান তাহাদেরকে দান করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ٠

"এইভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করাই, যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়" (৬ ঃ ৭৫)।

মহানবী (স)-এর মি'রাজে গমনের ঘটনাও একই উদ্দেশ্যে ঘটিয়াছিল। নবী-রাসূলগণকে কোন গায়বী বিষয়ের জ্ঞান বা সংবাদ প্রদানের বিষয়টি কুরআন মজীদ কর্তৃক স্বীকৃত।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ ٠

"গায়ব (অদৃশ্য) সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে অবহিত করিবার নহেন, তবে আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন" (৩ ঃ ১৭৯)।

এই গায়বী খবর নবী-রাসূলগণের নিকট পৌঁছাইবার সময় চতুর্দিক হইতে কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। যেমন কুরআন মজীদে উক্ত হইয়াছে ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا ٠ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ٠

"তিনি গায়বের (অদৃশ্যের) পরিজ্ঞাতা। তিনি তাঁহার গায়বী জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না তাঁহার মনোনীত রাসূলগণ ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন" (৭২ ঃ ২৬-২৭)।

সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ ছিল লাওহে মাহ্ফূজে সংরক্ষিত গায়বী জ্ঞান। ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞান রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছাইতে ঊর্ধ্ব জগত হইতে পৃথিবী পর্যন্ত কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। এইদিকে সূরা জিন্ন-এর নিম্নোক্ত আয়াতে ইংগিত রহিয়াছে ঃ

وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ٠

"আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম। কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে নিজের উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়" (৭২ ঃ ৯)।

অর্থাৎ কুরআন মজীদ নাযিল হওয়াকালে ৭২ ঃ ২৬-২৭ আয়াতে উক্ত প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে জিনেরা যেরূপ স্বাধীনভাবে ঊর্ধ্বজগতে যাতায়াত করিতে পারিত, কুরআন মজীদ নাযিল হওয়াকালে তাহাদের জন্য সেই সুবিধা আর থাকে নাই। তখন ঊর্ধ্ব জগতে আরোহণ করিতে গেলেই তাহারা জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের আঘাতসহ বিভিন্ন রকম বাধার সম্মুখীন হইত। এইসব নূতন কড়াকড়ি কেন করা হইতেছে তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইয়া একদল জিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত লাভ করে তাঁহার কুরআন পাঠরত অবস্থায়। কুরআনের পাঠ তাহাদের নিকট আশ্চর্যজনক মনে হয় এবং ইহাতে তাহারা অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, কুরআন নাযিল হওয়ার কারণেই ঊর্ধ্বজগতে উক্তরূপ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লক্ষণীয় যে, গায়বী বিষয় জানাইয়া দেওয়ার পর তাহার আর গায়বী বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে না। উহা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে। যেমন কুরআন মজীদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার পর উহা আর গায়বী বিষয় নহে। অথচ তাঁহার নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উহা ছিল সম্পূর্ণ গায়বী বিষয় যাহার জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও নিকট ছিল না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (স) এই অর্থে গায়ব জানিতেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে কোন গায়বী বিষয় অবগত করাইবার পর যতক্ষণ তিনি তাহা জনসমক্ষে প্রকাশ না করিতেন ততক্ষণ উহা তাহাদের ক্ষেত্রে গায়বী বিষয় কিন্তু তাঁহার জন্য গায়বী বিষয় নয়। রাসূলুল্লাহ (স) যেসব বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন সেইগুলিও গায়েবী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাহা বিভিন্ন মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁহাকে অবগত করিয়াছেন।

হযরত মূসা (আ) এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বিশেষ জ্ঞান লাভকারী বান্দার মধ্যকার সাক্ষাতকার, কথোপকথন ও ঘটনাবলী ছিল সম্পূর্ণ গায়বী বিষয়, বিশেষত মূসা (আ)-এর জন্য। সেই বান্দা একটি নৌযানের তলা ছিদ্র করিয়া দিলে, একটি বালককে হত্যা করিলে এবং একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর সুদৃঢ় করিয়া দিলে মূসা (আ) তাঁহার এসব কাজে আপত্তি জানান। সেই বান্দা এসব ঘটনার পিছনে যে গায়বী রহস্য বিদ্যমান ছিল তাহা জানাইয়া দিলে মূসা (আ) শান্ত হন (দ্র. ১৭ ঃ ৬০-৮২)। ঘটনাসমূহের রহস্যাবলী মূসা (আ)-কে অবহিত করার পর উহা আর গায়বী বৈশিষ্ট্যযুক্ত থাকে নাই।

এই জড় জগতের বাহিরে বা জড় জগত ছাড়াও যে অজড় বা গায়বী জগত আছে তাহা মানুষের বিশ্বাস বা বোধের আওতায় আনয়নের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সামনে অনেক নিদর্শন রাখিয়াছেন। যেমন মানবাত্মা যাহার সাহায্যে মানুষ একটি ক্রিয়াশীল শক্তি। বাতাস যাহা না হইলে সে মুহূর্তকালও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সে উহা অনুভব করিতেছে, অথচ দেখিতে ও স্পর্শ করিতে পাইতেছে না। কি বৈচিত্র্যময় এই গায়ব! দৃশ্যমান, স্পর্শযোগ ও ব্যবহারযোগ্য পানি তাহার চোখের সম্মুখে বাষ্পে পরিণত হইয়া উধাও হইয়া যাইতেছে। এই সবই হইল গায়ব-এর নিদর্শন। দাউ দাউ করিয়া জ্বলন্ত দৃশ্যমান আগুনের কুণ্ডলী মুহূর্তে কোথায় বিলীন হইয়া যায়।

"গায়েব একটি বই
পাতাগুলো যার বন্ধ করা,
তাকে রেখেছেন রব্বুল 'আলামীন
সৃষ্টির দৃষ্টির অন্তরালে"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে। বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী নিবন্ধে দ্র.।

মুহাম্মদ মূসা

মহানবী (স)-এর অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান ও ভবিষ্যদ্বাণী

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অদৃশ্য বিষয়ে অবহিত হওয়া অন্য প্রকৃতির এক বিশেষ মু'জিযা। অদৃশ্য বিষয় ও ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি অনেক তথ্য প্রদান করিয়াছেন। যেমন মুনাফিকদের গোপন ষড়যন্ত্রের সংবাদ, জান্নাত, জাহান্নাম, উম্মতের পরবর্তী কালের অবস্থা, কিয়ামতের আলামত, দাজ্জাল, ইয়াজূজ-মাজূজ এবং সেই সময় সংঘটিতব্য অনেক বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। মূলত অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান ('ইলমুল গায়ব) একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ .

"অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই আছে"(১০ ঃ ২০)।

لاَ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ .

"আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নই" (৬ ঃ ৫০)।

এই সম্পর্কে নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَ اَعْلَمُ اِلاَّ مَا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ .

"আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিজ হইতে কিছু জানি না, যাহা আমার প্রভু আমাকে জানাইয়াছেন তাহা ব্যতীত"।

এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নবী করীম (স)-এর অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার দান। তাঁহার অদৃশ্য জ্ঞানের বিষয়টি সর্বজন বিদিত।

নবী করীম (স)-এর অদৃশ্য জ্ঞান ছিল দুই ধরনের। এক প্রকার হইতেছে ওহী মাতলূ অর্থাৎ কুরআনুল কারীম। এই কুরআনুল কারীমের মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ (স) অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিষয়ে কুরআনুল কারীমে বেশ কিছু আয়াত রহিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে 'ওহী গায়র মাতলূ' অর্থাৎ হাদীছ শরীফ। অনেক হাদীছে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ রহিয়াছে।

'ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান এমন বিষয় যাহা মানুষ চোখ, কান, নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারে না, সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিধিতেও আসে না। যেমন ফেরেশতা, জিন্ন, জান্নাত, জাহান্নাম, শয়তান ইত্যাদি আমাদের নিকট অদৃশ্য। কেননা এইগুলি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় না।

অদৃশ্য জ্ঞানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (এক) যাহা কুরআন ও হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণ করা যায়। যেমন জান্নাত, জাহান্নাম, জিন, ফেরেশতা। (দুই) যাহা যুক্তি বা দলীল দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। যেমন মানুষ কখন মৃত্যুবরণ করিবে, সে হতভাগ্য না ভাগ্যবান হইবে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে ইত্যাদি।

(ক) আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবেই জ্ঞানী। তিনি অবগত না করাইলে একটি অক্ষরও কেহ জানিতে পারে না; (খ) আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স) ও অন্যান্য আম্বিয়া কিরামকে অদৃশ্য বিষয়ের বেশ কিছু জ্ঞান দান করিয়াছেন; (গ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকুল হইতে বেশি। এই তিনটি বিষয় ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা পঞ্চ অদৃশ্যের অনেক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সুবিস্তৃত জ্ঞান দান করিয়াছেন। এই পঞ্চ অদৃশ্য সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَّمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে; তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামী কাল সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত" (৩১ ঃ ৩৪)।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু হইতেছে পাঁচটি যাহা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ জানে না। ঐ পাঁচটি বিষয় হইতেছে– (১) কখন সংঘটিত হইবে কিয়ামত; (২) কোথায় কখন বৃষ্টিপাত হইবে, কী পরিমাণে হইবে; (৩) নারীর গর্ভাশয়ে কোন আকৃতি বা প্রকৃতির সন্তান রহিয়াছে; (৪) আগামী দিবসে সে কী উপার্জন করিবে, (৫) কাহার মৃত্যু কোন স্থানে ও কখন হইবে। এইগুলি জানেন কেবল আল্লাহ তা'আলা। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। হাদীছেও অনুরূপ বর্ণনা আছে (তাফসীরে মাযহারী, ৭খ., পৃ. ২৬৪; বুখারী, কিতাবুত-তাফসীর, সূরা লুকমান, ২খ., পৃ. ৭০৪)।

অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ .

"অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ অবহিত করিবার নহেন, তবে আল্লাহ তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন" (৩ ঃ ১৭৯)।

অদৃশ্য জ্ঞান জানানোর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। তবে তিনি তাঁহার নবীদের মধ্য হইতে কাহাকেও অদৃশ্য বিষয়ে অবগত করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-কে মুনাফিকদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও আরও অনেক বিষয়ে অবগত করাইয়াছিলেন। এই বিষয়ে সূরা জিন-এর আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য।

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا ۔ اِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ ۔

"তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত" (৭২ ঃ ২৬-২৭)।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ ۔

"অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না" (৬ ঃ ৫৯)।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوْا لاَ عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ۔

"স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ রসূলগণকে একত্র করিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তোমরা কি সাড়া পাইয়াছিলে?' তাহারা বলিবে, 'আমাদিগের তো কোন জ্ঞান নাই; তুমিই তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাতা" (৫ ঃ ১০৯)।

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ۔

"বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না" (২৭ ঃ ৬৫)।

এইখানে 'মান ফীস সামাওয়াতি' আকাশমণ্ডলীর কেহ এবং 'মান ফীল আরদ' পৃথিবীর কেহ বলিয়া বুঝানো হইয়াছে যথাক্রমে ফেরেশতামণ্ডলীকে এবং জিন ও মানুষকে। এইভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াইয়াছে—হে আমার প্রিয় রাসূল! আপনি মানুষকে জানাইয়া দিন, ফেরেশতা, জিন, মানুষ কেহই জানে না অদৃশ্যের সংবাদ। এই বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান সংরক্ষণকারী কেবল আল্লাহ। কারণ তিনিই একমাত্র 'আলিমুল গায়ব'=অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। উল্লেখ্য, আল্লাহ পাক দয়া করিয়া তাঁহার প্রিয়ভাজন নবী-রাসূলগণকে কোন কোন অদৃশ্যের সংবাদ জানান। তাই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রাপ্ত হিসাবে তাহারা অদৃশ্যের সংবাদ জানেন, এই কথা বলিতে কোন দোষ নাই। কিন্তু সাথে সাথে এই বিশ্বাসটিও রাখিতে হইবে যে, তাহাদের কেহই সত্তাগতভাবে 'আলিমুল গায়ব'= অদৃশ্যের সংবাদদাতা নন (তাফসীরে মাযহারী,৭খ., পৃ. ১২৮)।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۔

"ইহা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ—যাহা আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি" (৩ ঃ ৪৪)।

জ্ঞান অর্জিত হয় দেখিয়া, শুনিয়া বা পুস্তক পাঠের মাধ্যমে। কিন্তু এইসব মাধ্যম ব্যতিরেকে রাসূলুল্লাহ (স) জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁহার সেই বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়াছেন। যেমন তাঁহার সময় ও মরিয়ম (আ)-এর সময়ের ব্যবধান প্রায় পাঁচ শত বৎসর। পাঁচ শত বৎসর পূর্বের মরিয়মের অভিভাবকত্ব নিয়া বাদানুবাদের সংবাদ, লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সংবাদ, নদীর পানিতে কলম নিক্ষেপের

সংবাদের বর্ণনা তিনি দিয়াছিলেন। অতীতের এই সকল ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন ওহীর মাধ্যমে (তাফসীর মাযহারী, ২খ., পৃ. ৪৮, ৪৯)।

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ .

"সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে" (৮১ ঃ ২৪)।

আল্লাহ বলেন, আমার সর্বশেষ রাসূল এমন নহেন যে, তিনি আমার পক্ষ হইতে নাযিলকৃত ওহীর কোন অংশ প্রকাশ করিবেন এবং কোন অংশ গোপন করিবেন। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সকল বাণী যথাযথভাবে পৌঁছাইয়াছেন (তাফসীরে মাযহারী, ১০খ., পৃ. ২১১)।

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا .

"এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি, যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানিত না" (১১ ঃ ৪৯)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী বলেন, হে আমার প্রিয় রাসূল! এতক্ষণ ধরিয়া অদৃশ্যলোক হইতে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সুদূর অতীতের নূহ নবী ও তাঁহার সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আপনাকে জানাইলাম। এই সকল ঘটনা আপনি ও আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আগে কখনও শুনে নাই। তাই বিগত যুগের আসমানী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন ব্যতিরেকেই আপনাকে এই সকল তথ্য জানানো হইল। আর আপনার মাধ্যমে জানানো হইল আপনার সমসাময়িক ও ভবিষ্যতের সকল পাঠক ও শ্রোতাকে (তাফসীরে মাযহারী, ৫ খ., পৃ. ৯৩)।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ .

"ইহা অদৃশ্যলোকের সংবাদ—যাহা তোমাকে আমি ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি। ষড়যন্ত্র করাকালে যখন উহারা মতৈক্যে পৌঁছিয়াছিল তখন তুমি উহাদের নিকট ছিলে না" (১২ ঃ ১০২)।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হইতেছে, হে রাসূল! এতক্ষণ ধরিয়া প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি আপনাকে জানাইলাম নবী ইউসুফের জীবন-বৃত্তান্ত। সুদূর অতীতে ইউসুফের বিরুদ্ধে তাঁহার ভাইয়েরা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল সেই সময় এবং এই কাহিনীতে বিবৃত অন্যান্য ঘটনার সময় আপনি সেখানে ছিলেন না। কাহারও নিকট হইতে এই ইতিবৃত্তের আনুপূর্বিক বিবরণ জানিবার কোন সুযোগও আপনার ছিল না। তাই এই কাহিনী আপনাকে জানানো হইল ওহীর মাধ্যমে।

مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ .

"কে সে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না" (২ ঃ ২৫৫)।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাহাদেরকে তাঁহার জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করান, তাহারা হইলেন নবী ও রাসূলগণ যাহাতে তাহাদের অদৃশ্য জ্ঞান নবূওয়াতের দলীলরূপে পরিগণিত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا . اِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ .

"তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত" (৭২ ঃ ২৬-২৭)।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى .

"অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করিবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হইবে" (৯৩ ঃ ৫)।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে কি কি সাফল্যের অধিকারী করা হইবে, তাহা তাহাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হইয়াছিল (তাফসীরে মাযহারী, ১খ., পৃ. ২৮৩)।

অনুরূপভাবে কিয়ামতে যাহা ঘটিবে তাহাও কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। মহানবী (স) ভবিষ্যতের এই সকল বিষয়ে অবহিত হন ও বাস্তব সত্য হিসাবে তাঁহার নিকট সেইগুলি প্রতিভাত হয়। সেইগুলির কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হইল। আল-কুরআনুল করীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ . يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَاهُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ .

"হে মানুষ ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, কিয়ামতের কম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার! যে দিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে; মানুষকে দেখিবে নেশাগ্রস্ত সদৃশ, যদিও উহারা নেশাগ্রস্ত নহে। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন" (২২ ঃ ১-২)।

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ .

"এমনকি যখন ইয়া'জূজ ও মা'জূজকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং উহারা প্রতি উচ্চভূমি হইতে ছুটিয়া আসিবে" (২১ ঃ ৯৬)।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ . وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ . سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ .

"যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া অন্য পৃথিবী হইবে এবং আকাশমণ্ডলীও; এবং মানুষ উপস্থিত হইবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে–যিনি এক পরাক্রমশালী। সেই দিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখিবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়, উহাদের জামা হইবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করিবে উহাদের মুখমণ্ডল" (১৪ ঃ ৪৮-৫০)।

'ইকরিমা বলিয়াছেন, এই পৃথিবী নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে, সৃষ্টি করা হইবে নূতন পৃথিবী। এই পৃথিবীর সকল মানুষকে স্থানান্তরিত করা হইবে ওই পৃথিবীতে। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আসিয়াছে, হযরত সাহ্‌ল (রা) বলিয়াছেন, মহাবিচার দিবসে ধূসর বর্ণের এক নূতন পৃথিবীতে সকল মানুষকে একত্র করা হইবে। পিষ্ট আটার মত বর্ণবিশিষ্ট ওই পৃথিবী হইবে সমতল। সেখানে বাড়ি-ঘরের কোন চিহ্ন থাকিবে না। বায়হাকী ও সুদ্দীর বর্ণনায় আসিয়াছে, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, এই পৃথিবীকে পরিবর্তন করা হইবে, মুছিয়া ফেলা হইবে পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, উপত্যকা ও তরুলতাসমূহ। টানিয়া প্রস্তুত করা হইবে পৃথিবীকে। তারপর ওই পৃথিবী হইবে শুভ্র অভ্রের মত উজ্জ্বল, যাহার উপরে কোন রক্তপাত অথবা অপরাধ সংঘটিত হয় নাই। আর তখন বিলীন করিয়া দেওয়া হইবে আকাশের চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ (তাফসীরে মাযহারী, ৫খ., পৃ. ২৮৩, ২৮৪)।

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ . فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ .

"যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেই দিন হইবে এক সংকটের দিন" (৭৪ ঃ ৮-৯)।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا . يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا . وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا . وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا .

"নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস; সেই দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে। আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে, ফলে উহা হইবে বহু দ্বারবিশিষ্ট। আর চলমান করা হইবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেইগুলি হইয়া যাইবে মরীচিকা" (৭৮ ঃ ১৭, ১৮, ১৯, ২০)।

এই সকল বিষয় অদৃশ্য, আল্লাহ তা'আলা না জানাইয়া দিলে অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। মহান আল্লাহ মহানবী (স)-এর মাধ্যমে এই সকল অদৃশ্য বিষয় মানুষকে জানাইয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা হইতে প্রাপ্ত।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দ্বিতীয় প্রকার অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় হাদীছ শরীফে। অদৃশ্যের সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত হাদীছসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হইল।

হযরত 'আলী (রা) বলেন, নবী করীম (স) মিকদাদ, যুবায়র ও আমাকে 'রাওদায়ে খাখ' নামক স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়া বলিলেন, সেখানে পৌঁছিয়া তোমরা উষ্ট্রারোহী এক নারীর সাক্ষাত পাইবে। তাহার নিকট একটি পত্র রহিয়াছে। পত্রটি তাহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবে। তাহাকে যথাস্থানে পাইয়া বলিলাম, পত্রটি বাহির করিয়া দাও। সে বলিল, আমার নিকট কোন পত্র নাই। আমরা বলিলাম, শীঘ্র পত্রটি বাহির করিয়া দাও। নচেত তোমাকে উলঙ্গ করিয়া তল্লাশী করা হইবে। সে ভয় পাইয়া তাহার খোপার ভিতর হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল, মতান্তরে কোমর বন্ধনী হইতে।

হাতিব ইবন আবী বালতা'আ (রা) পত্রটি মক্কাবাসী কতিপয় মুশরিরের নামে লিখিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) হাতিবের নিকট কৈফিয়ত চাহিলেন। হাতিব বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দয়া করিয়া আমার ব্যাপারে তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না। আমি কুরায়শদের কেহ নহি। অন্যান্য মুহাজিরদের কোন না কোন পর্যায়ে কুরায়শদের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রহিয়াছে। কেবল আমারই কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই (আমার পরিবার মক্কা শরীফে রহিয়াছে)। আমি শুধু এই বিশ্বাসে পত্র লিখিয়াছিলাম যে, ইহাতে মুসলমানদের কোন ক্ষতি হইবে না। আর আমি কুরায়শদের প্রতি সহানভূতি দেখাইয়া নিজের পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তা বিধান করিতে পারিব। ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুফরের প্রতি সন্তুষ্টির ভিত্তিতে আমি ইহা করি নাই। আমি এখনও ইসলামের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত।

মহানবী (স) তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, হাতিব সত্য কথা বলিয়াছে। হযরত 'উমার (রা) আবেদন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান কাটিয়া দেই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদ। আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি' (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব ফাতহ মাক্কা, ২খ., পৃ. ৬১২)।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, লোকেরা নবী করীম (স)-এর নিকট প্রশ্ন করিত, এমনকি প্রশ্ন করিতে করিতে তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (স) মিম্বারে আরোহণ করিয়া বলিলেন, তোমরা আজ আমাকে যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করিতে পার, আমি উত্তর প্রদান করিব। হযরত আনাস (রা) বলিলেন, আমি ডাইনে বামে তাকাইতেছিলাম। দেখিতে পাইলাম, সকলেই আপন আপন বস্ত্র দ্বারা মাথা ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। সেই সময় এমন এক ব্যক্তি যাহাকে বাক-বিতণ্ডার সময় অন্য ব্যক্তির সন্তান বলিয়া সম্বোধন করা হইত, সে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা কে? তিনি বলিলেন, হুযায়ফা। ইহার পর 'উমার (রা)

বলিলেন, আমরা আল্লাহ্‌কে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল হিসাবে পাইয়া পরিতুষ্ট। ফিতনার অনিষ্টতা হইতে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। ইহার পর নবী করীম (স) বলিলেন, আজিকার মত এত উত্তম বস্তু এবং এত ভয়ংকর বস্তু আমি ইতোপূর্বে কখনও প্রত্যেক্ষ করি নাই। আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হইয়াছিল, এমনকি সেই দুইটি আমি দেওয়ালের পাশেই দেখিতে পাইতেছিলাম (বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব ফিতনা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা, ২খ., পৃ. ১০৫০)।

ইমাম মুসলিম (র) আবূ যায়দ হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে ফজরের সালাত পড়াইলেন। অতঃপর তিনি মিম্বারে আরোহণ করিয়া যুহর পর্যন্ত খুতবা দিলেন। মিম্বার হইতে নামিয়া তিনি যুহরের সালাত আদায় করিলেন। ইহার পর আবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত খুতবা দিলেন। এই সুদীর্ঘ খুতবায় তিনি অতীত ঘটনাবলী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়াবলীর বর্ণনা দিলেন। যে অধিক মনে রাখিতে পারিয়াছে সে অধিক জ্ঞানী (আল-খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১০৮)।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে উন্মুক্ত করিয়া আমার সামনে উপস্থিত করিলেন। তখন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিবে উহার সব কিছুই এমনভাবে জ্ঞাত হইলাম যেমনভাবে আমি আমার হাতের তালুকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। পূর্বেকার নবীগণের অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (স)-এর সামনে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা উদঘাটিত করিয়া দিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১০৯)।

সামুরা ইবন জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন, সূর্যগ্রহণ হইল। নবী করীম (স) সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি সালাতে তোমাদের সেই সকল বিষয় প্রত্যেক্ষ করিয়াছি, ভবিষ্যতে তোমরা যেইগুলির সম্মুখীন হইবে (প্রাগুক্ত, ২ খ., পৃ. ১০৯)।

হযরত হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন খুতবা প্রদান করিলেন। উহাতে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল কিছুই জানাইয়া দিলেন। ঐ সকল বিষয় কাহারও কাহারও স্মরণে আছে, আবার কেহ কেহ ভুলিয়া গিয়াছেন। ভুলিয়া যাওয়া বিষয়গুলি এইরকম যে, বাহ্যিকভাবে আমরা কোন কোন ব্যাপার ভুলিয়া যাই, আবার সেই বিষয়ের সামনা-সামনি হইলে তাহা স্মরণ হয়। যেমন কেহ কিছুকাল অনুপস্থিত থাকিলে তাহার কথা আমরা ভুলিয়া যাই, আবার সামনে আসিলে তাহাকে চিনিতে পারি। হযরত হুযায়ফা (রা) বলিলেন, আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমার সাথীগণ ইচ্ছা করিয়া ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন; বরং আল্লাহ্‌র কসম! তাহাদিগকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নিশ্চয় কিয়ামত পর্যন্ত দীনের মধ্যে যে সকল ফিতনা দেখা দিবে, রাসূলুল্লাহ (স) তাহার বিবরণ দিয়া গিয়াছেন, এমনকি ফিতনাকারীর নাম, পিতার নাম এবং বাসস্থানের নাম পর্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, প্রাথমিক অবস্থায় ফিতনাবাজদের সংখ্যা তিন শত পর্যন্ত হইবে। কিন্তু পরবর্তীতে তাহাদের অনুসারীদের সংখ্যা হইবে অনেক। হযরত আবূ যর (রা) বলেন, নবী (স)

এই রকম সকল বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। এমনকি আকাশে যেই পাখিটি পাখা মেলিয়া উড়িয়া যায়, তাহার সম্পর্কেও আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন (মাদারিজুন নুবূওয়াত, উর্দূ, ১খ., পৃ. ৩৭৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন, "মুসলমানদের মধ্যে দশ অশ্বারোহী নবূওয়াতের দাবিদার হইবে। তাহাদের নাম, তাহাদের পিতা ও পিতামহের নাম পর্যন্ত আমার জানা আছে। তাহাদের ঘোড়ার রং কি হইবে, তাহাও আমি বলিয়া দিতে পারি। পৃথিবীতে তাহারা উত্তম অশ্বারোহী হইবে" (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৪)।

নবী করীম (স) তাহার উম্মতগণকে জানাইয়া দিয়াছেন, তাহারা একদিন দুশমনদের উপর বিজয়ী হইবে। মক্কা মুকাররামা, বায়তুল মাকদিস, ইয়ামান, শাম ও ইরাকে মুসলমানদের বিজয় সূচিত হইবে এবং সেখানে এমন শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করিবে যে, একজন মহিলা একাকী হীরা হইতে মক্কা পর্যন্ত ভ্রমণ করিলে আল্লাহ্র ভয় ছাড়া তাহার আর কোন কিছুর সামান্যতম ভয় ও আশংকার উদ্রেক হইবে না (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৫)।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) এক সময় মদীনায় অবস্থান করিবেন। আল্লাহ তা'আলা তাহার উম্মতকে বিজয় দান করিবেন। কায়সার ও কিসরার ধনভাণ্ডার মুসলমানদের মধ্যে বণ্টিত হইবে। তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর পুনরায় কোন কিসরা ও কায়সার হইবে না। কিসরার রাজ্য টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছিল, যেইভাবে নবী করীম (স)-এর মুবারক পত্র সে ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়াছিল। কায়সার সিরিয়া হইতে পলায়ন করিয়াছিল এবং তাহার অধীনস্থ রাজ্যসমূহ ইসলামী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মুসলমানগণ তাহার অধীনস্থ অন্যান্য রাজ্যগুলিও দখল করিয়াছিল। এইসব হইয়াছিল হযরত উমার (রা)-এর খিলাফত কালে (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন বিবাদ-বিশৃংখলার উদ্ভব হইবে। মুসলমানগণ প্রবৃত্তির অনুসারী হইবে এবং অতীত কালের ইয়াহূদী-নাসারাদের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিবে। উম্মতের মধ্যে ৭৩ ফিরকা হইবে। তন্মধ্যে একটি মাত্র ফিরকা নাজাত প্রাপ্ত হইবে। মুসলমানগণ আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসের পিছনে ছুটিবে। সকাল-সন্ধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরিধান করিবে। জমকালো পোশাক পরিবে। ঘরের ভিতর ভাল ভাল ফরাস ব্যবহার করিবে। ঘরের পাকা ছাদ বানাইবে। দেওয়ালে ঝুলাইবে রং বেরঙের পর্দা। অহংকার ও দম্ভভরে চলাফিরা করিবে। নানা রকম আহার্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। পারস্য ও রোমদেশের নারীদের ন্যায় মুসলিম মহিলাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন, মুসলমানদের মধ্যে যখন এইগুলি বিস্তার লাভ করিবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর শাস্তি নাযিল করিবেন এবং তাহাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হইয়া যাইবে। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা পুণ্যবানদের স্থান দখল করিয়া লইবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা পুণ্যবান লোকদেরকে তাহাদের মধ্য হইতে উঠাইয়া নিবেন। সময় অতি দ্রুত অতিবাহিত হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে বিদ্যা উঠিয়া যাইবে

এবং বিদ্বান ব্যক্তিগণ দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইবেন। ফিতনা প্রকাশিত হইবে। গান-বাজনা ও হাসি-তামাশার উপকরণের ব্যাপক বিস্তার ঘটিবে (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৫)।

মুসায়লামা কায্যাব (মিথ্যাবাদী)-এর ফিতনার খবর দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার অনিষ্ট হইতে সাবধান করা হইয়াছে। এই মর্মে নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, আরবদের জন্য আক্ষেপ, ফিতনার আলামত নিকটবর্তী। তিনি আরো বলিয়াছেন, পৃথিবীর পরিমণ্ডলকে একাকার করিয়া আমাকে দেখানো হইয়াছে। যেই পর্যন্ত আমাকে দেখানো হইয়াছে সেই পর্যন্ত আমার উম্মতের অধিকারেই দেখিয়াছি। দেখিয়াছি মাশরিক, মাগরিব ও তৎমধ্যবর্তী স্থান ও ভারতের হুকুমতও ইসলামের ছায়াতলে সুদীর্ঘ হইবে। তাহার দৈর্ঘ্য পূর্বাঞ্চল হইতে এজিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে যাহার শেষে সংযুক্ত আর কোনো জনবসতি নাই (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৬)।

অতীতের কোন উম্মতের রাজ্য উত্তরে ও দক্ষিণে এত বড় রাজ্য হয় নাই। হযরত আবূ উমামা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সব সময়ই একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত দুশমনদের মুকাবিলায় শক্তিশালী থাকিবে। সাহাবা কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ধরনের লোক কোথায় থাকিবে? তিনি বলিলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসে (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৬)।

নবী করীম (স) একদা হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর মাকে বলিয়াছিলেন, তোমার গর্ভে পুত্র সন্তান রহিয়াছে। সে জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিবার পর নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত করা হইল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিলেন এবং নিজ মুখের লালা শিশুর মুখে দিলেন। অতঃপর তাহার নাম রাখিলেন আবদুল্লাহ। সে অনেক খলীফার পিতা হইবে।

তুর্কীরা আরবদের উপর বিজয়ী হইবে, এই সংবাদও তিনি দিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৬)।

হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফত সম্পর্কে নবী করীম (স) সংবাদ দিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত উছমানকে একটি জামা পরিধান করাইবেন। অথচ কতিপয় লোক তাহা খুলিয়া ফেলিতে চাহিবে। জামা পরিধান করানোর অর্থ খিলাফত প্রদান করা। তিনি তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছিলেন এবং তিনি যে পরীক্ষার সম্মুখীন হইবেন সেই সম্পর্কে তাঁহাকে আগেই জানাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যতক্ষণ 'উমার জীবিত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিতনার উদ্ভব হইবে না। হযরত 'উমার (রা) শহীদ হইবেন বলিয়াও তিনি পূর্বেই সংবাদ দিয়াছিলেন। হযরত 'আলী (রা)-এর সঙ্গে হযরত যুবায়র (রা)-এর যুদ্ধ হইবে এবং সে যুদ্ধের পর হযরত যুবায়র (রা) অনুতপ্ত হইবেন– এই সম্পর্কেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র স্ত্রীগণের একজন সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী হাওয়াব নামক স্থানে পৌছিবেন, তখন কুকুরের আওয়াজ শুনিবেন এবং সেখানে নিহতদের স্তূপ পাওয়া যাইবে। জঙ্গে জামালের সময় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) যখন মক্কা হইতে বসরার দিকে যাইতেছিলেন, তখন উক্ত স্থানে ঐ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৭)।

হযরত 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)-কে খবর দিয়াছিলেন, তাহাকে বিদ্রোহীরা হত্যা করিবে। হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর সৈন্যরা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৭)

রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-কে বলিয়াছিলেন, তোমার ব্যাপারে লোকেরা আক্ষেপ করিবে, আর তুমিও লোকদের তৎপরতায় আক্ষেপ করিবে। হাজ্জাজের নির্দেশে তাঁহার সহিত সেই রকম আচরণই করা হইয়াছিল। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা)-কে তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিবে। তিনি হযরত যায়দ ইবন হারিছা (রা), হযরত জা'ফার ইবন আবূ তালিব (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদাতের ব্যাপারেও সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ২৭৮)।

কুরনান নামের এক ব্যক্তি সম্পর্কে নবী করীম (স) মন্তব্য করিলেন, সে জাহান্নামী। লোকটি এক যুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করিল। পরিশেষে দেখা গেল, সে যখমের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তলোয়ার দিয়া আত্মহত্যা করিল। লোকেরা এই সংবাদ নবী করীম (স)-এর কাছে পৌঁছাইলে তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, আর আমি আল্লাহ্র রাসূল।

নবী করীম (স) একদল লোক সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন, সেই দলে ছিলেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত হুযায়ফা (রা), হযরত সামুরা ইবন জুনদুব (রা) প্রমুখ। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন, শেষোক্ত ব্যক্তি আগুনে পুড়িয়া মারা যাইবে। তিনজনের মধ্যে সর্বশেষে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন হযরত সামুরা ইবন জুনদুব (রা)। তিনি অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে এই রকম দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার শরীরের উত্তাপ একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। শরীরকে গরম রাখার জন্য সব সময় তাঁহাকে আগুনের তাপ গ্রহণ করিতে হইত। অবশেষে আগুনে পুড়িয়া তিনি ইন্তিকাল করেন (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৮)।

উহুদের যুদ্ধে হানযালা (রা) শাহাদাত বরণ করিলেন। নবী করীম (স) বলিলেন, হানযালাকে ফেরেশতারা এখন গোসল দিতেছে, যাহা সাহাবীগণ জানিতেন না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর, কারণ কি? তাহার স্ত্রী বলিলেন, তিনি অপবিত্র ছিলেন, তাহার গোসলের প্রয়োজন ছিল। হযরত হানযালা (রা) যখন শুনিলেন, নবী করীম (স) ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন, তখনই তিনি যুদ্ধের ময়দানে ছুটিয়া গেলেন এবং গোসল করার ফুরসত পান নাই। এই অবস্থায় তিনি শহীদ হন। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি হযরত হানযালার মাথা হইতে পানির ফোঁটা টপটপ করিয়া পড়িতে দেখিয়াছি (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৮)।

নবী করীম (স) আরও সংবাদ জানাইয়াছেন, বনূ ছাকীফ গোত্রে এক মিথ্যাবাদী এবং এক হত্যাকারী জন্ম নিবে। তাহাই হইয়াছিল। সেই গোত্রে জন্ম নিয়াছিল মিথ্যাবাদী মুখতার ইবন উবায়দ এবং নরঘাতক হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৮)।

নবী করীম (স) সায়্যিদা ফাতিমা (রা) সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, আহলে বায়তের মধ্যে সকলের আগে আমার সহিত মিলিত হইবে ফাতিমা। নবী করীম (স)-এর দুনিয়া

হইতে প্রস্থানের ছয় মাস পর হযরত ফাতিমা (রা) ইন্তিকাল করিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, আমার স্ত্রীগণের মধ্যে সেই আমার সহিত সর্বাগ্রে মিলিত হইবে যাহার হাত লম্বা। এই কথার দ্বারা তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা)-কে বুঝাইয়াছিলেন। কারণ তিনি খুব বেশী দান করিতেন। পরবর্তীতে তাহাই হইয়াছিল (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৮-৭৯)।

তিনি আরো বলিয়াছেন, আখেরী যামানায় আমার উম্মতের মধ্যে তিরিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটিবে। তাহাদের মধ্যে চারজন হইবে নারী। তাহাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করিবে। এক বর্ণনায় আসিয়াছে, তাহারা নবূওয়াতের দাবিদার হইবে (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭৯)।

তিনি আরও বলিয়াছেন কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (স) এর সহিত এখন হইতে অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধের পর আর যুদ্ধ করিবে না। ইহার পর কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত যুদ্ধ করার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছিল (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৮০)।

তিনি মিলহান-কন্যা উম্মু হারাম (রা)-কে সুসংবাদ দিয়াছিলেন যে, বাদশাদের মতো তিনি সমুদ্রপথে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। তাহাই হইয়াছিল। আমিরুল মু'মিনীন হযরত উছমান (রা)-এর সময়ে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৮১)।

নবী করীম (স) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদাই হকের উপর কায়েম থাকিবে। কিয়ামত পর্যন্ত এই রকম চলিবে।

নবী করীম (স) আপন চাচা 'আব্বাস (রা)-এর ঐ সম্পদের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন যাহা তিনি বদর যুদ্ধে আসিবার সময় তাহার স্ত্রী উম্মুল ফাদলের নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন। এই বিষয় তাহার স্ত্রী ছাড়া আর কেহই জানিত না। নবী করীম (স) ইহা তাহাকে জানাইবার পর হযরত আব্বাস (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৮২)।

হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) এক সময় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। মনে হইতেছিল, তিনি আর বাঁচিবেন না। কিন্তু নবী করীম (স) তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, সম্ভবত তুমি রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। তোমার দ্বারা একটি কওম উপকার লাভ করিবে এবং একটি কওম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অর্থাৎ তোমার দ্বারা মুসলমানদের লাভ হইবে আর কাফিরদের ক্ষতি হইবে। এই কথায় তাহার দীর্ঘ জীবন লাভের শুভ সংবাদ ছিল। জীবিতাবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মধ্যে তিনিই সকলের শেষে ইন্তিকাল করেন (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৮২)।

তিনি উমায়্যা ইবন খালাফ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, সে আমার হাতে মারা যাইবে। উতবা ইবন আবূ লাহাব সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রাণী তাহাকে ভক্ষণ করিবে। তাহাকে বাঘে খাইয়াছিল (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৮২)।

বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম (স) স্থান চিহ্নিত করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, অমুক অমুক কাফের অমুক অমুক স্থানে নিহত হইবে। যুদ্ধশেষে দেখা গেলো, নবী করীম (স)-এর চিহ্নিত স্থানে তাহারা মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৮২)।

বাদশাহ নাজাশী ইন্তিকাল করিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন, নাজ্জাশী দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছে। সাহাবীগণকে বলিয়া তিনি তাহার জানাযার সালাত আদায় করিয়াছিলেন। ফিরোজ দায়লামী পারশ্যের বাদশাহর দূত হইয়া আসিলে নবী করীম (স) তাহাকে বলিয়াছিলেন, বাদশাহর মৃত্যু হইয়াছে। ফীরোজ দায়লামী পরে এই কথার সত্যতা জানার পর মুসলমান হইয়াছিলেন। হযরত আবূযর গিফারী (রা)-কে বলিয়াছিলেন, হে আবূযর সেই দিন তোমার কী অবস্থা হইবে যেইদিন মদীনার লোকেরা তোমাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিবে? তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আমি মসজিদে হারামে অবস্থান লইবো। তিনি বলিলেন, সেখান হইতেও যদি বাহির করিয়া দেওয়া হয়? হাদীছের শেষের দিকে বলা হইয়াছে– এমতাবস্থায় তোমাকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইবে এবং ঐ অবস্থায় তুমি ইন্তিকাল করিবে (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৮৩)।

নবী করীম (স) একদিন হযরত সুরাকা (রা)-কে বলিয়াছিলেন, ঐদিন তোমার অবস্থা কেমন হইবে যেইদিন পারসের বাদশাহর হাতের স্বর্ণের চুড়ি তুমি পরিধান করিবে?

হযরত উমার (রা)-এর খিলাফতের সময় পারস্য বিজয় হইল। গনীমতের মালের মধ্যে বাদশাহর স্বর্ণের চুড়ি দুইটিও ছিল। হযরত উমার ফারূক (রা) হযরত সুরাকা (রা)-এর হাতে স্বর্ণের চুড়ি দুইটি পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি পারস্যের বাদশাহর স্বর্ণের চুড়ি সুরাকার হাতে পরাইয়াছেন (প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৩৮৩)।

সুহায়ল ইবন 'আমর কুরায়শদের একজন সরদার ছিলেন, তিনি ছিলেন সুবক্তা। তিনি নবী করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরামের নিন্দাবাদ করিতেন, তাহাদিগকে গালি-গালাজ করিতেন। বদর যুদ্ধে তাহাকে বন্দী করা হইলে হযরত উমার (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি ইহার দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দেই।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে উমার! অচিরেই সে এমন অবস্থায় পৌঁছিবে যাহা দেখিয়া তুমিও খুশি হইবে। সেই রকমই হইয়াছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া মক্কা মুকাররমাতেই বসবাস করিতেছিলেন। অতঃপর নবী করীম (স)-এর ওফাত ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত লাভের সংবাদ যখন মক্কাতে পৌঁছিল, তখন তিনি বিশেষ ভাষণ দিয়া মুসলমানদের মনে শান্তি ও দৃঢ়তা আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই ভাষণের মাধ্যমে তিনি তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৩৮৪)।

হযরত ছাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস (রা)-কে নবী করীম (স) বলিয়াছিলেন, এতদিন তো নিরুপদ্রব জীবন অতিবাহিত করিলে! এখন শাহাদাতের জন্য প্রস্তুতি নাও। তিনি ভণ্ড নবী মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়া ইয়ামামাতে শহীদ হইয়াছিলেন।

মক্কা বিজয়ের দিন ফদালা ইবন 'উমার আল-লায়ছী মনে মনে ইচ্ছা করিল যে, তাওয়াফরত অবস্থাতেই সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবে। ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলিয়া সে রাসূলুল্লাহ (স)- এর কাছাকাছি পৌঁছিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) ইহা জানিতে পরিয়া ডাকিলেন, ফদালা! তোমার মনে কি দূরভিসন্ধি আছে? সে বলিল তেমন কিছুই না, আমি তো আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিতেছি। তাহার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মৃদু হাসিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি দালাকে আরও কাছে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার পবিত্র হস্ত তাহার বক্ষে স্থাপন করিলেন। পরে হযরত ফদালা নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পবিত্র হস্ত আমার বক্ষ হইতে উঠাইয়া লওয়ার আগেই আমি গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করিলাম, এখন তিনিই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম (প্রাগুক্ত, ১০খ., পৃ. ৩৬২)।

ওয়াকিদী উম্মুল মু'মিনীল 'আইশা (রা)-এর এক মুক্তদাসের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) এক বন্দীকে 'আইশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন, ইহাকে কড়া পাহারায় রাখিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। 'আইশা (রা) বন্দীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এক আগন্তুক মহিলার সহিত কথা বলিতে গিয়া তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। সুযোগ পাইয়া লোকটি পলায়ন করিল। কিছুক্ষণ পর সেখানে রাসূলুল্লাহ (স) উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, বন্দী লোকটিকে তো দেখিতেছি না। 'আইশা বলিলেন, কোথায় যে গেল! রাসূলুল্লাহ (স) কিছুটা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহ তোমার হস্ত কর্তন করুন। এই কথা বলিয়া তিনি বাহিরে গিয়া অপেক্ষমান সাহাবীগণকে বলিলেন, মালযামের পশ্চাৎভূমি হইতে এখনই লোকটিকে খুঁজিয়া লইয়া আস। সাহাবীগণ নির্দেশ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশিত স্থান হইতে পুনরায় তাহাকে বন্দী করিয়া আনা হইল। সঠিক সনদ দ্বারা রিওয়ায়াতটি সমর্থিত নয় (প্রাগুক্ত, ৫খ. পৃ. ৪১৯)।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) হইতে ইমাম বাগাবী বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, লায়লাতুল মি'রাজ-এর পরবর্তী সকালে আমি বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম, মি'রাজের কথা বলিলে লোকেরা আমাকে অসত্যভাষী বলিবে। কা'বা প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে বসিয়াছিলাম দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে। এমন সময় আবূ জাহ্ল সেখান দিয়া যাওয়ার সময় বিদ্রূপের স্বরে বলিল, মুহাম্মাদ! নূতন কিছু পাইলে নাকি ? আমি বলিলাম, হাঁ, গত রাত্রে আমাকে এক স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সে বলিল, কোথায় ? আমি বলিলাম, বায়তুল মুকাদ্দাসে। সে বলিল, সকালের মধ্যেই মক্কায় ফিরিয়া আসিলে ? আমি বলিলাম, হাঁ। সে কোন মন্তব্য না করিয়া বলিল, তুমি যাহা বলিলে আমি কি তাহা লোকজনকে বলিয়া দিব? আমি বলিলাম, হাঁ।

সে লোকদেরকে ডাকিয়া আনিলে আমি প্রথমে কথা বলিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কার কিছু সংখ্যক লোক বায়তুল মাকদিস সফর করিয়াছিল। তাহারা বলিল, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি বায়তুল মুকাদ্দাসের বিবরণ দিতে পারিবে ? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি একে একে বায়তুল মাকদিসের বিভিন্ন অংশের বিবরণ দিতে শুরু করিলাম। বায়তুল মাকদিসকে আমার সম্মুখে

উপস্থিত করা হইল, যেন তাহা আকীলের বাড়ীর নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি দেখিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিলাম। লোকেরা শুনিয়া বলিল, তোমার বর্ণনা সঠিক। এইবার আমাদের কাফেলা সম্পর্কে কিছু বল? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি তোমাদের কাফেলাকে দেখিয়াছি আর-রাওহা নামক স্থানে। তাহাদের একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল। উহা খুঁজিতেছিল তাহারা। সেইখানে ছিল তাহাদের একটি পানির মশক। আমার তৃষ্ণা পাইয়াছিল। তাই মশক হইতে পানি পান করিয়াছি। কাফেলা ফিরিয়া আসিলে তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও, আমি যেই স্থানের কথা বলিলাম সেই স্থানে তাহাদের পানির পাত্রটি ছিল কি না? লোকেরা বলিল, ইহা একটি নিদর্শন বটে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি অমুক গোত্রের কাফেলারও সাক্ষাত পাইয়াছিলাম। তাহাদের দুইজন লোক আরোহণ করিয়াছিল একটি উটে। যুমুর নামক স্থানে ঐ উট আমাকে দেখিয়া আওয়াজ করিয়া উঠিল। তাহাদের কাফেলা আসিলে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও আমি ঠিক বলিয়াছি কিনা? লোকেরা বলিল, ইহাও একটি বিবেচ্য নিদর্শন।

লোকেরা পুনরায় বলিল, আমাদের কাফেলা সম্পর্কে বল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তানঈম নামক স্থানে আমি তোমাদের কাফেলার উটগুলি দেখিয়াছি। লোকেরা বলিল, কয়টি উট ছিল সেখানে এবং সেইগুলির আকৃতি কেমন ছিল? আর সেইগুলির পিঠে কোন কোন পণ্যের বোঝা ছিল? রাসূলুল্লাহ্ (স)-বলিলেন, আমি এতো কিছু লক্ষ্য করি নাই। তবুও বলিতেছি, শুন! হারুরা নামক স্থানে সম্পূর্ণ কাফেলা আমার সামনাসামনি হইয়াছিল। তখন আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। কাফেলার সম্মুখভাগে ছিল একটি মেটে বর্ণের উট। উহার পিঠে ছিল খেজুর পাতা দ্বারা তৈরী মাদুরের বোঝা। অমুক দিন সূর্যোদয়ের সময় তোমাদের কাফেলা মক্কায় পৌঁছিবে। মুশরিকরা বলিল, এই নিদর্শনও যাচাইযোগ্য। নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যোদয়ের সময় তাহারা বিস্ময়ে দেখিল যে, সম্মুখভাগেই মেটে বর্ণের উটটিসহ কাফেলা ফিরিয়া আসিয়াছে। কাফেলার লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য (তাফসীরে মাযহারী, ৫খ., পৃ ৪০১, ৪০২)।

বুখারী ও মুসলিম ইবন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) দুইটি কবরের নিকট দিয়া গমনকালে বলিলেন, এই দুইজন কবরবাসীকে আযাব দেওয়া হইতেছে, তবে মারাত্মক কোন গুনাহের জন্য নয়। তাহাদের একজন পেশাব হইতে আত্মরক্ষা করিত না। আর দ্বিতীয় জন পরনিন্দা করিয়া ফিরিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) খেজুরের একটি তাজা শাখা নিলেন এবং দুই ভাগ করিয়া কবরদ্বয়ের উপর রাখিয়া দিলেন। সাহাবীগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলিলেন, এই শাখা দুইটি শুষ্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের কবরের আযাব হালকা হইবে (সহীহ্ মুসলিম, তাহারাত অধ্যায়, আল-খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৮৮)।

ইব্‌ন জারীর আবূ উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) জান্নাতুল বাকী'তে গেলেন এবং দুইটি তাজা কবরের পাশে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমরা এখানে অমুক অমুককে দাফন করিয়াছ। সাহাবীগণ বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, অমুককে এই সময় বসানো হইয়াছে এবং তাহাকে শাস্তি দেওয় হইয়াছে। সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! তাহাকে

কঠিন শাস্তি দেওয়া হইয়াছে যাহা মানুষ ও জিন ছাড়া সকলেই শুনিয়াছে। যদি তোমাদের অন্তর অস্বচ্ছ না হইত এবং তোমরা কথায় কথায় বাড়াবাড়ি না করিতে তাহা হইলে আমি যাহা শুনিতে পাইতেছি তাহা তোমরাও শুনিতে পাইতে। প্রহারের তীব্রতায় এই ব্যক্তির প্রতিটি হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তাহার কবরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তির অপরাধ কি? তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি পেশাব হইতে নিজেকে রক্ষা করিত না এবং মানুষের গোশত খাইত, অর্থাৎ গীবত করিত। অনুরূপ ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৮৯)।

জারীর ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমরা পথ চলিতে চলিতে মরুভূমির দিকে চলিয়া গেলাম। আমরা দেখিলাম এক ব্যক্তি দ্রুত গতিতে উট চালাইয়া আসিতেছে। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা হইতে আসিতেছ? লোকটি বলিল, বাড়ী হইতে। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাইতেছি। তিনি বলিলেন, তুমি পৌঁছিয়া গিয়াছ। অতঃপর তিনি তাহাকে ইসলামের বিধান শিক্ষা দিলেন। তাহার উটের পা ইঁদুরের গর্তে ঢুকিয়া পড়ায় সে উট হইতে পড়িয়া মারা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, আমি দেখিলাম, দুইজন ফেরেশতা তাহার মুখে ফল তুলিয়া দিতেছে (আস-সূয়ূতী (র), প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৮৯)।

বুখারী ও মুসলিম ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলে সূর্যগ্রহণ হয়। তিনি এই সময় নামায পড়িলেন। নামায হইতে ফিরিয়া আসিলে সাহাবীগণ আরয করিলেন, আমরা আপনাকে কোন বস্তু গ্রহণ করিতে এবং পরক্ষণেই তাহা হইতে বিরত থাকিতে দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি জান্নাত দেখিয়া তাহা হইতে এক গুচ্ছ আঙ্গুর ফল লইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু নিলাম না। যদি নিতাম তাহা হইলে দুনিয়া বাকী থাকা পর্যন্ত তোমরা উহা খাইতে পারিতে। আমি দোযখ দেখিয়াছি, এমন ভয়াবহ দৃশ্য কখনও দেখি নাই। দোযখীদের অধিকাংশই ছিল নারী (সহী মুসলিম, সালাতুল কুসূফ অধ্যায়, ১খ., পৃ. ২৯৬; বুখারী, বাব সূর্য গ্রহণের নামায, ১খ., পৃ. ১৪৪; প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৮৯)।

ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমি জান্নাত দেখিয়াছি এবং জান্নাতীদের অধিকাংশই দরিদ্র। আমি জাহান্নামও দেখিয়াছি, জাহান্নামীদের অধিকাংশই নারী (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৮৯)।

হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করিলাম। সেখানে একটি প্রাসাদ দেখিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কাহার জন্য? ফেরেশতারা বলিলেন, ইহা উমার ইবন খাত্তাবের জন্য। হে 'উমার! তোমার আত্মসম্মানবোধের কথা চিন্তা করিয়া আমি প্রাসাদে প্রবেশ করি নাই। রাবী আবূ বকর ইবন 'আয়্যাশ বর্ণনা করেন, আমি হুমায়দকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (স) এই প্রাসাদ জাগ্রত অবস্থায় দেখিয়াছেন, না স্বপ্নে? হুমায়, বলিলেন, জাগ্রত অবস্থায় (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৮৯)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, জিবরাঈল আমার হাত ধরিয়া জান্নাতের সেই দরজা দেখাইলেন যাহা দিয়া আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, যদি আমিও আপনার সহিত থাকিতাম তাহা হইলে আমিও সেই দরজাটা দেখিতাম! রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই জান্নাতে দাখিল হইবে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৯০)।

উমায়্যা ইবন মাখশী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি খাবার খাইতেছিল, কিন্তু শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে নাই। খাওয়ার শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া সে বলিল, বিসমিল্লাহ আও- ওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, লোকটির সাথে শয়তানও খাইতেছিল। কিন্তু সে যখন বিসমিল্লাহ বলিল তখন শয়তান বমি করিয়া তাহার পেটের খাবার বাহির করিয়া দিল (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৯১)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, যাকাতলব্ধ খাদ্যশস্যের হিফাজত রাসূলুল্লাহ্ (স) আমার দায়িত্বে অর্পণ করেন। এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিল এবং নিজ হস্তে খাদ্যশস্য তুলিয়া লইতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। আমি বলিলাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া যাইব। সে বলিল, আমি গরীব মানুষ, আমার পরিবার-পরিজন ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে। আমি খুবই অভাবী। এই কথা শুনিয়া আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকালে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আবূ হুরায়রা! গত রাতের কয়েদী কোথায় গিয়াছে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে বিনয়ের সহিত পরিবারের ক্ষুধার কষ্টের কথা বলিলে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, সে তোমার সাথে মিথ্যা বলিয়াছে। সে আবার আসিবে। আমি অপেক্ষায় রহিলাম। সে পুনরায় আসিল এবং খাদ্যশস্য তুলিয়া লইল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি গরীব মানুষ। আর কখনও আসিব না। আমি ছাড়িয়া দিলাম। সকালে রাসূলুল্লাহ (স)-বলিলেন, রাতের কয়েদী কোথায়? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তাহার অভাব-অনটনের কথা বলিলে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে মিথ্যা বলিয়াছে। সে আবার আসিবে। আমি অপেক্ষায় রহিলাম। রাতে আসিয়া সে খাদ্যশস্য লইতে লাগিল। আমি তাহাকে পাকড়াও করিলাম, বলিলাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া যাইব। সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আপনাকে উপকারী 'ইল্‌ম শিখাইয়া দিব। তাহা এই, আপনি যখন নিদ্রা যাইবেন তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবেন। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনার দেহরক্ষী হইবে। সকাল পর্যন্ত আপনার নিকট শয়তান আসিবে না। আমি সকালে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে ঘটনা শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, তোমার নিকট যে আসিয়াছিল সে ছিল শয়তান। আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে সে যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিক কিন্তু সে নিজে মিথ্যাবাদী (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৯৫)।

'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়া আমি মানুষ ও জিনদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা প্রশ্ন করিলাম, আপনি জিনদের সহিত কিভাবে লড়াই করিলেন? তিনি বলিলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত এক স্থানে অবতরণ করিলাম। আমি পানি আনার জন্য বালতি ও মশক হাতে লইলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার নিকট কেহ আসিবে এবং তোমাকে পানি আনিতে বাঁধা

দিবে। কূপের নিকট পৌঁছিয়া আমি কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে যুদ্ধবাজ মনে হইতেছিল। সে বলিল, তুমি এক কূপ হইতে এই বালতি পানিও উঠাইতে পারিবে না। আমি তখনই তাহাকে ধরিয়া ধরাশায়ী করিলাম। অতঃপর একটি পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহার নাক ও মুখ ভাঙ্গিয়া দিলাম, অতঃপর মশক ভর্তি পানি নিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আসিলাম। তিনি বলিলেন, কেহ আসিয়াছিল কি? আমি ঘটনার বর্ণনা দিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে ছিল শয়তান (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ., ৯৫)।

সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি নবী। সে প্রশ্ন করিল, কিয়ামত কখন হইবে? তিনি বলিলেন, ইহা অদৃশ্য বিষয় এবং এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। সে বলিল, নবীর পরিচয় কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, নবী হইলেন আল্লাহ্র প্রেরিত। সে বলিল, আপনার তলোয়ারটি আমাকে দেখান। তিনি তাহাকে তলোয়ারখানা দিলেন। সে উহা নাড়াচাড়া করিয়া ফিরাইয়া দিল। তিনি বলিলেন, তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলে তাহা করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। সে বলিল, আমার উহাই ইচ্ছা ছিল। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, লোকটি আমার তলোয়ার দিয়া আমাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা পারিল না (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১০০)।

হযরত ওয়াবিসা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সৎকর্ম ও পাপকর্ম সম্পর্কে জানার জন্য হাযির হইলাম। তিনি বলিলেন, ওয়াবিসা! তুমি যেই বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য আসিয়াছ আমি তাহা বলিয়া দিতেছি। আমি বলিলাম, বলুন। তিনি বলিলেন, তুমি সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ। আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন! আমি এইজন্যই আসিয়াছিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, সৎকাজ উহাই যেই কাজে তোমার বক্ষ উন্মুক্ত থাকে, কোনরূপ সন্দেহের কাঁটা অনুভূত হয় না। আর মন্দ সেই কাজ, যে কাজে তোমার মনে খটকা থাকে, যদিও মানুষ তোমাকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়া থাকে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১০১)।

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (স)-এর নিকট ছিলাম। তাঁহার খেদমতে দুই ব্যক্তি উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন আনসারী, অপরজন ছাকাফী। তাহারা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) ছাকাফীকে বলিলেন, প্রশ্ন কর। আর যদি চাও তাহা হইলে আমিই বলিয়া দেই, তুমি কি প্রশ্ন করিতে আসিয়াছ। ছাকাফী বলিলেন, বলুন। তিনি বলিলেন, তুমি নামায, রুকূ, সিজদা, রোযা এবং ফরয গোসল সম্পর্কে জানিতে আসিয়াছ। সে বলিল, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ রাসূল হিসাবে পাঠাইয়াছেন! আমি এইসব বিষয়েই জ্ঞান অর্জন করিতে আসিয়াছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আনসারীকে বলিলেন, তুমিও প্রশ্ন কর, তুমি চাহিলে আমি তোমার প্রশ্নও বলিয়া দিতে পারি। সে বলিল, বলুন। তিনি বলিলেন, তুমি আসিয়াছ এই কথা জানিতে যে, গৃহ হইতে বায়তুল্লাহ্র নিয়াতে বাহির হইলে তাহার কি ছওয়াব? তুমি আরও জানিতে চাও যে, তুমি আরাফাতে অবস্থান, মাথা মুণ্ডন, তাওয়াফ ও কংকর নিক্ষেপ

করিবে কিনা। আনসারী বলিল, আমি এইসকল কথাই জানিতে আসিয়াছি (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১০১)।

উকবা ইব্‌ন আমের আল-জুহানী (রা) বর্ণনা করেন, কয়েকজন ইয়াহূদী আগমন করিল। তাহাদের সহিত তাহাদের ধর্মগ্রন্থও ছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিল। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁহাকে জ্ঞাত করিলাম। তিনি বলিলেন, তাহাদের সহিত আমার সাক্ষাতে লাভ কি? তাহারা আমাকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিতে চাহে যাহা আমার জানা নাই। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। আমি কেবল তাহাই জানি যাহা আমার প্রভু আমাকে জানাইয়া দেন। তারপর তিনি উযূ করিয়া মসজিদে গেলেন, দুই রাক্‌'আত নামায পড়িয়া প্রফুল্ল মনে বাহির হইলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন প্রস্ফুটিত ছিল। তিনি বলিলেন, তাহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। তাহারা আসিলে তিনি বলিলেন, তোমরা ইচ্ছা করিলে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ তাহা আমি বলিয়া দেই। তাহারা বলিল, বলুন। আমাদের ইচ্ছাও তাহাই। তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট যুল-কারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১০১)।

যুলকারনায়ন একজন রোমক সম্রাট। তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া অবশেষে মিসরের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। তিনি একটি শহর নির্মাণ করিলেন, যাহার নাম আলেকজান্দ্রিয়া। শহরের নির্মাণ সমাপ্ত হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠাইলেন। ফেরেশতা তাঁহাকে লইয়া আকাশে আরোহণ করিলেন। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল পর্যন্ত উঁচুতে উঠিয়া ফেরেশতা বলিলেন, নীচে দেখেন কি আছে? যুল-কারনায়ন বলিলেন, দুইটি শহর দেখিতেছি। ফেরেশতা তাহাকে আরও উপরে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, নীচে কি আছে? তিনি বলিলেন, কিছুই দেখা যাইতেছে না। ফেরেশতা বলিলেন, যে দুইটি শহর দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, সেই দুইটি শহর নয়, মহাসাগর। আল্লাহ তা'আলা তোমার পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তুমি সেই পথে চলিবে। মূর্খকে জ্ঞান শিখাইবে এবং জ্ঞানীকে জ্ঞানের উপর দৃঢ় রাখিবে। ইহার পর ফেরেশতা যুল-কারনায়নকে পৃথিবীতে নামাইয়া দিলেন। তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন, ইহার পর ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, যাহাদের চেহারা ছিল কুকুরের মত। তাহারপর অন্য এক সম্প্রদায়ের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ইয়াহূদীরা এই বিবরণ শুনিয়া বলিল, আমাদের কিতাবে এইরূপই বলা হইয়াছে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১০১)।

ছাবিত আল-বানানী বর্ণনা করেন, মুনাফিকরা এক স্থানে সমবেত হইয়া পরস্পর আলোচনা করিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি সমবেত হইয়া এমন এমন কথাবার্তা বলিয়াছে। যাহারা এমন কথা বলিয়াছ তাহারা উঠিয়া আল্লাহ্‌র কাছে তওবা ইস্তিগফার করুক। আমিও তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিব। কিন্তু মুনাফিকরা উঠিল না। তিনি এই কথা তাহাদেরকে তিনবার বলিলেন, অতঃপর বলিলেন, তোমরা না দাঁড়াইলে আমি তোমাদের নাম প্রকাশ করিয়া দিব। তিনি তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তখন মুনাফিকরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইল (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ., ১০২)।

ইমাম বায়হাকী জনৈক আনসারী হইতে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দাওয়াত করিলেন। খাবার পেশ করা হইলে তিনি এক লোকমা মুখে দিয়া চর্বণ করিতে লাগিলেন, অতঃপর বলিলেন, ইহা সেই ছাগলের গোশত যাহা অন্যায়ভাবে লওয়া হইয়াছে। মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, তাহার প্রতিবেশিনী স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকেই ছাগলটি প্রেরণ করিয়াছিল।

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণ এক মহিলার নিকট দিয়া গমন করিলেন। মহিলা একটি ছাগল যবেহ করিয়া খাবার প্রস্তুত করিল। তিনি এক লোকমা মুখে দিলেন কিন্তু গলাধকরণ করিতে পারিলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিলেন, এই ছাগলটি অনুমতি ছাড়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। মহিলা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মু'আয পরিবারের লোকদের সহিত আমাদের কোন লৌকিকতা নাই। আমরা তাহাদের বস্তু নিয়া নেই এবং তাহারাও আমাদের বস্তু নিয়া নেয় (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১০৩)।

ইবনুল কায়্যিম বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক পৌঁছিয়া বলিলেন, আজ রাত্রে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হইবে। তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যেন রাতে না দাঁড়ায়। যাহার নিকট উট রহিয়াছে সে যেন তাহার উটের উরুদেশের রশি বাঁধিয়া রাখে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হইল (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৩৩৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক হইতে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) কে দূমাতুল জান্দালের শাসক উকায়দির-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। উকায়দির ইবন আবদুল মালিক বানূ কিন্দার খৃস্টধর্মাবলম্বী রাজা ছিল। হযরত খালিদের (রা) যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তাহাকে গরু শিকাররত অবস্থায় পাইবে। খালিদ (রা) যখন সেখানে পৌঁছিলেন তখন ছিল ফুটফুটে চাঁদনী রাত। রাজা তাহার রাণীকে নিয়া ছাদে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিল। এমন সময় একটি বন্যগরু আসিয়া তাহার প্রাসাদের দরজায় শিং দ্বারা আঘাত করিল। রাণী বলিল, এইরূপ কখনও দেখিয়াছেন কি? উকায়দির বলিল, না, এমন তো কখনও দেখি নাই। রাণী বলিল, হাতের নিকট এমন শিকার কি হাতছাড়া করা যায়? উকায়দির ঃ তাহা কি করিয়া হয়?

উকায়দির সাথে সাথে ঘোড়া ডাকিয়া তাহার ভাই হাসসানসহ পরিবারের কয়েকজন লোক লইয়া শিকারের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। ইতোমধ্যে খালিদ (রা) তাঁহার বাহিনী নিয়া সেখানে পৌঁছিলেন। উভয় দল মুখামুখি হইল এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর অদৃশ্য সংবাদটি বাস্তবায়িত হইল (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩৪৩-৪৪)।

ইবনুল কাইয়িম লিখিয়াছেন, আবুল আসওয়াদ তাঁহার 'মাগাযী' গ্রন্থে হযরত উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তনকালে কতিপয় মুনাফিক শলা-পরামর্শ করিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন আকাবা গিরি-সংকট অতিক্রম করিবেন তখন তাহাকে সেই সংকীর্ণ গিরি-সংকটের উঁচু স্থান হইতে নিচে গর্তে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা তাঁহার পিছু পিছু আসিতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাহা তাঁহার প্রিয় হাবীবকে অবগত করেন। রাসূলুল্লাহ (স) আকাবার নিকটে আসিয়াই ঘোষণা করিলেন,

যাহাদের ইচ্ছা তাহারা বাত্‌ন ওয়াদীর প্রশস্ত নিচু পথ দিয়া রাস্তা অতিক্রম করিতে পারে। তিনি আকাবার পথ ধরিয়াই চলিলেন। লোকজন ঘোষণা শুনিয়া বাত্‌ন ওয়াদীর পথে চলিল, কিন্তু মুনাফিকরা এই পথেই অগ্রসর হইল। তাহারা মুখে মুখোশ পরিয়া নিল এবং তাহাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিল।

রাসূলুল্লাহ (স) হুযায়ফাও আম্মার (রা)-কে সঙ্গে লইলেন। তিনি বলিলেন, হে আম্মার! তুমি উটনীর লাগাম ধর। হে হুযায়ফা! তুমি উটনির পিছনে থাক। রাসূলুল্লাহ (স) যখন আকাবার সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিতেছিলেন তখন সেই হতভাগাদের পদধ্বনি (পিছন দিক হইতে) শোনা যাইতেছিল। তাহাদের মুখে ছিল মুখোশ, আর রাতটাও ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ক্রোধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা রক্তিম বর্ণ হইয়া উঠিল তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন, তাহাদেরকে পিছনের দিকে হটাইয়া দাও। হুযায়ফা (রা) তাহার তীরের ফলা দিয়া তাহাদের উটের মুখে সজোরে আঘাত হানিলেন। প্রথমে তাহারা তাঁহাকে একজন সাধারণ পথিক বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা হুযায়ফা (রা)-কে চিনিতে পারিয়া বুঝিতে পারিল, ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া মুখোশ ফেলিয়া জনতার ভিড়ে মিশিয়া গেল।

হুযায়ফা (রা) ফিরিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (স) দ্রুত উট হাকাইবার নির্দেশ দিলেন। 'আম্মার (রা)-কেও দ্রুত চলিবার নিদের্শ দিলেন। এইভাবে দ্রুত আকাবা অতিক্রম করিয়া তিনি সৈন্যদের অপেক্ষায় থামিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি লোকগুলিকে চিনিতে পারিয়াছ? তিনি বলিলেন, সওয়ারীগুলি তো অমুক অমুকের ছিল, কিন্তু লোক কাহারা ছিল উহা সনাক্ত করিতে পারি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি কি তাহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা করিতে পারিয়াছ? হুযায়ফা (রা) বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উহারা আমাদেরকে আকাবার গিরি-পথ হইতে নিচে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। তিনি আরও বলিলেন, ব্যাপারটি ফাঁস করিও না, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অভিসন্ধি ও তাহাদের নাম সম্পর্কে আমাকে অবহিত করিয়াছেন। ইনশাআল্লাহ প্রত্যূষে উহা বলিব।

ইবন ইসহাকের বর্ণনায় রহিয়াছে, প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবন উবায়, সা'দ ইবন আবী সারহ, আবা খাতির আল-আরাবী, আমের আবু আমের রাহিব ও জালাস ইবন সাওয়াদকে ডাকিয়া আন। জালাস ইবন সওয়াদ বলিয়াছিল, আজ রাত্রে আমরা মুহাম্মাদকে আকাবা হইতে নিচে ফেলিয়া দিব, যদিও মুহাম্মাদ ও তাঁহার সঙ্গীগণ আমাদের চাইতে উত্তম হইয়া থাকে। আমরা তো ছাগল আর তাহারা হইতেছে আমাদের রাখাল। আমরা নির্বোধ, তাহারা বুদ্ধিমান। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ডাকিয়া আন মুজাম্মে' ইবন জারিয়াকে এবং মালীহ তামীমীকে। এই ব্যক্তিদ্বয় মুরতাদ হইয়া নিখোঁজ হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ডাকিয়া আন হিস্‌ন ইবন নুমায়রকে। এই ব্যক্তি যাকাতের খেজুর লুট করিয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, তুমি কেন এমনটি করিলে? সে জবাব দিল, আমার জানা ছিল না যে, আপনি উহা জানিতে পারিবেন। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আপনি

সত্যিই আল্লাহ্‌র রাসূল। ইতোপূর্বে আমি মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করি নাই। এখন আমি মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

তিনি আরও বলিলেন, ডাকিয়া আনো তুআয়ম ইবন আবীরাককে, ডাকিয়া আনো 'আবদুল্লাহ ইবন 'উওয়ায়নাকে। এই ব্যক্তি তাহার সঙ্গীদেরকে বলিয়াছিল, আজ রাতে জাগ্রত থাক, তাহা হইলে চিরদিন শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে। আজ মুহাম্মাদকে খতম করা ছাড়া তোমাদের আর কোন কাজ নেই। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি নিহত হইলে তোমার কি লাভ হইত শুনি? সে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

তাহার পর তিনি বলিলেন, ডাকিয়া আনো মুররা ইবন রবীকে। সে বলিয়াছিল, একটি লোককে হত্যা করিলে সকলেই শান্তি পাইবে। সর্বমোট এই বার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যার পরামর্শ করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রত্যেকের নাম ও উক্তি হুবহু বলিয়া দিলেন। তিনি তাহাদের প্রত্যেককে বলিলেন, তুমি এইরূপ উক্তি করিয়াছিলে এবং তোমার অভিসন্ধি ছিল এই, ইত্যাদি। ইহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا وَمَا نَقَمُوْا اِلاَّ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ.

"উহারা আল্লাহ্‌র শপথ করে যে, উহারা কিছু বলে নাই। কিন্তু উহারা তো কুফরীর কথা বলিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর উহারা কাফির হইয়াছে। উহারা যাহা সংকল্প করিয়াছিল তাহা পায় নাই। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল নিজ কৃপায় উহাদেরকে অভাবমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই উহারা বিরোধিতা করিতেছে। উহারা তওবা করিলে উহাদের জন্য ভাল হইবে, কিন্তু উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন। পৃথিবীতে উহাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই" (৯ ঃ ৭৪)।

আল-ওয়াকিদী বলেন, দশম হিজরীতে দশ সদস্যবিশিষ্ট গামিদ প্রতিনিধি দল মদীনায় 'বাকী'উল-গারকাদে' উপস্থিত হন। সেখান হইতে সকলে একত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তাহাদের মাল-পত্রের নিকট তাহারা একজন বালককে রাখিয়া যান। ঘটনাক্রমে বালকটি ঘুমাইয়া পড়িলে এক চোর আসিয়া একজনের একটি ব্যাগ নিয়া পালাইয়া যায়। সেই ব্যাগে তাহারা কাপড়-চোপড় ছিল।

তাঁহারা সকলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া সালাম দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদেরকে শরীয়াতের বিধানাবলী সম্বলিত একটি লিখিত ফরমান দিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তোমাদের মাল-পত্রের নিকট কাহাকে রাখিয়া আসিয়াছ? তাহারা জবাবে বলিলেন, এক বালককে রাখিয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ছেলেটি তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একটি চোর আসিয়া একজনের একটি ব্যাগ চুরি করিয়াছে।

তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল, আমার ছাড়া দলের আর কাহারও ব্যাগ নাই। একটু পরেই তিনি বলিলেন, ব্যাগটি চোর লইয়া গিয়াছিল, পরে তাহা আবার পাওয়া গিয়াছে।

তাহারা বিলম্ব না করিয়াই তাহাদের মালপত্রের নিকট চলিয়া গেলেন এবং ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আমি ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিলাম, ব্যাগ নাই। খোঁজ করিতে বাহির হইয়া পড়িলাম, সামান্য দূরেই একটি লোককে বসা অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। আমি সেই দিকে অগ্রসর হইতেই লোকটি চলিয়া গেল। সে যেখানে বসিয়াছিল সেখানে গিয়া কিছু মাটি খোড়া অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। একটু খোঁজার পরেই সেখানে ব্যাগটি পাইলাম এবং তাহা নিয়া চলিয়া আসিলাম। আনুপূর্বিক রাসূলুল্লাহ (স)-এর অদৃশ্য সংবাদের বাস্তবায়ন দেখিয়া সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র সত্য রাসূল। অবশেষে বালকটিও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল। মহানবী (স) অন্যান্য দলের মত তাহাদেরকেও পথখরচা দিয়া বিদায় করিলেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮-৬৫)।

নাখ'আ ইয়ামানের একটি কবীলা। একাদশ হিজরীর মুহাররামের মাঝামাঝি এই কবীলার একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় আসিলেন। ইহাই ছিল সর্বশেষ আগমনকারী প্রতিনিধি দল। এই দলের লোকসংখ্যা ছিল দুই শত। ইহারা আসিয়া আয্-যিয়াফা নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন এবং সেইখান হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। ইহারা ইসলামের স্বীকারোক্তি করেন। ইহারা ইতোপূর্বেই হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর হাতে ইসলামের বায়'আত করিয়াছিলেন।

এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে একজনের নাম ছিল যুরারা ইব্ন 'আমর। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সফরে আমি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই সকল স্বপ্ন কি? তিনি বলিলেন, একটি স্বপ্ন এই যে, একটি মাদী গাধা বাচ্চা প্রসব করিয়াছে- যাহার রং লাল-কালো মিশ্রিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি কি একজন গর্ভবতী দাসীকে ঘরে রাখিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে একটি শিশু সন্তান প্রসব করিয়াছে। নবজাতকটি পুত্র সন্তান। আর সে তোমারই ঔরসজাত সন্তান। যুরারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার রঙের তাৎপর্য কি? রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কানে কানে বলিলেন, তোমার কি শ্বেতকুষ্ঠ আছে, যাহা তুমি লোকাদের নিকট গোপন করিয়া থাক? যুরারা বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম, আজ পর্যন্ত কেহই এই সংবাদ অবগত ছিল না এবং আপনি ব্যতীত কেহই এই কথাটি জানে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই রঙের তাৎপর্য ইহাই।

তিনি বলিলেন, আমি অতঃপর স্বপ্নে দেখিলাম, নু'মান ইবনুল মুনযির দুল ও অলংকারাদি পরিয়া রহিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহা হইতেছে আরবদেশ যাহা তাহার সুন্দরতম বেশে এখন সজ্জিত রহিয়াছে আর এই সৌন্দর্যে তাহাকে বেশ মানাইতেছে।

যুরারা ইব্ন 'আমর বলেন, আমি আরও দেখিলাম, একটি দীর্ঘকেশী বৃদ্ধা ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহা হইতেছে আরব ছাড়া অন্যান্য দেশের অবস্থা। তিনি বলিলেন, আমি আরও দেখিলাম, ভূগর্ভ হইতে একটি অগ্নিশলাকা বাহির হইয়া তাহা

আমার এবং আমার পুত্র 'আমরের মধ্যে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহা হইতেছে পরবর্তীকালে প্রকাশমান ফিতনা বা বিপর্যয়। যুরারা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সেই ফিতনা, হে আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, লোকেরা তাহাদের ইমামকে হত্যা করিবে। মুসলমানরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হইবে। একজন মুসলমানকে হত্যা করা অপর মুসলমান পানি পান করার মত স্বাভাবিক মনে করিবে। যদি তোমার পুত্র প্রথমে মারা যায় তাহা হইলে তুমি তাহা প্রত্যক্ষ করিবে। আর যদি তুমি ইন্তিকাল কর তাহা হইলে তোমার পুত্র সেই ফিতনা প্রত্যক্ষ করিবে।

যুরারা সেই ফিতনা না দেখার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দু'আ চাহিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহার জন্য দু'আ করিলেন এবং তিনি কিছু দিন পর ইন্তিকাল করিলেন। কিন্তু তাহার পুত্র হযরত 'উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর বিরোধী দলে যোগদান করিয়াছিল (প্রাগুক্ত, সিয়ার, পৃ. ৪৬৯-৭০)।

'উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব যখন বদর যুদ্ধে অনেক মুশরিকের নিহত হওয়ার পর মক্কায় ফিরিয়া গেল, তখন সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যার সাথে হিজরে আসিয়া বসিল। সে বলিল, সাফওয়ান! যুদ্ধে নিহতদের পরে আমাদের বাঁচিয়া থাকার প্রতি ধিক্কার। সাফওয়ান বলিল, বাস্তবিকই এমন পরাজয়ের পর বাঁচিয়া থাকার মধ্যে কোন আনন্দ নাই। 'উমায়র আরও বলিল, যদি আমার ঘাড়ে ঋণের বোঝা না থাকিত, যাহা আদায় করার কোন উপায় আমার নাই এবং সন্তানাদি না থাকিত যাহাদের জন্য আমার পরে কোন সম্পদ নাই, তবে আমি যাইয়া মুহাম্মাদকে হত্যা করিতাম। যদি তুমি আমাকে আমার সন্তানাদি ও ঋণের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করিতে পার, তবে আমার জন্য মুহাম্মাদের নিকট একটি বাহানা করার সুযোগও আছে। আমি তাঁহাকে বলিব, আমি আমার বন্দীকে মুক্ত করার জন্য আসিয়াছি। 'উমায়রের এইসব কথা শুনিয়া সফওয়ান খুবই প্রীত হইল। সে বলিল, আচ্ছা তোমার ঋণ আমার যিম্মায় এবং তোমার সন্তানদের ভরণ-পোষণ আমার দায়িত্বে রহিল।

অতঃপর সফওয়ান তাহাকে সওয়ারীর উট দিল, সকল প্রকার সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করিল এবং আদেশ করিল যে, 'উমায়রের তরবারি শান দিয়া তাহাতে বিষ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হউক। অতঃপর 'উমায়র রওয়ানা হইয়া মদীনায় পৌঁছিল। সে মসজিদের দরজায় আসিয়া উট হইতে নামিল। উট বাঁধিয়া তরবারি নিয়া সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে চলিল। হযরত 'উমর (রা) তাহাকে দেখিয়া ফেলিলেন। তিনি তখন আনসারদের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। 'উমায়রকে তিনি বলিলেন, এই সেই কুকুর, আল্লাহ্র দুশমন তোমাদের সম্মুখে আসিয়াছে। সে বদরে আমাদের সহিত যুদ্ধের চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমাদের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল।

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) 'উমায়রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছ? সে বলিল, আপনার নিকট আমার এক লোক বন্দী আছে। আপনি আমার নিকট হইতে ইহার মুক্তিপণ গ্রহণ করুন। আপনি আমাদের গোত্রের ও পরিবারেরই লোক। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহা

হইলে তোমার ঘাড়ে এই তরবারি ঝুলিতেছে কেন? 'উমায়র বলিল, এই তরবারির সর্বনাশ হউক– বদর যুদ্ধে ইহা আমাদের কি উপকার করিতে পারিয়াছে? সওয়ারী হইতে নামার সময় আমি ভুলক্রমে ইহা ঝুলন্ত অবস্থায় লইয়া আসিয়াছি।

রাসূলুল্লাহ (স) আবার বলিলেন, সঠিক করিয়া বল, তুমি কেন আসিয়াছ? সে বলিল, আমি তো কেবল আমার বন্দীর মুক্তিপণ দেওয়ার জন্যই আগমন করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আচ্ছা, তুমি হিজর নামক স্থানে বসিয়া সাফওয়ানের সহিত কী পরামর্শ করিয়াছিলে? এই কথা শুনিয়া সে হতভম্ব হইয়া বলিল, আমি কোন ব্যাপারে পরামর্শ করি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি এই ব্যাপারে পরামর্শ করিয়াছিলে যে, তুমি আমাকে হত্যা করিবে এবং সাফওয়ান তোমার সন্তানদের ব্যয়ভার বহন করিবে এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করিবে। আল্লাহ তা'আলা আমার ও তোমার এই সংকল্পের মাঝখানে অন্তরায়। অতএব তুমি আমাকে হত্যা করিতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া 'উমায়র তৎক্ষণাৎ কলেমা শাহাদাত পাঠ করিল এবং বলিল, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। আমরা ওহী ও আকাশ হইতে আগত সকল বিষয়কে মিথ্যা বলিতাম। কিন্তু হিজর নামক স্থানে বসিয়া আমার ও সাফওয়ানের মধ্যে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা আমরা দুইজন ব্যতীত আর কেহই জানিত না। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলাই আপনাকে এই সংবাদ অবগত করাইয়াছেন (তরজমানুস সুন্নাহ, ৪খ., পৃ. ২২৫-২৬)।

ইব্ন সা'দ হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, পারস্য-রাজের নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র পৌঁছিলে সে ইয়ামানের গভর্ণর বাযানকে নির্দেশ প্রেরণ করিল যে, দুইজন শক্তিশালী ব্যক্তিকে এই লোকের নিকট পাঠাইয়া তাহাকে গ্রেফতার করিয়া আমার নিকট নিয়া আসিবে। সেই মুতাবিক বাযান একটি পত্রসহ দুই ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রেরণ করিল। পত্র পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসিলেন এবং তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাহাদের স্কন্ধদেশ কাঁপিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আগামী কাল তোমরা উভয়ে আমার নিকট আসিবে। আমি আমার সিদ্ধান্ত তোমাদেরকে জানাইয়া দিব। পরের দিন সকালবেলা তাহারা উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা তোমাদের প্রভু বাযানকে এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দাও যে, আমার রব আল্লাহ্ বাযানের রব পারস্য-রাজকে গত রাতের সপ্তপ্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হত্যা করিয়াছেন এবং তাহার পুত্র শেরওয়াঁকে তাহার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। সে পিতাকে হত্যা করিয়াছে। তাহারা উভয়ে বাযানের নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিল। বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়া বাযান ও ইয়ামানের লোকজন ইসলামে দীক্ষিত হইলেন (আল-খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১০)।

বায়হাকী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) একজন সাহাবীকে জনৈক মুশরিক সরদারের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। মুশরিক সরদার বলিল, যেই আল্লাহ্‌র দিকে আপনি আমাকে দাওয়াত দিতেছেন, তিনি সোনার তৈরী, না রূপার তৈরী, না পিতলের তৈরী? এই কথা শুনিয়া সাহাবী ফিরিয়া আসিলেন। আল্লাহ তা'আলা আকাশ হইতে বজ্রপাতের মাধ্যমে সেই মুশরিককে জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিয়া দেন। দূত সাহাবী তখনও পথিমধ্যে ছিলেন

এবং তিনি এই সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়া দিলেন যে, সেই মুশরিক ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪)।

বায়হাকী ও আবূ নু'আয়ম বর্ণনা করেন যে, 'উরওয়া ইব্ন মাস'উদ ছাকাফী রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি সেখানে গেলে তাহারা তোমাকে হত্যা করিবে। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে, তাহারা তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে। 'উরওয়া বলিলেন, এইরূপ আশংকা নাই। কারণ তাহারা আমাকে অত্যন্ত সমীহ করে। তাহারা আমাকে নিদ্রিত পাইলেও জাগ্রত করিবে না। তাহার পর 'উরওয়া আপন সম্প্রদায়ের নিকট চলিয়া গেলেন। তাহাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তাহারা মানিল না। তিনি তাহাদেরকে শাস্তির কথা শুনাইলেন। ইহাতেও কাজ হইল না।

একদিন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, সুবহে-সাদেক উদিত হইল, তিনি আপন কক্ষে নামাযের জন্য আযান দিলেন এবং কলেমা শাহাদাত পাঠ করিলেন। জনৈক ছাকাফী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। 'উরওয়ার শাহাদাতের সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, উরওয়ার দৃষ্টান্ত ইয়াসীন (আ)-এর সঙ্গীর অনুরূপ। তিনিও তাঁহার কওমকে আল্লাহর দিকে আহবান করার ফলে নিহত হইয়া ছিলেন। এক রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, তীর লাগার পর 'উরওয়া বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তিনি আমাকে পূর্বেই বলিয়াছিলেন, তোমার সম্প্রদায় তোমাকে হত্যা করিবে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪)।

আবূ ইয়া'লা ও বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কেরামের সহিত কথাবার্তার মাঝে ইরশাদ করিলেন, এই দিক হইতে একটি প্রতিনিধি দল আগমন করিবে, তাহারা পূর্ব দিকের সকল লোকজনের মধ্যে উত্তম। হযরত 'উমর (রা) মজলিস হইতে উঠিয়া সেই দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি তেরজন উষ্ট্রারোহীর দেখা পাইলেন। তিনি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, আমরা বানূ আবদুল কায়সের লোক (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৬)।

ইব্ন সা'দ 'উরওয়া হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন সকালে দিগন্তের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, উষ্ট্রারোহীদের একটি দল পূর্ব দিক হইতে আগমন করিয়াছে। তাহারা ইসলামের প্রতি অনিহা প্রকাশ করিবে না। এই দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে যাইয়া তাহারা তাহাদের উটগুলিকে শীর্ণকায় করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক পাথেয় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের সরদারের একটি আলামত রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের জন্য বলিলেন, হে আল্লাহ! আবদুল কায়সকে ক্ষমা কর। তাহারা আমার নিকট দুনিয়া অন্বেষণ করিতে আসে নাই। তাহারা পূর্ব দিককার সর্বোত্তম মানুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ ব্যক্তি আগমন করিলেন। তাহাদের সরদার ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আওফ আল-আশাজ্জ। রাসূলুল্লাহ (স) তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি জওয়াব দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আওফ আল-আশাজ্জ কে? তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৬)।

হাকেম হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হিজরের অধিবাসী বানূ 'আবদুল কায়স রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলে কথা বলিতে বলিতে রাসূলুল্লাহ (স)-ইরশাদ করেন, তোমাদের দেশে অমুক ধরনের খেজুর রহিয়াছে, যাহার নাম তোমাদের নিকট এই, আর অমুক প্রকারের খেজুর আছে যাহার নাম এই। এইভাবে তিনি হিজরের সকল প্রকার খেজুরের প্রচলিত নামসহ উল্লেখ করিলেন। প্রতিনিধি দলের এক ব্যক্তি বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হউক! যদি আপনি হিজরে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলেও সেখানকার খেজুর সম্পর্কে আপনার জ্ঞান ইহার চেয়ে বেশি হইত না যাহা এখন রহিয়াছে। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই স্থানে তোমাদের উপস্থিতির সময় তোমাদের ভূখণ্ড আমাকে দেখানো হইয়াছে এবং আমি সব কিছুই দেখিয়া লইয়াছি। তোমাদের এক প্রকার খেজুর আছে বরনী যাহা অসুখ-বিসুখে ফলপ্রদ (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৬)।

বায়হাকীর বর্ণনায় ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির সংবাদ অবগত হই। অতঃপর আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাত্রা করিলাম। আমি সেখানে উপস্থিত হইলে সাহাবীগণ বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তোমাদের আগমনের সংবাদ তিন দিন পূর্বেই আমাদিগকে জানাইয়াছেন (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ২২)।

মা'মার বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ্! নৌকারোহীদেরকে প্রাণে রক্ষা করুন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, নৌকা পার হইয়া গিয়াছে। ইহার পর বলিলেন, তাহারা আসিতেছে। তাহাদেরকে একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি নিয়া আসিতেছে। এই নৌকারোহীরা ছিল আশ'আরী গোত্র এবং তাহাদিগকে যিনি নিয়া আসিতেছিলেন, তিনি ছিলেন আমর ইব্ন হুমুক আল্-খুযাযী। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? আমর বলিলেন, আমরা যাবীদ হইতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের জন্য বরকতের দু'আ করিলেন (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ২২)।

ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন, তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর দারী গোত্রের দশ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিল। তাহাদের মধ্যে তামীম আদ-দারীও ছিলেন। তাহাদের সকলেই মুসলমান হইয়া গেলেন। তামীম আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের প্রতিবেশী রোমকদের দুইটি গ্রাম রহিয়াছে– একটি জরী ও অপরটি বায়াতে আয়নূল। যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শামে বিজয় দান করেন, তাহা হইলে এই দুইটি গ্রাম আমাকে প্রদান করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই দুইটি গ্রামই তোমার। অতঃপর তিনি তামীমের নামে গ্রাম দুইটি লিখিয়া দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে শাম বিজিত হইলে তিনি গ্রাম দুইটি তামীমকে দিয়া দেন (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ২৭)।

খারাইতীর রিওয়ায়াতে সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র বর্ণনা করেন, বানূ তামীমের রাফি' ইব্ন 'উমায়র বলিয়াছেন, আমি এক রাতে বালুকাময় ভূমিতে সফরে ছিলাম। নিদ্রা আসিলে আমি বলিলাম ঃ

اَعُـوْذُ بِـعَـظِـيْـمِ هٰـذَا الْـوَادِىْ مِـنَ الْـجِـنِّ .

"আমি এই উপত্যকা প্রধানের নিকট জিন হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি"।

হঠাৎ এক বৃদ্ধ জিন আমার সামনে আসিয়া বলিল, তুমি যখন কোন ভয়ংকর মরু ভূমিতে যাইবে তখন বলিবে ঃ

اَعُـوْذُ بِـاللّٰـهِ رَبِّ مُـحَـمَّـدٍ مِّـنْ هٰـذَا الْـوَادِىْ .

"আমি মুহাম্মাদের রব আল্লাহ্‌র নিকট এই উপত্যকার জিন হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি"।

কেননা জিনদের শাসন বাতিল হইয়া গিয়াছে। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মুহাম্মাদ কে? সে বলিল, তিনি আরবের নবী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায় থাকেন? সে বলিল, ইয়াছরিবে। এই কথা শুনিয়া আমি উটে আরোহণ করিয়া মদীনার পথে চলিলাম। সেইখানে পৌছিলে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে দেখিয়া ইতোপূর্বেই ঘটনা বলিয়া দিলেন। আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৩৩)।

ইব্‌ন মান্‌দা ও ইব্‌ন 'আসাকির বর্ণনা করেন, আবূ সুফরা নবী করীম (স)-এর নিকট বায়'আতের উদেশ্যে আগমন করিলেন। তাহার পরনে ছিল হলদে রঙের মূল্যবান বস্ত্রজোড়া। সে আঁচল টানিয়া টানিয়া অহংকারভরে আসিতেছিল। সে ছিল সুন্দর, দীর্ঘদেহী, গম্ভীর ও স্পষ্টভাষী। নবী করীম (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? সে বলিল, আমি কাতি' (ছিন্নকারী) ইব্‌ন সারিক (চোর) ইব্‌ন জালিম (অত্যাচারী)। আমার পিতামহ ছিলেন জুলান্দী। তিনি নৌকা ছিনতাই করিতেন। আমি বাদশাহ এবং শাহযাদা। এমন অদ্ভুত পরিচয় শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি কেবল আবূ সুফরা। সারেক, জালিম ইত্যাদি উপাধি পরিত্যাগ কর। সে বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমার আঠারো সন্তান। সর্বশেষ সন্তানটি কন্যা যাহার নাম আমি সুফরা রাখিয়াছি (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৩৩)।

হাযেম ইবন আওস ইবন হারিছা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন আমি তাঁহার নিকট হিজরত করিলাম। তিনি বলিলেন, হীরা এলাকা আমার সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছিল। আমি শায়মা বিনতে নুফায়লাকে সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার দেখিতে পাইতেছি। সে কাল ওড়না পরিহিতা। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হীরা যদি জয় করি আর শায়মাকে যদি ঐ অবস্থায় পাই, তবে শায়মা আমার হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ, তাহাই হইবে।

ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে আমরা মুসায়লামা কায্‌যাবের বিরুদ্ধে অভিযান সমাপ্ত করিয়া হীরায় আগমন করিলাম। হীরায় সর্বপ্রথম আমরা শায়মা বিনতে নুফায়লাকে পাইলাম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী শায়মা কাল ওড়না পরিহিতা অবস্থায় খচ্চরের উপর সওয়ার ছিল। আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (স) এই মহিলা আমাকে দান করিয়াছেন। খালিদ ইবন ওয়ালীদ তাহার পক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করিতে

বলিলেন। আমি মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও মুহাম্মাদ ইবন বিশর আনসারীদ্বয়কে সাক্ষীস্বরূপ পেশ করিলাম। অতঃপর খালিদ শায়মাকে আমার হাতে সোপর্দ করিলেন। শায়মার ভাই আসিয়া বলিল, শায়মাকে আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দাও। আমি বলিলাম, ইহার মূল্য এক হাজার দিরহাম। সে আমাকে এক হাজার দিরহামই দিল। লোকেরা বলিল, তুমি এক লাখ দিরহাম চাহিলে শায়মার ভাই তাহাই দিত। আমি বলিলাম, দশ শতকের বেশি গণনা আমি জানি না (প্রাগুক্ত, ২খ.,পৃ. ১০৯)।

'আওফ ইবন মালিক আশজাঈ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমরা জানিয়া রাখ, কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি বিষয় সংগঠিত হইবে। তন্মধ্যে আমার ওফাত, বায়তুল মাকদিস বিজয়, ইহার পর দুইটি মৃত্যু, যেমন ছাগলের কিয়াছ রোগ হয় আর মরিয়া যায়। ইহার পর দৌলতের এত প্রাচুর্য হইবে যে, এক ব্যক্তি একশত দীনার পাইয়াও সন্তুষ্ট হইবে না। ইহার পর একটি ফিতনা আসিবে এবং আরবের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করিবে। ইহার পর তোমাদের ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সন্ধি হইবে এবং শেতাঙ্গরা তোমাদের সহিত বিশ্বাসভঙ্গ করিবে, অবশেষে নারীর গর্ভ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। 'আমওয়াস দুর্ভিক্ষের বছরে 'আওফ ইবন মালিক মু'আযকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিয়াছেন, তুমি ছয়টি বিষয় গণনা কর। তন্মধ্যে তিনটি হইয়া গিয়াছে, আর বাকী আছে তিনটি। এ তিনটি বিষয়ের জন্য দীর্ঘ সময় বাকী আছে (প্রাগুক্ত, ২খ., ১১০)।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) উম্মে হারামের বাড়িতে আসিলেন এবং ঘুমাইয়া পড়িলেন। অতঃপর যখন জাগ্রত হইলেন, তখন তাহার মুখে ছিল মুচকি হাসি। উম্মে হারাম আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের অবস্থা আমার সামনে পেশ করা হইয়াছিল। যাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিবে তাহারা সমুদ্রের মধ্যে থাকিবে এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের শাসক হইবে। উম্মে হারাম বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি উম্মে হারামের জন্য দু'আ করিলেন। উহা বাস্তবায়িত হইয়াছিল হযরত 'উছমান (রা)-এর শাসনামলে। উম্মে হারাম ও তাহার স্বামী 'উবাদা ইবনুস সামিতের সহিত গাযীরূপে সমুদ্রে গমন করেন (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১১১)।

'আবদুল্লাহ ইবন হানযালা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বসিয়া আমাদের অভাব-অনটনের কথা আলোচনা করিতেছিলাম। এমন সময় তিনি বলিলেন, শুভসংবাদ শুনিয়া রাখ। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য দ্রব্যাদির স্বল্পতার চেয়ে আধিক্যের ভয় বেশি করিতেছি। পারস্য, রোম, ও হিময়ার জয় করা পর্যন্ত তোমাদের বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকিবে। তোমাদের তিনটি বড় বাহিনী হইবে। একটি সিরিয়ায়, একটি ইরাকে ও একটি ইয়ামানে থাকিবে। তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্য এমন হইবে যে, এক ব্যক্তিকে দুই শত দিরহাম কিংবা দীনার দেওয়া হইলে সে ইহাকে কম মনে করিয়া নারাজ হইবে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সিরিয়া কিরূপে বিজিত হইবে? সিরিয়া তো রোমকদের করতলগত। সেখানে তাহাদের বড় বড় নেতা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, সিরিয়া অবশ্যই বিজিত হইবে।

সেখানে তোমরাই খলীফা হইবে। তোমাদের পদাতিক বাহিনীর কৃষ্ণকায় ব্যক্তির আশেপাশে শ্বেতাঙ্গদের প্রচণ্ড ভিড় থাকিবে এবং তাহারা তোমাদের আদেশের প্রতীক্ষা করিবে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১১২)।

আবদুল্লাহ ইব্ন বুস্র বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, সেই সত্তার কসম যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ! পারস্য ও রোম অবশ্যই বিজিত হইবে। ফলে খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য হইবে, কিন্তু আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইবে না। অর্থাৎ খাদ্য আল্লাহর নাম নিয়া খাইবে না (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১১১)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যখন আমার উম্মত গর্বভরে চলিবে এবং পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা তাহাদের খাদেম হইবে, তখন তাহাদের দুষ্টরা সৎ ব্যক্তিদের উপর, মন্দ ব্যক্তিরা ভাল ব্যক্তিদের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে (খাসাইসুল-কুবরা, ২খ., পৃ. ১১১)।

'উরওয়া ইবন মালেক (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) সাহাবায়ে কিরামের মাঝে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর, অথচ আল্লাহ তা'আলা পারস্য ও রোম তোমাদের অধীন করিয়া দিবেন। তখন ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হইবে। আমার পরে ধন-সম্পদ তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করিবে।

'আমর ইবন শুরাহবীল বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আজ রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন কালো ছাগলের পাল আমার পিছনে পিছনে আসিতেছে। ইহার পশ্চাতে সাদা ছাগলের পাল আসিল। ফলে কালো ছাগলের পাল আর দৃষ্টিগোচর হইল না। হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কালো ছাগলের পাল হইতেছে আরবের বাসিন্দা, যাহারা আপনার অনুসারী হইবে। ইহার পর অনারবরা আপনার অনুসরণ করিবে, তাহাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আরবরা তাহাদের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (স) এই কথার সমর্থনে বলিলেন, নিঃসন্দেহে এইরূপই হইবে। (খাসায়েসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১১২)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, বনী ইসরাঈলের রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা পয়গাম্বরগণ করিতেন। এক পয়গাম্বরের ওফাত হইলে অন্য পয়গাম্বর আসিতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নাই। আমার পরে অনেক খলীফা হইবে। সাহাবীগণ আরয করিলেন : আপনি তাহাদের সম্পর্কে আমাদের কি আদেশ দেন? ক্রমানুসারে তাহাদের প্রতি বায়'আত পূর্ণকর এবং তাহাদের হক আদায় কর। তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১১৩)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমার পরে এমন খলীফা হইবে তাহারা যাহা জানিবে, তাহা করিবে এবং সেই বিষয়ের প্রতি তাহাদিগকে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে যাহা তাহারা নিজেরাও করিবে। তাহাদের পরে এমন খলীফা হইবে, তাহারা যাহা জানিবে না, তাহা করিবে এবং যে কাজ তাহাদেরকে করিতে বলা হয় নাই, তাহা তাহারা করিবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, অনেক অপ্রিয় ঘটনা ঘটিবে যাহা তোমরা পছন্দ করিবে না। সাহাবীগণ বলিলেন, আমাদের কেহ যদি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় তাহা হইলে সে কী করিবে? তিনি বলিলেন, তোমরা তাহাদের প্রাপ আদায় করিবে এবং আল্লাহর নিকট তোমাদের প্রাপ্য অনুসন্ধান করিবে (উপরিউক্ত বর্ণনাগুলির জন্য আল-খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১১১-১১৪)।

'ইরবাদ ইবন সারিয়া বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন, যাহা শুনিয়া আমাদের মন বিগলিত হইয়া গেল, চোখে অশ্রু প্রবাহিত হইল। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই উপদেশ তো বিদায় গ্রহণকারীর উপদেশের মত। আপনি আমাদের হইতে কি অঙ্গীকার লইতে চাহেন? তিনি বলিলেন, আমি তোমাদেরকে ওসিয়াত করিতেছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করিবে। কোন হাবশী গোলাম তোমাদের আমীর হইলে তোমরা তাহার আনুগত্য করিবে। তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকিবে সে অনেক মতবিরোধ দেখিবে। তোমরা বিদ'আতী কাজকে ভয় করিবে। কেননা উহা পথভ্রষ্টতা। যেই ব্যক্তি এইসব বিষয় পাইবে, তাহার উপর আমার ও আমার খলীফাগণের সুন্নত পালন করা ওয়াজিব। এই সুন্নতের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকিবে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১১৪)।

হযরত সফীনা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) মসজিদে নববীর নির্মাণ শুরু করিলে হযরত আবু বকর (রা) একটি পাথর বহন করিয়া আনিলেন এবং সেইটি স্থাপন করিলেন। হযরত 'উমার (রা)-ও একটি পাথর আনিলেন এবং তাহা স্থাপন করিলেন। অতঃপর হযরত 'উছমান (রা) পাথর আনিয়া স্থাপন করিলেন। নবী করীম (স) বলিলেন, ইহারা আমার পরে শাসক হইবে (প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ১১৪)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি শক্তিশালী ছাগলকে পানি পান করাইতেছি। ইহার পর যুবক ছাগলও ইহাদের সহিত শামিল হইল। ইহার পর আবূ বকর আসিল সে এক অথবা দুই বালতি পানি তুলিল। তাহার মধ্যে দুর্বলতা ছিল। ইহার পর 'উমার আসিয়া বালতি হাতে নিতেই বালতি বৃহদাকার ধারণ করিল। সে তৃপ্তি সহকারে সকল মানুষ ও ছাগলকে পানি পান করাইল। ছাগলগুলিও পানি পান করিয়া প্রস্থান করিল। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইহাই যে, শক্তিশালী ছাগলগুলি হইতেছে আরবের জনগণ আর যুবক ছাগলগুলি হইতেছে অনারব। ইমাম শাফি'ঈ বলেন, নবীগণের স্বপ্ন ওহী। হযরত আবূ বকরের (রা) দুর্বলতার অর্থ হইতেছে তাহার শাসনামলে সংক্ষিপ্ততা এবং অনতিবিলম্বে তাহার ইন্তিকাল হইবে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১১৫)।

হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) অসুস্থ অবস্থায় আমাকে বলিলেন, তুমি তোমার পিতা ও ভ্রাতাকে ডাকিয়া আন। আমি আবূ বকরকে একটি কাগজ লিখিয়া দিব। কারণ আমার আশংকা হয় যে, নানাজনে নানা কথা বলিবে এবং অনেকেই আশা করিবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা কেবল আবূ বকরকে চাহেন (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১১৫)।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমার পরে ১২জন খলীফা হইবে। আবূ বকর (রা) আমার পরে অল্প সময় থাকিবে। অতঃপর তিনি হযরত

'উমার (রা) সম্পর্কে বলেন, সে শহীদ হইবে। অতঃপর তিনি হযরত 'উছমান (রা)-কে বলেন, মানুষ তোমার সেই জামা খুলিয়া ফেলিতে চাহিবে যাহা আল্লাহ তোমাকে পরিধান করাইবেন। আল্লাহর কসম! তুমি সেই জামা খুলিয়া ফেলিলে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যে পর্যন্ত সুচের ছিদ্র দিয়া উট প্রবেশ না করিবে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১১৫)।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, বানূ মুস্তালিকের লোকেরা হযরত আনাসকে বলিলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করুন, আমরা আগামী বৎসর আসিয়া যদি তাঁহাকে না পাই তাহা হইলে যাকাতের অর্থ কাহাকে প্রদান করিব। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহাদেরকে বলিয়া দাও, যাকাতের অর্থ আবূ বকরকে প্রদান করিবে। আমি এই কথা তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিলাম। তাহারা বলিল, যদি আবূ বকর (রা)-কে না পাই, তাহা হইলে কাহাকে দিব? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 'উমার (রা)-কে দিবে। তাহারা আবার প্রশ্ন করিল, যদি 'উমার (রা)-কে না পাই তাহা হইলে কাহাকে দিব? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিলেন, 'উছমানকে দিবে। যেই দিন 'উছমান শহীদ হইবে সেই দিন তোমাদের উপর বিপদ নামিয়া আসিবে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১১৫)।

হযরত জাবির ইবন সামুরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'আলী (রা)-কে বলেন, তুমি আমীর ও খলীফা হইবে এবং শাহাদাত লাভ করিবে। তোমার দাড়ি তোমার মাথার রক্তে রঞ্জিত হইবে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১১৫)।

ছাওর ইবন মাজযা (রা) বর্ণনা করেন, জামাল যুদ্ধে আমি যখন তালহার নিকট গেলাম, তখন তাহার মধ্যে সামান্য প্রাণ স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন দলের লোক? আমি বলিলাম, আমি হযরত 'আলী (রা)-এর সহচরগণের একজন। হযরত তালহা বলিলেন, হাত বাড়াও। আমি বায়'আত করিব। আমি হাত বাড়াইলে তিনি অঙ্গীকার করিলেন। সেই মুহূর্তেই তিনি শাহাদাত বরণ করিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া এই ঘটনা হযরত 'আলী (রা)-কে বলিলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহু আকবার। রাসূলুল্লাহ (স) সত্যই বলিয়াছেন, "আমার বায়'আত গ্রহণ না করিয়া তালহা জান্নাতে যাইবে, ইহা আল্লাহ্র পছন্দ নয়" (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১১৫)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবূ বকর, 'উমার, 'উছমান, 'আলী, তালহা ও যুবায়র (রা) সহ হিরা পাহাড়ে ছিলেন। এই সময় একটি বড় পাথর নড়িয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, হে পাথর! থামিয়া যাও, নড়াচড়া করিও না। তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও একজন শহীদ রহিয়াছে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১২৪)।

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ, জা'ফর ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার শহীদ হওয়ার সংবাদ মদীনায় পৌঁছিবার আগেই মানুষকে জানাইয়া দেন যে, যায়দ পতাকা হাতে লইয়াছে এবং শাহাদাত বরণ করিয়াছে। তারপর জা'ফর পতাকা হাতে লইয়াছে এবং সেও শহীদ হইয়াছে। তারপর 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা পতাকা হাতে নিয়াছে। সে শহীদ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) যখন এই সংবাদ দিতেছিলেন, তখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। অবশেষে খালিদ ইবন ওয়ালীদ এই পতাকা হাতে

তুলিয়া নিল। সে আল্লাহ তা'আলার অন্যতম তরবারি। তাহার হাতেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করিয়াছেন (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব, গাযওয়া মূতা মিন আরদিশ শাম, ২খ., পৃ. ৬১১)।

উওয়ায়স আল-কারনী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত 'উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, ইয়ামানের জনৈক ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসিবে। ইয়ামানে কেবল তাহার মাথা থাকিবে। তাহার শরীরে সাদা দাগ থাকিবে। ইহা দূর করার জন্য সে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার সাদা দাগ দূর করিয়া দিবেন, কিন্তু এক দীনার পরিমাণ জায়গা সাদা থাকিবে। তাহার নাম হইবে উওয়ায়স। কেহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ পাইলে তাহার উচিত হইবে তাহার দ্বারা নিজের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করানো (খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১২৯)।

আবূ যার (রা) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

উম্মু যার (রা) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ যার (রা)-এর ওফাত সন্নিকটবর্তী হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখ হইতে শুনিয়াছি, তিনি একদল লোক সম্পর্কে বলিলেন, (যাহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম) তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি জনমানবশূন্য প্রান্তরে মারা যাইবে। তাহার মৃত্যুর সময় একদল মুমিন উপস্থিত হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) যাহাদের সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই বসতি এলাকায় ইন্তিকাল করিয়াছেন। এখন জনমানবশূন্য প্রান্তরে একমাত্র আমিই রহিয়া গিয়াছি। তুমি পথের দিকে দৃষ্টি রাখিও। আমি বলিলাম, এখন রাস্তায় কেহই নাই। কিছুক্ষণ পর আমি কিছু লোককে দেখিলাম। আমি কাপড় নাড়িয়া তাহাদেরকে ডাকিলাম। তাহারা আসিয়া আবূ যারের নিকট দাঁড়াইল। তাঁহার ইন্তিকালের পর তাহার দাফনকার্য সমাধা করিয়া তাহারা চলিয়া গেল (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৩০)।

উম্মু ওয়ারাকার শাহাদাতের খবর

হযরত উম্মু ওয়ারাকা বিনতে নাওফাল (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন, যাহাতে আল্লাহ পাক আমাকে শাহাদাত নসীব করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি এখানেই থাক। এখানেই তোমার শাহাদাত নসীব হইবে। এজন্য উম্মু ওয়ারাকাকে শহীদ বলা হইত। তিনি কুরআন পাঠ করিতেছিলেন। তিনি একটি গোলাম ও একটি বাঁদীকে শর্তাধীনে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই গোলাম ও বাঁদী উভয়ে এক রাতে তাহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করে। হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফত কালে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। খলীফার নির্দেশে তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৩৪)।

হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা খলীফা উমার (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সেই উক্তি স্মরণ রাখিয়াছ যাহা তিনি

ফিতনা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন? হুযায়ফা বলিলেন, আমি। অতঃপর তিনি বসিলেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন, মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পাড়া-প্রতিবেশি সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ফিতনায় নিপতিত হয়—সালাম, সাদাকা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ তাহার সেই পাপকে মোচন করিয়া দেয়। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি নাই। সেই ফিতনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি যাহা সাগরের তরঙ্গের ন্যায় প্রবাহিত হইবে। হুযায়ফা (রা) বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই ফিতনা আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। কেননা সেই ফিতনা ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রহিয়াছে। 'উমার (রা) বলিলেন, দরজাটি কি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে, না খুলিয়া দেওয়া হইবে? তিনি বলিলেন, ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে। উমার (রা) বলিলেন, তাহা হইলে উহা আর বন্ধ করা যাইবে না। আমি বলিলাম, হাঁ। (শাকীক বলিলেন) আমরা হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, উমার (রা) কি দরজাটি সম্পর্কে জানিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ (বুখারী, কিতাবুল ফিতনা, বাব, সমুদ্রের উর্মি মালার ন্যায় ফিতনা প্রকাশ পাইবে, ২খ., পৃ. ১০৫১)।

হযরত আয়উব ইব্‌ন বাশীর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) সফরে যাওয়ার পথে হাররায় পৌঁছিয়া ইন্নালিল্লাহ...... পাঠ করিলেন। সাহাবা কিরাম ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, তোমাদের পরে আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোকগণ এই হাররায় নিহত হইবে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪১)। বায়হাকী হাসান হইতে বর্ণনা করেন, হাররার যুদ্ধে মদীনার লোকজনকে সমূলে হত্যা করা হয় (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪১)।

হযরত মালেক ইব্‌ন আনাস (রা) বর্ণনা করেন, হাররার যুদ্ধে সাত শত হাফিজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন। তাহাদের তিন শত ছিলেন সাহাবী। এই ঘটনা ইয়াযীদের শাসনামলে সংঘটিত হয়। বায়হাকী মুগীরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মুসলিম ইব্‌ন 'উকবা তিনদিন পর্যন্ত মদীনায় লুণ্ঠন কার্য চালায় এবং এক হাজার কুমারীর ইযযত হরণ করে। লায়ছ ইবন সা'দ বর্ণনা করেন, হাররার যুদ্ধ ৬৩ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের তিন দিন বাকী থাকিতে বুধবার দিন সংঘটিত হয় (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪২)।

'উবাদা ইব্‌ন সামিত বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন; ভবিষ্যতে এমন শাসকবর্গ আসিবে, যাহারা দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকিয়া বিলম্বে নামায আদায় করিবে। তোমরা তাহাদের সহিত নফলস্বরূপ নামায আদায় করিবে। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) বলেন, ইহারা হইল বানূ উমায়্যার শাসকবর্গ। যাহারা বিলম্বে নামায পড়ার ব্যাপারে পরিচিত। অবশ্য খলীফা হযরত উমার ইব্‌ন আবদুল আযীযের আগমনের পর অবস্থায় পরিবর্তন হয়। তিনি যথা সময়ে নামায পড়ার রীতি প্রবর্তন করেন (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪২)।

'আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র বর্ণনা করেন, বাশীর ইব্‌ন সা'দ আপন পুত্র নু'মান ইব্‌ন বাশীরকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই পুত্রের জন্য দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে তোমার সমমর্যাদায় পৌঁছিবে। তাহার পর সে সিরিয়া যাইবে। সেখানকার মুনাফিকরা তাহাকে হত্যা করিবে।

ইব্ন সা'দ মাসলামা ইব্ন মুহারিব হইতে বর্ণনা করেন, মারওয়ানের খিলাফাতকালে দাহ্হাক ইব্ন কায়স মারজ রাহিতে নিহত হন। সেই সময় নু'মান ইব্ন বাশীর হিম্স হইতে পলায়ন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তখন হিমসের গভর্নর ছিলেন। তিনি মারওয়ানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। হিমসবাসীরা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করে এবং হত্যা করে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪৩)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের শেষ যুগে এমন লোক আসিবে যাহারা মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করিবে। এমন হাদীছ বর্ণনা করিবে, যাহা তোমরা এবং তোমাদের প্রবীণগণ কেহই শুনে নাই। তোমাদের উচিত এমন লোক হইতে বাঁচিয়া থাকা (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪৩)।

ওয়াসিলা ইব্নুল 'আসকা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, কিয়ামত সংঘটিত হইবে না যে পর্যন্ত ইবলীস বাজারে ঘুরাফিরা করিয়া এই কথা প্রচার না করিবে যে, অমুকের পুত্র অমুক আমার নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছে। হযরত ইব্ন মাস'উদ (রা) বর্ণনা করেন, শয়তান এক ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করিয়া মানুষের নিকট মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করিবে। ফলে মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪৩)।

ওয়ালীদ ইবন 'উকবা বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীরা তাহাদের শিশুদেরকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করে। তিনি শিশুদের মাথায় স্নেহের হাত বুলান এবং দু'আ করেন। আমার জননীও আমাকে লইয়া তাঁহার নিকট আসেন। আমার শরীরে সুগন্ধি মাখা ছিল। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইলেন না এবং স্পর্শও করিলেন না। বায়হাকী বলেন, ওয়ালীদের ব্যাপারে এই আচরণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভবিষ্যত জ্ঞানের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, ওয়ালীদ এই বরকত হইতে বঞ্চিত থাকুক। 'উছমান (রা)-এর সময় তিনি গভর্নর ছিলেন। তিনি শরাব পান করিতেন এবং নামাযে বিলম্ব করিতেন। তাহার এইসব বদভ্যাসের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহার সঙ্গে এইরূপ করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪৪)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের প্রত্যেকের একাত্তর ফিরকা কিংবা বাহাত্তর ফিরকা ছিল, আর আমার উম্মত তেহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হইবে। তাহারা প্রবৃত্তির পূজা করিবে। একটি ফিরকা ছাড়া সকলেই জাহান্নামে যাইবে। আমার অনুসারী জামা'আত জাহান্নামী হইবে না। আমার উম্মতের মধ্যে এমন সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করিবে, যাহারা খেয়াল-খুশীর অনুসরণে অতীত সম্প্রদায়সমূহের অনুগামী হইবে, যেমন কুকুর তাহার মনিবের অনুগামী হয়। এই উম্মতের শিরা-উপশিরায় কু-প্রবৃত্তি প্রবিষ্ট হইবে (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪৫)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কিয়ামত কায়েম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানগণ ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই না করিবে। মুসলমানগণ তাহাদিগকে হত্যা করিবে। তাহারা প্রস্তর অথবা বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করিলে প্রস্তর বা বৃক্ষ বলিবে, হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা! এই তো আমার পশ্চাতে ইয়াহূদী। তাহাকে হত্যা

কর। গারকাদ নামক বৃক্ষ এই কথা বলিবে না, কারণ উহা হইতেছে ইহূদীদের বৃক্ষ (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস-সা'আত, বাব লা তাকূমুস-সা'আতু হাত্তা তাআ'বুদু দাউসু জুলখালাসাত, ২খ., পৃ. ৩৯৬)।

হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কিয়ামতের পূর্বে আবার লাত-'উযযার পূজা আরম্ভ হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে, তিনিই তাঁহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর উহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা উহা অপছন্দ করে। এই আয়াত নাযিলের পর আমি মনে করিয়াছিলাম, এই ওয়াদা পূর্ণ করা হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহা অবশ্যই হইবে। তবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করিবেন ততদিন তাহা বলবৎ থাকিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, আয়াতসমূহের তরজমা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খৃ.; (২) কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপতী (র), আত-তাফসীরুল মাযহারী, মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা, ১২২৫ হি.; (৩) সহীহ্ আল-বুখারী, আসাহ্হুল মাতাবি', দেওবন্দ ১৯৮৫ খৃ., কিতাবুল মাগাযী, ২খ. কিতাবুল ফিতান, ২খ.; (৪) তিরমিযী শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, কিতাবুল ফিতান, ৪খ.; (৫) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (র), মাদারেজুন নুবূওয়াত, অনু. মুফতি গোলাম মঈনউদ্দীন (উর্দূ), দিল্লী ১৯৯২ খৃ., ১খ.; (৬) আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র), আল-খাসায়েসুল কুবরা, বৈরূত, রজব ১৩২০ হি., ২খ.; (৭) সহীহ্ মুসলিম, কুতুব খানা রহীমিয়া, দেওবন্দ; (৮) আবূ দাউদ শরীফ, ৫খ., ই.ফা.বা.; (৯) আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী (র), আসাহ্হুস সিয়ার, কুতুব খানা রহীমিয়া, দেওবন্দ, সাহারান পুর, ১৩৫১ হি./১৯৩২ খৃ.; (১০) বদরে আলম মিরাঠী, তরজমানুস সুন্নাহ (আরবী), নাদওয়াতুল মুসান্নিফীন, উর্দূ বাজার, দিল্লী, ৪খ., ১ম সংস্করণ, ১৩৮৭ হি./১৯৬৮ খৃ.; (১১) মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী, জা'আল হক (উর্দূ), মাদরাসা গাউছিয়া নঈমিয়া, পাকিস্তান, ১৩৮৫ হি./ ১৯৬৬ খৃ.।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রস্তর সংক্রান্ত মু'জিযা

প্রস্তর খণ্ড নরম হওয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি উল্লেখযোগ্য মু'জিযা। প্রস্তব খণ্ডও তাঁহার ব্যবহারের জন্য নরম ও আরামদায়ক হইত। হাদীছ শরীফে ও সীরাত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত দাউদ (আ)-এর হাতের স্পর্শে লোহা নরম হইয়া যাইত। আর আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য কঠিন প্রস্তর কোমল হইয়া যাইত।

হাফিজ আবূ না'ঈম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হেরা গুহাকে ইবাদতের জন্য নির্বাচন করিয়া পবিত্র মস্তক উহাতে প্রবেশ করাইয়াছিলেন তখন কঠিন প্রস্তরগুলি প্রশস্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, পাথরের এই পরিবর্তন তাঁহার জন্য হইয়াছিল। তাঁহার হাতের স্পর্শে বায়তুল মাকদিসের শক্ত পাথরগুলি আটার খামীরের ন্যায় নরম হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর সেই পাথরে তিনি আঙ্গুল দিয়া ছিদ্র করিয়া বুরাকের রশি বাঁধিয়াছিলেন (মাদারিজুন নুবূওয়্যা, ১খ.,পৃ. ২১৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) পাথরের উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলে পাথরে কদম মুবারকের ছাপ পড়িত। তাঁহার দুই কনুই মুবারকের চিহ্ন মক্কার পাথরে রহিয়াছে। তাঁহার ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন মদীনা মুনাওয়ারার বানূ মু'আবিয়ার মসজিদে বিদ্যমান রহিয়াছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩)।

শায়খ ইবন হাজার মাক্কী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যেখানে বসিতেন তাহার বিপরীত দিকে একটি দেওয়াল ছিল। সেইখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কনুই মুবারকের দাগ রহিয়াছে। সেই প্রাচীরটি ছিল পাথরের তৈরী। উলামায়ে কিরাম বলেন, আম্বিয়া কিরামের জন্য আল্লাহ্র কুদরতে লোহা, পাথর নরম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মক্কা মুকাররমার ঐ পাহাড় যেখানে রাসূলুল্লাহ (স) বকরী চরাইতেন, সেইখানে তাঁহার কদম মুবারকের দাগ রহিয়াছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১)।

হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা) বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য উপযুক্ত কোন জায়গা দেখিতে পাইয়াছ? আমি আরয করিলাম, এই প্রান্তরে নির্জন কোন জায়গা তো দেখিতেছি না। চারদিকে শুধু খেজুর গাছ আর পাথর। তিনি বলিলেন, গাছগুলিকে বল, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য উহারা যেন একত্র হইয়া যায়। পাথরগুলিকেও এই কথা বল। আমি নির্দেশ পালন করিলাম। কসম ঐ মহান আল্লাহ্র যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন! আমি দেখিলাম, গাছগুলি একটি অপরটির নিকট চলিয়া গিয়াছে, আর পাথরগুলি নরম হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছে। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) প্রয়োজন শেষ করিয়া বলিলেন, উহাদিগকে পরস্পর পৃথক হইতে বলিয়া দাও (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০)।

খন্দক যুদ্ধের সময় সকল সাহাবী মিলিয়া মদীনার চারিপাশে শত্রুদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে এক স্থানে এক বৃহৎ পাথর দেখা গেল। লোকজন উহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিল কিন্তু কোনক্রমেই উহা ভাঙ্গিতে পারিল না। কোদাল ও শাবলের আঘাতে একটুও খণ্ডিত করা গেল না। পরিশেষে লোকজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাজির হইয়া অবস্থা বর্ণনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) অকুস্থলে গমন করিলেন এবং কোদাল হাতে নিয়া পাথরটির উপর আঘাত হানিলেন। ফলে বিশাল পাথর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৮৮)।

আবূ না'ঈমের বর্ণনায় আসিয়াছে, হযরত 'আমর ইবন 'আওফ (রা) বলেন, পরিখা খননকালে আমাদের সম্মুখে একটি সাদা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট পাথর দৃষ্টিগোচর হইল। উহা আমাদের লোহার যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া দিল এবং পাথরটি ভাঙ্গা খুবই কঠিন হইয়া পড়িল। নবী করীম (স)-কে এই বিষয়ে অবহিত করিলে তিনি হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর হাত হইতে কোদাল নিলেন এবং এক আঘাতেই বিদ্যুৎ-এর ন্যায় আলো বিচ্ছুরিত হইল (প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯)।

পরিশেষে আমরা বলিতে পারি, প্রস্তর খণ্ড খুবই কঠিন ও মজবুত। ইহা নরম ও কোমল হওয়া স্বাভাবিকতার উর্ধ্বে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য শক্ত ও কঠিন পাথরকে নরম করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে কাফির-মুশরিকরা এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া হেদায়াত লাভ করিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, আসাহহুল মাতাবি', দেওবন্দ ১৯৮৫ খৃ.; (২) শায়খ আবদুল হক (র), মাদারিজুন নুবুওয়াত, অনু. মুফতী গোলাম মঈন উদ্দীন, দিল্লী ১৯৯২ খৃ.; (৩) শিবলী নো'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী (র), সীরাতুন নবী, ৪খ., দারুল ইশা'আত, উরদু বাজার, করাচী ১৯৮৪ খৃ.; (৪) কাযী 'আয়ায, আশ-শিফা, মাকতাবা, ফারাবী বৈরূত- দামিশক, তা. বি.; (৫) আস-সুয়ূতী (র), আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., দারুল কিতাব আল- ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি .।

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে পাথর কণার তাসবীহ্ পাঠ

ইহাও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মু'জিযাসমূহের অন্যতম। আবূ যার (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বকর, 'উমার ও 'উছমান (রা)-সহ একটি মজলিসে বসা ছিলেন। তিনি সাতটি পাথরের টুকরা হাতে উঠাইয়া লইলেন এবং উহা হইতে তাসবীহ্ পাঠের আওয়াজ শ্রুত হইল। এমনকি আমি উহা হইতে মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। পুনরায় তিনি যখন পাথরের টুকরা গুলি মাটিতে রাখিয়া দিলেন তখন উহার আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেল।

পুনরায় তিনি পাথরগুলি উঠাইয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে দিলেন। তখনও পূর্বেকার মত পাথরগুলি হইতে তাসবীহ্ পাঠের আওয়াজ শোনা গেল এবং আমি উহা হইতে মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শুনিতে পাইলাম।

অতঃপর তিনি পাথরগুলি মাটিতে রাখিয়া দিলে আবার উহাদের আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ (স) আবারও পাথরগুলি তুলিয়া 'উমার (রা)-এর হাতে দিলেন এবং পূর্বেকার মত পাথরগুলি হইতে মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শোনা গেল। তিনিও সেইগুলি মাটিতে রাখিলে উহার আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেল।

ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) পাথরগুলি উঠাইয়া হযরত 'উছমান (রা)-এর হাতে দিলেন। এবারও উহা হইতে পূর্বেকার ন্যায় তাসবীহ্ পাঠের আওয়াজ শ্রুত হইল এবং আমি উহা হইতে মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। অতঃপর তিনি পাথরগুলি মাটিতে রাখিয়া দিলে উহার আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেল (আল- ওয়াফা, ১খ., পৃ. ৩২৪-২৫)।

হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। হাদারামাওতের কয়েকজন প্রশাসক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিল, তাহাদের মধ্যে আশ'আছ ইব্‌ন কায়সও ছিলেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমরা আপনার জন্য একটি জিনিস লুকাইয়া রাখিয়াছি, বলুন তো উহা কি ? রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন ঃ সুব্হানাল্লাহ, ইহা তো গণকেরাই করিয়া থাকে, আর গণক তো জাহান্নামী। অতঃপর তাহারা বলিল, আমরা কিভাবে জানিব যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল ? তখন রাসূলুল্লাহ (স) এক মুষ্টি কংকর হাতে

লইয়া বলিলেন, এই ইহাই সাক্ষী দিবে যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। তাঁহার হাতের কংকর তাসবীহ্ পাঠ করিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা বলিল, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুস্তাফা, ফয়সলআবাদ, পাকিস্তান ১৩৯৭/১৯৭৮, ২য় সং., ১খ., ৩২৪-২৫; (২) জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল-কুবরা, দারুল সুতুবিল আরাবী, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২০ হি., ২খ., পৃ. ৭৪-৭৫; (৩) ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৩, ১ম সং, ৯খ., ৫০৩; (৪) হযরত রাসূলে করীম (স) জীবন ও শিক্ষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, মে, ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ৫৬৩।

মুহাম্মাদ আবদুর রব মিয়া

শত্রুদের দৃষ্টি হইতে উধাও হওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে অনেক সময় বিদ্রূপকারী শত্রুদের দৃষ্টি হইতে উধাও করিয়া রাখিতেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ٠

"আমি উহাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদেরকে আবৃত করিয়াছি, ফলে উহারা দেখিতে পায় না" (৩৬ ঃ ৯)।

একবার অভিশপ্ত আবূ জাহ্ল বলিল, আমি মুহাম্মাদ (স)-কে দেখিতে পাইলে এই করিব, সেই করিব। তখন নাযিল হয় এই আয়াত। লোকেরা তাহাকে বলিল, ঐ তো মুহাম্মাদ। কিন্তু সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায়? আমি তো তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৩ খ., পৃ. ১৫৬)।

ইমাম বাগাবী বলেন, আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে আবূ জাহ্ল ও তাহার সুহৃদ মাখযূমীকে লক্ষ্য করিয়া। আবূ জাহ্ল শপথ করিয়া বলিয়াছিল, আমি মুহাম্মাদকে সালাতরত অবস্থায় দেখিতে পাইলে পাথরের আঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিব। ইহার পর একদিন সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিতে পাইল সালাতরত অবস্থায়। সে একটি প্রস্তর খণ্ড হাতে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে আগাইয়া গেল কিন্তু তাহার হাত জড়াইয়া গেল তাহার গ্রীবার সহিত। পাথরটি পড়িল তাহার অন্য হাতের উপর। সে তাহার সাথীদের নিকট ফিরিয়া বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিল। পরক্ষণেই সে ধপাস করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। বানূ মাখযূম গোত্রের এক ব্যক্তি বলিল, ঠিক আছে, এবার আমিই এই পাথর দ্বারা তাহাকে হত্যা করিব। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইতেই আল্লাহ তা'আলা তাহার দৃষ্টি ছিনাইয়া লইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন সালাতে কুরআন পাঠ করিতেছিলেন। সে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনিতে পাইল কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। বাধ্য হইয়া সে ফিরিয়া আসিল তাহার সাথীদের নিকট, কিন্তু তাহাদিগকেও দেখিতে পাইল না। সাথীরা বলিল, কি হইল তোমার? সে বলিল, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিলাম না; অবশ্য তাঁহার কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনিতে ছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার! আমি মুহাম্মাদের দিকে আগাইয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, এক ভয়ংকর আকৃতির প্রাণী তাঁহার ও আমার মধ্যে আড়াল হইয়া মুখ বাঁকা অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছিল আর একটু অগ্রসর হইলে প্রাণীটি আমাকে খাইয়া ফেলিত (তাফসীরে মাযহারী, ৮ খ., পৃ. ৭২)।

وَاَخْرَجَ الْبَيْهَقِي فِي الدَّلَائِلِ مِنْ طَرِيْقِ السُّدِّيِّ الصَّغِيْرِ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ تَوَاصَوْا بِالنَّبِي ﷺ لِيَقْتُلُوْهُ مِنْهُمْ اَبُوْ جَهْلٍ وَالْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ فَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّيْ يَسْمَعُوْنَ قِرَاَتَهُ اَرْسَلُوْا اِلَيْهِ الْوَلِيْدَ لِيَقْتُلَهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى اَتَى الْمَكَانَ الَّذِيْ يُصَلِّي فِيْهِ فَجَعَلَ يَسْمَعُ قِرَائَتَهُ وَلاَ يَرَهُ فَانْصَرَفَ اِلَيْهِمْ فَاَعْلَمَهُمْ فَاَتَوْهُ فَلَمَّا انْتَهَوْا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ هُوَ يُصَلِّي فِيْهِ سَمِعُوْا قِرَائَتَهُ فَيَذْهَبُوْنَ اِلَى الصَّوْتِ فَاِذَا الصَّوْتُ مِنْ خَلْفِهِمْ فَيَذْهَبُوْنَ اِلَيْهِ فَيَسْمَعُوْنَهُ اَيْضًا مِّنْ خَلْفِهِمْ فَانْصَرَفُوْا وَلَمْ يَجِدُوْا اِلَيْهِ سَبِيْلاً ·

"বায়হাকী তাঁহার "দালাইল" গ্রন্থের সুদ্দী সগীরের সনদে কালবী হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইবন্ 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মাখযূম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক ঠিক করিল, তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবে। তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল আবূ জাহ্ল ও ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা। একদিন রাসূলুল্লাহ (স) সালাতরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনিতেছিল দুর্বৃত্তরা। প্রথমে আগাইয়া আসিল ওয়ালীদ। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিতে পাইল না। শ্রুত হইতেছিল তাঁহার কুরআন পাঠের আওয়াজ। সে ফিরিয়া আসিয়া সাথীদেরকে সব খুলিয়া বলিল। আর একজন উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু অগ্রসর হইতেই তাহার অবস্থাও হইল তথৈবচ। সে কেবল কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনিল কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সামনে অগ্রসর হইলে মনে হইল আওয়াজ আসিতেছে পিছনের দিক হইতে। সেই দিকে যাওয়া শুরু করিলে শুনিতে পাইল আওয়াজ আসিতেছে বিপরীত দিক হইতে। তাই বিফল হইয়া ফিরিয়া আসা ছাড়া আর কোন উপায় রহিল না"।

সেই কথাই বলা হইয়াছে সূরা ইয়াসীনের ৯ নং আয়াতে ঃ "আমি উহাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদিগকে আবৃত করিয়াছি, ফলে উহারা দেখিতে পায় না" (৩৬ ঃ ৯, প্রাগুক্ত, পৃ.৭২)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ঘোষণা করেন, وَاَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا "এবং তিনি তাহাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাহা তোমরা দেখ নাই" (৯ ঃ ৪০)।

'আইশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন পর্বতের গুহায়। 'উমার (রা) হইতে বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) রওয়ানা করিয়াছিলেন রাত্রিবেলায়। ইব্ন ইসহাক ও ওয়াকিদী বলিয়াছেন, তিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বসতবাড়ীর পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়াছিলেন। 'আইশা বিনতে কুদামা (রা) হইতে আবূ নু'আয়ম লিখিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমরা পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়াছিলাম, সামনে পড়িয়াছিল আবূ জাহ্ল। আল্লাহ তা'আলা

তাহার দৃষ্টিশক্তি রহিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাই সে আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই (প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ২০৯)।

আবূ নু'আয়মের বর্ণনায় আসিয়াছে, হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দেখিলেন, এক লোক গুহার মুখামুখি হইয়াছে। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লোকটি তো আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, কখনও না। তাহার সামনে রহিয়াছে ফেরেশতাদের পাখার আড়াল। একটু পরেই লোকটি তাহাদের দিকে মুখ করিয়া পেশাব করিতে বসিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আবূ বক্‌র! লোকটি আমাদিগকে দেখিলে এমন কাজ করিত না (প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ২১৩)।

হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) বর্ণনা করেন, আমি (ভয়ার্ত স্বরে) বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা গুহার মধ্যে আর উপরে শত্রুরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পায়ের দিকে তাকাইলেই তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আবূ বক্‌র! ঐ দুইজন সম্পর্কে তোমার ধারণা কি, যাহদের সংগে তৃতীয় জন স্বয়ং আল্লাহ? আবূ নু'আয়ম তাঁহার হিল্‌য়া পুস্তকে 'আতা ইব্‌ন মায়সারা সূত্রে বর্ণনা করেন, মাকড়সা জালের মাধ্যমে আড়াল করিয়াছিল দুইবার। একবার জালূতের আক্রমণ হইতে দাউদ (আ.)-কে আর একবার ছওর গিরি গুহায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২; বুখারী, ১ খ., কিতাবুল মানাকিব, পৃ. ৫১৬)।

একবার আবূ জাহ্‌ল একটি পরামর্শ সভা ডাকিল। সমাবেশে অভিশপ্ত ব্যক্তিটি বলিল, দেখ মুহাম্মাদ বলে, যদি তোমরা তাঁহার আনুগত্য কর তবে তোমরা বাদশাহ হইবে আর মৃত্যুর পর তোমরা চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করিবে। আর যদি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ কর তাহা হইলে অসম্মানে মৃত্যুবরণ করিবে এবং পরকালে আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত হইবে। আবূ জাহ্‌ল বলিল, আমি একটি প্রস্তাব করিতে চাই— প্রস্তাবটি আপনাদের মনঃপূত হইবে। সকলে বলিল, ঠিক আছে, এইবার আপনার কথাই শুনি। আবূ জাহ্‌ল বলিল, প্রত্যেক গোত্র হইতে একজন করিয়া তেজোদ্দীপ্ত যুবক নির্বাচন করা হউক। এইভাবে সকল যুবক একত্র হইয়া একযোগে আক্রমণ করিয়া তলোয়ারের আঘাতে মুহাম্মাদকে হত্যা করিবে। এইভাবে সকল গোত্র হত্যাকাণ্ডে শরীক হইতে পারিবে। আর মুহাম্মাদের নিকটজনেরা সকল গোত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস পাইবে না। খুব বেশী হইলে রক্তপণ দাবি করিতে পারিবে। সম্মিলিতভাবে সেই রক্তপণের দাবি পরিশোধ করাও আমাদের জন্য সহজ হইবে। নজদী শায়খ শয়তান বলিল, হাঁ, ইহা একটা প্রস্তাবের মত প্রস্তাব।

আবূ জাহ্‌লের প্রস্তাবটিকে নজদী শায়খের মত অন্যান্যরাও সর্বান্তকরণে মানিয়া লইল। ঐ সমাবেশেই প্রস্তাবটি কার্যকর করার দিনক্ষণ নির্ধারণ করিয়া ফেলিল। হযরত জিবরাঈল (আ) এই সংবাদ পৌছাইয়া দিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট। আরও বলিলেন, আবূ জাহ্‌লের দল ঠিক করিয়াছে, আজ রাত্রে তাহারা আপনাকে হত্যা করিতে আসিবে। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হিজরতের নির্দেশ দিয়াছেন। আজ রাতেই আপনাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে।

আবূ জাহ্‌লের দল আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহের চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের পরিকল্পনা ছিল ভোরবেলা মুহাম্মাদ যখন বাড়ীর বাহিরে আসিবে, তখন সকলে মিলিয়া একযোগে তাঁহার উপর তলোয়ারের আঘাত হানিবে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের উপস্থিতি টের পাইলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) এক মুষ্টি মাটি লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। ঐ মাটি আবূ জাহ্‌লের লোকদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, হাঁ, আমি এই রকম বলিয়াছি, যাহারা আমার লোকদের মাধ্যমে নিহত হইবে, তুমিও তাহাদের একজন। রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মাটি গিয়া পড়িল তাহাদের সকলের মস্তকে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের চোখের সামনে সৃষ্টি করিয়া দিলেন অন্তরায়। রাসূলুল্লাহ (স) পাঠ করিলেন ঃ

يٰسٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۚ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۚ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۚ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۚ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ.

"ইয়াসীন, শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত; তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। কুরআন নাযিলকৃত পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার এমন জাতিকে যাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, যাহার ফলে উহারা গফিল। উহাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হইয়াছে; সুতরাং উহারা ঈমান আনিবে না। আমি উহাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরাইয়াছি, ফলে উহারা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া গিয়াছে। আমি উহাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদিগকে আবৃত করিয়াছি; ফলে উহারা দেখিতে পায় না" (৩৬ ঃ ১-৯)।

এই পর্যন্ত পাঠ করিয়া তিনি তাহাদের সম্মুখ দিয়ে বাহির হইয়া গেলেন। তাহাদের কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ৫২-৫৩; তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর (দ্র.), প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৫৫-৫৮)।

আবূ লাহাবের স্ত্রীর নাম ছিল উম্মু জামীল। তাহার পিতার নাম ছিল হারব। সে ছিল আবূ সুফ্‌য়ান-এর বোন "হাম্মালাতাল হাতাব" বা কাষ্ঠ বহনকারিনী। নানা কটূক্তির মাধ্যমে সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মনে কষ্ট দিত।

একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির ছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, উম্মু জামীল আসিতেছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলাটি বড়ই বেআদব ও কটুভাষিণী। এইখান হইতে চলিয়া গেলে ভাল হইত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে আমাকে দেখিতে পাইবে না। উম্মু জামীল সেইখানে আসিয়া

বলিল, হে আবূ বক্র! তোমাদের নেতা আমার বদনাম করিয়াছে। হযরত আবূ বক্র (রা) বলিলেন, আমাদের নেতা কবিতাও বলেন না, কাহারও দোষও বলেন না। অভিশপ্ত মহিলাটি ব্যর্থ হইয়া চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) সেইখানেই ছিলেন, কিন্তু সে দেখিতে পায় নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠাইয়াছিলেন। সে আমাকে তাহার পাখা দ্বারা আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। ইমাম বুখারী (র) বলেন, সেই সময় ঐ দুষ্ট মহিলার হাতে একটি পাথর ছিল। সে বলিয়াছিল, মুহাম্মাদকে দেখিতে পাইলে এই পাথরের আঘাতে তাহার মুখ ভাঙ্গিয়া ফেলিব (নাউযুবিল্লাহ্) (আল-খাসাইসুল- কুবরা, ১খ., পৃ. ১২৮; মাদারিজুন নুবূওয়াত, ১ খ., পৃ. ৩৮৬-৮৭)।

আবূ ইয়া'লা, ইব্‌ন আবী হাতিম, বায়হাকী ও আবূ নু'আয়ম হযরত আসমা' বিন্‌তে আবূ বক্র (রা) হইতে বর্ণনা করেন, সূরা লাহাব নাযিল হওয়ার পর 'আওরা' বিন্‌তে হার্‌ব উত্তেজিত অবস্থায় রওয়ানা হইল। তাঁহার হাতে ছিল একটি পাথর। রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে বসিয়াছিলেন। হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-ও তাঁহার সহিত ছিলেন। 'আওরাকে আসিতে দেখিয়া হযরত আবূ বক্র (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! 'আওরা আসিতেছে। আমার আশংকা হয় যে, সে আপনাকে দেখিয়া ফেলিবে। রাসূলুল্লাহ! বলিলেন, সে আমাকে দেখিতে পাইবে না। 'আওরা আসিয়া হযরত আবূ বক্‌র (রা)-এর নিকট দাঁড়াইয়া গেল, রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিতে পাইল না। সে হযরত আবূ বক্‌র (রা)-কে বলিল, আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমার সাথী আমার নিন্দাবাদ করিয়াছে। হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, কা'বা গৃহের প্রভুর কসম! তিনি তোমার নিন্দা করেন নাই।

বায়হাকী এই বর্ণনাটি আসমা (রা) হইতে হুবহু বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে কথাগুলি এইরূপ— হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আমার সঙ্গী কবি নন্। তিনি কবিতা জানেন না। রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বকর (রা)-কে ইশারায় বলিলেন, আওরা-কে প্রশ্ন কর, আমার সঙ্গে আর কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় কি? সে আমাকে দেখে না। কারণ আমার ও তাহার মধ্যে একটি অন্তরাল স্থাপন করা হইয়াছে। আবূ বকর (রা) আওরা-কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, তুমি আমার সাথে উপহাস করিতেছ। আমি তো তোমাদের নিকট কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না (আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১২৭)।

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ নাযিল হওয়ার পর আবূ লাহাব জানিতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার নিন্দা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তখন সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) তখন আবূ বকর (রা)-এর সহিত কা'বা গৃহের পার্শ্বে অবস্থান করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার জন্য আবূ লাহাব সঙ্গে পাথর লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যখন সে তাহাদের নিকটবর্তী হইল তখন সে আবূ বকর (রা)-কে ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আল্লাহ তা'আলা তাহার দৃষ্টি হইতে তাঁহাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে আবূ বকর (রা)-কে বলিল, হে আবূ বকর! তোমার বন্ধু কোথায়? আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, সে আমার নিন্দাবাদ করিয়াছে।

আল্লাহ্‌র কসম। আমি যদি এই সময় তোমার সাথীকে পাইতাম তাহা হইলে এই পাথর তাঁহার মুখে নিক্ষেপ করিতাম (আশ্-শিফা, ১ খ., পৃ. ৬৮৪)।

اَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ قَالَ فَقِيْلَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللاَّتِ وَالْعُزّٰى لَئِنْ رَاَيْتُهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ لَاَطَاَنَّ عَلٰى رَقَبَتِهٖ اَوْ لَاُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِى التُّرَابِ قَالَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ زَعَمَ لِيَطَاَ عَلٰى رَقَبَتِهٖ قَالَ فَمَا مِنْهُ اِلاَّ وَهُوَ يَنْكُصُ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِىْ بِيَدَيْهِ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ مَالَكَ فَقَالَ اِنَّ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلاً وَاَجْنِحَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ دَنَا مِنِّىْ لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كَلاَّ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى..... كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ .

"আবূ হুরায়ারা (রা) হইতে বর্ণিত। আবূ জাহ্ল লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মাদ নিজ মুখমণ্ডল তোমাদের সামনে মাটিতে রাখে কি? তাহারা বলিল, হাঁ। আবূ জাহ্ল বলিল, লাত ও উয্যার কসম! আমি তাহাকে এইরূপ দেখিলে তাহার গর্দান পদদলিত করিব অথবা মুখমণ্ডল ধূলায় ধূসরিত করিয়া দিব। অতঃপর একদিন রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন সালাতরত ছিলেন, তখন আবূ জাহ্ল আগাইয়া আসিল। সেখানে উপস্থিত লোকেরা দেখিল, আবূ জাহ্ল হঠাৎ পিছনের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে এবং উভয় হাত দিয়া নিজেকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, আমার ও মুহাম্মাদের মধ্যে আগুনের একটি খাদ রহিয়াছে এবং কতকগুলি অদৃশ্য হাত কার্যকর দেখিতে পাইতেছি। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, সে আমার নিকট আসিলে ফেরেশ্তাগণ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিত। সেই সময় নাযিল হয়ঃ كَلاَّ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى (আল-খাসাইসুল কুবরা, ১ খ., পৃ. ১২৬)।

ইব্ন ইসহাক, বায়হাকী ও আবূ নু'আয়ম ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আবূ জাহ্ল বলিল, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা দেখিতেছ যে, মুহাম্মাদ আমাদের ধর্মের দোষ বাহির করে, আমাদের পূর্বপুরুষদের মন্দ বলে, আমদিগকে নির্বোধ সাব্যস্ত করে এবং আমাদের উপাস্যদিগকে গালি দেয়। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আগামী দিন পাথর লইয়া বসিব। যখন সে নামাযে দাঁড়াইবে এই পাথর দিয়া তাহার মাথা পিষ্ট করিয়া দিব। ইহার পর দেখিব তাহার গোত্র বনূ'আবদে মানাফ কি করিতে পারে। আবূ জাহ্ল সকালে উঠিয়া একটি পাথর লইয়া বসিয়া রহিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) সালাতে দাঁড়াইলেন। কুরায়শগণ আপন আপন মজলিসে বসিয়া গেল। তাহারা আবূ জাহ্লের কাণ্ড দেখিতেছিল। যখন রাসূলুল্লাহ্ (স) সিজদায় গেলেন, তখন আবূ জাহ্ল পাথর লইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া গেল। নিকটে পৌছিলে হঠাৎ সে বিবর্ণ হইয়া গেল এবং ভীত-বিহবল হইয়া পড়িল। সে পশ্চাতে হঁটিতে লাগিল এবং পাথরটি হাত হইতে

ফেলিয়া দিল। কুরায়শরা দৌড়িয়া আবূ জাহ্‌লের নিকট গেল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হইল? সে বলিল, আমি যখন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম, তখন একটি হৃষ্টপুষ্ট উট দেখিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! এই উটের মাথা, ঘাড় ও দাঁত যেমন দেখিলাম, কোন উটের তেমন দেখি নাই। মনে হইল, এই উট আমাকে খাইয়া ফেলিবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আ)। আবূ জাহ্‌ল আমার নিকট আসিলে সে তাহাকে ধরিয়া ফেলিত (আল-খাসাইসুল-কুবরা, ১খ., পৃ. ১২৬)।

وَاَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ لَئِنْ رَاَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَاَطَأَنَّ عَلٰى عُنُقِهٖ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ ذَالِكَ فَقَالَ لَوْ فَعَلَ لَاَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ.

"হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আবূ জাহ্‌ল বলিল, আমি মুহাম্মাদকে বায়তুল্লাহে সালাতরত অবস্থায় দেখিলে তাঁহার গর্দান পদদলিত করিব। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহার এই সংকল্পের কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন, আবূ জাহ্‌ল এইরূপ করিতে আসিলে ফেরেশতারা সর্বসমক্ষে তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৭৪০)।

বাযযার, তাবারানী, হাকেম, বায়হাকী ও আবূ নু'আয়ম ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদিন মসজিদে আমার উপস্থিতিতে আবূ জাহ্‌ল বলিল, মুহাম্মাদকে সিজদায় দেখিলে তাঁহার গর্দান পদদলিত করার জন্য আমি সংকল্প করিয়াছি। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট গমনপূর্বক আবূ জাহ্‌লের কুমতলবের খবর তাঁহাকে অবহিত করিলাম। তিনি কিছুটা রাগান্বিত অবস্থায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া মসজিদে যাইয়া সালাত শুরু করিলেন। তিনি সালাতে সূরা ইকরা পাঠ করিতেছিলেন। যখন اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى পর্যন্ত পৌঁছিলেন তখন এক ব্যক্তি আবূ জাহ্‌লকে বলিল, এই তো মুহাম্মদ! সে বলিল, আমি যাহা দেখিতেছি, তোমরা তাহা দেখিতেছ না। আল্লাহ্‌র কসম! আকাশের প্রান্ত আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭)।

আবূ নু'আয়ম 'ইকরিমা হইতে এবং তিনি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) মসজিদুল হারামে সশব্দে কুরআন তিলাওয়াত করিলে কুরায়শরা তাঁহার উপর নির্যাতন চালায় এবং তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হয়। হঠাৎ তাহাদের হাত তাহাদের গর্দানের সহিত বেড়ি হইয়া যায় এবং তাহাদের দৃষ্টিশক্তি রহিত হইয়া যায়। তাহারা কোন কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। এই অবস্থায় তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সকাশে হাযির হইয়া আরয করে, আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিতেছি। অতঃপর তিনি তাহাদের জন্য দু'আ করেন। ফলে তাহাদের অন্ধত্ব দূর হয় (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮)।

আবূ নু'আয়ম মু'তামির ইব্‌ন সুলায়মান হইতে, তিনি তঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, জনৈক মাখযূমী মন্দ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দিকে অগ্রসর হইল। তাহার হাতে একটি পাথর ছিল। সে যখন নিকটে আসিল তখন তিনি সিজদায় ছিলেন। সে হাত তুলিল, সঙ্গে

সঙ্গে তাহার হাত অবশ হইয়া গেল, হাত হইতে পাথর আলাদা করার শক্তি রহিল না। সে তাহার সঙ্গী-সাথীদের নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহারা বলিল, তুমি কাপুরুষ। সে বলিল, আমি কাপুরুষতা দেখাই নাই। এই দেখ, পাথর আমার হাতেই রহিয়াছে। আমি ইহা আলাদা করিতে পারি না। তাহারা অবাক হইল। তাহারা পাথরে তাহার আঙ্গুলগুলি অবশ দেখিতে পাইল। অনেক চিকিৎসা করার পর পাথরটি আঙ্গুল হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইল (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮)।

আল-ওয়াকিদী ও আবূ নু'আয়ম 'উরওয়া ইব্নুয যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নাদর ইব্নুল হারিছ রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে কষ্ট দিত। একদিন গ্রীষ্মকালে তীব্র গরমের সময় দ্বিপ্রহর রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য যাইতেছিলেন। তিনি ছানিয়াতুল হুযনের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলেন। এই কাজে দূরে চলিয়া যাওয়াই তাঁহার অভ্যাস ছিল। নাদর বলিল, মুহূর্তে তিনি যেমন নির্জনে রহিয়াছেন, তাঁহাকে হত্যা করার জন্য এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। সে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া আপন গৃহে ফিরিয়া আসিল। পথিমধ্যে আবূ জাহ্লের সহিত তাহার সাক্ষাত হইলে সে বলিল, কোথা হইতে আসিতেছ? নাদর বলিল, আমি মুহাম্মাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহাকে হত্যা করা। কারণ সে একাকী ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ আমি অনেকগুলি সিংহ দেখিলাম। সেইগুলি মুখ হা করিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছিল। আমি ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আবূ জাহ্ল বলিল, ইহাও তাঁহার যাদু (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-২৯)।

তাবারানী, ইব্ন মান্দা ও আবূ নু'আয়মের রিওয়ায়াতে হাকামের কন্যা বর্ণনা করেন। আমার দাদা হাকাম আমাকে বলিয়াছেন, আমি তোমার নিকট একটি চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করিতেছি শুন। একদিন আমরা এই মর্মে অঙ্গীকার করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে পাকড়াও করিব। তখন আমরা একটি ভয়ংকর শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল যেন তিহামার পাহাড় চুরমার হইয়া গিয়াছে। আমরা জ্ঞান হারাইলাম। রাসূলুল্লাহ্ (স) নামায সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কোন বোধশক্তিই ছিল না। পরবর্তী রাতে আমরা আবার পূর্ববৎ অঙ্গীকার করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (স) মসজিদে আসিলে আমরা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, সাফা ও মারওয়া পহাড়দ্বয় আসিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া আমাদের ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে অন্তরাল হইয়া গেল। আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আল্লাহ্র কসম! আমাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে ইসলামে প্রবেশের তৌফিক দান করিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, শায়বা ইব্ন 'উছমান ইব্ন আবূ তালহা আমার নিকট বর্ণনা করেন, আর তিনি ছিলেন 'আবদুদ-দার গোত্রের একজন। আমি মনে মনে বলিলাম, আজই আমাদের মুহাম্মাদের নিকট হইতে রক্তের প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ। উল্লেখ্য, তাহার পিতা উহুদের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। সে বলিল, আজ আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করিব। আমি মুহাম্মাদকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁহার চারিপার্শ্বে ঘুরিতে লগিলাম। তাহার পর কি যেন আসিয়া আমার ও তাঁহার মধ্যখানে অন্তরায় হইল, এমনকি হৃদয় পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শেষ পর্যন্ত আর

মুহাম্মাদকে হত্যা করা সম্ভব হইল না। আমি উপলব্ধি করিলাম, আমাকে এই কাজ হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৬৫)।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বিদ্রূপকারী কাফির মুশরিকদের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য রাখিতেন, আবার কখনও অন্য কৌশল অবলম্বন করিতেন। এই মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ "আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে" (১৫ ঃ ৯৫)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সং, ১৯৬৮ খৃ.; (২) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআন আল-'আজীম, দারুল কুরআনিল কারীম, বৈরূত, তা. বি.; (৩) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাযহারী, মাকতাবায়ে রাশীদীয়া, কোয়েটা, ৪ ও ৮ খ., তা.বি.; (৪) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ., আশরাফ বুক ডিপো, দেওবন্দ তা.বি.; (৫) সহীহ আল-বুখারী, ১ ও ২ খ., আসাহ্হুল মাতাবি, দেওবন্দ ১৯৮৫ খৃ.; (৬) সহীহ মুসলিম, ২খ., মাকতাবায়ে রাশীদিয়া, দিল্লী, তা.বি.; (৭) ইমাম ইব্ন কায়্যিম জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ২খ., দারুল কিতাব ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা, বি.; (৮) কাযী ইয়াদ, আশ-শিফা, মাকতূবাতে ফারাবী, দামিশ্ক, ১খ., তা.বি.; (৯) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দিহলাবী, মাদারিজুন নুবূওয়াত, ১খ., আদাবী দুন্য়া, মিটিয়া মহল্লা, দিল্লী তা.বি.; (১০) আস্-সুয়ূতী, আল-খসাইসুল কুবরা, ১খ., দারুল কুতুব, আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা.বি.; (১১) এস. এম. মতিউর রহমান নূরী, মু'জিযাতুন নবী, ইফাবা ১৯৮৪ খৃ.; (১২) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪ খ., বৈরূত ১৯৭৫ খৃ.; (১৩) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, কুতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ ১৯৩২ খৃ.; (১৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., দারু সাদির বৈরূত, তা.বি.; (১৫) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৪০৪/১৯৮৪; (১৬) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী, দারুল ইশা'আত, করাচী ১৯৮৪ খৃ.।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

মানুষ ও জিনদের অনিষ্ট হইতে রাসূলুল্লাহ (স) নিরাপদ

রাসূলুল্লাহ (স) নবূওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হইয়া যেই দিন সাফা পর্বতে দাঁড়াইয়া মক্কার কুরায়শদের উদ্দেশ্যে ইসলামী দাওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন, সেই দিন হইতেই তিনি সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। ধীরে ধীরে নানা বাধা-বিঘ্নের প্রকাশ ঘটে। এক সময় জুলুম নির্যাতন সীমা অতিক্রম করে। ক্রমশ এমন অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার মদদ ও সাহায্য ব্যতীত এই অবস্থায় টিকিয়া থাকাই অসম্ভব, সফলতা লাভ করার তো প্রশ্নই উঠে না। যদি তাঁহার উপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতে রাসূলুল্লাহ (স) সাফল্যের এই সমস্ত দুর্গম বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেন ও সফলতা অর্জন করেন। ইহা সন্দেহাতীত যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁহার হিফাযত করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ٠

"হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হইতে আপনার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে, আপনি তাহা প্রচার করুন। যদি আপনি তাহা না করেন, তবে তো আপনি তাঁহার বার্তা প্রচার করিলেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন" (৫ ঃ ৬৭)।

এই আয়াত নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন। "হে লোকসকল ! আমার জন্য পাহারা দান অপসারিত কর, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিয়া দিয়াছেন" (তিরমিযী, ৫খ., পৃ. ৩৬৩, হাদীছ নং ৩০৪৬, বাংলা অনু. ইফাবা)।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (স)-কে রক্ষা করিবার তাৎপর্য হইল, মহান আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতে সকল ব্যবস্থায় তাহার পূর্ণ হিফাযত করা। মহান আল্লাহ তাঁহার দাওয়াতের প্রথমদিকে তাঁহার চাচা আবূ তালিব দ্বারা তাঁহার হিফাযত করিয়াছেন। আবূ তালিবের মৃত্যুর পর মুত'ইম ইবন 'আদী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন (আসাহহুস- সিয়ার, পৃ. ৫৭)। রাসূলুল্লাহ (স) তাইফ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় জিন্নদের একটি দল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে ও ইসলাম গ্রহণ করে (সূরা জিন্ন, আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৫৭)। পরিশেষে মদীনায় হিজরত করিবার পর মদীনাবাসী আওস ও খাযরাজ গোত্র তাহারা তাঁহার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। এইভাবে যখনই কোন মুশরিক আহলে কিতাব ও মুনাফিক, তাঁহার অনিষ্টের চেষ্টা করিয়াছে তখনই মহান আল্লাহ তাঁহাকে হিফাযত করিয়াছেন ও তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন (ইবন কাছীর, ২খ., পৃ. ৮৮-৮৯)।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিরাপত্তা বিধান ও তাঁহার শত্রুগণকে তাঁহার ক্ষতি করা হইতে বিরত রাখিবার অনেক ঘটনা ও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তদ্রূপ কিছু ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

উম্মু জামীল আবূ লাহাবের স্ত্রী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি শত্রুতায় সে তাহার স্বামী আবূ লাহাব অপেক্ষা কোন অংশেই কম ছিল না। উম্মু জামীল যখন জানিতে পারিল, তাহার এবং তাহার স্বামীর নিন্দা করিয়া কুরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছে তখন সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে খুঁজিতে খুঁজিতে কা'বা শরীফের নিকটে আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) সেই সময় কা'বা ঘরের পাশে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও ছিলেন। উম্মু জামীলের হাতে ছিল এক মুষ্ঠি পাথর। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছাকাছি পৌঁছামাত্র আল্লাহ তাহার দৃষ্টি কাড়িয়া লইলেন। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আর দেখিতে পায় নাই, হযরত আবূ বকরকে দেখিতে পাইতেছিল। আবূ বকর (রা)-এর সামনে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সাথী কোথায় ? আমি শুনিয়াছি তিনি আমার নিন্দা করেন। আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি তাঁহাকে পাইয়া যাই, তা হইলে তাঁহার মুখে এই পাথর ছুড়িয়া মারিব। দেখো আমিও একজন কবি। অতঃপর সে এই কবিতা শুনাইল ঃ

مذمما عصينا - وامره ابينا - ودينه قلينا ·

"মুযাম্মামের অবাধ্যতা করিয়াছি, তাহার কাজকে সমর্থন করি নাই এবং তাহার দীনকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি আপনাকে দেখিতে পায় নাই ? তিনি বলিলেন, না, দেখিতে পায় নাই। মহান আল্লাহ আমার ব্যাপারে তাহার দৃষ্টি কাড়িয়া লইয়াছিলেন (ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩৪২-৩৪৩; দালাইলুন নুবূওয়াহ, পৃ. ১৫০)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, একদা আবূ জাহল কুরায়শ সরদারদেরকে জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মাদ কি আপনাদের সামনে মাটিতে সিজদা করে ? তাহারা বলিল, হা। আবূ জাহ্ল বলিল, লাত এবং উয্যার শপথ! আমি যদি তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখি, তবে তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিব, তাঁহার চেহারা মাটিতে হেঁচড়াইব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-কে সালাত আদায় করিতে দেখিয়া আবূ জাহ্ল রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘাড়ে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইল। কিন্তু সকলে দেখিল যে, হঠাৎ আবূ জাহ্ল চিৎ হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি খাইতেছে এবং চিৎকার করিয়া বলিতেছে, বাঁচাও! বাঁচাও!! পরিচিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আবুল হাকাম! তোমার কি হইয়াছে ? আবূ জাহল বলিল, আমি দেখিলাম, আমার এবং মুহাম্মাদের মাঝখানে আগুনের বিরাট একটি পরিখা। ভয়াবহ সেই আগুনের পরিখায় দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে।

রাসূলুল্লাহ (স) এই কথা শুনিয়া বলিলেন, যদি সে আমার কাছে আসিত তবে ফেরেশতাগণ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি একটি করিয়া ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইত (ফাত্হুল বারী, ৮খ., পৃ. ৯৩৮-৯৩৯; হাদীছ নাং ৪৯৫৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৫৮)।

অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে, আবূ জাহ্‌ল বলিয়াছিল, হে কুরায়শ ভাইয়েরা ! আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ আমাদের ধর্মের সমালোচনা এবং আমাদের উপাস্য হইতে বিরত হইতেছে। আমাদের পিতা ও পিতামহকে গালমন্দ করিয়া যাইতেছে। এই কারণে আমি আল্লাহর সহিত অঙ্গিকার করিয়াছি যে, আমি একটি ভারি পাথর লইয়া বসিয়া থাকিব। মুহাম্মাদ যখন সিজদায় যাইবে, তখন সেই পাথর দিয়া তাঁহার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিব। অতঃপর যে কোন পরিস্থিতির জন্য আমি প্রস্তুত আছি। ইচ্ছা হইলে আপনারা আমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় রাখিয়া দিবেন অথবা আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবেন। কুরায়শরা এই প্রস্তাব শুনিয়া বলিল, কোন অবস্থাতেই আমরা তোমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় রাখিয়া দিব না। তুমি যাহা করিতে চাও করিতে পার।

পরদিন সকালে আবূ জাহ্‌ল একটি ভারি পাথর লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিল। কুরায়শরা একে একে সমবেত হইয়া আবূ জাহলের তৎপরতা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। রাসূলুল্লাহ (স) যথারীতি হাজির হইয়া সালাত আদায় করা শুরু করিলেন। তিনি যখন সিজদায় গেলেন তখন আবূ জাহ্‌ল তাহার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য পাথর লইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু পরক্ষণে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া এমন অবস্থায় ফিরিয়া আসিল যেন তাহার হাত পাথরের সহিত আটকাইয়া রহিয়াছে। কুরায়শের কয়েকজন তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আবুল হাকাম! তোমার কী হইয়াছে ? সে বলিল, আমি রাত্রিবেলা যেই কথা বলিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ করিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলাম, মুহাম্মদ এবং আমার মধ্যখানে একটা উট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আল্লাহর কসম! এত বড়, এত লম্বা ঘাড় ও দাঁতবিশিষ্ট উট আমি কখনও দেখি নাই। উটটি আমার উপর আক্রমণ করিতে চাহিতেছিল।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিলেন, উটের ছদ্মবেশে তিনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ)। আবূ জাহ্‌ল যদি আমার নিকট আসিত তবে তাহাকে পাকড়াও করা হইত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৫৭; সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৯৬-৯৭)।

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, ফাতিমা (রা) বলেন, একদিন কুরায়শ মুশরিকরা কা'বার হাতীমে লাত-'উয্‌যার কসম খাইয়া সমস্বরে বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা যদি মুহাম্মাদকে পাই তাহা হইলে তাহাকে হত্যা না করিয়া এই স্থান ত্যাগ করিব না। ফাতিমা (রা) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি ক্রন্দন করিতে করিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়া বলিলাম, তাহারা আপনাকে দেখিলে হত্যা করিবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, মা, চুপ কর। আমার জন্য উযূর পানি লইয়া আস। রাসূলুল্লাহ (স) উযূ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের পাশ দিয়াই মসজিদে গমন করিলেন। মুশরিকরা তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, এইতো মুহাম্মাদ! এই কথা বলিয়াই তাহারা তাহাদের মাথা অবনত করিল। এমনকি তাহাদের চিবুক বুকে গিয়া লাগিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের পাশে গিয়া এক মুষ্ঠি মাটি লইলেন এবং شاهت الوجوه বলিয়া তাহাদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। এই মাটি যাহাদের শরীরে লাগিয়াছিল, তাহারা সকলেই বদরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছে (দালাইলুন নুবূওয়াহ, পৃ. ১৫০)।

হাকাম ইবন আবিল 'আস বলেন, আমরা কতিপয় কাফির রাসূলুল্লাহ (স) কে হত্যা করিবার অঙ্গিকার করিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, রাত্রিবেলয় যখন রাসূলুল্লাহ (স) ঘর হইতে বাহির হইবেন, তখন তাঁহার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালানো হইবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন আমরা এক বিকট আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যাহাতে আমাদের এই আশঙ্কা হইল যে, হয়ত মক্কার সকল প্রাণী মৃত্যবরণ করিয়াছে। ঐ শব্দ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। রাসূলুল্লাহ (স) হারাম শরীফ হইতে সালাত আদায় করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে আমরা জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম।

পরবর্তী রাত্রেও আমরা একই উদ্দেশ্যে যথাস্থানে ওঁত পাতিয়া রহিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাদের নিকট পৌছামাত্র সাফা-মারওয়া পাহাড় আমাদের ও রাসূলের মাঝে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। ফলে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে কাফিরদের অনিষ্ট হইতে হিফাজত করিলেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ আমাদিগকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করিয়াছেন (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৬৮৪-৬৮৫; দালা'ইলুন নুবূওয়াহ, পৃ. ৫২৮-৫২৯)।

ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) উচ্চস্বরে মসজিদুল হারামে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করিতেছিলেন। নির্যাতন চালাইবার জন্য কুরায়শরা তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হয়। হঠাৎ তাহাদের হাত তাহাদের নিজ নিজ ঘাড়ের সহিত আটকাইয়া বেড়ীর মত হইয়া যায়। তাহারা দৃষ্টি শক্তিও হারাইয়া ফেলে। ফলে তাহারা আর কিছুই দেখিতে পাইল না (দালাইলুন নুবূওয়াহ, পৃ. ১৫৫)।

'উরওয়া ইবনুয যুবায়র বর্ণনা করেন, নাদর ইবনুল হারিছ রাসূলুল্লাহ (স)-কে ভীষণ কষ্ট দিত। গ্রীষ্মকালে একদিন দুপুরে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সানিয়্যাতুল হুযনের নিম্নাঞ্চলে গেলেন। নাদর তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া ভাবিল, তাঁহাকে হত্যা করিবার এমন উত্তম সুযোগ আর কখনও পাওয়া যাইবেনা। নযর তাহার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু হঠাৎ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। পথে আবূ জাহ্লের সহিত দেখা হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, নাদর কোথায় হইতে আসিয়াছ ? নাদর বলিল, মুহাম্মাদ নির্জনে ছিল, আমি তাঁহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ অনেকগুলি সিংহ উহাদের মুখ হা করিয়া আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিল। তাই ভীত হইয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম (দালাইলুন নুবূওয়াহ, পৃ. ১৬০)।

বানূ মুগীরার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে আসিবার পর তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। ফলে সে তাঁহাকে আর দেখিতে পায় নাই। অতঃপর ঐ ব্যক্তি তাহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার পরও দৃষ্টি শক্তি আর ফিরিয়া পায় নাই (মাদারিজুন নুবূওয়াত, ১খ., পৃ. ৩৮৭)।

মু'তামির ইবন সুলায়মান তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় বানূ মাখযূমের এক ব্যক্তি তাঁহার মাথায় আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে পাথর লইয়া আসে। সে তাঁহার উপর পাথর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে তাহার হাত পাথরের সহিত আটকাইয়া যায়। ফলে সে আর পাথরটি নিক্ষেপ করিতে পারে নাই। অতঃপর লোকটি তাহার সম্প্রদায়ের নিকট যাওয়ার পর লোকেরা তাহার হাত পাথরের সহিত লাগানো দেখিয়া অবাক হইয়া গেল এবং ঐ ব্যক্তিকে চিকিৎসার মাধ্যমে পাথর হইতে মুক্ত করিল (দালাইলুন নুবূওয়াহ, পৃ. ১৫৫)।

আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-সহ অনেক সাহাবায়ে কেরাম হইতে বর্ণিত। একবার মক্কার আবূ কুরায়স পর্বত হইতে কয়েকটি কবিতার শব্দ ভাসিয়া আসিল। যাহার মর্মার্থ ছিল- মুসলমানদেরকে হত্যা কর, তাহাদেরকে শহর হইতে বহিষ্কার করিয়া দাও। প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিও না। কাফিররা এই ঘোষণায় উৎসাহিত হইয়া মুসলমানদেরকে বলিতে লাগিল, গায়েব হইতেও তোমাদেরকে হত্যা করিবার এবং শহর হইতে বিতাড়িত করিবার নির্দেশ হইতেছে।

এই ঘটনায় মুসলমানদের মনে বড় আঘাত লাগিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিলেন, তোমরা নিশ্চিত থাক, মিছ'আর নামক এক ভ্রষ্ট জিন এই ঘোষণা দিয়াছে। আল্লাহ শীঘ্রই তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবেন।

উক্ত ঘটনার তৃতীয় দিবসে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কেরামকে সুসংবাদ দিয়া বলিলেন, আজ মিছ'আর নামক এক প্রভাবশালী জিন আমার নিকট আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছি আবদুল্লাহ। সে আমার নিকট মিছ'আরকে হত্যা করিবার অনুমতি চাহিলে আমি তাহাকে উহার অনুমতি দেই। সুতরাং মিছ'আর আজ মারা যাইবে। সাহাবায়ে কেরাম উৎফুল্ল চিত্তে ঐ জিনের মৃত্যুসংবাদের অপেক্ষা করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় সেই পাহাড় হইতে উচ্চস্বরে কয়েকটি কবিতার শব্দ শুনা গেল, যাহার মর্মার্থ ছিল, আমি মিছ'আরকে এই কারণে হত্যা করিয়াছি যে, সে অবাধ্যতা প্রদর্শন পূর্বক ন্যায় ও সত্যের অবমাননা করিয়া অকল্যাণ ও অসত্যের পথ সুগম করিয়াছে। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শানে অশালীন আচরণ করিয়াছে। আমি একটি ধারালো তলোয়ার দিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছি (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ৩২৩)।

মক্কার কুরায়শদের সভাগৃহ দারুন নাদওয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার জঘন্য প্রস্তাব পাশ হইবার পর হযরত জিবরাঈল (আ) ওহী লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাযির হইলেন। তিনি নবী করীম (স)-কে কুরায়শদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করিয়া বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মক্কা হইতে হিজরতের অনুমতি দিয়াছেন। কুরায়শ কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবননাশের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাড়ির চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। দুর্বৃত্তরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, তাহাদের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র অবশ্যই সফল হইবে। এমনি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'আলী (রা)-কে

তাঁহার বিছানায় শায়িত রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। অতঃপর তিনি এক মুষ্টি মাটি লইয়া কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতেই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া লইলেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স) কে আর দেখিতে পায় নাই। সেই সময় তিনি কুরআন কারীমের এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেছিলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ ·

"আমি উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি, ফলে তাহারা দেখিতে পায় নাই" (৩৬ ঃ ৯)।

অতঃপর তিনি তাঁহার গন্তব্যপানে রওয়ানা হইয়া গেলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৯৯-৩০০, হাদীছ ৩৯০৫৬, ইবন হিশাম, ২খ., পৃ. ৭২)।

কুরায়শদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার পর তাহারা যখন পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিল, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছেন, তখন তাহারা যেন উম্মাদ হইয়া গেল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসন্ধানে পাহাড়ে-প্রান্তরে উচু-নিচু এলাকায় সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনুসন্ধানকারীরা "ছওর" পর্বতের গুহার নিকট পৌছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছাকেই পূর্ণতা দান করেন। হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, উপরদিকে মস্তক উঠাইয়া তাকাইয়া দেখি কাফিরদের পা দেখা যাইতেছে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তাহাদের কেহ যদি একটুখানি নিচু হইয়া এইদিকে তাকায় তবে আমাদেরকে দেখিতে পাইবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আবূ বকর! বিষণ্ণ হইও না, আল্লাহ আমাদের সংগে আছেন (৯ ঃ ৪০)।

হযরত যায়দ ইবন আরকাম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) যেই রাতে আবূ বকর (রা)-সহ হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া ছওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই রাতে মহান আল্লাহর হুকুমে কোথা হইতে কবুতর আসিয়া গুহার মুখে বাসা তৈরি করিয়া তৎক্ষণাৎ ডিম পাড়িল। গুহার প্রবেশপথেই জাল বুনন করিল মাকড়সা। রাসূলুল্লাহ (স)-কে অন্বেষণকারী কুরায়শ দল গুহার মুখে আসিয়া বলিতে লাগিল, মুহাম্মাদ এবং তাহার সংগী এই গুহায় প্রবেশ করিলে গুহার প্রবেশপথে কবুতর ও মাকড়সার বাসা এইভাবে অক্ষত থাকিত না। কাফিররা তাঁহাদের এতই নিকটবর্তী হইয়াছিল যে, গুহাভ্যন্তর হইতে তাহারা কাফিরদের কথার শব্দ শুনিতেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তথায় কবুতর ও মাকড়সা পাঠাইয়া স্বীয় হাবীবকে কাফিরদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩০০, হাদীছ ৩৯০৫)।

হিজরতের সময় এক রাখাল রাসূলুল্লাহ (স) ও আবূ বকর (রা)-কে দেখিয়া দ্রুত দৌড়াইয়া কুরায়শদেরকে সংবাদ দিতে গেল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি তাহাদের নিকট পৌছিবার পর সে ভুলিয়া গিয়াছে কেন সে দৌড়াইয়া আসিয়াছে ? অতঃপর সেই লোক আবার তাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে (মাদারিজুন নুবূওয়াত, ১খ, পৃ. ৩৮৮; আশ শিফা, ১খ., পৃ. ৬৮৮)।

হিজরতের ঘটনা প্রসঙ্গে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলিয়া পড়িবার পর আমরা যাত্রারম্ভ করি। তখন কুরায়শদের নেতৃত্বের পুরস্কার লোভী গোয়েন্দা বাহিনীর মধ্যে হইতে সুরাকা নামক এক ব্যক্তি আমাদের পশ্চাতে ছুটিয়া আসে। এক পর্যায়ে সে আমাদের এতই নিকটে আসিয়া যায় যে, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ধরা পড়িয়া যাইতেছি। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সুরাকার প্রতি অভিসম্পাত করিয়া বলিলেন ঃ

اللهم اكفنا شره بما شئت .

"হে আল্লাহ! আপনি যেইভাবে চাহেন আমাদেরকে তাহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করুন"।

উহার ফলে তাহাকেসহ তাহার অশ্বের পা পেট পর্যন্ত প্রোথিত হইয়া যায়। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া সে বলিল, আমি তোমাদেরকে দেখিলাম যে, তোমরা আমাকে অভিসম্পাত দিতেছ। আমার অনুরোধ, তোমরা আমার জন্য দু'আ কর। আল্লাহর শপথ! তোমাদের অনুসন্ধানকারীদের গতি অন্য দিকে ফিরাইয়া দিব। তাহার অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (স) তাহার জন্য দু'আ করিয়া বলেন ঃ

اللهم ان كان صادقا فاطلق فرسه .

"হে আল্লাহ! সে যদি সত্যবাদী হয় তাহা হইলে তাহার ঘোড়াকে মুক্তি দিন"।

ফলে সুরাকা এই আকস্মিক বিপদ হইতে মুক্তি পায়। অতঃপর সে ফিরিয়া গেল এবং সেই সংগে কোন লোকের সহিত দেখা হইলে তাহাকেও ফিরাইয়া দিত (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩০২, ৩০৪, হাদীছ ৩৯০৬, ৩৯০৮; মাদারিজুন নুবূওয়াত, ২খ., পৃ. ১০৪)।

হিজরতের পথে কাফেলার একটা উট অকেজো হইয়া গেল। এই অবস্থায় হঠাৎ দেখা গেল, অনতিদূরে বনী সাহম গোত্রের সরদার বিরাট একটি দল লইয়া পুরস্কারের লোভে আকৃষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহাদেরকে দেখিয়া আবূ বকর (রা) ভীষণ ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাহারা কাছাকাছি আসিলে রাসূলুল্লাহ (স) অগ্রসর হইয়া গোত্রের সরদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? লোকটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুবারক চেহারা দেখিয়া, তাঁহার পবিত্র কণ্ঠস্বর শুনিয়া অন্তরে ভয় ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। বিনীতভাবে উত্তর দিল, আমার নাম আবূ আবদুল্লাহ বুবায়দা আল- আসলামী। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, برد امرنا "আমরা নিরাপদ হইয়া গেলাম"।

রাসূলুল্লাহ (স) পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন গোত্রের? সে উত্তর দিল, বানী সাহম গোত্রের। তিনি বলিলেন, خرج سهمك "তোমার জন্য ইসলামের অংশ নির্ধারিত হইয়া গেল"। রাসূলুল্লাহ (স) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন কওমের? সে উত্তর দিল, বানী আসলাম। তিনি বলিলেন, قد سلمنا "ব্যস, আমরা নিরাপদ হইয়া গেলাম"।

ভয়, বিস্ময় ও চমৎকারিত্বে বিমোহিত হইয়া সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা ভিন্ন উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলাম। দয়া করিয়া আমাদেরকে আপনার দলভুক্ত করিয়া লন অতপর।

اشهد أن لا اله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله ·

বলিয়া আবূ বুরায়দা ও তাহার সত্তরজনের কাফেলা মুসলমান হইয়া গেল (মাদারিজুন নুবূওয়াত, ২খ., পৃ. ১০৫)।

ইয়াহূদীদের চক্রান্ত হইতে রক্ষা ঃ আবদুর রহমান ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কুরায়শ কাফিররা আবদুল্লাহ ইবন উবায় এবং মূর্তীপূজকদিগকে এই মর্মে পত্র লিখিল, আপনারা আমাদের লোককে আশ্রয় দিয়াছেন। এই কারণে আমরা আল্লাহ্র কসম খাইয়া বলিতেছি, আপনারা হয় তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন অথবা তাহাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিন। যদি উহা না করেন তবে আমরা সর্বশক্তি দিয়া আপনাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িব এবং আপনাদের যোদ্ধা পুরুষদেরকে হত্যা করিব ও আপনাদের মহিলাদের সম্মান বিনষ্ট করিব।

এই চিঠি পাইবার পরই ইবন উবায় এবং তাহার মূর্তিপূজারী সাথীরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিবার পর তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাত করেন এবং বলেন, মনে হইতেছে মক্কার কুরায়শদের হুমকিতে তোমরা যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছ। কিন্তু উহা তোমাদের জন্য এতো মারাত্মক নয়, যতনা ক্ষতি তোমরা নিজেরা নিজেদের করিবে। কেননা তোমরা তো তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই কথা শুনিয়া তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল এবং যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিল। বদর যুদ্ধের পর মক্কার কুরায়শরা আবার ইয়াহূদীদের নিকট পত্র লিখিল, তোমরা ঘরবাড়ি ও দুর্গের অধিকারী। কাজেই তোমাদের উচিত আমাদের সঙ্গীর (মুহাম্মাদ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। অন্যথা আমরা তোমাদের সহিত যাহা করার করিব। আর আমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কোন পার্থক্য থকিবে না।

এইরূপ চিঠি পাইবার পর বানূ নাযীরের ইয়াহূদীরা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই মর্মে অবহিত করিল, আপনি আপনার সঙ্গীদের ত্রিশজন লইয়া আমাদের কাছে আসুন এবং আমাদের ত্রিশজন আলিম আপনার সংগে এক আলাদা স্থানে দেখা করিবে। তাহারা আপনার কথা শুনিবে। যদি তাহারা আপনার উপর ঈমান আনে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনিব। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের কথায় সম্মত হইলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইয়াহূদীদের পরিকল্পনা ছিল, রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্জনে আনিয়া হত্যা করিবে। ইহার জন্য তাহারা তরবারি লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বানূ নাযীরের এক মহিলা অবহিত হইয়া সে তাহার ভাই আনসারী মুসলমানের নিকট সংবাদ দিল। ঐ মহিলার ভাই রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই সম্পর্কে অবগত করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার পূর্বেই যেন ফিরিয়া আসেন। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে হিফাযত করেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৪২১, হাদীছ ৪০২৮, ৪০৩২; আবূ দাউদ, ৩খ, পৃ. ১৫৫, হাদীছ নং ৩০০৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) একদা তাঁহার কয়েকজন সাহাবাকে লইয়া বানূ আমেরের দুই ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে বানূ নাযীরের নিকট গমন করেন, যাহাদিগকে হযরত আমর ইবন উমায়্যা আদ-দামরী (রা) ভুলক্রমে হত্যা করিয়াছিলেন। তখন তাহারা বলিল, আপনি আপনার সংগীদেরকে লইয়া এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমরা ব্যবস্থা করিতেছি। এই কথার পর রাসূলুল্লাহ (স) ইয়াহূদীদের একটি দেয়ালের সহিত হেলান দিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় তাহারা গোপনে বলাবলি করিল, এই মুহূর্তের মত মুহাম্মাদকে এত নিকটে তোমরা আর কখনও পাইবে না। সুতরাং এমন কে আছে যে ঐ ঘরের ছাদে উঠিয়া বিরাট পাথর খণ্ড তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার উপদ্রব হইতে আমাদেরকে রক্ষা করিবে? তখন আমর ইবন জাহ্হাশ ইব্ন কা'ব বলিল, আমি পারিব।

সেই মুহূর্তে মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স)-র নিকট জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) দ্রুত সেই স্থান হইতে উঠিয়া মদীনার পথে রওয়ানা হইলেন। সাহাবীগণ তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এতো দ্রুত চলিয়া আসিলেন যে, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রাসূলুল্লাহ (স) কুচক্রী ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাহাবীদেরকে অবহিত করিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৪২০, হাদীছ ৪০২৮, ৪০৩২; ইবন হিশাম, ২খ., পৃ. ২৩৪)।

'আইশা (রা) বলেন, খায়বার যুদ্ধের পর সাল্লাম ইবন মিশকামের স্ত্রী যয়নব বিনত হারিছ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বকরির ভূনা গোশত উপঢৌকন হিসাবে পাঠায়। সেই নারী আগেই খবর লইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ বকরীর কোন অংশ বেশী পছন্দ করেন। তদনুযায়ী সে পছন্দনীয় অংশে বেশী করিয়া বিষ মিশ্রিত করে, অন্যান্য অংশেও বিষ মিশ্রিত করে। রাসূলুল্লাহ (স) পছন্দনীয় অংশের এক টুকরা মুখে দেন, কিন্তু চিবিয়াই ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, এই যে হাড় দেখিতেছ, ইহা আমাকে বলিতেছে, উহার মধ্যে বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে। যয়নবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবার পর সে স্বীকার করিল। তিনি বলিলেন, তুমি কেন এই কাজ করিয়াছ? সে বলিল, আমি ভাবিয়াছিলাম, যদি আপনি বাদশাহ হন তবে আমরা তাঁহার শাসন হইতে মুক্তি পাইব। আর যদি এই ব্যক্তি নবী হন তবে আমার বিষ মিশানোর খবর তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। এই বিষ মিশ্রিত গোশত ভক্ষণ করা হইতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে এইভাবে হিফাযত করিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৬৩৩, হাদীছ ৪২৪৯)।

বদর যুদ্ধের কয়েক দিন পরের কথা। 'উমায়র ইবন ওয়াহ্ব নামক এক কুরায়শ রাসূলুল্লাহ (স)-কে নানাভাবে কষ্ট দিত। এই 'উমায়র একদিন কা'বার হাতীমে বসিয়া সাফওয়ান ইবন উমায়্যার সহিত বদরের যুদ্ধে নিহতদের লাশ বদরের একটি নোংরা কূঁপে নিক্ষেপ করিবার দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিল। এক পর্যায়ে সাফওয়ান বলিল, আল্লাহ্র কসম! তাহাদের অনুপস্থিতিতে বাঁচিয়া থাকার মধ্যে কোন স্বাদ নাই। উত্তরে 'উমায়র বলিল, আল্লাহ্র কসম! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ। দেখো, আমি যদি ঋণগ্রস্ত না হইতাম, আমার পরিবার-পরিজনের যদি চিন্তা না থাকিত তাহা হইলে আমি মদীনায় গিয়া মুহাম্মাদকে হত্যা করিতাম।

সাফওয়ান সব কথা শুনিয়া 'উমায়রকে বলিল, তোমার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আমি তোমার পক্ষ হইতে ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব। তোমার পরিবারকে আজীবন আমার নিজের পরিবারের ন্যায় দেখাশুনা করিব। 'উমায়র বলিল, তবে আমাদের এই কথা যেন গোপন থাকে। সাফওয়ান বলিল, হাঁ।

অতঃপর 'উমায়র তাহার তরবারি ধারাল করিল এবং উহাতে বিষ মিশ্রিত করিয়া মদীনার পথে রওয়ানা হইল। মদীনায় পৌঁছিয়া সে মসজিদে নববীর সামনে উট বসাইতেছিল, এমতাবস্থায় 'উমার (রা)-এর দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। উমায়রকে দেখামাত্র 'উমার (রা) বলিলেন, এই নরাধম! আল্লাহর দুশমন! নিশ্চয় তুমি কোন খারাপ উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? হযরত 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে সংবাদ দিলেন যে, 'উমায়র তরবারি ঝুলাইয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আস।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসার পর তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উমায়র! তুমি কেন আসিয়াছ ? সে বলিল, আপনাদের কাছে আমাদের যে বন্দী রহিয়াছে তাহাদের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আসিয়াছি। তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে তোমার গলায় তরবারি কেন ? সে বলিল, আল্লাহ এই তরবারি নিপাত করুন, ইহা কি আর আমাদের কোন কাজে আসিবে ?

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যি করিয়া বল, কেন আসিয়াছ ? সে পুনরায় বলিল, যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। বরং তুমি এবং সাফওয়ান কা'বার হাতীমে বসিয়া কুরায়শদের লাশ কূপে ফেলিবার প্রসঙ্গ লইয়া আফসোস করিতেছিলে। তুমি এক পর্যায়ে বলিয়াছিলে, আমি যদি ঋণগ্রস্ত না হইতাম এবং আমার যদি পরিবার-পরিজন না থাকিত, তবে এই স্থান হইতে গিয়া মুহাম্মাদকে শেষ করিয়া দিতাম। এই কথা শুনিবার পর সাফওয়ান তোমার ঋণ এবং পরিবারের দায়িত্ব নিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমাকে হত্যার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক আমার এবং তোমার মধ্যে অন্তরায় হইয়া রহিয়াছেন।

'উমায়র বলিল, ইহা তো এমন ব্যাপার যাহা আমি ও সাফওয়ান ব্যতীত সেই স্থানে অন্য কেহ উপস্থিত ছিল না। কাজেই আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি, ইহা আল্লাহ ব্যতীত আপনাকে অন্য কেহ জানান নাই। এই বলিয়া 'উমায়র ইসলাম গ্রহণ করিলেন (ইবন হিশাম, ২খ., পৃ. ২২৭-২২৮)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, যেই রাত্রে এক দল জিনকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আকৃষ্ট করা হইয়াছিল আমি সেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত ছিলাম। ইবন মাস'উদ(রা) বলেন, একজন জিন অগ্নিশিখা লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে আসিল। তখন জিবরাঈল (আ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে একটি দু'আ শিক্ষা দিব, পাঠ করিলে তাহার অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যাইবে। অতঃপর জিবরাঈল বলিলেন, আপনি বলুন ঃ

اعوذ بكلمات الله التامة التى لايجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ فى الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقاً يطرق بخير يا رحمن ·

"আমি আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, যিনি বড়ই অনুগ্রহকারী এবং তাঁহার ঐসমস্ত পরিপূর্ণ কলেমার দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি যাহা নেককার অথবা বদকার অতিক্রম করিতে পারে না, ঐসব বস্তুর অনিষ্ট হইতে যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঐসব বস্তুর অনিষ্ট হইতে যাহা আসমান হইতে অবতরণ করে, ঐসব বস্তুর অনিষ্ট হইতে যাহা আসমানে আরোহণ করে, ঐসব বস্তুর অনিষ্ট হইতে যাহা যমীনে বিস্তার করিয়াছে, ঐসব বস্তুর অনিষ্ট হইতে যাহা যমীন হইতে বাহির হয় এবং রাত্রি ও দিনের ফিৎনার অনিষ্ট হইতে এবং প্রত্যেক রাত্রিতে আগমনকারী দুর্ঘটনার অনিষ্ট হইতে, ঐ আগমনকারী ঘটনা ব্যতীত যাহা কল্যাণ বহিয়া আনে। হে দয়ালু" (দালাইলুন নুবূওয়াহ্, পৃ. ১৪৯)।

হযরত জাবির (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত নাজদের দিকে সংঘটিত একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। উক্ত সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে অতিশয় কণ্টকযুক্ত বৃক্ষবেষ্টিত এক উপত্যকায় দেখিতে পাই যে, তিনি একটি গাছের নিচে অবতরণ করিয়া একটি ডালে তরবারি ঝুলাইয়া রাখিলেন। হযরত জাবির (রা) বলেন, লোকেরা তখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া উপত্যকায় গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিল। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম, সেই সুযোগে গাওরাস ইবনুল হারিছ নামক এক লোক আমার নিকট আসিয়া তরবারি ধারণ করিয়া আমাকে বলিল, আমা হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে ? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি উত্তর দিলাম "আল্লাহ"! আল্লাহ্র নাম শুনিবামাত্র তাহার দেহে কম্পন শুরু হইয়া তরবারিটি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল এবং সে সেইখানে বসিয়া পড়িল। এইবার রাসূলুল্লাহ (স) গাত্রোত্থান করিয়া তরবারিটি হাতে লইয়া বলিলেন, এখন তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে ? কোন উপায়ন্তর না দেখিয়া সে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই ক্ষমাসুলভ আচরণ দেখিয়া সে ইসলাম গ্রহণ করিল এবং স্বগোত্রের লোকদের নিকট যাইয়া বলিল, আমি মুহাম্মাদের চাইতে উত্তম মানুষ আর কখনও দেখি নাই (বুখারী, পৃ. ৫৭০, হাদিছ ২৯১৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৩)।

ফাদালা ইবন 'উমার (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স) যখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিতেছিলেন, তখন আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রাসূলুল্লাহ (স)-কে শেষ করিয়া দিব। কিন্তু আমি যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলাম তখন তিনি বলিলেন, ফাদালা মনে মনে কি ভাবিতেছ ? আল্লাহ্র রাসূলকে শহীদ করিয়া দিতে চাহিতেছ ? আমি বলিলাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর তিনি হাসিলেন এবং আমার জন্য দু'আ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মুবারক হাত আমার বুকে রাখিলেন। তখন আমার অবস্থা এমন হইল যে, পৃথিবীর সকল বস্তু

হইতে তিনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হইয়া গেলেন (মাদারিজুন নুবূওয়াত, ১খ., পৃ. ৩৮৯; আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৬৯২)।

মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে আরবের বিস্তীর্ণ এলাকার বিভিন্ন গোত্র হইতে আনুগত্য প্রকাশ ও সন্ধি স্থাপনের জন্য প্রতিনিধি দলসমূহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিতে থাকে। তেমনি এক প্রতিনিধি দল আসে বানূ আমের হইতে। এই প্রতিনিধি দলে আমের ইবন তুফায়ল, আব্বাদ ইবন কায়স এবং জাব্বার ইবন সালামা এই তিন নেতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

মূলত আমের ইবন তুফায়ল আসিয়াছিল কোন এক বাহানায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে। তাহার সঙ্গী আব্বাদকে সে বলিল, মুহাম্মাদের কাছে গিয়া একটা কিছু বাহানা করিয়া আমি তাহাকে অন্যমনস্ক করিব। তুমি এই সুযোগ তাঁহার উপর তরবারি চালাইবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া আমের বলিল, মুহাম্মাদ! একটু এই দিকে আসুন তো। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি আল্লাহ্র উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত আমি আসিব না। সে পুনরায় একই অনুরোধ জানাইল। রাসূলুল্লাহ (স) এইবারও প্রত্যাখান করিলেন। তখন সে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল, ঈশ্বরের নামে বলিতেছি, আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ঘোড়া এবং যোদ্ধা দিয়া দেশ ভরিয়া দির। তাহারা চলিয়া যাইবার পর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইয়া আল্লাহ! আমেরের দুরভিসন্ধি হইতে হিফাযত কর। পথে আমের আব্বাদকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি আব্বাদ? কথামত কাজ করিলে না কেন? পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র লোক, যাহাকে আমি সমীহ করিতাম। আজ হইতে আর তাহা থাকিল না।

আব্বাদ বলিল, আমার ব্যাপারে এত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিও না। তোমার কথামত যতবার আমি মুহাম্মাদকে মারিবার উদ্যোগ লইয়াছি, ততবারই তুমি আমার সামনে আসিয়া আড়াল হইয়াছ। তবে কি তরবারি দিয়া তোমাকেই মারিব? এইভাবে আল্লাহ তাঁহার হাবীবকে বাঁচাইয়া লইলেন (দালাইলুন নুবূওয়াত, পৃ. ১৬২-১৬৩)।

হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। এক পর্যায়ে তাঁহার সাহাবীগণ পিছু হটিয়া আসেন। পরিশেষে কাফিররা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে, তখন রাসূলুল্লাহ (স) খচ্চর হইতে নিচে নামিয়া যমীন হইতে এক মুষ্ঠি মাটি লইলেন এবং তিনি তাহাসহ কাফিরদের দিকে অগ্রসর হইয়া বলেন ঃ شاهت الوجوه "মুখমণ্ডল কদর্য হউক"। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের প্রতিটি ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় উক্ত মাটিদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। ফলে তাহারা সকলে পিছু হটিয়া যায় এবং মহান আল্লাহ কাফিরদের পরাজিত করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের হইতে প্রাপ্ত গনীমতের মাল সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করিয়া দেন (ফাতহুল-বারী, ৮খ., পৃ. ৩৯, হাদীছ ৪৩১৭)।

শায়বা ইবন 'উছমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন হুনায়নের যুদ্ধে যান তখন আমার পিতা ও চাচার কথা স্মরণ হইল। তাহাদেরকে হযরত 'আলী ও হামযা (রা) হত্যা করিয়াছিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, আজ মুহাম্মাদের উপর প্রতিশোধ লইব। যখন আমি

তাঁহার কাছে আগাইয়া গেলাম, দেখিলাম আব্বাস (রা) তাঁহার ডান পার্শ্বে। বামদিকে গেলাম দেখিলাম তাঁহার চাচাত ভাই আবূ সুফ্য়ান ইবনুল হারিছ তাঁহার বাম পার্শ্বে। অতঃপর আমি পিছন দিক দিয়া আসিলাম এবং একেবারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া গেলাম। যখন তরবারি দিয়া আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে উদ্যত হইলাম হঠাৎ বিদ্যুতের ন্যায় অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আসিয়া পড়িল। আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পিছনে সরিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ (স) আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, শায়বা! আমার কাছে আস। তিনি আমার বুকে হাত রাখিলেন। ইহাতেই আল্লাহ তা'আলা আমার ভিতর হইতে শয়তানী দূর করিয়া দিলেন। আমি তাঁহার পবিত্র চেহারার দিকে তাকাইবা মাত্রই তিনি আমার কাছে প্রাণের চাইতে প্রিয় হইয়া গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, শায়বা! যাও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৬৯১-৯২; দালাইলুন নুবূওয়াত, পৃ. ১৫১)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদু করার ফলে তাঁহার অবস্থা এমন হইল যে, তিনি যেই কাজ করেন নাই, তাহা সম্পর্কেও ধারণা হইত যে, তিনি কাজটি করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) এই ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন। অতঃপর তিনি একদিন 'আইশা (রা)-কে বলিলেন, আমার রোগটা কি, মহান আল্লাহ তাহা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন। (স্বপ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি আসিল, একজন শিয়রে এবং অন্যজন পায়ের কাছে বসিয়া গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্যজনকে বলিল, তাঁহার অসুখটা কি ? অন্যজন বলিল, ইনি যাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কে যাদু করিয়াছে ? উত্তর দিল, ইয়াহূদীদের মিত্র মুনাফিক লাবীদ ইবন আসাম। আবার প্রশ্ন করা হইল, কি বস্তুতে যাদু করিয়াছে ? উত্তর হইল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হইল, চিরুণীটি কোথায় ? উত্তর হইল, খেজুর ফলের আবরণীতে বির যারওয়ান কূপে একটি পাথরের নিচে চাপা দিয়া রাখা হইয়াছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সেই কূপের নিকট গিয়া বলিলেন, স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) 'আইশা (রা)-কে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, কূপের পানি মেহেন্দি ভিজা পানির মত হইয়া আছে। পরবর্তীতে জিনিসগুলি বাহির করিয়া আনিলেন। তাহাতে একটা চিত্র ছিল। চিত্রে একটা ধনুকের ছিলায় এগারটা গিরা ছিল। এই সময় সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হয়। এই সূরাদ্বয় পাঠ করিলে গিরাগুলি খুলিয়া যায়। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যান (ফাতহুল-বারী, ১০খ., পৃ. ২৭২-২৯০, হাদীছ ৫৭৬৩-৫৭৬৬; ইবন কাছীর, ৪খ., পৃ. ৬১২; আল-খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৯৯)।

ইসলামী বাহিনী তাবূক অভিযান হইতে বিজয়ের বেশে ফিরিবার পথে এক জায়গায় একটি ঘাটিতে ১২জন মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত ছিলেন হযরত আম্মার (রা) ও হযরত হুযায়ফা (রা)। অন্য সাহাবীগণ তখন দূরে ছিলেন। মুনাফিক কুচক্রীরা এই সময়কে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। ১২জন মুনাফিক নিজেদের চেহারা ঢাকিয়া অগ্রসর হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। তিনি হযরত হুযায়ফা (রা)-কে পাঠাইলেন। হুযায়ফা (রা) পিছনের দিকে গিয়া মুনাফিকদের বাহন উটগুলিকে এলোপাথাড়ি আঘাত করিতে লাগিলেন।

এই আঘাতের প্রভাবে আল্লাহ তাহাদেরকে দ্রুত পিছনের দিকে সরাইয়া দিলেন। মহান আল্লাহ এইভাবে তাঁহাকে তাহাদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করেন (আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৩৪; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৩৩১-৩২)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) ইসমাঈল ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, করাচী, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা.বি., ২খ.; (৩) ইবন হাজার আসকালানী ফাতহুল-বারী, ইন্ডিয়া, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, তা. বি., কিতাবুল জিহাদ, বাব নং ৮৪, ৮৭; ৬খ, কিতাবুল জিয়্যা, কিতাবুল মানাকিবিল আনসার, কিতাবুল মাগাযী, কিতাবুত তিব্ব, ১০খ.; (৪) ইসমাঈল ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, কায়রো, বৈরূত, ১৯৮৮ খৃ. / ১৪০৮ হি., ১খ.; (৫) আবূ নু'আয়ম আল-ইসবাহানী, দালাইলুন নুবূওয়াহ, ১৯৭৭ খৃ. / ১৩৯৭ হি., দ্বিতীয় সংস্করণ; (৬) আবুল ফাদল কাযী ইয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফ হুকূকিল মুসতাফা, তা, বি, ১খ.; (৭) ইবন হিশাম, সীরাতে ইবন হিশাম, আল-আযহার, তা. বি., ১খ.; (৮) আবুল বারাকাত আবদুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, ইন্ডিয়া, তা.বি.; (৯) আবদুল হক দেহলবী, মাদারিজুন নুবূওয়াত, উর্দূ অনুবাদ, মুফতী গোলাম মুঈনুদ্দীন, দিল্লী ১৯৯২ খৃ., ১খ.; (১০) আস-সুয়ূতী, আল খাসাইসুল কুবরা, বৈরূত-লেবানন, তা.বি.; ২খ.; (১১) ইবন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, বৈরূত-লেবানন ১৯৭৬ খৃ. / ১৩৯৫ হি. ৩খ.; (১২) আল-কাসতাল্লানী, মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১৯৭৩ খৃ. / ১৩৯৩ হি., ২য় সংস্করণ, ২খ.; (১৩) শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, বৈরূত ১৯৮১ খৃ. / ১৪০১ হি.; (১৪) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), বৈরূত ১৯৭৫ খৃ. / ১৩৯৫ হি.; (১৫) মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত, তা.বি., ১খ., ২খ.; (১৬) ইবন সায়্যিদিন্-নাস 'উয়ূনুল আছার, বৈরূত, তা.বি., ১খ.; (১৭) ইমাম বুখারী, আল জামিউস-সাহীহ, রিয়াদ ১৯৯৭ খৃ. / ১৪১৭ হি., কিতাবুল জিহাদ, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, বাব নং ৪৫, কিতাবুত তাফসীর, কিতাবুত তিব্ব.; (১৮) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, কায়রো ১৯৯৭ খৃ./১৪১৮ হি, কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল ফাদাইল; (১৯) ইমাম তিরমিযী, আল-জামি'উস-সুনান, কায়রো, তা.বি. কিতাবুত-তাফসীর, বাব. ৬৫, ৮৫; (২০) ইমাম আবূ দাঊদ, আস-সুনান, তা.বি., কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারা ওয়াল-ফাই, কিতাবুল আতইমা; (২১) ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ ফী হুদা খাইরিল ইবাদ, বৈরূত ১৯৯৭ খৃ. / ১৪১৮ হি., ২য় সংস্করণ, ৩খ; (২২) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, বৈরূত ১৯৮৪ খৃ. / ১৪০৪ হি., ৩য় সংস্করণ, ১খ., ৩খ.; (২৩) আলী ইবন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ৩খ.; (২৪) আবুল কাসিম আবদুর রহমান আল-খাছ'আমী, আর- রাওদুল উনুফ, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ. / ১৩৯৮ হি., ২খ., পৃ. ৫১; ৪খ.; (২৫) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, হায়াতে মুহাম্মাদ, তা.বি.।

মুহাম্মদ জাবির হোসাইন

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপস্থিতিতে প্রাচীরের বাক্যালাপ

আবূ নাঈম কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, হযরত আবূ উসায়দ (রা) বলেন, একদা মহানবী (স) তাঁহার পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা)-কে বলেন, হে আবুল ফাদল! আগামী কল্য আমি না আসা পর্যন্ত আপনি সন্তান-সন্ততিসহ কোথাও যাইবেন না। আপনার সহিত আমার প্রয়োজন আছে। পরের দিন ভোরে সকলে তাহার প্রতীক্ষায় রহিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আগমন করিলেন। তিনি সকলকে সালাম দিলে সকলেই তাঁহার সালামের উত্তর দিলেন।

তিনি প্রত্যূষের শুভ সমাচার জিজ্ঞাসা করিলে হযরত আব্বাস (রা) প্রত্যূষের শুভ সমাচার জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, সকলে পরস্পর মিলিত হইয়া বসুন। সকলে পরস্পর মিলিত হইয়া বসিলে তিনি তাঁহার চাদর মুবারক দ্বারা সকলকে ঢাকিয়া লইলেন, অতঃপর দু'আ করিতে লাগিলেন, "হে আমার পালনকর্তা! আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব আমার চাচা; পিতৃ সদৃশ। আর তাঁহার সন্তান-সন্ততি আমার পরিবারভুক্ত। অদ্য আমি স্বীয় চাদরের আবরণ দ্বারা তাহাদেরকে যেমন অন্তরাল করিয়াছি, তদ্রূপ তুমি তাহাদেরকে দোযখের আগুন হইতে দূরে রাখিও।" সঙ্গে সঙ্গে গৃহের দরজার চৌকাঠ, দেওয়াল, প্রাচীর সম্মিলিতভাবে আমীন আমীন বলিতে লাগিল। হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বায়হাকীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ, ৫০৫; কাযী 'ইয়ায, আশ-শিফা, ২খ., ৫৯০; মাদারিজুন নুবূওয়াত, ১খ, পৃ., ৩৫১; আবূ নাঈম, দালাইলুন নুবূওয়াহ, পৃ. ৩৭০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আস-সালিহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরিত ১৯৯৩ খৃ.; (২) কাযী 'ইয়ায, আশ-শিফা, মাকতাবা আল-ফারাবী, দামিশক, তা, বি.; (৩) শায়খ আবদুল হক, মাদারিজুন নুবূওয়াহ (উর্দূ), আদাবী দুনিয়া, পৃ. ৫১০, দিল্লী ১৯৯২ খৃ.; (৪) আবূ নু'আয়ম আহমাদ আল-ইসফাহানী, দালাইলিন নবূওয়াত, দাইরাতুল মা'আরিফিল-উছমানিয়া, হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণাত্য, ভারত, ১৯৭৭ খৃ.।

তালেব আলী

বাঘের বাক্যালাপ এবং মহানবী (স)-এর রিসালাত সম্পর্কে সাক্ষ্যদান

হযরত রাসূলে কারীম (স)-এর মু'জিযাসমূহের মধ্যে তাঁহার সহিত বাঘের কথা বলা এবং বাঘ কর্তৃক তাঁহার নবূওয়াত ও রিসালাতের সংবাদ অন্যের নিকট পৌছানো অন্যতম। এই ঘটনা বিভিন্ন সাহাবী হইতে কিছু কিছু শব্দের তারতম্য ও ঘটনার প্রেক্ষাপটের ভিন্নতাসহ হাদীছ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু রিওয়ায়াতগুলির মূল প্রতিপাদ্য একই। তবে কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। উহার কিছু কিছু রিওয়ায়াত সনদের দিক দিয়া দুর্বল হইলেও মু'জিযার ক্ষেত্রে তাহা গ্রহণযোগ্য। হাফিজ ইব্ন কাছীর এই সম্পর্কে বেশকিছু রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা একটি বাঘ একটি বকরীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহা লইয়া গেল। অতঃপর রাখাল উহার অনুসরণ করিয়া বাঘের নিকট হইতে বকরীটি ছিনাইয়া লইয়া আসিল। বাঘটি তখন লেজের উপর বসিয়া বলিল, তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় কর না? আল্লাহ যে রিযিক আমার নিকট আনিয়া দিয়াছেন তাহা তুমি আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছ? রাখালটি বলিল, কী আশ্চর্য! বাঘ আমার সহিত মানুষের ন্যায় কথা বলিতেছে। বাঘটি বলিল, আমি কি তোমাকে ইহা হইতেও আশ্চর্যজনক খবর দিব? মুহাম্মাদ (স) ইয়াছরিবে অতীতের খবর দিতেছেন!

তখন রাখাল তাহার বকরীর পাল তাড়াইয়া লইয়া মদীনায় প্রবেশ করিল। অতঃপর মদীনার এক প্রান্তে বকরীগুলি রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেল এবং তাঁহাকে উক্ত ঘটনা অবহিত করিল। তখন সালাতের ঘোষণা (আযান) দেওয়া হইল। অতঃপর (সালাতশেষে) রাসূলুল্লাহ (স) বাহিরে আসিয়া রাখালকে বলিলেন, লোকজনকে উহা অবহিত কর। সে লোকজনকে তাহা অবহিত করিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে। সেই সত্তার কসম! যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হইবে না যতক্ষণ না হিংস্র জন্তু মানুষের সহিত কথা বলে, আর মানুষের সহিত তাহার চাবুকের প্রান্ত, জুতার ফিতা কথা বলিবে এবং তাহার উরুদেশ তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার পরিবার কি কাজ করিয়াছে সেই সংবাদ প্রদান করিবে।

হাফিজ ইব্ন কাছীর (র) রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, ইহার সনদ সহীহ-এর শর্তে উত্তীর্ণ। বায়হাকী ইহাকে সহীহ বলিয়া প্রত্যয়ন করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহার অংশ বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকে হাসান-গারীব-সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১৬৩-১৬৪; আল-খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬১)

ইমাম আহ্‌মাদ (র) আর এক সূত্রে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক বেদুঈন মদীনার এক প্রান্তে তাহার বকরীর কাছে ছিল। একটি বাঘ আসিয়া পাল হইতে একটি বকরী লইয়া গেল। বেদুঈন দৌড়াইয়া গিয়া বাঘের কবল হইতে উহা উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিল। বাঘ তাহাকে অনুসরণ করিয়া পিছনে পিছনে আসিল। তারপর চারপায়ের উপর বসিয়া লেজ নাড়াইতে নাড়াইতে লোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তুমি আমার রিযিক লইয়া আসিয়াছ, যে রিযিক আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। লোকটি বলিল, আহা! কী আশ্চর্য! বাঘ লেজ নাড়াইয়া আমাকে সম্বোধন করিতেছে! তখন বাঘ বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি ইহা হইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় রাখিয়া আসিয়াছ। লোকটি বলিল, ইহা হইতে অধিক আশ্চর্যজনক বিষয় আর কি? বাঘ বলিল, রাসূলুল্লাহ (স) দুই মরুভূমির মধ্যখানে দুইটি খেজুর গাছের আড়ালে মানুষের সহিত অতীতে কি ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা লইয়া আলাপ করিতেছেন।

অতঃপর বেদুঈন বকরীগুলিকে চীৎকার দিয়া হাঁকাইয়া লইয়া আসিল এবং মদীনার এক স্থানে রাখিয়া নবী কারীম (স)-এর নিকট চলিয়া আসিল। সে সোজা গিয়া তাঁহার দরজায় করাঘাত করিল। নবী কারীম (স) সালাতশেষে বলিলেন, বকরীর মালিক বেদুঈন কোথায়? তখন লোকটি দাঁড়াইল। নবী কারীম (স) তাহাকে বলিলেন, তুমি যাহা শুনিয়াছ এবং যাহা দেখিয়াছ তাহা লোকজনকে অবহিত কর। অতঃএব সে বাঘটিকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিল এবং তাহার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিল। তখন নবী কারীম (স) বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে। কিয়ামতের পূর্বে কিছু নিদর্শন দেখা যাইবে। সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার জীবন! ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হইবে না যতক্ষণ না তোমাদের কেহ তাহার পরিবারের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিবে। অতঃপর তাহাকে তাহার জুতা অথবা চাবুক অথবা লাঠি তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার পরিবার যাহা করিয়াছে তাহার খবর দিবে। এই রিওয়ায়াতটি সুনান গ্রন্থের শর্তে উত্তীর্ণ হইলেও ইহার সংকলকগণ ইহা রিওয়ায়াত করেন নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১৬৪)।

একই ঘটনা ইমাম আহমাদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, একটি বাঘ বকরীর রাখালের নিকট আসিয়া পাল হইতে একটি বকরী লইয়া গেল। রাখাল উহার অনুসন্ধানে গিয়া বাঘের নিকট হইতে উহা ছিনাইয়া লইয়া আসিল। অতঃপর বাঘটি একটি টীলায় আরোহণ করিয়া চার পায়ের উপর বসিল এবং লেজ নাড়াইতে নাড়াইতে বলিল, তুমি এমন এক রিযিকের পিছু ধাওয়া করিয়া উহা ছিনাইয়া লইয়াছ যাহা আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। লোকটি বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! আজিকার মত আমি আর কখনও দেখিনাই যে, বাঘ কথা বলিতে পারে। বাঘ বলিল, ইহা হইতে বেশী আশ্চর্যের বিষয় সেই লোক, যিনি দুই মরুভূমির মধ্যখানে খেজুরগাছ পরিবেষ্টিত অবস্থায় তোমাদেরকে যাহা অতীত হইয়াছে এবং যাহা তোমাদের পরে ভবিষ্যতে হইবে তাহার খবর দিতেছেন। রাখাল ছিল ইয়াহূদী সম্প্রদায়ভুক্ত। সে নবী কারীম (স)-এর নিকট চলিয়া আসিল, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাঁহাকে এই সংবাদ অবহিত করিল। নবী কারীম (স) ইহার সত্যায়ন করিলেন এবং

বলিলেন, ইহা কিয়ামতের আলামাতসমূহের একটি। অতি সত্বর এমন এক সময় আসিবে যে, লোক ঘর হইতে বাহির হইবে আর তাহার জুতা ও চাবুক তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার পরিবার কি করিয়াছে সেই খবর না দেওয়া পর্যন্ত সে ফিরিবে না (প্রাগুক্ত, ৬খ., পৃ. ১৬৫)।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীছ অন্যত্র আরও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অতঃপর বাঘটি (রাখালকে) বলিল, তুমিই বরং বেশী আশ্চর্যের। তুমি তোমার বকরীর কাছে দাঁড়াইয়া আছ আর এমন নবীকে ত্যাগ করিয়াছ যাঁহার তুলনায় অধিক সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন নবী আল্লাহ আর কখনও প্রেরণ করেন নাই। জান্নাতের দরজাসমূহ তাঁহার জন্য উন্মুক্ত করা হইয়াছে এবং উহার অধিবাসিগণ তাঁহার সাহাবীদের প্রতি তাঁকাইয়া তাহাদের যুদ্ধ দেখে। তোমার ও তাঁহার মধ্যে কেবল এই ঘাটিরই ব্যবধান। ইহা অতিক্রম করিলেই তুমি আল্লাহ্র সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। রাখাল বলিল, আমার বকরী কে দেখিবে? বাঘ বলিল, তুমি ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আমি উহা চরাইব।

অতঃপর লোকটি তাহার বকরীগুলি বাঘের যিম্মায় রাখিয়া চলিয়া গেল। এইভাবে তাহার ইসলাম গ্রহণ এবং নবী কারীম (স)-এর সহিত জিহাদে অংশগ্রহণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। লোকটি ফিরিয়া আসিয়া তাহার বকরীর পাল অক্ষত অবস্থায়ই পাইল এবং বাঘের জন্য উহার মধ্য হইতে একটি বকরী যবেহ করিল (কাযী 'ইয়ায, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৩১০-৩১১)।

আবূ নু'আয়ম তাঁহার দালাইলুন নুবূওয়াত গ্রন্থে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইহা তাঁহার নিজের এবং তাবূক যুদ্ধের সময়কার ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১৬৫)।

বায়হাকী ইব্ন উমার (রা) সূত্রে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, হাফিজ ইব্ন 'আদী বলেন, আবূ বকর ইব্ন দাউদ বলিয়াছেন, এই রাখালের বংশধরকে বলা হইত বানূ মুকাল্লিমুয-যি'ব (বাঘের সহিত কথোপকথনকারীর বংশধর)। তাহাদের বেশ সম্পদ ও উট ছিল। তাহারা ছিল খুযা'আ বংশের। বাঘের সহিত যে রাখাল কথা বলিয়াছিল তাহার নাম ছিল উতবান। খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইব্ন আশ'আছ আল-খুযা'ঈ (র) তাঁহারই বংশধর (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১৬৬)।

বাঘের ঘটনাটি অন্যভাবেও বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বাঘ কর্তৃক বকরী শিকারেরর কথা নাই, তবে তাহার জন্য খাবার বরাদ্দ করার প্রস্তাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একটি বাঘ আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে চারি পায়ের উপর ভর করিয়া বসিয়া পড়িল এবং লেজ নাড়াইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে সমস্ত বাঘের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হইয়া তোমাদের নিকট তোমাদের সম্পদ হইতে কিছু চাহিতে আসিয়াছে। তাহারা বলিল, আল্লাহ্র কসম! আমরা এইরূপ করিব না। তাহাদের মধ্যকার এক লোক পাথর উঠাইয়া বাঘের দিকে ছুড়িয়া মারিল। ইহাতে বাঘটি পিছনে ফিরিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল (প্রাগুক্ত, ৬খ., পৃ. ১৬৬; আস-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা,

বায়হাকী হামযা ইব্‌ন আবী উসায়দ হইতে এবং আল-ওয়াকিদী আল-মুত্তালিব ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন হানতাব হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের বর্ণনায় আরও রহিয়াছে যে, সাহাবায়ে কিরাম বাঘটির জন্য কোন অংশ দিতে অস্বীকার করিলে রাসূলুল্লাহ (স) উহাকে ইশারায় ছিনাইয়া লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, ৬খ., পৃ. ১৬৭; আল-খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬৩)। কোন কোন রিওয়ায়াতে এক শত বাঘ আগমনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে (প্রাগুক্ত)।

অন্য এক রিওয়ায়াতে দেখা যায়, মক্কায় কুরায়শ নেতা আবূ সুফ্‌য়ানের সম্মুখে এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব রিওয়ায়াত করিয়াছেন, এই ধরনের একটি ঘটনা আবূ সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হারব ও সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যার সহিত ঘটিয়াছিল। তাহারা দেখিল, একটি বাঘ একটি শিশুকে (কাযী ‘ইয়ায-এর বর্ণনামতে হরিণ) ধাওয়া করিয়া লইয়া যাইতেছে। শিশুটি হারাম শরীফে ঢুকিয়া পড়িল। অতঃপর বাঘটি ফিরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল। তখন বাঘটি বলিল, ইহা হইতে আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হইল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ মদীনায় তোমাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকিতেছেন, আর তোমরা তাঁহাকে ডাকিতেছ জাহান্নামের দিকে। আবূ সুফ্‌য়ান বলিল, লাত ও ‘উযযার কসম! তুমি এই কথা যদি মক্কায় বলিতে তাহা হইলে উহার অধিবাসিগণ মক্কা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত (কাযী ‘ইয়ায, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ৩১১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১৬৭; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৫১৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিক্‌র আল-আরাবী জীযা, মিসর ১৩৮৭ হি., ২য় সং.; (২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১৪১৪/১৯৯৩, ১ম সং., ৯খ.; (৩) কাযী আবুল ফাদল ‘ইয়ায, আশ-শিফা বিতা‘রীফি হুকূকিল মুসতাফা, দারুল কুতুব আল-‘ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ২খ.; (৪) আল-হায়ছামী, মাজমাউয-যাওয়াইদ ওয়া মামবাউল-ফাওয়াইদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা; বৈরূত, ১৪০৮/১৯৮৮, ৮খ.; (৫) জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, দারুল কিতাব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২০ হি., ২খ.।

ড. আবদুল জলীল

মহানবী (স)-এর সহিত হরিণীর বাক্যালাপ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মু'জিযাসমূহের একটি হইল জঙ্গলের হরিণের তাঁহার সহিত কথা বলা এবং তাঁহার সহিত কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা। এই সম্পর্কে তিনটি রিওয়ায়াত পাওয়া যায়, যাহাদের মর্ম প্রায় একই। একটি রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

আবূ নু'আয়ম আল-ইসফাহানী তাঁহার দালাইলুন-নুবূওয়াত গ্রন্থে আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে উল্লেখ করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) একটি কওমের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা একটি হরিণ শিকার করত উহাকে তাঁবুর খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। হরিণী বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে পাকড়াও করা হইয়াছে, অথচ আমার দুইটি দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা রহিয়াছে। তাই আপনি তাহাদের নিকট হইতে আমাকে একটু অনুমতি লইয়া দিন যাহাতে আমি বাচ্চাদের দুধ পান করাইয়া আবার তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিতে পারি।

তিনি বলিলেন, ইহার মালিক কোথায়? কওমের লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা। তিনি বলিলেন, ইহাকে ছাড়িয়া দাও। সে তাহার বাচ্চার নিকট গিয়া উহাদের দুধ পান করাইয়া তোমাদের নিকট আবার ফিরিয়া আসিবে। তাহারা বলিল, আমাদের জন্য ইহার জামিন হইবে কে? তিনি বলিলেন, আমি।

অতঃপর তাহারা হরিণীকে ছাড়িয়া দিল। হরিণী গিয়া তাহার বাচ্চাদের দুধ পান করাইয়া তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিল। অতঃপর তাহারা হরিণীকে বাঁধিয়া ফেলিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি উহাকে আমার নিকট বিক্রয় করিবে? তাহারা বলিল, উহা আপনার জন্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, তোমরা উহাকে ছাড়িয়া দাও। অতঃপর তাহারা হরিণীকে ছাড়িয়া দিল এবং উহা চলিয়া গেল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১৬৮; আল-খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬১)।

বাকী দুইটি রিওয়ায়াতে হরিণীটি এই কালিমা উচ্চারণের উল্লেখ আছে ঃ

اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ٠

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল" (আল - বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১৬৯-৭০; আল - খাসাইসুল কুবরা, ২খ.,

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাফিজ ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকর আল-'আরাবী, মিসর ১৩৮৭ হি., ২য় সং., ৬খ.; (২) কাযী আবুল ফাদল 'ইয়ায, আশ-শিফা, বিতা'রীফি হুকূকিল-মুসতাফা, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ২খ.; (৩) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল 'ইবাদ, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১৪১৪/১৯৯৩, ১ম সং., ৯খ.; (৪) ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল-মুসতাফা, আল-মাকতাবতুন-নূরিয়্যা আর-রিদাবিয়্যা, লায়ালপুর, পাকিস্তান ১৩৯৭/১৯৭৭, ২য় সং., ১খ.; (৫) আল-হায়ছামী, মাজমাউয-যাওয়াইদ ওয়া মামবা'উল-ফাওয়াইদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১৪০৮/১৯৮৮, ৮খ.; (৬) আস-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, দারুল-কিতাবিল আরাবী, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২০ হি., ২খ.।

ড. আবদুল জলীল

গুইসাপের আশ্চর্যজনক বাকশক্তি লাভ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মু'জিযাসমূহের মধ্যে গুইসাপের তাঁহার সহিত কথা বলা এবং তাঁহার রিসালাত ও আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া অন্যতম। ঘটনাটি বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ইমাম বায়হাকী উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার তাঁহার সাহাবীদের এক মাহফিলে ছিলেন। তখন বানূ সুলায়ম গোত্রের এক বেদুঈন তাঁহার নিকট আসিল। সে একটি গুইসাপ শিকার করিয়া তাহার আস্তিনের মধ্যে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল স্বীয় আস্তানায় গিয়া উহা ভূনা করিয়া খাইবে।

অতঃপর সে দলবদ্ধ লোকজন তথা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাহাবীদের সঙ্গে দেখিয়া বলিল, ইহা কি? লোকজন বলিল, এই ব্যক্তি বলে যে, সে নবী। তখন বেদুঈনটি ভীড় ঠেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, লাত ও উয্যার কসম! মহিলারা যাহাদিগকে দুধ পান করাইয়াছে তাহাদের মধ্যে আমার নিকট তোমা হইতে বেশী ঘৃণিত ও বেশী ক্রোধের পাত্র আর কেহ নাই। আমার কওম যদি আমাকে আজূল (তাড়াহুড়াকারী) নাম না রাখিত তবে অবশ্যই আমি দ্রুত তোমাকে হত্যা করিতাম এবং ইহাতে আনন্দিত হইতাম।

তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি তাহাকে হত্যা করি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে উমার! তুমি কি জান না যে, ধৈর্যশীল ব্যক্তি নবী হওয়ার কাছাকাছি? অতঃপর তিনি বেদুঈনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা বলিতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে? তুমি নাহক কথা বলিয়াছ। তুমি আমার মজলিসে আমাকে সম্মান কর নাই কেন? বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাচ্ছিল্যভরে বলিল, তুমি আমার সহিত কথাও বলিতেছ! এই গুইসাপটি তোমার উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত আমি তোমার উপর ঈমান আনিব না। এই বলিয়া সে নিজ জামার হাতার ভিতর হইতে গুইসাপটি বাহির করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিল। রাসূলুল্লাহ (স) গুইসাপটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে গুইসাপ! গুইসাপটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় তাঁহার ডাকের উত্তর দিল যাহা কওমের সকলেই শুনিতে পাইল। সে বলিল, লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়ক।

لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة

"আমি হাজির। আপনার কল্যাণ হউক, হে কিয়ামত পর্যন্ত আগতদের মধ্যে সুন্দরতম ব্যক্তি"!

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি কাহার ইবাদাত কর হে গুইসাপ? গুইসাপ বলিল ঃ

الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه ·

"আকাশে যাঁহার আরশ রহিয়াছে; পৃথিবীতে যাঁহার ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে; সমুদ্রের মধ্যে যাঁহার পথ রহিয়াছে; জান্নাতে যাঁহার রহমত এবং জাহান্নামে যাঁহার শাস্তি রহিয়াছে"।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি কে হে গুইসাপ? গুইসাপ বলিল ঃ

انت رسول رب العالمين وخاتم النبيين قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك ·

"আপনি জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল, সর্বশেষ নবী। যে আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিবে সে সফলকাম হইবে। আর যে আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিবে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে"। কোন কোন রিওয়ায়াতে গুইসাপের একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. ইব্ন জাওযী, আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ৩৩৮)।

এই কথা শুনিয়া বেদুঈন বলিল, আল্লাহ্র কসম! আমি চাক্ষুষ দেখার পর আর কাহারও কথার অনুসরণ করিব না। আল্লাহ্র কসম! আমি এমতাবস্থায় আসিয়াছিলাম যে, পৃথিবীর বুকে আপনার তুলনায় অধিক ঘৃণিত ব্যক্তি আমার নিকট আর কেহ ছিল না। আর আজ আপনি আমার নিকট আমার পিতা, আমার চক্ষু ও খোদ আমার নিজ হইতে অধিক প্রিয়। আমি আপনাকে ভিতরে-বাহিরে গোপনে-প্রকাশ্যে ভালবাসি। আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাকে আমার দ্বারা হিদায়াত দান করিয়াছেন। এই দীন নিশ্চয়ই বিজয়ী হইবে; বিজিত হইবে না। অতঃপর বেদুঈন তাহার কওমের নিকট গিয়া এই সংবাদ জানাইলে কওমের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ১৭০; কাযী 'ইয়ায; আশ-শিফা, ২খ., পৃ. ৩০৯-৩১০; আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ৩৩৬-৩৮; মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮খ., পৃ. ২৯২-৯৩)।

এই রিওয়ায়াত সম্পর্কে অনেকে অনেক সমালোচনা করিয়াছেন। যেমন ইমাম বায়হাকী বলেন, এই সম্পর্কে হযরত 'আইশা (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও হাদীছ বর্ণিত আছে। তবে এইসব বর্ণনা যঈফ। আয-যাহাবী (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম! বায়হাকী সত্য বলিয়াছেন। কারণ ইহা বাতিল খবর। আল-মুযানী ও ইব্ন তায়মিয়া ইহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইহাকে কাহিনীকারের বানানো গল্প বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে আল-হায়ছামী ইহাকে খুবই যুক্তিসংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য মত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহার সনদে এমন কোনও রাবী নাই, যাহাকে মনগড়া হাদীছ বানাইবার অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। তবে ইহা ঠিক যে, তাহাদের মধ্যে দুর্বলতা রহিয়াছে। এই ধরনের দুর্বলতার কারণে ইহাকে 'মনগড়া' বা 'বানানো' বলিয়া মন্তব্য করা যায় না। নবী

করীম (স)-এর মু'জিযা অতি বিশাল ব্যাপার। উহাতে এমনও বিষয় রহিয়াছে যাহা ইহা হইতেও আশ্চর্যজনক। তাই তাহার মধ্যে শারী'আতের দৃষ্টিকোণ হইতে অস্বীকার করিবার মত কিছুই নাই। উপরন্তু এই সম্পর্কে ইমামগণের রিওয়ায়াত রহিয়াছে। ইহা যঈফ ঠিকই তবে তাই বলিয়া মনগড়া বা বানানো কাহিনীর পর্যায়ভুক্ত নহে (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৫২১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাফিজ ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকর আল-'আরাবী, জীযা, মিসর ১৩৮৭ হি., ২য় সং., ৬খ.; (২) কাযী আবুল ফাদল 'ইয়ায, আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকূকিল মুসতাফা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ২খ.; (৩) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল 'ইবাদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৩, ১ম সং., ৯খ.; (৪) ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুসতাফা, আল-মাকতাবতুন-নূরিয়্যা আর-রিদাবিয়্যা, লায়ালপুর, পাকিস্তান ১৩৯৭/১৯৭৭, ২য় সং., ১খ.; (৫) আল-হায়ছামী, মাজমা'উয-যাওয়াইদ ওয়া মামবাউল-ফাওয়াইদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪০৮/১৯৮৮, ৮খ.; (৬) আস-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, দারুল-কিতাব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২০ হি., ২খ.।

ড. আবদুল জলীল

উসতুওয়ানা-ই হান্নানা রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি মু'জিযা

মসজিদে নববী নির্মাণের পর হইতে তথায় খুতবা দেওয়ার জন্য কোন মিম্বার ছিল না। তখন সমতল মেঝের উপর দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ (স) খুতবা দিতেন। খুতবা প্রদান করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে কোন কোন সময় তিনি তাঁহার নিকটস্থ খুঁটির (উসতুওয়ানা) পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতেন। অষ্টম হিজরীর প্রারম্ভ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) এইভাবেই খুতবা প্রদান করেন। মদীনার এক আনসারী মহিলার মায়মূন নামক একজন গোলাম ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুনিপুণ কাঠমিস্ত্রী। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ (স) সমীপে আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অনুমতি পাইলে আমি আপনার জন্য একখানা সুন্দর কাঠের মিম্বার তৈরি করিয়া দিতে পারি। উহার উপর দাঁড়াইয়া খুতবা প্রদান করিতে আপনার সুবিধা হইবে। প্রয়োজন হইলে ইহার উপর বসিতেও পারিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার আবেদন মঞ্জুর করিয়া তাহাকে এই কাজের অনুমতি দেওয়ার জন্য তাহার মনিবকে বলিয়া পাঠাইলেন। তাহার মনিব আনন্দের সহিত তাহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি মদীনার নিকটবর্তী জংগল হইতে অতি উৎকৃষ্ট কাঠ কাটিয়া তাহা দিয়া একখানা সুন্দর মিম্বার নির্মাণ করিয়া দিলেন (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮৩৩)।

হযরত মায়মূনের নির্মিত মিম্বারখানা তিন সিঁড়িবিশিষ্ট ছিল। প্রত্যেকটি সিঁড়ির প্রস্থ এক বিঘত এবং মিম্বারখানার দৈর্ঘ্য দুই হাত ও প্রস্থ একহাত ছিল। এই মিম্বার তৈরি হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) স্বাভাবিকভাবেই পূর্বের স্থান ত্যাগ করিয়া নবনির্মিত মিম্বারে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যে খুঁটিতে তিনি ইতোপূর্বে হেলান দিতেন সেই খুঁটিটি তাঁহার বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। খুঁটির উচ্ছ্বাসপূর্ণ ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামও কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) মিম্বার হইতে নামিয়া খুঁটিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "হে খুঁটি! তুমি যে অবস্থায় আছ এই অবস্থায়ই আমি তোমাকে রাখিতে পারি, আর যদি ইচ্ছা কর তবে আমি তোমাকে জান্নাতে লইয়া যাইতে পারি"। এই কথা বলিবার সংগে সংগে খুঁটির ক্রন্দন বন্ধ হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে জান্নাতে যাওয়াকেই গ্রহণ করিয়াছে (আবূ নু'আয়ম আল-ইসফাহানী, দালাইলুন নুবূওয়াত, ২খ., পৃ. ১৪২; আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ., পৃ. ৫০৬-৫০৭; আন-নাসাঈ, সুনান, ১খ, পৃ. ১৪১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংস্পর্শে আসিয়া উক্ত কাঠে প্রাণের সঞ্চার হওয়া, তাঁহার বিচ্ছেদে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করা এবং তাঁহার সান্ত্বনা প্রদানে নীরব হওয়া—রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি মু'জিযা। উক্ত খেজুর কাণ্ডটি সম্পর্কে হাদীছ গ্রন্থসমূহে অনেক তথ্য আছে। যথা ঃ (১) উহাকে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে পুনরায় তোমার পূর্বস্থানে রোপণ করিয়া দেই, তুমি তাজা গাছ হইয়া যাইবে। আর ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে জান্নাতে রোপণ করিতে পারি। তুমি জান্নাতের মাটি ও পানিতে বর্ধিত হইয়া আল্লাহর পেয়ারা বান্দাগণকে ফল খাওয়াইবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, সেই খেজুর কাণ্ডটি দ্বিতীয় ব্যবস্থাকে

পছন্দ করিয়াছে (আল-বুখারী, ৫খ., অনুবাদ হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৪ খৃ., ৫ম সংস্করণ, ঢাকা পৃ. ৪৯৫)।

সাময়িকভাবে রাসূলুল্লাহ (স) ঐ খেজুর কাণ্ডটিকে দাফন করাইয়া দিয়াছিলেন (আল-বুখারী, ৫খ., পৃ. ৪৯৫)। পরবর্তী খেজুর কাণ্ডটি সাহাবী উবায়্যি ইবন কা'ব (রা)-এর হস্তগত হইয়া তাহারই হিফাজতে ছিল। কালের বিবর্তনে ধীরে ধীরে ইহার বিলুপ্তি সাধিত হয়। আলিমগণ লিখিয়াছেন, দাফনকৃত খেজুর কাণ্ডটি বোধহয় মসজিদে নববী পুনঃ নির্মাণ কালে উক্ত সাহাবীর হস্তগত হইয়াছিল (আল-বুখারী, অনু. হামিদিয়া লাইব্রেরী, ৫ম সংস্করণ, ৫খ, পৃ. ৪৯৫)। এই ঘটনা ১১জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে (সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী, ৩খ., পৃ. ৬১৫, টিকা নং ২)।

মাওলানা কাসিম নানুতবী (র)-এর মতানুসারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মু'জিযা হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর মৃতকে জীবিতকরণ মু'জিযাসমূহ হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি অজগরের আকৃতি ধারণ করিয়া জীবিত হইয়াছিল এবং উহা অজগরের ন্যায়ই ছুটাছুটি করিয়াছিল। এমনিভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রস্তুতকৃত বস্তুগুলি পাখির আকার ধারণপূর্বক জীবিত হইয়াছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর বরকতে উসতুওয়ানা কাষ্ঠ থাকা অবস্থায়ই উহা হইতে জীবিতদের ন্যায় আচরণ প্রকাশ পাইয়াছিল। সুতারাং তাঁহার এই মু'জিযা পূর্ববর্তী রাসূলগণের মু'জিযার তুলনায় অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ (দুনিয়া মে ইসলাম কেউ কর ফয়লা, দেওবন্দ ১৩৬৫ হি., পৃ. ১০৩; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০ খ., পৃ. ৭৬৬; হযরত রাসূলে কারীম (সা) জীবন ও শিক্ষা, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ৫৬১-৬২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুল্লা মাজদুদ্দীন, সীরাতে মোস্তফা, মাকতাবা' উসমানিয়া দিল্লী ১৯৫৭, পৃ. ৬৬৭ ; (২) আবূ নু'আয়ম আল-ইসফাহানী, দালাইলুন নুবূওয়াত, ২খ, পৃ. ১৪২; (৩) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ., পৃ. ৫০৬-৫০৭, ইসলামাবাদ, তা.বি.; (৪) আন–নাসাঈ, সুনান, ১খ., পৃ. ১৪১; (৫) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোসাইন, সম্পাদনা ঃ ড.এ.এইচ.এম.মুজতবা হোছাইন, প্রকাশকাল এপ্রিল ২০০১, ঢাকা, পৃ. ৮৩৩; (৬) মাওলানা আশিক ইলাহী মীরঠী, ইসলাম, পৃ. ২৯৮; (৭) বুখারী শরীফ, ৫খ., অনুবাদ হামিদিয়া লাইব্রেরী, পৃ. ৪৯৫ ; ৫ম সংস্করণ, প্রকাশকাল ১৯৯৪ খৃ., ঢাকা; (৮) সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী, ৩খ., পৃ. ৬১৫, টীকা নং ২; (৯) হাবীবুর রহমান, দুনিয়া মে ইসলাম কেউ কর ফয়লা, দেওবন্দ ১৩৬৫ হি., পৃ. ১০৩; (১০) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০খ., প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ১৯৯৬ খৃ.; পৃ.৭৬৬ ; (১১) হযরত রাসূলে করীম (সা) জীবন ও শিক্ষা, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৯৭ খৃ., ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৫৬১-৬২।

মুহাম্মাদ আবদুর রব মিয়া

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইহ্সান ও আত্মশুদ্ধি

ইহ্সান ও আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য ও গুরুত্ব

ইহ্সান (اِحْسَانٌ) শব্দটি আরবী। ইহার আভিধানিক অর্থ নেক কাজ করা, সদাচার করা, কোন কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়া ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় ইহ্সান হইল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য উত্তমরূপে ইবাদত করা এবং তাঁহার সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, মহান রাব্বুল 'আলামীনের প্রতি এবং তাঁহার সৃষ্টির প্রতি যাবতীয় কর্তব্য সুন্দর ও উত্তমরূপে সম্পাদন করাই হইল ইহ্সান। কুরআন মজীদের একাধিক আয়াতে ইহ্সানের বিষয়টি বিবৃত হইয়াছে। মহান রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন" (২ ঃ ১৯৫)।

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"হাঁ, যে কেহ আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহার প্রতিদান তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না" (২ ঃ ১১২)।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

"তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে, কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পসন্দ করেন না দাম্ভিক অহংকারীকে" (৪ঃ ৩৬)।

ইহসান সম্পর্কে হাদীছেও পরিষ্কার বর্ণনা রহিয়াছে।

عن ابى هريرة قال كَانَ النبى ﷺ بارز يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما

الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلوة وتؤدى الزكوٰة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স) জনসমক্ষে বাহির হইয়া আসিলেন। এমন সময় তাঁহার কাছে একজন লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঈমান কি? তিনি বলিলেন, ঈমান হইল—তুমি বিশ্বাস রাখিবে আল্লাহ্র উপর, তাঁহার ফেরেশতাগণের উপর, (কিয়ামতের দিন) তাঁহার সাক্ষাতের উপর এবং তাঁহার রাসূলগণের উপর। তুমি আরও বিশ্বাস রাখিবে পুনরুত্থানের উপর। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ইসলাম কি? তিনি বলিলেন, ইসলাম হইল, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সংগে শরীক করিবে না, সালাত কায়েম করিবে, ফরয যাকাত আদায় করিবে এবং রমযানের রোযা রাখিবে। অতঃপর লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ইহ্সান কি? তিনি বলিলেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করিবে যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ, যদি দেখিতে না পাও তবে তিনি তোমাকে দেখিতেছেন" (বুখারী, ১খ., পৃ. ১২)।

'আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী এবং মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, উপরিউক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) ইহ্সান তথা তাসাওউফের দুইটি স্তরের প্রতি বিশেষভাবে ইংগিত করিয়াছেন। একটি হইল মুকাশাফা ও মুশাহাদা এবং অপরটি হইল মুরাকাবা। আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উছমানী (র) فان لم تكن تراه فانه يراك -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

فان لم تتصور انك تراه (الذى هو مقام المشاهدة) فتصور انه يراك (الذى هو مقام المراقبة)

"তুমি যদি ধারণা করিতে না পার যে, তুমি তাঁহাকে (আল্লাহকে) দেখিতেছ (যাহাকে মুশাহাদা বলা হয়) তবে এই ধারণা করিবে যে, তিনি (আল্লাহ) তোমাকে দেখিতেছেন (যাহাকে মুরাকাবা বলা হয়) (ফায়দুল বারী, ১খ., পৃ. ৫৩১-৫৩৪)।

কুরআন ও হাদীছের উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ হইতে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে ইহ্সানের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত ইহ্সান এবং আত্মশুদ্ধি হইল বিদ্যুতের পাওয়ার হাউজের মত। পাওয়ার হাউজের সহিত সংযোগ না থাকিলে যেমন বাতি জ্বলে না তেমনিভাবে আত্মশুদ্ধি ছাড়া বান্দার কোন প্রচেষ্টাই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না এবং তাহা কবুলিয়াতের মর্যাদায় উন্নীত হয় না। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) বলেন, ইহ্সান ও ইখলাস এমন মহাসম্পদ যে, উহা ব্যতীত ইলম ও আমল সবই গুরুত্বহীন (আকাবির কা সুলূক ও ইহ্সান, পৃ. ২৩)।

মোল্লা আলী (র)-এর মতে, "উপরিউক্ত হাদীছে ইহ্সান বলিয়া ইখলাসের কথাই বুঝানো হইয়াছে। আর এই ইখলাস হইল ঈমান ও ইসলামের বিশুদ্ধতার জন্য পূর্বশর্ত" (মিরকাত, ১খ., পৃ. ১২৪)। শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (র) বলেন, উপরিউক্ত বক্তব্য হইতে

প্রতীয়মান হয় যে, ইহ্সান হইল ইখলাসের সমার্থবোধক শব্দ। ইহা ছাড়া ঈমান ও ইসলাম কিছুই সহীহ হয় না। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও ইহারই উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) বলিয়াছেন, ইখলাসবিহীন আমল রূহবিহীন শরীর এবং অর্থ ছাড়া শব্দের অনুরূপ (আকাবির কা ইহ্সান ও সুলূক, পৃ. ২৩)।

বস্তুত ইহসান ও ইখলাসের স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যই অধ্যাত্মিকতার যাবতীয় সাধনা এবং এই ইহ্সানই হইল তাসাওউফের মূল হাকীকত। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দিহলাবী (র) اشعة اللمعات গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, হাদীছে ইহ্সানের কথা বলিয়া তাসাওউফের দিকেই ইংগিত করা হইয়াছে (আকাবির কা ইহ্সান ও সুলূক, পৃ. ২৩)।

উল্লেখ্য যে, ইহ্সান, আত্মশুদ্ধি এবং তাসাওউফের মূল কথা হইল, ব্যক্তিকে আখলাকে সায়্যি'আ তথা গাফলাত, খিয়ানত, জিহালাত (মূর্খতা), গীবত, নিফাক, চোগলখোরী, বদগুমানী, ধোঁকা, প্রতারণা, হিংসা, বিদ্বেষ, রাগ, ক্রোধ, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, মিথ্যা, অকৃতজ্ঞতা, পদ ও সম্পদের মোহ, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইত্যাদি হইতে পরিশুদ্ধ করত আখলাকে হাসানা অর্থাৎ ইখলাস, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, সবর, শোকর, যিকির, সিদক, আদল, ইনসাফ আফউ, ক্ষমা, আমানতদারী, বিনয়, নম্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত করা। বস্তুত খুলুকে 'আযীম অর্থাৎ পরিশুদ্ধ জীবনের মূর্ত প্রতীক ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)। তাঁহার চারিত্রিক গুণাবলীর কথা উল্লেখ পূর্বক কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

"আর আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (৬৮ ঃ ৪)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজেও তাঁহার উত্তম চরিত্রের কথা উল্লেখ পূর্বক বলিয়াছেন ঃ

بعثت لاتمم حسن الاخلاق.

"আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হইয়াছি" (মিশকাত, পৃ. ৪৩২)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজে মহান চরিত্রের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সাহাবায়ে কিরামকেও উক্ত চরিত্রে চরিত্রবান বানানোর লক্ষ্যে জীবনব্যাপী সাধনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার নবূওয়াতী মিশনের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। সে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট

তিলাওয়াত করে, তাহাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তাহারা পূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল" (৩ ঃ ১৬৪)।

আয়াতে বর্ণিত তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা চরিত্র সংশোধনের এই গুরুদায়িত্ব রাসূলুল্লাহ্ (স) অত্যন্ত দক্ষতার সহিত আঞ্জাম দেন। ফলে মারামারি, কাটাকাটি, ছিনতাই, রাহাযানী এক কালে যাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় ছিল তাঁহারাই পরবর্তী কালে এমন সোনার মানুষে পরিণত হইলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের সত্যবাদিতা, আমানতদারী, ইখলাস, লিল্লাহিয়াত ও আন্তরিকতার প্রশংসা করেন। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াত ও রিসালাতের সাক্ষী হিসাবে পৃথিবীর সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ.

"মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল, তাহার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদেরকে রুকূ ও সিজদায় অবনত দেখিবে। তাহাদের লক্ষণ তাহাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন পরিস্ফুট থাকিবে" (৪৮ ঃ ২৯)।

ইমাম কুরতুবীসহ মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন, وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ শব্দ দুইটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, সকল সাহাবীই এই আয়াতের মর্মার্থের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (স) সাহাবায়ে কিরামকে পরিশোধিত করিয়া গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে একদিকে যেমনিভাবে তাহাদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করিয়াছেন, তেমনিভাবে তিনি তাহাদেরকে এই ব্যাপারে বহু নীতিবাক্যও শুনাইয়াছেন, উৎসাহিত করিয়াছেন তাহাদেরকে আলখাকে হাসানা অবলম্বনের জন্য এবং জোর নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন আখলাকে সায়্যিআ বর্জনের জন্য।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবনে ইহসানের প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন

রাসূলুল্লাহ্ (স) ছিলেন ইহসান এবং আত্মশুদ্ধির মূর্তপ্রতীক। তিনি ছিলেন পরিশুদ্ধ জীবনের বাস্তব নমুনা। কুরআন মজীদে তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মশুদ্ধি বলিয়া যাহা কিছুকে বুঝানো হইয়াছে ইহার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়াছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বাস্তব জীবনে। কেননা কুরআনই হইল তাঁহার আখলাক। আত্মশুদ্ধির মূল কথা হইল, আখলাকে সায়্যিআ তথা মন্দ স্বভাব হইতে পরিশুদ্ধ হওয়া এবং আখলাকে হাসানা তথা সুন্দর গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হওয়া। এই দুইটি বিষয়কে সামনে রাখিয়া আমরা যদি কুরআন, হাদীছ এবং ইতিহাস গ্রন্থের প্রতি গভীরভাবে নযর দেই তাহা হইলে দেখিতে পাইব, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবনে ইহসান ও আত্মশুদ্ধির পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটিয়াছিল। যেই গুণাবলীর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি হাসিল হয় তাহা

মহানবী (স)-এর মধ্যে যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা নিম্নে পেশ করা হইল ঃ

(এক) ইখলাস ও নিয়াতের বিশুদ্ধতা ঃ ইখলাসের অর্থ হইল, যাবতীয় আমল একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই সম্পাদন করা। তাঁহার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন কাজ না করা। রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন উসওয়াতুন হাসানা। তিনি জীবনে যত কাজ করিয়াছেন সব মহান প্রভু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তই করিয়াছেন। নিজে ইখলাসের উপর চলার সাথে সাথে অপরকেও তিনি ইখলাসের দাওয়াত দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ

اخلص دينك يكفيك العمل القليل.

"তুমি ইখলাসের সহিত আমল করিলে অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে" (মুসতাদরাক হাকেম, ৪খ., পৃ. ৩০৫)।

قال رسول الله ﷺ ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم.

"রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের প্রতি তাকান না, বরং তিনি তাকান তোমাদের হৃদয় ও অন্তরের দিকে" (মিশকাত, পৃ. ৪৫৪)।

উপরিউক্ত হাদীছ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ছওয়াব ও প্রতিদান দেওয়ার যে বিধান রহিয়াছে তাহা ব্যক্তির আন্তরিকতা ও নিয়াতের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল।

(দুই) আল্লাহ্র ভয়, তাঁহার আনুগত্য ও ইবাদত ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) সকল মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ্কে অধিক ভয় করিতেন। তিনি নামায ও ইবাদতে মশগুল থাকিতেন। সাওম পালন করিতেন। কুরআন তিলাওয়াত করিতেন এবং সদা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। এই প্রসঙ্গে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রা) ইহতে বর্ণিত এক হাদীছে আছে, একবার তিনজন সাহাবী নবী কারীম (স)-এর ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে জানার জন্য উম্মুল মু'মিনীনগণের নিকট আসিলেন। তাহাদেরকে নবী কারীম (স)-এর ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে অবগত করার পর তাহারা ইহাকে সামান্য বলিয়া মনে করিলেন। তৎপর তাহারা বলিলেন, কোথায় আমরা, আর কোথায় নবী কারীম (স)! আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁহার পূর্বাপর সব গুনাহ্ মাফ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহাদের একজন বলিলেন, আমি সর্বদা রাতভর নামায পড়িব। দ্বিতীয়জন বলিলেন, আমি সব সময় রোযা রাখিব, কখনও রোযা ভাঙ্গিব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, আমি মহিলাদের হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিব, মোটেই বিবাহ করিব না। ইহার পর নবী কারীম (স) তাহাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি এমন কথা বলিয়াছ? আল্লাহ্র কসম! আমি কি তোমাদের তুলনায় সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু নহি এবং আমি কি তোমাদের তুলনায় অধিক মুত্তাকী নহি? কিন্তু (এই সব কিছুর পরও) আমি রোযা রাখি এবং

রোযা ভঙ্গও করি। আমি নামায পড়ি এবং (কখনও) ঘুমাইয়াও থাকি। আমি বিবাহও করি (মহিলাদের সহিত আমি সম্পর্ক ছিন্ন করিনা। ইহাই আমার নীতি ও আদর্শ)। সুতরাং যেই ব্যক্তি আমার নীতি ও আদর্শ হইতে বিমুখ হইয়া থাকিবে সে আমার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না (মিশকাত শরীফ, ১খ., পৃ. ২৭)।

হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) এত দীর্ঘ নামায পড়িতেন যে, ইহাতে তাঁহার উভয় পা ফুলিয়া যাইত। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, আপনি এত কষ্ট করিতেছেন ? অথচ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না (জামে তিরমিযী, ১খ., পৃ. ৯৪) !

রাসূলুল্লাহ্ (স) ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্র ভয় পোষণ করা এবং আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য করার পাশাপাশি অন্যদেরকে তাকওয়া এবং ইবাদতের দাওয়াত দিয়াছেন। হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন–

سمعت رسول الله ﷺ يخطب فى حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة اموالكم واطيعوا امراءكم تدخلوا جنة ربكم.

"বিদায় হজ্জের সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ (র)-কে এই মর্মে বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করিবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে, নিজেদের মালের যাকাত প্রদান করিবে এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করিবে। তাহা হইলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে দাখিল হইতে পারিবে" (তিরমিযী, সূত্র রিয়াদুস সালিহীন, ১খ., পৃ. ৪৮)।

তাকওয়া ও হিদায়াতের মূর্ত প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (স) সর্বদা আল্লাহ্র নিকট তাকওয়া ও হিদায়াতের জন্য দু'আ করিতেন। হাদীছে আছে–

ان النبى ﷺ كان يقول اللهم انى اسئلك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

"নবী কারীম (স) বলিতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট হিদায়াত, তাকওয়া, সংযম, পবিত্রতা এবং মুখাপেক্ষীহীনতা কামনা করি" (সহীহ মুসলিম, সূত্র ঃ রিয়াদুস সালিহীন, ১খ., পৃ. ৪৭)।

(তিন) তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা ঃ তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (স) অনুপম গুণের অধিকারী ছিলেন। এই ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন উসওয়াতুন হাসানা। রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সম্বোধন করিয়া কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

"এবং কাজকর্মে তুমি তাহাদের সহিত পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিবে; যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাহাদেরকে ভালবাসেন" (৩ঃ ১৫৯)।

উহুদ যুদ্ধের সময় এই আয়াতের বাস্তব নমুনা আমরা দেখিতে পাই মহানবী (স)-এর মাঝে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কিরামকে ডাকিলেন এবং তাহাদের নিকট পরামর্শ চাহিলেন, আমরা মদীনার অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিব, নাকি বাহিরে গিয়া তাহাদের মুকাবিলা করিব? আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের মধ্যে যাহারা প্রধান ছিলেন তাহারা মদীনার অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যেইসব নওজোয়ান সাহাবী বদরযুদ্ধে শরীক হইতে পারেন নাই তাহারা জিহাদের জযবায় উদ্বেলিত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু নবী কারীম (স)-এর ইচ্ছা ছিল মদীনার অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। পরিশেষে হযরত হামযা, হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা এবং হযরত নু'মান ইব্‌ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যদি মদীনার অভ্যন্তরে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলি তাহা হইলে ইসলামের দুশমনেরা আমাদেরকে কাপুরুষ বলিবে। তাহাদের বক্তব্য শোনার পর রাসূলুল্লাহ্ (স) মদীনার বাহিরে যাইয়া প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার উপর ফয়সালা প্রদান করিলেন। অতঃপর আসরের নামায আদায় করত নবী কারীম (স) হুজরা মুবারকে প্রবেশ করিলেন। সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর ও হযরত উমার (রা)।

তিনি এখনও পর্যন্ত হুজরা মুবারক হইতে বাহির হননি। ইত্যবসরে হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয এবং হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুদায়র (রা) উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মদীনার বাহিরে যাইয়া কাফিরদের মুকাবিলা করার ব্যাপারে তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বাধ্য করিয়াছ। অথচ তাঁহার উপর মহান আল্লাহ্ ওহী নাযিল করেন। কাজেই সমীচীন হইল বিষয়টিকে তাঁহার রায়ের উপর ছাড়িয়া দেওয়া। ইতোমধ্যে তিনি দুইটি লৌহবর্ম পরিধান করত অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হুজরা হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ভুলবশত আপনার মর্জির খেলাপ কাজের ব্যাপারে আমরা আপনাকে চাপ দিয়াছি, যাহা আমাদের জন্য কোনভাবেই শোভনীয় নহে। কাজেই আপনি আপনার ইচ্ছামত কাজ করুন। এই কথা শোনার পর তিনি বলিলেন, কোন নবীর জন্য জায়েয নাই হাতিয়ার পরিধান করার পর যুদ্ধ না করিয়া তাহা খুলিয়া ফেলা। তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া চল। আমি যাহা বলি তাহা মান্য কর। আর মনে রাখিবে, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও অবিচল থাক তবে তোমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে বিজয় ও সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ১৮৭-১৯০)।

নিজে তাওয়াক্কুল অবলম্বনের পাশাপাশি মহানবী (স) সাহাবায়ে কিরামকেও তাওয়াক্কুল অবলম্বনের দাওয়াত দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন-

لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا.

"যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথাযথভাবে নির্ভর করিতে তাহা হইলে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিযিক দান করিতেন যেইরূপ পক্ষীকুলকে রিযিক দিয়া থাকেন। তাহারা ভোরে খালি পেটে বাহির হয় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে ফিরিয়া আসে" (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, সূত্র মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৫২)।

লজ্জা ও সম্ভ্রম মানুষের এমন একটি স্বভাবজাত গুণ যদ্দারা বহুবিধ নৈতিক গুণাবলীর বিস্তৃতি ঘটে। লজ্জাশীলতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করত রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম, সূত্র মিশকাত, পৃ. ১২)। অপর এক বর্ণনায় আছে, الحياء خير كله। "লজ্জার সর্বাংশই উত্তম" (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম, সূত্র মিশকাত, পৃ. ৪৩১)।

লজ্জা মানুষকে সকল প্রকার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করে। লজ্জাহীন মানুষ ভাল-মন্দ সকল কাজ নির্বিঘ্নে করিতে পারে। কোন কিছুই তাহাকে মন্দ কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স) ইরশাদ করেন ঃ

ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحى فاصنع ماشئت.

"পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী হইতে পরবর্তী লোকেরা যাহা পাইয়াছে তাহা হইল, তোমার লজ্জা না থাকিলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার" (সহীহ্ বুখারী, সূত্র মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৩১)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) বলেন, একদা নবী কারীম (স)-এক আনসারী ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন সে তাহার ভাইকে অধিক লজ্জাশীল না হওয়ার জন্য উপদেশ দিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তাহাকে এইভাবে থাকিতে দাও। কেননা লজ্জা ঈমানের অঙ্গ (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম, সূত্র মিশকাত, পৃ. ৪৩১)।

তবে ইল্ম হাসিলের ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা প্রশংসনীয় নহে। মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, লাজুক এবং অহংকারী ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করিতে পারে না। হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আনসারদের মহিলারা উত্তম। লজ্জা তাহাদেরকে দীনের ইল্ম শিক্ষা হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে হযরত উম্মু সালামা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে উম্মু সুলায়ম (রা) হাযির হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ হক কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হইলে কি তাহাতে তাহাদের গোসল করিতে হইবে? নবী কারীম (স) বলিলেন, হাঁ, যখন সে বীর্য দেখিতে পাইবে। তখন উম্মু সালামা (রা) (লজ্জায়) তাঁহার মুখ ঢাকিয়া লইলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীলোকদের কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বলিলেন, হাঁ, হয়। তোমার ডান হাত ধুলায় ধুসরিত হউক। (তাহা না হইলে) তাহার সন্তান তাহার আকৃতি পায় কিরূপে (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ২৪)?

(চার) আমানতদারী ঃ আমানতদারী একটি মহৎ গুণ। এই গুণের ক্ষেত্রে নবী কারীম (স) ছিলেন অদ্বিতীয় ও অনন্য। জীবনে কখনও তিনি আমানতের খিয়ানত করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ নাই। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার নিকট আমানত রাখিতেন। তিনি তাহা প্রাপককে যথাযথভাবে ফেরত দিতেন। ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আমানতদারী যেহেতু কাফিরদের নিকটও স্বীকৃত ছিল, তাই তাঁহার নিকট সাধারণ লোকেরা আমানত রাখিত। তাঁহার নিকট রক্ষিত আমানত প্রাপকদের নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য তিনি হিজরতের সময় হযরত 'আলী (রা)-কে মক্কায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সেই আমানতসমূহ যথাযথভাবে প্রদান করিয়া মদীনায় আগমন করেন (সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৫)। উপরিউক্ত গুণে গুণান্বিত করিয়া গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে তিনি এই ব্যাপারে লোকদেরকে উৎসাহিত করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ

لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له .

"যাহার মধ্যে আমানতদারী নাই তাহার ঈমান নাই এবং যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না তাহার ধর্ম নাই" (সুনান বায়হাকী, সূত্র মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৫)।

اية المنافق ثلث زاد مسلم وان صام وصلى وزعم انه مسلم ثم اتفقا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان.

"মুনাফিকের আলামত তিনটি। সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, যদিও সে সাওম পালান করে, সালাত আদায় করে এবং সে মনে করে যে, সে মুসলমান। অতঃপর তাহারা (ইমাম বুখারী ও মসলিম) উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে; (২) অঙ্গীকার করিলে বরখেলাফ করে এবং (৩) আমানত রাখা হইলে আত্মসাত করে" (মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৭)।

(পাঁচ) অঙ্গীকার রক্ষা করা ঃ অঙ্গীকার রক্ষা করা সত্যপরায়ণতারই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (স) অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অঙ্গীকার রক্ষা করার ব্যাপারে ইহার চাইতে উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কী হইতে পারে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস হযরত আবূ সুফ্য়ান (রা)-কে যেই সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ইহাও ছিল যে, মুহাম্মাদ কি কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছেন? উত্তরে আবূ সুফ্য়ান (রা) স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, তিনি তখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নাই (সহীহ্ বুখারী, ১খ., পৃ. ৩)। এই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রাণের শত্রু (মুসলমান হওয়ার পূর্বে) আবূ সুফ্য়ান (রা)-এর ভাষ্য। হযরত সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে কাফির ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইয়ামান গমনের উদ্দেশ্যে জিদ্দা গমন করেন। 'উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহার পলায়নের ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার মাথার পাগড়ী তাহাকে দান করিয়া বলিলেন, ইহা হইল সাফওয়ানের নিরাপত্তার প্রতীক। 'উমায়র পাগড়ী লইয়া সাফওয়ানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমার পলায়নের প্রয়োজন নাই, তুমি নিরাপদ। অতঃপর তিনি

তাঁহার খিদমতে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী (স), ২খ., পৃ. ২১১-১২)।

উল্লিখিত ঘটনা প্রমাণ করে যে, তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছেন কখনও ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই। রাসূলুল্লাহ্ (স) স্বয়ং অঙ্গীকার রক্ষা করার পাশাপাশি লোকজনকেও অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ولا دين لمن لا عهد له.

"যে ব্যক্তি অঙ্গীকার রক্ষা করে না তাহার ধর্ম নাই" (বায়হাকী, সূত্র মিশকাত, পৃ. ১৫)।

(ছয়) বীরত্ব ও সাহসিকতা ঃ এই গুণের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অবস্থান ছিল অনন্য। তিনি জীবনে বহু বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন কিন্তু কখনও সাহস হারান নাই ও বিচলিত হন নাই। হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) লোকদের মধ্যে সকলের চাইতে সুন্দরতম, সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল এবং সর্বাপেক্ষা অধিক সাহসী ছিলেন। এক রাত্রে মদীনাবাসিগণ কোন একটি শব্দ শুনিয়া ভীষণ ভয় পাইয়াছিল। ইহাতে লোকজন সেই বিকট শব্দের দিকে ছুটিয়া চলিল এবং নবী কারীম (স)-কে তাহাদের সম্মুখে দেখিতে পাইল। তিনি সর্বাগ্রে সেই আওয়াজের দিকে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। এই সময় নবী কারীম (স) বলিতে লাগিলেন, ভীত হইও না, ভীত হইও না। তখন তিনি আবূ তালহা (রা)-এর একটি ঘোড়ার পিঠে জিনপোষ ছাড়াই আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গলায় ঝুলিতেছিল একটি তরবারি। অতঃপর নবী কারীম (স) বলিলেন, আমি এই ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মত পাইয়াছি (বুখারী, মুসলিম, সূত্র মিশকাত, পৃ. ৫১৮)।

হুনায়নের যুদ্ধের দিন স্বল্প সংখ্যক সাহাবী ব্যতীত সকলেই যখন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তখন নবী কারীম (স) উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب "আমি নবী, মিথ্যাবাদী নহি, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৭)।

(সাত) ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ঃ বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্থির থাকা এবং অবিচল থাকার ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (স) পূর্ণতার অধিকারী ছিলেন। বিপদে তিনি কখনও অধৈর্য হইতেন না এবং কঠিন হইতে কঠিনতর অবস্থায়ও তিনি মনোবল হারাইতেন না। জীবনে তিনি এমন বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন— যাহা তাঁহার চুলকে পাকাইয়া দিয়াছে, প্রতিরোধের দেওয়াল ভাংগিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে, ইহার পরও তিনি ছিলেন শান্ত ও অবিচল। দুর্বলতম অবস্থায়ও তিনি বিজয়ীর মতো ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন।

প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ্ (স) দীন প্রচারে সামান্যতম পিছপা হন নাই। ইহা চরম ধৈর্যের একটি উদাহরণ। অন্যরাও যেন ধৈর্য অবলম্বন করে সেইজন্য রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, الصبر ثوابه الجنة "ধৈর্যের বিনিময় হইল জান্নাত" (সুনান বায়হাকী, সূত্র মিশকাত, পৃ. ১৭৩)।

অন্য এক হাদীছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "ঈমানদার ব্যক্তির বিষয়টি খুবই অদ্ভুত। বস্তুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তাঁহার জন্য মঙ্গলময়। আর ইহা একমাত্র মুমিনদেরই বৈশিষ্ট্য। তাহার সচ্ছলতা অর্জিত হইলে সে শোকর করে। ইহা তাহার জন্য কল্যাণকর। তাঁহার উপর কোন বিপদ আসিলে সে সবর করে। ইহাও তাহার জন্য কল্যাণকর" (সহীহ মুসলিম, সূত্র মিশকাত, পৃ. ৪৫২)।

(আট) যুহ্দ (অল্পে তুষ্টি) ও শোকর ঃ এতদুভয় ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (স) পরিপূর্ণতার অধিকারী ছিলেন। যুহদ মানে হইল আখিরাতের শান্তি লাভের আশায় দুনিয়ার সুখ-শান্তি পরিহার করা, অল্পে তুষ্ট থাকা। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে দুনিয়ার ভোগবিলাস ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, এখানকার আনন্দ ও সৌন্দর্যোপকরণ পরীক্ষার জন্য দেওয়া হইয়াছে। আসল শান্তি আখিরাতে পাওয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى .

"তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করিও না উহার প্রতি যাহা আমি তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যরূপে উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়াছি, তদ্দ্বারা তাহাদের পরীক্ষা করিবার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী" (২০ ঃ ১৩১)।

আল্লাহ্ তা'আলার এই আদেশ ও উপদেশ রাসূলুল্লাহ্ (স) স্বীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানিয়া চলিয়াছেন। তাই নবী কারীম (স)-এর সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের প্রতি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। ভোগ-বিলাসের সকল উপকরণ করায়ত্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় তাহা পরিহার করিয়াছেন। মদীনায় হিজরতের পর তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। গণীমতরূপে তাহার হস্তগত হয় বেশুমার সম্পদ। এইগুলির কিছুই তিনি নিজের আরাম-আয়েশের জন্য ব্যয় করেন নাই। পরিবারের ব্যয়ভার বহনের জন্য তিনি ঋণও করিয়াছেন। তাঁহার ইনতিকালের পর দেখা গেল যে, তাঁহার লৌহ বর্মটি আবূ শাহমা নামক এক ইয়াহূদীর নিকট বন্ধক রহিয়াছে। উহার বিনিময়ে তিনি পরিবারের জন্য সামান্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন (কাযী ইয়ায, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৪০)। সাহাবায়ে কিরামও যেন যুহ্দ অবলম্বন করিয়া চলেন সেজন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ

ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما فى ايدى الناس يحبوك .

"দুনিয়াতে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন কর তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসিবেন এবং মানুষের হাতে যে ধন-সম্পদ রহিয়াছে তাহা হইতেও কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন কর, তাহা হইল লোকেরাও তোমাকে মহব্বত করিবে" (সুনান ইব্ন মাজা, কিতাবুয-যুহ্দ, বাব ১, হাদীছ নং ১০২)।

(নয়) বিনয় ও নম্রতা ঃ কথাবার্তা, আচার-আচরণ ইত্যাদি সব কিছুর ক্ষেত্রে নবী কারীম (স) বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করিয়া চলিতেন। এই ক্ষেত্রেও তিনি অনন্য কামালাতের অধিকারী ছিলেন। তিনি সর্বদা আল্লাহ্ পাকের দরবারে মিনতি জানাইতেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার চোখে আমাকে তুচ্ছ করিয়া দেখাও আর শ্রেষ্ঠ করিয়া দেখাও মানুষের চোখে (মাদারিজুন নুবূওয়াত, ১খ., পৃ. ৭৯)।

হযরত উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে এই স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন যে, তিনি নবী বাদশাহ হইবেন, না নবী বান্দা হইবেন। মহানবী (স) নিজের জন্য নবী বান্দা হওয়াই শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন (কাযী ইয়ায, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩০)।

তিনি তাঁহার সাহাবীদেরকে বলিতেন, তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করিবে না, যেমন খৃস্টান সমাজ মারয়াম-তনয় ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে। পূর্ণ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা সত্ত্বেও আমি আল্লাহ্রই বান্দা। তাই তোমরাও আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল বলিও (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., প. ২০৪)।

একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখামাত্র ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এতদ্দর্শনে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে বলিলেন, আমি মহাপরাক্রমশালী কোন রাজা-বাদশাহ নই। আমি এক মহিলার সন্তান, যিনি শুকনা গোশত রান্না করিয়া ভক্ষণ করিতেন। হযরত আইশা (রা) বলেন, যে কোন ধরনের লোক তাঁহাকে আহবান করিলে তিনি তাঁহার আহবানে সাড়া দিতেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ২০৪; হাকেম আল-মুসতাদরাক, ৩খ., পৃ. ৪৮)।

হযরত আবূ উমামা (র) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স) লাঠিতে ভর দিয়া আমাদের নিকট আসিলেন। তাঁহার সম্মানার্থে আমরা দাঁড়াইয়া গেলাম। তিনি আমাদেরকে বলিলেন, অনারব লোকেরা কাহাকেও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যেভাবে দাঁড়াইয়া যায় তোমরা সেইভাবে দাঁড়াইবে না (কাযী ইয়ায, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২৬৩)। তিনি আরও বলেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা, তাঁহার অন্যান্য বান্দাদের মতই আমি পানাহার করি, আমিও সেইভাবে উপবেশন করি, যেইভাবে তাহারা উপবেশন করে (প্রাগুক্ত)।

সাহাবায়ে কিরামও যাহাতে নম্রতা অবলম্বন করেন সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি এই মর্মে ওহী নাযিল করিয়াছেন যে, তোমরা বিনয় অবলম্বন করিবে। কেহ কাহারও সামনে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিবে না এবং কেহ কাহারও উপর সীমালংঘন করিবে না (সহীহ মুসলিম, সূত্র-রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ২৬৭)।

অন্য এক হাদীছে আছে ঃ

وما تواضع احد لله الا رفعه الله.

"কেহ আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য বিনয় অবলম্বন করিলে আল্লাহ্ তাহার মর্যাদা বাড়াইয়া দেন" (সহীহ মুসলিম, সূত্র-রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ২৬৭)।

(দশ) দানশীলতা ও বদান্যতা ঃ সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ বসবাস করে। কেহ ধনী, কেহ গরীব। ধনীদের জন্য উচিত গরীবদের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা। বস্তুত

সমাজের গরীব শ্রেণীর লোকদের প্রতি দানশীলতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করা একটি মহৎ গুণ। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এই বিষয়ে বহু তাকীদ রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা হইলেন সবচেয়ে বড় দাতা। তাঁহার পর মানুষের মধ্যে বড় দাতা হইলেন রাসূলুল্লাহ (স)। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

قال رسول الله ﷺ هل تدرون من اجود الناس قالوا الله ورسوله اعلم قال الله تعالى اجود جودا ثم انا اجود بنى ادم واجودهم من بعدى رجل علم علما/فنشره ياتى يوم القيامة اميرا وحده او قال امة واحدة.

"রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, তোমরা কি বলিতে পার, সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে? সাহাবীগণ বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহ্ই হইলেন সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। তৎপর বনী আদমের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। আর আমার পর বড় দাতা হইবে সেই ব্যক্তি যে ইলম শিক্ষা করিয়া তাহা বিস্তার করিতে থাকিবে। কিয়ামতের দিন সে একাই একজন আমীর অথবা একটি উম্মত হইয়া উঠিবে" (বায়হাকী, সূত্র মিশকাত, পৃ. ৩৭)।

كان رسول الله ﷺ اجود الناس وكان اجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبرئيل وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ولرسول الله ﷺ اجود بالخير من الريح المرسلة ·

"রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা! আর রমযান মাসে তিনি আরও বেশী দানশীল হইতেন, যখন জিব্রাঈল (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিব্রাঈল (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কুরআন মজীদ পরস্পর পাঠ করিয়া শুনাইতেন। আল্লাহ্র কসম! প্রবল বেগে প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষাও রাসূলুল্লাহ্ (স) অধিক দানশীল ছিলেন" (সহীহ বুখারী, ১খ, পৃ. ৩)।

দানশীলতা ও বদান্যতা ব্যক্তিকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষস্বরূপ। যে ব্যক্তি দানশীল সে যেন উহার একটি শাখা ধরিয়াছে এবং সেই শাখা তাহাকে ছাড়িতেছে না, যে পর্যন্ত না তাহাকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দেয়। পক্ষান্তরে কৃপণতা হইতেছে জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। যে ব্যক্তি কৃপণ সে যেন উহার একটি শাখা ধরিয়াছে এবং ঐ শাখা তাহাকে ছাড়িতেছে না, যে পর্যন্ত না তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দেয় (বায়হাকী, সূত্র মিশকাত, পৃ. ১৬৭)।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

ما سئل رسول الله ﷺ على الاسلام شيئا الا اعطاه قال فجاء رجل فاعطاه غنما بين جبلين فرجع الى قومه فقالَ يا قوم اسلموا فان محمدا يعطى عطاء لا يخشى الفاقة.

"রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণের পর কেহ কিছু চাহিলে তিনি তাহাকে উহা দান করিতেন। আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আগমন করিল। তিনি তাঁহাকে এত বেশী ছাগল দান করিলেন যাহাতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। অতঃপর সেই ব্যক্তি তাহার সম্প্রদায়ের নিকট যাইয়া বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা মুহাম্মাদ (স) এত বেশী দান করেন যাহার পর আর অভাবের ভয় থাকে না" (মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, হাদীছ নং ৫৮১৩-৫৮১৪)।

নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও রাসূলুল্লাহ্ (স) এই দান ও সেবার কাজ করিতেন। প্রথম ওহী লাভের পর যখন তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন তখন খাদীজা (রা) তাহার কিছু সৎগুণাবলীর উল্লেখ পূর্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন–

كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق.

"আল্লাহ্র কসম! কখনও নহে। মহান আল্লাহ্ আপনাকে কখনও অপমানিত করিবেন না। আপনি তো আত্মীয় তার সম্পর্ক অটুট রাখেন, অসহায়-দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, বেকারের কর্মসংস্থান করেন, মেহমানদের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন" (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৩)।

মহানবী (স) বলেন ঃ আমি মুমিনদের জন্য তাহাদের নিজ হইতেও অধিক আপন। তাই মুমিনদের যে ইনতিকাল করিবে সে ঋণ রাখিয়া গেলে তাহা পরিশোধ করা আমার যিম্মায় (বুখারী, কিতাবুল কাফালা, হাদীছ নং ২২৯৮)।

উল্লেখ্য যে, ইহসান ও আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য, গুরুত্ব এবং নবী জীবনে ইহার বাস্তবায়ন সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু স্বভাব-চরিত্র আছে যাহা খুবই নিকৃষ্ট এবং অপসন্দনীয়। এই জাতীয় স্বভাবচরিত্রকে আখলাকে রযীলা (اخلاق رذيلة) বা আখলাক সায়্যিআ (اخلاق سيئة) বলা হয়। আখলাকে সায়্যিআ, যেমন— গাফলত, জিহালাত (মূর্খতা), মিথ্যা, অহংকার, গীবত, চোগলখোরী, বদগুমানী, আত্মম্ভরিতা, ধোঁকা, প্রতারণা, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, রাগ, অকৃতজ্ঞতা, পদ ও সম্পদের মোহ ইত্যাদি। এইগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকাও অত্যাবশ্যক। মহানবী (স) যেহেতু মানবতার আদর্শ ছিলেন, তাই তিনি এইসব মন্দ চরিত্র হইতেও মুক্ত ছিলেন। নিজে দুশ্চরিত্র হইতে নিষ্কলুষ থাকার পাশাপাশি অন্যদেরকে উহা হইতে মুক্ত থাকার জন্য তিনি উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظرى.

"অহঙ্কারী ও দুশ্চরিত্রের মানুষ জান্নাতে দাখিল হইতে পারিবে না" (সুনান আবূ দাঊদ, কিতাবুল আদাব, বাব ৭; মুসনাদ আহ্মাদ, ৪খ., পৃ. ২২৭, সূত্র মিশকাত, পৃ. ৪৩১)।

বস্তুত চরিত্র সংশোধন ব্যতীত আত্মার সংশোধন সম্ভব নহে, এমনকি প্রকৃত মানুষ হওয়াও সম্ভব নহে। মানুষ হইতে হইলে চারিত্রিক দুর্বলতার যতগুলি দিক রহিয়াছে সবগুলির সংশোধন আবশ্যক। সংশোধনের জন্য অনুশীলন আবশ্যক। আর অনুশীলন বারংবার করিতে হয়।

অব্যাহতভাবে মুজাহাদা ও সাধনা করিলে এবং বারংবার নফসের বিরুদ্ধাচরণ করিলে একদিন এই খারাপ স্বভাব নির্মূল হইয়া যাইবে। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম সাধনা করে আমি তাহাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সংগে থাকেন" (২৯ ঃ ৬৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিজের নফসের সহিত জিহাদ করে (সুনান বায়হাকী, সূত্র মিশকাত, পৃ. ১৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ই. ফা. বা.; (২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র), সহীহ বুখারী, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ইন্ডিয়া, ১খ.; (৩) আবূ দাঊদ আস-সিজিস্তানী, সুনান আবী দাঊদ, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (৪) ইব্‌ন মাজা আল-কাযবীনী, সুনান ইব্‌ন মাজা, আল-মাকবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, হিন্দুস্তান; (৫) আল্লামা শাববীর আহ্‌মাদ উছমানী, ফাদলুল বারী, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ইন্ডিয়া; (৬) শায়খ ওয়ালীউদ্দীন আল-খাতীব আত-তিবরিযী, মিশকাতুল-মাসাবীহ, মিরাজ বুক ডিপো, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ইন্ডিয়া; (৭) ইমাম আন-নাবাবী (র), রিয়াদুস সালিহীন, ইদারায়ে ইশাআতে দীনিয়াত, নয়াদিল্লী; (৮) মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (র), আকাবির কা সুলূক ও ইহসান, মাকতাবাতুশ শায়খ, করাচী; (৯) ইমাম আল-বাগাবী (র), মুখতাসারু তাফসীরিল বাগাবী, তাওযীউ জিহাযিল ইরশাদ ওয়াত-তাওজী বিল-হাবশিল ওয়াতানী; (১০) মোল্লা আলী কারী (র), মিরকাতুল মাফাতীহ আলা মিশকাতিল মাসাবীহ, দেওবন্দ, ভারত; (১১) কাযী ইয়ায, আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকূকিল মুসতাফা, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, বৈরূত, তা. বি.; (১২) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী (স), দারুল ইশাআত, করাচী; (১৩) মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র), সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, পাকিস্তান; (১৪) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী (র), নবীয়ে রহমত, অনু. মজলিসে নশরিয়াত-ই ইসলাম, ঢাকা; (১৫) হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (র), শরীআত ও তরীকাত, মারকাযী ইদারায়ে তাবলীগ, জামে মসজিদ, দিল্লী; (১৬) আবদুল হক মুহাদ্দিছে দিহলাবী (র), মাদারিজুন নুবূওয়াত, দিল্লী; (১৭) মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী আল-বরকতী (র), কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ; (১৮) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র), আল-আদাবুল মুফরাদ, বাবুশ শাহনা; (১৯) আল-মুসতাদরাক হাকিম, দাইরাতুল মা'আরিফ উছমানিয়া, হায়দরাবাদ, ইন্ডিয়া; (২০) তিরমিযী, সূত্র, যাদুত তালিবীন, মাওলানা আশিক ইলাহী (র); (২১) ইব্‌ন কাছীর (র), আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত; (২২) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, কায়রো, তা. বি.; (২৩) মাওসূআ নাদরাতুন নাঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম (স), সৌদী আরব।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খাসাইস বা বৈশিষ্ট্যসমূহ

কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ ও হাদীছ হইতে এই কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সর্বাধিক সম্মানিত, সর্বাধিক মর্যাদাবান ও সর্বাধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী মহান ব্যক্তি। তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন যাহা অন্য কোন নবী বা রাসূলকে দেন নাই।

প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থ আল-কামূস প্রণেতার মতে خص - خصًا - خصوصا وخصوصية অর্থ ফযীলত বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা। লিসানুল আরাবের ভাষ্যমতে ইহার অর্থ হইল, বিশেষ কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কোন বস্তু দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা। পারিভাষিক ব্যাখ্যা ঃ খাসাইস বলিয়া এমন বিষয়কে বুঝানো হইয়াছে যাহা আল্লাহ তা'আলা কেবল হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে দান করিয়াছেন এবং যাহার মাধ্যমে তিনি তাঁহাকে অন্যান্য নবী-রাসূলগণের উপর এবং সমস্ত মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দান করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর খাসাইস বা বৈশিষ্ট্যের উপর পূর্ববর্তী, পরবর্তী ও সর্বকালের আলিমগণই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে বহু আলোচনা ও কিতাব প্রণয়ন করিয়াছেন। যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে রাসূলুল্লাহ (স) অন্যান্য নবী-রাসূল হইতে স্বতন্ত্র ইহার উপরও স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা হইয়াছে। এমনিভাবে যেসব বিষয়ে তিনি উম্মত হইতে স্বাতন্ত্রের অধিকারী ইহার উপরও কিতাব লেখা হইয়াছে। এই জাতীয় বিষয়ে আলিমদের অনেকেই কলম ধরিয়াছেন, যেমন 'ইয্যুদ্দীন ইব্ন আবদুস সালাম بداية السول فى تفضيل الرسول নামে কিতাব প্রণয়ন করিয়াছেন। ইমাম ইব্নুল মুলাক্কান خصائص افضل المخلوقين নামে কিতাব লিখিয়াছেন। অনুরূপভাবে আল্লামা সুয়ূতী (র) الخصائص الكبرى নামে কিতাব প্রণয়ন করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ অপরাপর বিষয় মিলাইয়া এই বিষয়ে কিতাব লিখিয়াছেন। যেমন আবূ নু'আয়ম ইসফাহানী (র) রচিত কিতাবের নাম دلائل النبوة। ইমাম বায়হাকী (র)-ও دلائل النبوة নামে কিতাব লিখিয়াছেন। কাযী ইয়ায (র) الشفا بتعريف حقوق المصطفى নামক কিতাবে, ইমাম নববী (র) تهذيب الاسماء واللغات নামক কিতাবে, ইমাম ইবনুল জাওযী (র) الوفاء باحوال المصطفى নামক কিতাবে এবং আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) البداية والنهاية ও الفصول فى سيرة الرسول ص ইত্যাদি গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছেন। এমনিভাবে হাদীছ, তাফসীর ও সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে এই সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

খাসাইস সম্পর্কে জানার উপকারিতা

যেসব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) একক ও অনন্য, যাহা কোন নবী-রাসূলের মধ্যে নাই, এগুলি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন যাহা তাঁহার চিরসম্মানিত হওয়ার পরিচায়ক এগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মধ্যে বহুবিধ উপকারিতা নিহিত রহিয়াছে।

এগুলি সম্বন্ধে জানার দ্বারা মুসলমানদের ঈমান বৃদ্ধি পায়; রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি ভালবাসা ও ইয়াকীন বৃদ্ধি পায়। মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিমকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এই সব অবস্থাদি পড়ার জন্য আহবান জানাইতে পারে। ফলে যদি উক্ত ব্যক্তি ইনসাফপরায়ণ হয় তবে সেও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি ঈমান আনিবে, তাঁহাকে ও তাঁহার আনীত মতাদর্শকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করিবে। আরেকটি বিশেষ ফায়দা হইল, এগুলি যে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বৈশিষ্ট্য তাহা জানা ও অন্যদের কাছে তাহা বর্ণনা করা। সাথে সাথে একথা জ্ঞান করা যে, এসব ব্যাপারে তাঁহাকে ব্যতীত অপর কারও অনুসরণ করা যায় না।

হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী (র) সাওমে বিসাল (ইফতারের সময় যৎসামান্য পানাহার করিয়া একাধারে কয়েক দিন রোযা রাখা)-এর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীছ বর্ণনা করিয়া বলেন, এই হাদীছ হইতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কোন কোন আমল এমনও রহিয়াছে যাহা কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যই নির্দ্ধারিত এবং তাঁহার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উল্লেখ্য যে, সাওমে বিসালের এই আমল ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১) আয়াতের সাধারণ নির্দেশের ব্যক্তিক্রম। অর্থাৎ তাঁহার এই আমলটি উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয় (ফাতহুল বারী, ৪খ., পৃ. ২৪২)।

এইসব খাসাইস সহীহ্ দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হওয়া অপরিহার্য (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., ৩৮৬; ইরাকীর সূত্রে বর্ণিত)। এ কানুনের ভিত্তিতেই আমি এই গ্রন্থে খাসাইস সম্পর্কিত বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা করিতে গিয়া ক্ষেত্রবিশেষে আমি কোন কোন রিওয়ায়াত বর্জন করিয়াছি যাহা সহীহ দলীলাদির ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খাসাইস হওয়া প্রমাণিত নয়।

খাসাইস বা বৈশিষ্ট্যের প্রকারভেদ

মৌলিকভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ দুই প্রকার ঃ (১) এমন বৈশিষ্ট্যসমূহ যাহা কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে পাওয়া যায় বা কেবল তাঁহার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য কোন নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। (২) এমন বৈশষ্ট্যসমূহ যাহা কেবল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; তবে পূর্ববর্তী নবীগণের কাহারও মধ্যে উহা বিদ্যমান থাকিতে পারে।

প্রথম প্রকার ঃ এমন বৈশিষ্ট্যসমূহ যাহা কেবল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্য কোন নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁহাকে এমন বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন যাহা আল্লাহ্র নিকট তাঁহার মহামর্যাদাবান হওয়ার পরিচায়ক।

দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দান করিয়াছেন যাহা চিরন্তন মু'জিযা এবং চিরসংরক্ষিত কিতাব। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে কুদরতী ভয়ভীতি (رعب) দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে করিয়াছেন খাতামুন নাবিয়্যীন।

আর আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে শাফআতে কুবরা এবং ওয়াসীলার মর্যাদার দ্বারা ভূষিত করিবেন। তাঁহাকে হাওযে কাওছার দান করিবেন এবং তিনি হইবেন কিয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তানের নেতা।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উম্মতকেও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন যাহা অন্য কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই। দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য গনীমতের মাল হালাল করিয়াছেন, পৃথিবীর যে কোন স্থানকে পবিত্র ও নামায পড়ার উপযোগী বানাইয়াছেন এবং তাহাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আর আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে অন্যান্য উম্মতের ব্যাপারে নবী-রাসূলগণের পক্ষে সাক্ষী বানাইবেন এবং তাহারাই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

যেসব বৈশিষ্ট্য কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রযোজ্য, অন্য কোন নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেগুলিকে আলিমগণ কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

১. এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য যাহা দুনিয়াতে কেবল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. এমন বৈশিষ্ট্য যাহা আখিরাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩. এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য যাহা দুনিয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীর ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য।

৪. এমন বৈশিষ্ট্য যাহা আখিরাতে উম্মতে মুহাম্মাদীর ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য।

যেসব বৈশিষ্ট্য দুনিয়াতে কেবল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কতিপয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন– যাহা অন্য কোন নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল ঃ

(এক) নবী-রাসূলগণের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত যত নবী-রাসূল এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদের সকলের নিকট হইতেই তিনি এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন ঃ তোমাদের কাহারও যমানায় যদি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব হয় তবে অবশ্যই তোমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাঁহাকে সাহায্য-সহযোগিতা করিবে, নিজেদের ইলম ও নবূওয়াতের কারণে তাঁহার আনুগত্য ও সাহায্য করা হইতে বিরত থাকিবে

না। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে তাহাদের নিজ নিজ উম্মত হইতেও অনুরূপ অঙ্গীকার গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৩৮৬; (আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৬; শামাইলুর রাসূল, পৃ. ৫৪৫; খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১৬)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ.

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার লইয়াছিলেন, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি অতঃপর তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসিবে তখন তোমরা অবশ্যই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে। তিনি বলিলেন, তোমরা কি স্বীকার করিলে ? এবং এই সম্পর্কে আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করিলে? তাহারা বলিল, আমরা স্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম" (৩ ঃ ৮১)।

হযরত আলী ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত নবী-রাসূল হইতেই এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহার জীবদ্দশায় যদি আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (স)-কে প্রেরণ করেন তবে অবশ্যই যেন তিনি তাঁহার উপর ঈমান আনেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করেন। তিনি নবী-রাসূলগণকে এই মর্মেও হুকুম দিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ উম্মত হইতেও অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, যদি তাহাদের জীবদ্দশায় হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব হয় তবে তাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবে। একাধিক তাফসীর বিশারদ হইতে এই ব্যাখ্যা উদ্বৃত রহিয়াছে (তাফসীর ইব্ন জারীর তাবারী, ২খ., পৃ. ২৩৬; তাফসীর ইব্ন কাছীর ১খ., পৃষ্ঠা ৩৮৬; তাফসীর বাগাবী, ১খ., পৃ. ৩২২)।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একদা হযরত উমর (রা) তাওরাতের একটি পৃষ্ঠা হইতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সামনে পাঠ করেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স) অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি উদ্ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছ? যাঁহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! আমি তোমাদের নিকট এক স্পষ্ট দান লইয়া আসিয়াছি। তোমরা যদি তাহাদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর এবং তাহারা তোমাদেরকে যথার্থ সংবাদ প্রদান করে তাহা হইলে এই কারণে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হইবে। আর যদি তাহারা তোমাদেরকে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে তবে তোমাদেরকে সত্যবাদী বলিয়া জ্ঞান করা হইবে। আল্লাহ্র শপথ! হযরত মূসা (আ) জীবিত থাকিলে তাঁহার জন্যও আমার অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না (মুসনাদ আহমাদ ৩খ., পৃ. ৩৮৭; দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব ৪০, নং ৪৩৫১; নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর মতে হাদীছটি হাসান; মিশকাতুল মাসাবীহ্, ১খ., পৃ. ৬৩)।

হাফিয ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) খাতামুল আম্বিয়া, আখিরী নবী এবং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির জন্য নবী। তিনি ইমামে আজম— সকলের মহান ইমাম। সর্বকালের মানুষের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হইল তাঁহার আনুগত্য করা। তিনি নবী-রাসূলগণেরও ইমাম। এই কারণেই মি'রাজ রজনীতে নবী-রাসূলগণ সকলেই বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্র হইলে তিনি তাহাদের নামাযের ইমামতি করেন (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৩৮৬)।

(দুই) বিশ্বব্যাপী তাঁহার রিসালাত

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ বিশেষ কওম, বিশেষ এলাকা এবং বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। যেমন কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ...

"আমি তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করিতেছি" (৭ ঃ ৫-৯)।

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا...

"আদ জাতির নিকট আমি উহাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমরা কি সাবধান হইবে না" (৭ ঃ ৬৫)।

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا...

"ছামূদ জাতির নিকট আমি তাহাদের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হইতে স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। অতএব তোমরা ইহাকে আল্লাহ্‌র জমিতে চরিয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইবে" (৭ ঃ ৭৩)।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ...

"আর আমি লূতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই" (৭ ঃ ৮০)।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا...

"আমি মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য

কোন ইলাহ্ নাই : তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদেরকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর উহাতে বিপর্যয় ঘটাইবে না। তোমরা মু'মিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণকর" (৭ ঃ ৮৫)।

আর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাত ও নবূওয়াত হইতেছে বিশ্বব্যাপী। তথা আরব-অনারব এবং মানুষ ও জিন সকলের জন্যই তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। ইহা তাঁহার একক বৈশিষ্ট্য।

ইয্যুদ্দীন ইব্ন আবদুস সালাম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পূর্ববর্তী নবীগণকে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে তিনি প্রেরণ করিয়াছেন সমস্ত মানুষ ও জিন জাতির প্রতি। প্রত্যেক নবী তাঁহার উম্মতের নিকট ধর্ম প্রচারের ছওয়াব পাইবেন। আর আমাদের নবী কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের নিকট ধর্ম প্রচারের ছওয়াব পাইবেন। উহা প্রচারের কারণেও ছওয়াব পাইবেন এবং নিজের সত্তার মর্যাদার ভিত্তিতেও ছওয়াব পাইবেন। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনস্বরূপ বলেন ঃ

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا.

"আমি ইচ্ছা করিলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করিতে পারিতাম" (২৫ ঃ ৫১)।

এখানে অনুগ্রহের বিষয় এই যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি জনপদে একজন করিয়া সতর্ককারী প্রেরণ করিতেন তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (স) যে জনপদবাসীকে সতর্ক করিয়াছেন কেবল তাহাদেরকে সতর্ক করার ছওয়াব পাইতেন (বিদায়াতুস সুউল ফী তাফদীলির রাসূল, পৃ. ৪৬-৪৭)। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআন ও হাদীছে বিশদভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا..

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না" (৩৪ঃ ২৮)।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি" (২১ ঃ ১০৭)।

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا....

"বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁহার বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি— যে আল্লাহ্ ও তাঁহার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাহার অনুসরণ কর, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাও" (৭ ঃ ১৫৮)।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا.

"কত মহান তিনি যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি ফুরকান (আল-কুরআন) নাযিল করিয়াছেন যাহাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারে" (২৫ ঃ ১)।

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ.

"স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জিন্নকে, যাহারা কুরআন পাঠ শুনিতেছিল। যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন বলিল, তোমরা চুপ করিয়া শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হইল তখন উহারা উহাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপে" (৪৬ ঃ ২৯)।

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) বলেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হইয়াছে যাহা আমার পূর্ববর্তী কাহাকেও দেওয়া হয় নাই ঃ (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত আমার প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে। (২) যমীনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আমার উম্মতের যেখানেই নামাযের সময় হইবে সেখানেই যেন নামায আদায় করিয়া নেয়। (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে, আমার পূর্বে কাহারও জন্য তাহা হালাল ছিল না। (৪) আমাকে শাফা'আতের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। (৫) পূর্ববর্তী নবীগণকে বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হইত। আর আমি জগৎসমূহের জন্য প্রেরিত হইয়াছি (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ৫৫৩; মুসলিম, মাসাজিদ, বাব ১, নং ১১৬৩/৩/৫২১)। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইতেন। আর আমি লাল-কালো সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি (মুসলিম, নং ৫২১)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যেই সত্তার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁহার কসম! এই উম্মত উম্মতে দাওয়াত বা উম্মতে ইজাবাত। যে কোন ব্যক্তি ইয়াহূদী হউক কিংবা খৃস্টান; আমার আগমনের কথা শুনার পর যদি আমি যে দীন নিয়া প্রেরিত হইয়াছি ইহার উপর ঈমান না আনিয়া মারা যায় তবে সে জাহান্নামী হইবে (মুসলিম, ঈমান, বাব ৭০, নং ৩৮৬/২৪০/১৫৩)।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে নবী-রাসূল এবং আকাশবাসী সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে বলিলেন, হে ইব্ন আব্বাস! কেমন করিয়া এবং কোন দলীলের ভিত্তিতে তাঁহাকে আকাশবাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশবাসীদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ.

"তাহাদের মধ্যে যে বলিবে, 'আমিই ইলাহ্ তিনি ব্যতীত, তাহাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম; এইভাবেই আমি যালিমদেরকে শাস্তি দিয়া থাকি" (২১ ঃ ২৯)।

তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ.

"নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন" (৪৮ ঃ ১-২)।

তাহার পর উপস্থিত লোকজন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী-রাসূলগণের উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কেমন করিয়া? জবাবে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ.

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য" (১৪ ঃ ৪)।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ.

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি" (৩৪ ঃ ২৮)।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সমস্ত জিন ও ইনসানের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন (মুসনাদে দারিমী, ১খ., পৃ. ২৯-৩০, হাদীছ নং ৪৭; ইব্ন আবূ হাতিম, তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ৫৪৭; হাফিয হায়ছামী (র) বলেন, হাদীছটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। তবে হাকাম ইব্ন আবান ইহার ব্যতিক্রম। অবশ্য তিনিও নির্ভরযোগ্য। আবূ ইয়া'লাও হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন; মাজামাউয যাওয়াইদ, ৮খ., পৃ. ২৫৫)।

(তিন) খতমে নবূওয়াত

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করিয়াছেন ইহার অন্যতম হইল হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে তাহাদের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। আর রাসূলুল্লাহ্

(স)-এর বিশেষ সম্মান হইল, তিনি তাঁহার মাধ্যমে নবূওয়াত ও রিসালাতের ধারা সমাপ্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার মাধ্যমেই তিনি দীন ইসলামের পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে এবং রাসূলুল্লাহ্ (স) হাদীছ শরীফে পরিষ্কারভাবে এই কথা জানাইয়া দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পর নূতনভাবে আর কোন নবী বা রাসূল এই পৃথিবীতে আসিবেন না যাহাতে মানুষ একথা বুঝিতে পারে যে, তাঁহার পর যদি কেহ নবূওয়াতের দাবি করে তবে সে মিথ্যাবাদী, প্রতারক এবং দাজ্জাল। খতমে নবূওয়াত তথা নবূওয়াত ও রিসালাতের পরিসমাপ্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا.

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে; বরং সে আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ" (৩৩ ঃ ৪০)।

খতমে নবূওয়াত সম্পর্কে হাদীছের ভাষ্য

এই সম্বন্ধে হাদীছেও বিশদ বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে, বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, পূর্ববর্তী নবীগণের সহিত আমার দৃষ্টান্ত এরূপ— যেমন এক ব্যক্তি একটি বালাখানা তৈরি করিয়াছে এবং সে উহা খুব সুন্দর ও মনোরম করিয়া তৈরি করিয়াছে ,কিন্তু একটি ইটের জায়গা শূন্য রাখিয়া দিয়াছে। লোকজন ইহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ইহার সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়াছে, এই একটি ইট কেন সংযোজন করা হইল না (তাহা হইলে তো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হইত) ? আমিই শূন্যস্থানের সেই ইট এবং আমি খাতামুন্নাবিয়্যীন। অর্থাৎ নবূওয়াতের ইমারত আমার দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৬খ., হাদীছ নং ৩৫৩৫, মুসলিম, হাদীছ নং ২২৮৬)।

মুসলিম শরীফে হাদীছটি এইভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, আমিই সেই ইটের জায়গাটি। আমি আবির্ভূত হইয়া নবূওয়াতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছি (মুসলিম, হাদীছ নং ৫২৩)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্র সামনে বান্দার উপস্থিত হওয়া এবং মানুষের ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া নবীগণের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার ঘটনা বর্ণনা প্রসংঙ্গে বলিয়াছেন, আমি আদম সন্তানের নেতা। তাহার পর হযরত ঈসা (আ) বলিবেন, তোমরা আমি ছাড়া অন্য কাহারও কাছে যাও। তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে যাও। তখন মানুষ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিবে এবং বলিবেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং আখিরী নবী (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮খ., হাদীছ নং ৪৭১২; মুসলিম, হাদীছ ১৯৪)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, ছয়টি বিষয়ের দ্বারা আমাকে অন্যান্য নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে ঃ আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক কালাম দান করা হইয়াছে, রু'ব (ব্যক্তিত্বের প্রভাব বা ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা

হইয়াছে, গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে, আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের বস্তু বানানো হইয়াছে এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রতি আমি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। আর আমার দ্বারা নবূওয়াতের সিলসিলা সমাপ্ত করা হইয়াছে (মুসলিম, হাদীছ নং ৫২৩)।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, নবূওয়াত ও রিসালাতের সিলসিলা শেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার পর আর কোন নবী-রাসূল আসিবেন না। কথাটি সাহাবীগণের নিকট জটিল মনে হইলে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, উহার সুসংবাদ বাকী রহিয়া গিয়াছে। এই কথায় সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সুসংবাদ কি? তিনি বলিলেন, তাহা হইল, মুসলিম ব্যক্তির স্বপ্ন নবূওয়াতের অংশসমূহের একটি বিশেষ অংশ [তিরমিযী, হাদীছ নং ২২৭২; তাঁহার মতে হাদীছটি হাসান, মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ৩খ., পৃ. ২৬৭; মুসতাদরাক হাকেম, ৪খ., পৃ. ৩৯১; তিনি বলেন, হাদীছটি ইমাম মুসলিম (র)-এর সহীহ-এর শর্তে উত্তীর্ণ। তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেন নাই। ইমাম যাহাবীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। নাসিরুদ্দীন আলবানীও হাদীছটিকে সহীহ বলিয়াছেন; সহীহুল জামে, হাদীছ নং ১১২৭ দ্রষ্টব্য। মূল হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত রহিয়াছে]।

মুহাম্মাদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত'ইম তাঁহার পিতা জুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী কারীম (স) বলেন, আমার অনেকগুলি নাম রহিয়াছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি মাহী, আমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কুফরকে ধ্বংস করিয়াছেন; আমি হাশির, সমস্ত মানুষ আমার পদতলে একত্র হইবে এবং আমি আকিব; আমার পর এই পৃথিবীতে আর কেহ নবী হিসাবে আসিবে না (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৬খ., হাদীছ নং ৩৪৫৫; মুসলিম, হাদীছ নং ১৮৪২)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরামই বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোন নবী ইনতিকাল করিতেন তখনই পরবর্তী নবী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। কিন্তু আমার পর আর কোন নূতন নবী আসিবে না (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৬খ., হাদীছ নং ৩৪৫৫; মুসলিম, হাদীছ নং ১৮৪২)।

(চার) বিশ্বজগতের জন্য রহমত

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জগতসমূহের জন্য রহমতস্বরূপ এ পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। মু'মিন-কাফির, জিন-ইনসান সকলের জন্য তিনি রহমত (বিদায়াতুল সুউল ফী তাফদীলির রাসূল, পৃ. ৬৫, ৫৬; খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩২২)।

বিশেষভাবে তিনি মু'মিনদের প্রতি দয়াময় ও পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি এই রহমত গ্রহণ করিয়া ইহার শোকর আদায় করিবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান হইবে। আর যে তাহা

প্রত্যাখ্যান করিবে ও অস্বীকার করিবে সে উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে ইহার প্রতি সমর্থন রহিয়াছে। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ.

"তুমি কি উহাদেরকে লক্ষ্য কর না যাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং উহারা উহাদের সম্প্রদায়কে নামাইয়া আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে জাহান্নামে, যাহার মধ্যে উহারা প্রবেশ করিবে! কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল" (১৪ ঃ ২৮-২৯)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উমার ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এখানে نِعْمَةً বলিয়া মুহাম্মাদ (স) এবং اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا দ্বারা কাফির সম্প্রদায়কে বুঝানো হইয়াছে (তাফসীরে ইব্ন জারীর, ১৩খ., পৃ. ১৪৫-১৪৭; তাফসীরে বাগাবী, ৩খ., পৃ. ৩৫; শামাইলে ইব্ন কাছীর, পৃ. ৫৫৯)।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি" (২১ ঃ ১০৭)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুশরিকদের জন্য বদদু'আ করুন। তিনি বলিলেন, আমি অভিশাপকারী হিসাবে প্রেরিত হই নাই। আমি তো রহমতস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছি (মুসলিম, হাদীছ নং ২৫৯৯)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আরও বর্ণিত রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হে লোকসকল! আমি রহমতস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছি (মুসতাদরাক হাকেম, ১খ., পৃ. ৩৫)। ইমাম হাকেম (র)-এর মতে হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম-এর শর্তে উত্তীর্ণ। আল্লামা যাহাবী (র)ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। হাফিয হায়ছামী (র) বলেন, হাদীছটি বাযযার ও তাবারানী সাগীর ও আওসাতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাযযার-এর রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে হাদীছের শব্দমালা يا ايها الناس انما انا رحمة مهداة নয়, বরং তাহা হইল انما بعثت رحمة مهداة (যাওয়াইদ, ৮খ., পৃ. ২৫৭ দ্র.)।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নিজে আমাদের সামনে তাঁহার কতিপয় নাম উল্লেখ করিলেন। তিনি বলেন, আমি আহমাদ, আখিরী নবী, হাশির, নবীয়্যুত তাওবা ও নবীয়্যুর রহমত (মুসলিম, হাদীছ নং ২৩৫৫)।

হযরত সালমান (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, রাগান্বিত হইয়া আমি হয়ত আমার উম্মতের কাহাকেও গালি দেই বা কাহারও প্রতি অভিসম্পাত করি (তাহা হইতে পারে)। কেননা আমি আদম সন্তান। তাহারা যেমন রাগান্বিত হয় আমিও তদ্রূপ রাগান্বিত হই। বস্তুত আমি জগতসমূহের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। সুতরাং হে আল্লাহ্! আপনি এই গালি

বা অভিশাপকে কিয়ামতের দিন তাহাদের জন্য রহমতে পরিণত করিয়া দিন (আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৬৫৯; মুসনাদে আহমাদ, ৫খ., পৃ. ৪৩৭; মূল হাদীছটি মুসলিম শরীফে উদ্বৃত হইয়াছে, নং ২৬০১)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ الاَّرَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"আমি তো তোমাকে জগতসমূহের জন্য কেবল রহমতস্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি" -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (স) সমস্ত মানুষের জন্য রহমত। যে তাঁহার অনুসরণ ও অনুকরণ করিবে তাহার জন্য তিনি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে রহমত হইবেন। আর যে তাঁহার অনুসরণ করে না তাহাকে নবী (স)-এর উসিলায় ভূমি ধ্বসে যাওয়া, আকৃতি বিকৃত হওয়া ও প্রস্তর বর্ষণ ইত্যাদি বিপদ, যাহাতে পূর্ববর্তী উম্মতরা আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন (তাফসীরে ইব্ন জারীর, ১৭খ., পৃ. ৮৩; তাফসীরে কুরতুবী, ১১খণ্ড, পৃ. ৩৫০; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ.২১১-২১২)।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার وَمَا اَرْسَلْنٰكَ الاَّرَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ. -এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত। মু'মিনদের জন্য হিদায়াতের বাণী প্রচার করার ভিত্তিতে, মুনাফিকদের জন্য মৃত্যুদণ্ড হইতে নিরাপত্তা দানের ভিত্তিতে এবং কাফিরদের জন্য আযাব বিলম্বিত করার ভিত্তিতে তিনি রহমত (শিফা, কাযী ইয়ায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭)।

অবশ্য তিনি মু'মিনদের জন্য বিশেষভাবে রহমতস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছেন। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এক রাসূল আসিয়াছে। তোমাদেরকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মংগলকামী, মু'মিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু" (৯ ঃ ১২৮)।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِىَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"এবং উহাদের মধ্যে এমনও লোক আছে যাহারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, সে তো কর্ণপাতকারী। বল, 'তাহার কান তোমাদের জন্য যাহা মংগল তাহাই শুনে'। সে আল্লাহে ঈমান আনে এবং মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করে। তোমাদের মধ্যে যাহারা মু'মিন সে তাহাদের জন্য রহমত এবং যাহারা আল্লাহ্র রাসূলকে ক্লেশ দেয় তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি" (৯ ঃ ৬১)।

(পাঁচ) তিনি নিজ উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ

আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে মহাসম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার অস্তিত্বকে তাঁহার উম্মতের জন্য আযাব হইতে বাঁচার রক্ষাকবচ বানাইয়াছেন (খাসাইসুল কুবরা, ২ খ., পৃ. ৩২২)। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতদের অনেককে তাহাদের নবীর জীবদ্দশায়ই শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (স)-এর অস্তিত্ব তাঁহার উম্মতের জন্য ছিল রক্ষাকবচ। অনুরূপভাবে তাঁহার অস্তিত্ব তামাম ফিতনা-ফাসাদ, লড়াই, ইরতিদাদ ও মনের গরমিল ইত্যাদি সবকিছু হইতেই তাঁহার সাহাবীগণকে রক্ষা করিয়াছে। অবশ্য তাঁহার ইনতিকালের পর এই ধরনের কিছু বিষয় সংঘটিত হইয়াছে।

শায়খ 'ইয্‌যুদ্দীন আবদুস সালাম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হইল, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে জগতসমূহের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নাফরমান উম্মতকে সুযোগ দিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বাকী রাখার লক্ষ্যে আযাব ত্বরান্বিত করেন নাই। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী নবীগণের বিষয়টি ইহার ব্যতিক্রম। অর্থাৎ যখনই উম্মতরা তাঁহাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে তখনই তাহাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের বিবরণ কুরআন, হাদীছ এবং পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের আলোচনায় উল্লেখ রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায়ও এই কথা উক্ত হইয়াছে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪৬৪৮; শব্দমালা বুখারীরই; মুসলিম, হাদীছ নং ২৭৯৬)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আবূ জাহল বলিল, হে আল্লাহ! ইহা যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও। তখন নাযিল হইল ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .....

"আল্লাহ এমন নহেন যে, তুমি তাহাদের মধ্যে থাকিবে অথচ তিনি তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ এমনও নহেন যে, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে অথচ তিনি তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন। এবং তাহাদের কী বা বলিবার আছে যে, আল্লাহ্ তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন না, যখন তাহারা লোকজনকে মসজিদুল হারাম হইতে নিবৃত্ত করে? তাহারা উহার তত্ত্বাবধায়ক নহে, শুধু মুত্তাকীগণই উহার তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা অবগত নহে" (৮ ঃ ৩৩-৩৪)।

হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে মাগরিবের নামায আদায় করার পর বলিলাম, আমরা যদি বসিয়া থাকিতাম তাঁহার সঙ্গে ইশার নামায আদায় করা পর্যন্ত! এই বলিয়া আমরা বসিয়া রহিলাম। এমতাবস্থায় তিনি আমাদের সামনে আসিয়া বলিলেন,

তোমরা কি এখানেই ছিলে? আমরা বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার সহিত মাগরিবের নামায আদায় করিবার পর বলিলাম, ইশা পর্যন্ত আমরা এখানেই উপবিষ্ট থাকিব। একথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ভাল করিয়াছ অথবা বলিলেন, তোমরা ঠিক করিয়াছ। তাহার পর তিনি আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করিলেন। আর তিনি প্রায়ই আকাশের দিকে তাকাইতেন। ইহার পর বলিলেন, নক্ষত্ররাজি আকাশের রক্ষাকবচ। যখন নক্ষত্রসমূহ ধ্বংস হইয়া যাইবে তখন আকাশের ব্যাপারে কুরআন মজীদে যাহা ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা সংঘটিত হইতে থাকিবে। আমি আমার সাহাবীদের জন্য রক্ষাকবচ। যখন আমি বিদায় লইব তখন আমার সাহাবীদের উপর ঐ সমস্ত বিপদ-আপদ আসিতে থাকিবে যাহার অঙ্গীকার করা হইয়াছে। আর আমার সাহাবীগণ আমার উম্মতের জন্য রক্ষাকবচ। যখন তাহারা চলিয়া যাইবে তখন আমার উম্মতের মধ্যে ঐ সমস্ত ঘটনা ঘটিবে যাহা তাহাদের ব্যাপারে অঙ্গীকার করা হইয়াছে (শারহুন--নাবাবী, মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৮৩; মুসলিম, হাদীছ নং ২৫৩১)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে "সালাতুল কুসূফ"-এর আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দেন নাই, আমি তাহাদের মধ্যে জীবিত থাকা অবস্থায় আপনি তাহাদের শাস্তি দিবেন না? আপনি কি এই ওয়াদা করেন নাই, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনারত থাকিলে আপনি তাহাদের শাস্তি দিবেন না [আবূ দাউদ, হাদীছ নং ১১৯; নাসাঈ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৪৯; নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলিয়াছেন। সহীহ সুনানে আবূ দাউদ, হাদীছ নং ১০৫৫; নাসাঈ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩; মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯; আহমাদ শাকির-এর মতে হাদীছটি সহীহ। অপর এক বর্ণনায়ও অনুরূপ কথা উল্লেখ রহিয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাফসীর ইব্ন জারীর, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭]।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের আমান ও নিরাপত্তার জন্য দুইটি ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত তাহা তোমাদের মধ্যে থাকিবে তোমরা আযাব হইতে নিরাপদ থাকিবে। একটি আল্লাহ তা'আলা উঠাইয়া নিয়াছেন এবং অপরটি বাকী রহিয়াছে। তাহা হইল আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

(ছয়) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন ও সত্তার শপথ গ্রহণ

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বক্তব্যকে সুদৃঢ় করার জন্য সৃষ্টির বহু কিছুর শপথ করিয়াছেন [আল্লাহ্র জন্য সৃষ্টির শপথ করা জায়েয। কিন্তু কোন সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্র যাত (সত্তা) ও সিফাত (গুণাবলী) ব্যতীত অন্য কিছুর শপথ করা জায়েয নয়। এই ব্যাপারে বহু দলীল-প্রমাণ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ কেহ যদি শপথ করে তবে সে যেন আল্লাহ্র নামে শপথ করে অথবা নীরব থাকে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১১ খণ্ড, হাদীছ নং ৬৬৪৬; মুসলিম, ৩য় খণ্ড,

হাদীছ নং ১৬৪৬)। হাফিয ইব্ন হাজার (র) বলেন, আলিমগণ বলিয়াছেন, গায়রুল্লাহ্র নামে শপথ করা নিষিদ্ধ হওয়ার পিছনে রহস্য হইল, কোন বস্তুর নামে শপথ করা হইলে ইহাতে উহাকে সম্মান করা হয়। আর সম্মান তো একমাত্র আল্লাহ্র জন্য খাস (দ্র. ফাতহুল বারী, ১১খ., পৃ. ৫৪০)। ইহাতে তাঁহার কামাল বা পূর্ণতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র, সূর্য, ভোরবেলা, আকাশ ইত্যাদির শপথ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) ছাড়া কোন মানুষের নামে আল্লাহ তা'আলা শপথ করেন নাই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

"তোমার জীবনের শপথ! উহারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হইয়া আছে" (১৫ ঃ ৭২)।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর তুলনায় অধিক সম্মানিত কোন মাখলূক আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন নাই। আর তিনি ছাড়া কোন মানুষের জীবনের শপথ করিতে আমি আল্লাহ তা'আলাকে শুনি নাই অর্থাৎ পাই নাই। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার জীবনের শপথ করিয়া বলেন ঃ

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

"তোমার জীবনের শপথ উহারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হইয়া আছে" (১৫ ঃ ৭২)।

ইহার মর্ম এই যে, আপনার জীবন, আপনার বয়স এবং দুনিয়ায় আপনার অবস্থান ইত্যাদির শপথ (তাফসীর ইব্ন জারীর, ১৪ খ., পৃ. ৩০; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৫ দ্র.)।

শায়খ ইব্ন আবদুস সালাম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার জীবনের কসম করিয়া বলিয়াছেন ঃ

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

উল্লেখ্য যে, এই শপথের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শপথকারীর নিকট যাঁহার জীবনের শপথ করা হয় তিনি মহা সম্মানিত। কাজেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের শপথ করাই অধিক বাঞ্ছনীয়। কেননা তাঁহার জীবনের মধ্যে ব্যাপক বা সাধারণ ও বিশেষ উভয় প্রকারের বরকত নিহিত আছে যাহা অন্যদের মধ্যে অনুপস্থিত (বিদায়াতুস সুউল ফী তাফদীলির রাসূল, পৃ. ৩৭ দ্র.)।

(সাত) রাসূলুল্লাহ (স)-কে নবী ও রাসূল বলিয়া সম্বোধন

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে তাঁহাকে কুরআন মজীদে নবী-রাসূল বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাঁহার নাম ধরিয়া সম্বোধন করেন নাই (আল-ওয়াফা বি-আহ্ওয়ালিল মুসতাফা, পৃ. ৩৬২, ৩৬৩; আল-খাসাইসুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪; বিদায়াতুস সুউল, পৃ. ৩৭-৩৮)। পক্ষান্তরে অন্যান্য নবী-রাসূলকে তাঁহাদের নাম ধরিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ.

"হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যাহারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়" (৫ ঃ ৪১)।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ.

"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা প্রচার কর" (৫ ঃ ৬৭)।

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট" (৮ ঃ ৬৪)।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ অন্যান্য নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে বলিয়াছেন ঃ

يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ.

"হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর" (২ ঃ ৩৫)।

يَا نُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ.

"হে নূহ্! অবতরণ কর শান্তি ও কল্যাণসহ" (১১ ঃ ৪৮)।

يَا مُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ.

"হে মূসা! আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি" (৭ ঃ ১৪৪)

আরও বলা হইয়াছে ঃ

يٰاِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا.

"হে ইব্রাহীম! 'তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করিলে" (৩৭ ঃ ১০৪-১০৫)।

يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ.

"হে মারইয়াম-তনয় 'ঈসা! তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর" (৫ ঃ ১১০)

ইহা ছাড়া আরও বহু আয়াতে এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে।

শায়খ ইব্ন আবদুস সালাম (র) বলেন, এই কথা সকলের নিকটই স্পষ্ট যে, মনিব যদি তাহার কোন গোলামকে বিশেষ বিশেষণে সম্বোধন করে এবং অন্যদেরকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করে তবে ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যাহাকে বিশেষ বিশেষণে সম্বোধন করা হইয়াছে, তিনি অন্যদের তুলনায় তাহার নিকট অধিক সম্মানিত (দ্র. বিদায়াতুস সুউল ফী তাফদীলির রাসূল, পৃ. ৩৮)।

আল্লামা ইব্‌নুল জাওযী (র) বলেন, পরিচিতির জন্য যেখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে 'রাসূল' শব্দটিও যোগ করা হইয়াছে (আল-ওয়াফা, পৃ. ৩৬৩)। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ الاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ.

"মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে" (৩ ঃ ১৪৪)।

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

"মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল" (৪৮ ঃ ২৯)।

وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ.

"এবং যাহারা ঈমান আনে মুহাম্মাদের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে" (৪৭ ঃ ২)।

উল্লেখ্য যে, কুরআন মজীদের যে স্থানে ইব্‌রাহীম (আ)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে ইব্‌রাহীম (আ)-কে তাঁহার নাম সহকারে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁহার উপাধিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ.

"নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তাহারা ইব্‌রাহীমের ঘনিষ্ঠতম যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং এই নবীরও" (৩ ঃ ৬৮)।

(আট) রাসূলুল্লাহ (স)-কে নাম ধরিয়া ডাকা নিষেধ

রাসূলুল্লাহ (স)-কে কিভাবে সম্বোধন করিতে হইবে এবং তাঁহার সহিত কিভাবে কথা বলিতে হইবে এই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাদেরকে আদব শিক্ষা দিয়াছেন। উদ্দেশ্য হইল, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে আদেশ করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিবে না, বরং তাঁহাকে "হে নবী বা হে রাসূল" বলিয়া সম্বোধন করিবে (আল-ওয়াফা, ২ খ., পৃ. ৭-৮; আল-খাসাইস, ২খ., পৃ. ৩২৪)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনেব লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু কুরআন মজীদে তাঁহাকে নবী ও রাসূল বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেহেতু ঈমানদার লোকদের জন্য অপরিহার্য হইল তাঁহাকে এভাবেই সম্বোধন করা। ডাকার এই পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (স)-এরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য নবী-রাসূলের বিষয়টি ইহার ব্যতিক্রম। কেননা তাঁহাদেরকে তাঁহাদের উম্মতগণ নাম ধরিয়াও ডাকিত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لاَتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের পরস্পরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করিও না। তোমাদের মধ্যে যাহারা অলক্ষ্যে সরিয়া পড়ে আল্লাহ তো তাহাদেরকে জানেন। সুতরাং যাহারা তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় তাহাদের উপর আপতিত হইবে অথবা আপতিত হইবে তাহাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি" (২৪ ঃ ৬৩)।

ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) প্রমুখ বলেন, প্রথমে লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে হে মুহাম্মাদ! হে আবুল কাসিম! বলিয়া সম্বোধন করিত। পরে নবী কারীম (স)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে ডাকিতে তাহাদের নিষেধ করেন এবং হে আল্লাহ্র নবী! হে আল্লাহ্র রাসূল! বলিয়া ডাকিতে হুকুম করেন, (দ্র. তাফসীরে ইব্ন জারীর, ১৮ খ., পৃ. ১৩৪; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৩ খ., পৃ. ৩১৮)।

কাতাদা (র) উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী কারীম (স)-কে তা'যীম করা এবং তাঁহার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার আদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহাকে নেতা হিসাবে বরণ করারও হুকুম দিয়াছেন, (দ্র. তাফসীর ইব্ন জারীর ১৮ খ., পৃ. ১৩৪; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৩ খ., পৃ. ৩১৮)।

পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতগণের সম্বোধনের ভাষা ইহার ব্যতিক্রম। তাহারা যে ভাষায় তাহাদের নবীকে সম্বোধন করিয়াছে তাহা উল্লেখপূর্বক বলা হইয়াছে ঃ

قَالُوْا يَا مُوْسٰى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ.

"তাহারা বলিল, হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর" (৭ ঃ ১৩৪)।

قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ.

"তাহারা বলিল, হে মূসা! তাহাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও" (৭ ঃ ১৩৮)।

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, হে মারইয়াম-তনয় 'ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করিতে সক্ষম? সে বলিয়াছিল, আল্লাহ্কে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও" (৫ ঃ ১১২)।

(নয়) ব্যাপক অর্থবোধক কালাম

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (স) -কে অন্যান্য নবী-রাসূলগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। এবং তিনি তাঁহাকে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার ক্ষমতা দান

করিয়াছেন (দ্র. আল-ওয়াফা, ২খ., পৃ. ১৪; শামাইলে ইব্ন কাছীর, পৃ. ৬০৫ ও খাসাইস, ২খ., পৃ. ৩৩১-৩৩৩)।

তিনি কথা বলার সময় এমন বাক্য ব্যবহার করিতেন যাহা শব্দগত দিক হইতে সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহার অর্থ ছিল ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ (হাফিয ইব্ন হাজার, ফাতহুল বারী, ১৩ খ., পৃ. ২৬১; ইমাম যুহরী (র)-ও অনুরূপ বলিয়াছেন; ফাতহুল বারী, ১২খ., পৃ. ৪১৮; ইব্নুল আছীর, জামি'উল উসূল, ৮খ., পৃ. ৫৩১)।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ভাষার কুঞ্জি দান করিয়াছেন। ভাষার অলংকার, সাহিত্যের লালিত্য, বক্তব্যের গভীরতা এবং শব্দ প্রয়োগের পাণ্ডিত্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন, যাহা অন্যদের জন্য ছিল খুবই দুষ্কর, এমনকি অসম্ভবও বটে (ইব্ন মানযূর, লিসানুল 'আরাব, ২খ., পৃ. ৫৩৭)।

ইব্ন আবদুস সালাম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হইল, আল্লাহ্ তাঁহাকে ব্যাপক অর্থবোধক ভাষা দান করিয়াছেন। ফলে তিনি অল্প কথায় অনেক তথ্য তুলিয়া ধরিতে পারিতেন। ভাষার অলংকার ও বাগ্মিতায় তিনি ছিলেন আরবদের শীর্ষস্থানীয় (গায়াতুস সুউল ফী তাফদীলির রাসূল, পৃ. ৪৭)।

এই সম্বন্ধে হাদীছে বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছেঃ আমাকে ব্যাপক কালাম দান করা হইয়াছে ; রু'ব তথা ভীতির দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে; গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে; আমার জন্য পৃথিবীকে পবিত্রতা হাসিলের বস্তু ও মসজিদ করা হইয়াছে; আমাকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং নবূওয়াত ও রিসালাতের সিলসিলা আমার দ্বারা সমাপ্ত করা হইয়াছে (মুসলিম, হাদীছ নং ৫২৩)।

আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ আমাকে ভাষার কুঞ্জি, জামে' কালাম এবং সাহিত্য ও কাব্যজ্ঞান দান করা হইয়াছে (মুসনাদ আহমাদ ইব্ন হাম্বল, ১খ., পৃ. ৪০৮-৪৩৭; মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, ৪খ., নং ১৭৩৭)।

হাফিয ইব্ন রাজাব হাম্বালী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে যে জামে' কালাম দান করা হইয়াছে তাহা দুই প্রকার। (১) এমন জামে কালাম যাহা কুরআন মজীদে উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَائِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ.

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর" (১৬ ঃ ৯০)।

হাসানী বসরী (র) বলেন, এই আয়াতে যাবতীয় কল্যাণের হুকুম দেওয়া হইয়াছে এবং যারতীয় অকল্যাণ হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

(২) এমন জামে কালাম যাহা হাদীছ শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে। এই জাতীয় কালাম হাদীছের মধ্যে ছড়াইয়া আছে (জামি'উল 'উলূম ওয়াল-হিকাম, আল্লামা ইব্‌ন রাজাব (র), পৃ. ৩ দ্র.)। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী ঃ আমলের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর যে যাহা নিয়ত করিবে সে তাহাই পাইবে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১খ., নং ১; মুসলিম, হাদীছ নং ১৯০৭)।

ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, এই হাদীছে ইলমের তিন ভাগের এক ভাগ নিহিত রহিয়াছে এবং তাহা ফিক্‌হ-এর সত্তরটি অধ্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (জামি'উল 'উলূম ওয়াল-হিকাম, পৃ. ৫)।

কাযী ইয়ায (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্বাভাবিক কথা, তাঁহার বাগ্মিতা, জামে কালাম ও হিকমত ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার ফাসাহাত, বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্যের কোন তুলনা হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণস্বরূপ কিছু হাদীছও উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ তুমি যেখানেই থাকিবে আল্লাহকে ভয় করিবে; কোন মন্দ কাজ হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে কোন নেক আমল করিবে; তাহা হইলে নেকী বদীকে মিটাইয়া দিবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করিবে (তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৮৭; ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীছটি হাসান, সহীহ। মুসনাদে আহমাদ, ৫খ., হাদীছ নং ৫৪। হাকেমের মতে হাদীছটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ)।

তিনি আরও বলেন ঃ কল্যাণকামিতাই দীন। সাহাবীগণ বলেন, আমরা প্রশ্ন করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাহার জন্য? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্, তাঁহার কিতাব, রাসূল, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সকল মানুষের জন্য" (মুসলিম, হাদীছ নং ৫৫)।

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ সন্দেহজনক কাজ ছাড়িয়া সন্দেহমুক্ত কাজ করিবে (তিরমিযী, হাদীছ নং ২৫১৮, ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীছটি হাসান-সহীহ। মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ২০০; নাসাঈ, ৮খ., হাদীছ নং ৩২৭-৩২৮; হাকেম, ২খ., হাদীছ নং ১৩; তাহার মতে হাদীছটির সূত্র সহীহ। তবে বুখারী ও মুসলিম তাহা বর্ণনা করেন নাই। আল্লামা যাহাবীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন)।

আরও বহু হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা, তাঁহার কথোপকথন, বক্তৃতা, দু'আ ও অঙ্গীকারমূলক কথার উল্লেখ রহিয়াছে। এসব কিছু এমনভাবে বিন্যস্ত যাহার সহিত অন্য কোন মানুষের কথাবার্তা ইত্যাদিকে তুলনা করা যায় না এবং এই বিষয়ে তাঁহার অগ্রগামী বা তাঁহার সমকক্ষ হওয়াও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় (শিফা, কাযী ইয়ায, ১খ., হাদীছ নং ১৭৩-১৭৬)।

(দশ) শ্রদ্ধা ও ভক্তি মিশ্রিত ভয় বা ব্যক্তিত্বের প্রভাব

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি মিশ্রিত ভীতি (رُعْبٌ) অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের প্রভাব দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর শত্রুদের হৃদয়ে ভয় ঢালিয়া দিতেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (স) ও শত্রুদের মধ্যে এক মাস বা দুই মাসের পথের দূরত্ব থাকা অবস্থায়ই তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া যাইত এবং তাঁহার মুকাবিলায় আসিতে সাহস করিত না (ইব্‌নুল আছীর আল-জাযারী, জামি'উল 'উসূল, ৮খ., পৃ. ৫৩১)।

আল্লামা ইব্‌ন হাজার (র) বলেন, এই বৈশিষ্ট্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে সর্বাবস্থায় পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। এমনকি একাকী থাকা অবস্থায়ও তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে (ফাতহুল বারী, ১খ., নং ৫২১ দ্র.)। হাদীছে এই সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ রহিয়াছে।

আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ চারটি বিষয়ের দ্বারা আমাকে অন্যান্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে। আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রকারী বস্তু বানানো হইয়াছে। আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির যদি নামাযের ওয়াক্ত হয় এবং কিসের উপর দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে এমন কিছু না পাইলে সে মাটিকে মসজিদ এবং পবিত্রকারী বস্তু হিসাবে ব্যবহার করিবে। আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। এক মাস বা দুই মাসের পথ পর্যন্ত আমাকে রু'ব (ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় মিশ্রিত ভীতি) দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে। আর আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে (বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ১খ., হাদীছ নং ২১২; নাসিরুদ্দীন আলবানীর মতে হাদীছটি সহীহ্। সহীহ্ জামিউস সাগীর, হাদীছ নং ৪০৯৬ দ্র.)।

সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) হইতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) বলেন ঃ আমাকে পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা অন্যান্য নবীগণের উপর শেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছেঃ আমি সমস্ত মানুষের প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি; আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশকে সংরক্ষণ করিয়াছি; রু'ব দ্বারা আমার সামনে এক মাসের পথ এবং পেছনে এক মাসের পথ পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি; আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রকারী বস্তু বানানো হইয়াছে; আর আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে। আমার পূর্ববর্তী কাহারও জন্য তাহা হালাল ছিল না (তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হাদীছ নং ৬৬৭৪; নাসিরুদ্দীন আলবানী দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হাদীছটিকে সহীহ্ প্রমাণিত করিয়াছেন। সহীহ্ জামে সাগীর, হাদীছ নং ৪০৯৭ দ্র.)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ ছয়টি বিষয়ের দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে ঃ আমার জন্য গনীমতের মাল হালা করা হইয়াছে, পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রকারী বস্তু বানানো হইয়াছে, আমাকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং আমার দ্বারা নবূওয়াতের সিলসিলা খতম করা হইয়াছে।

আল্লামা তীবি (র) বলেন, কোন বর্ণনায় ছয়টি, কোন বর্ণনায় পাঁচটি এবং কোন বর্ণনায় চারটি বিষয়ের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। মূলত এগুলির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা এক সংখ্যা উল্লেখ করার দ্বারা অন্য সংখ্যাকে অস্বীকার হয় না। অথবা বর্ণনাকারী প্রথমে কমের ব্যাপারে জ্ঞাত হইয়াছেন এবং পরে বেশির ব্যাপারে জ্ঞাত হইয়াছেন (উমদাতুল কারী, ৪খ., হাদীছ নং ৮; ফাতহুল কাদীর, ৪খ., হাদীছ নং ৪৩৯ দ্র.)।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, তাবূক যুদ্ধের সময় এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স) নামায আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হইলে কতিপয় সাহাবী তাঁহার পাহারাদানের উদ্দেশ্যে তাঁহার পিছনে একত্র হন। রাসূলুল্লাহ (স) নামাযশেষে তাঁহাদের বলেন, আজ রাত্রে আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হইয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। আমি সমস্ত মানুষের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি; কিন্তু আমার পূর্বে বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইত। রু'ব দ্বারা আমাকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা হইয়াছে। আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে; কিন্তু আমার পূর্বে গনীমতের মাল ভোগ করাকে হারাম মনে করা হইত এবং তাহা জ্বালাইয়া দেওয়া হইত। আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রকারী বস্তু বানানো হইয়াছে। কাজেই যেখানেই আমার নামাযের ওয়াক্ত হয়, সেখানেই আমি তায়াম্মুম করিয়া নামায আদায় করিতে পারি। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতগণকে গীর্জা ও ইবাদতখানায় নামায আদায় করিতে হইত। আমাকে বলা হইয়াছে, আপনি দু'আ করুন। কেননা পূর্ববর্তী নবীগণ সকলেই বিশেষ ধরনের দু'আ করিয়াছেন। অবশ্য আমি কিয়ামত দিবসের জন্য আমার দু'আর বিষয়টিকে স্থগিত রাখিয়াছ। আর তাহা তোমাদের জন্য এবং ঐ সমস্ত লোকের জন্য যাহারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই (মুসনাদে আহমাদ, ৩খ., হাদীছ নং ২২২; হাফিয হায়ছামী বলেন, ইহার রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০খ., পৃষ্ঠা নং ৩৬৭ দ্র.)।

(এগার) পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি তাঁহারই হাতে

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে মহাসম্মানে ভূষিত করিয়াছেন এবং অন্যান্য নবীগণ অপেক্ষা তাঁহাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি দান করিয়াছেন (খাসাইস, ২খ., পৃ. ৩৩১ দ্র.)। অর্থাৎ তাঁহার এবং তাঁহার উম্মতের জন্য রাজ্যজয়, পৃথিবীর ধনভাণ্ডার হস্তগত করা, গনীমতের মাল প্রাপ্ত হওয়া এবং সোনা-রূপার গুপ্ত সম্পদ ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করা ইত্যাদিকে সহজ করিয়া দিয়াছেন। আল্লামা খাত্তাবী অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (ফাতহুল বারী, ২খ., হাদীছ নং ৪৪২; ইব্নুল আছীর, জামিউল উসূল, ৮খ., পৃ. ৫৩২ দ্র.)। হাদীছে অনুরূপ বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে ঃ

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ জামে কালাম দিয়া আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে; রু'ব বা ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে। একদা আমি যখন

ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে পৃথিবীর খাযানা প্রদান করা হয় এবং আমার হাতে স্বর্ণের বলয় পরাইয়া দেওয়া হয়। এই বলয় দুইটি আমার অপসন্দ লাগে এবং ইহাতে আমি ভীষণভাবে চিন্তিত হইয়া পড়ি। তখন আমার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়, তুমি ইহাতে ফুক দাও। আমি তাহাতে ফুক দিলে বলয় দুইটি উধাও হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমার মতে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হইল, দুই মিথ্যাবাদী এবং তাহাদের মধ্যে আমার অবস্থান। একজন হইল সানআর অধিবাসী, আর অপরজন হইল ইয়ামামার অধিবাসী। সানআর অধিবাসী হইল আসওয়াদ আনাসী এবং ইয়ামামার অধিবাসী হইল মুসায়লামাতুল কায্‌যাব (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১১খ., হাদীছ নং ৬৫৯০; মুসলিম, ২২খ., হাদীছ নং ২২৭৪)।

'উকবা (রা) বলেন, একদা নবী কারীম (স) বাড়ি হইতে বাহির হইয়া উহুদের শহীদগণের জানাযায় নামায আদায় করিলেন। অতঃপর আসিয়া মিম্বরে আরোহণ করিয়া বলিলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য অগ্রগামী এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী হইব। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এখান হইতে হাওয দেখিতে পাইতেছি। পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার পর তোমাদের শিরকে লিপ্ত হওয়ার কোন আশংকা আমি করি না। তবে আমার আশংকা হইল, তোমরা দুনিয়ার ঐ সমস্ত ধনভাণ্ডার হাসিলের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া পড়িবে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১২খ., হাদীছ নং ৭০৩৭; মুসলিম, ২২খ., হাদীছ নং ১২২৯৬)।

(বার) রাসূলুল্লাহ (স)-এর যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করা হইয়াছে

মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স)-কে বহু মর্যাদা দান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এই মাগফিরাতের সুসংবাদ জানাইয়া দিয়াছেন (খাসাইস, ২খ., পৃ. ৩৩৬)।

শায়খ ইব্‌ন আবদুস সালাম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার জীবনের যাবতীয় গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়ার সুসংবাদ দান করিয়াছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন নবী সম্বন্ধে এই জাতীয় সুসংবাদ প্রদান করা হয় নাই। হাশরের ময়দানে নবীগণের "নাফসী নাফসী" বলা হইতে একথাই প্রতীয়মান হয় (বিদায়াতুস সুউল ফী তাফদীলির রাসূল, পৃ. ৩৫ দ্র.)।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

انَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ .

-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অন্য কোন নবী-রাসূল শরীক নাই (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৯৮)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উক্ত বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا.

"নিশ্চয় আমি আপনাকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং আপনার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন" (৪৮ ঃ ১-২)।

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. الَّذِيْ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.

"আমি কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই? আমি অপসারণ করিয়াছি আপনার ভার, যাহা ছিল আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক এবং আমি আপনার খ্যাতিকে সমুন্নত করিয়াছি" (৯৪ ঃ ১-৪)।

শাফা'আতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আনাস (রা) বলেন, ... তাহার পর লোকেরা ঈসা (আ)-এর নিকট আসিবে। তিনি বলিবেন, আমি এই কাজের উপযুক্ত নই বরং তোমরা আল্লাহ্র বান্দা মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট যাও। তাঁহার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮খ., হাদীছ নং ৪৭১২; মুসলিম, হাদীছ নং ১৯৪)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে শাফাআতের বর্ণনা প্রসঙ্গে অপর হাদীছে আছে ঃ তখন লোকেরা ঈসা (আ)-এর নিকট আসিবে। তিনি বলিবেন, তোমরা মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট যাও। তাহারা মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট আসিবে এবং বলিবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়া দিয়াছেন (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮খ., হাদীছ নং ৪৭১২; মুসলিম, হাদীস নং ১৯৪)।

আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। ইহাতে তাঁহার উভয় পা ফুলিয়া যাইত। আইশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এইরূপ কষ্ট করেন কেন? আল্লাহ্ তো আপনার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ আমি কি আল্লাহ্র শোকরগুজার বান্দা হওয়া কামনা করিব না?

শেষ জীবনে তাঁহার স্বাস্থ্য মোটা হইয়া গেলে তিনি বসিয়া নফল নামায পড়িতেন (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮খ., হাদীছ নং ৪৮৩৭; মুসলিম, হাদীছ নং ২৮২০)। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) বলেন ঃ ছয়টি বিষয়ের দ্বারা আমাকে অন্যান্য নবী-রাসূলগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমার পূর্ববর্তী অন্য কাহাকেও প্রদান করা হয় নাই। আমার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে.... আল্লাহ্র শপথ! যাঁহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদের সাথী তথা নবীর হাতেই থাকিবে লিওয়াউল হামদ' (لواء الحمد = প্রশংসার ঝাণ্ডা)। আর এইঝাণ্ডার ছায়াতলে থাকিবেন আদম (আ)-সহ

সমস্ত নবী-রাসূল [ইমাম বাযযার হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয হায়ছামী বলেন, ইহার সূত্র খুবই মযবুত, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮খ., পৃ. ২৬৯; আল্লামা সুয়ূতীর মতেও হাদীছটির সূত্র মযবুত; খাসাইসুল কুবরা, ২খ., হাদীছ নং ৩৩৬০)।

হুযায়ফা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। আমরা মনে করিলাম, হয়ত তিনি আসিবেন না। কিন্তু পরে তিনি আসিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরিয়া সিজদা করিলেন আমরা ধারণা করিলাম, হয়ত তাঁহার জান কবয করা হইয়াছে। তাহার পর তিনি মাথা তুলিয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার সহিত পরামর্শ করার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি তাহাদের সহিত কিরূপ আচরণ করিব? আমি বলিলাম, আপনার যেরূপ ইচ্ছা। তাঁহারা তো আপনারই সৃষ্টি এবং আপনারই বান্দা। দ্বিতীয়বার তিনি এই ব্যাপারে আমার পরামর্শ চাহিলে আমি অনুরূপ জবাব দিলাম। তখন আল্লাহ বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মতের ব্যাপারে আমি আপনাকে লাঞ্ছিত করিব না। ইহার পর তিনি আমাকে এই মর্মে সুসংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এই সত্তর হাজারের প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে থাকিবে আরও সত্তর হাজার। তাহাদের কোন হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হইবে না।

তারপর আল্লাহ তা'আলা কোন এক ফেরেশতাকে আমার নিকট পাঠাইবেন। তিনি বলিবেন, আপনি দু'আ করুন, কবূল করা হইবে এবং প্রার্থনা করুন, মঞ্জুর করা হইবে। আমি তাহাকে বলিব ঃ আমি যাহা চাহিব তাহাই কি আমাকে প্রদান করা হইবে? ফেরেশতা বলিবেন, আপনাকে দেওয়ার জন্যই তো আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে সব কিছুই দান করিয়াছেন। ইহাতে আমার কোন অহংকার নাই। আমার জীবদ্দশায়ই তিনি আমার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাকে এই অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছেন যে, আমার উম্মত কখনও দুর্ভিক্ষে পড়িবে না এবং তাহারা পরাজিত হইবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাকে হাওযে কাওছার দান করিয়াছেন। বস্তুত জান্নাতেরই একটি নহর প্রবাহিত হইয়া হাওযে কাওছার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তিনি আমাকে ইজ্জত দান করিয়াছেন ও বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। পূর্ববর্তী নবীগণের উপর কিছু কঠোর বিধান ছিল, সেগুলিকে তিনি আমার উম্মতের জন্য সহজ করিয়া দিয়াছেন এবং আমাদের জন্য দীনি বিষয়ে কোন জটিলতা রাখেন নাই (মুসনাদে আহমাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩; হাফিয হায়ছামী (র) বলেন, হাদীছটি ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন; হাদীছের সনদ হাসান; মাজমা উয্-যাওয়াইদ, ১০খ., হাদীছ নং ৬৮৬৯)।

(তের) তাঁহাকে চিরন্তন কিতাব দান করা হইয়াছে

আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের প্রত্যেককেই এমন কিছু মু'জিযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দান করিয়াছেন, যাহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাঁহাদের আনীত আদর্শের সত্যতা ও বিশুদ্ধতার

প্রমাণ বহন করে এবং যে সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহাদের জন্য ছিল তাহাতে বিশদ যুক্তি ও প্রমাণ। তবে এই মু'জিযা ছিল সাময়িক। নবী-রাসূলগণের জীবদ্দশায়ই ঐসব মু'জিযার স্থায়িত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা, যাহা তাঁহারই একমাত্র বৈশিষ্ট্য, তাহা হইল মহাগ্রন্থ কুরআন মজীদ। এই কুরআন শাশ্বত ও চিরন্তন। কিয়ামত পর্যন্ত এই কিতাব সর্বকালের সর্বযুগের সকল স্তরের মানুষের জন্য সমভাবে অনুসরণীয়। ইহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া শেষ করা যাইবে না। ইহার আশ্চর্যাবলী ও উপকারিতা বর্ণনা করিয়াও খতম করা যাইবে না। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এই কিতাবের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাই এই কিতাব সকল প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রদবদল হইতে চিরসংরক্ষিত (ফুসূল, পৃ. ২৮৭; খাসাইস আফদালিল মাখলূকীন, পৃ. ৩৯৮; খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩১৫-১৮)।

শায়খ ইব্ন আবদুস সালাম (র) বলেন, প্রত্যেক নবীর মু'জিযা তাঁহার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের নবী সায়্যিদুল আওয়ালীন ওয়াল-আখিরীন-এর মু'জিযা হইল কুরআন মজীদ। এই মু'জিযা শাশ্বত, চিরন্তন। তাহা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকিবে (গায়াতুস সুউল ফী তাফদীলির রাসূল, পৃ. ৩৯)। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইহার প্রতিটি শব্দ সংরক্ষণ করিয়াছেন। যদি দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একত্র হইয়া চেষ্টা করিয়া ইহার মধ্যে কোন অক্ষর বাড়াইতে বা কমাইতে চায়, তবে তাহারা তাহা করিতে সক্ষম হইবে না। পক্ষান্তরে তাহারা ইনজীলে কি পরিমাণ রদবদল করিয়াছে; তাহা কাহারও নিকট অস্পষ্ট নয় (ঐ, পৃ. ৭০)। কুরআন মজীদে এই বিষয়ে মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

انَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَانَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

"আমিই কুরআন নাযিল করিয়াছি এবং অবশ্যই আমি ইহার সংরক্ষক" (১৫ ঃ ৯)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীকে কিছু আয়াত বা নিদর্শন প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি নাযিলকৃত আয়াতের উপর যে পরিমাণ মানুষ ঈমান আনিয়াছে, কোন নবীর উপর নাযিলকৃত আয়াতের উপর সে পরিমাণ মানুষ ঈমান আনে নাই। আমাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা তো ওহী, যাহা আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীদের সংখ্যা অন্যান্যদের তুলনায় অধিক হইবে বলিয়া আমি আশাবাদী, বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪৯৭১; মুসলিম, হাদীছ নং ১৫২)।

হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী (র) বলেন, নবী কারীম (স) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় অধিক হইবে বলিয়া আমি আশাবাদী"। এই বাক্য দ্বারা কুরআন মজীদের চিরন্তন মু'জিযার কথা প্রতীয়মান হয়। যেহেতু কুরআনের মধ্যে দাওয়াত, প্রমাণাদি এবং ভবিষ্যত সম্পর্কীয় ঘটনাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে, তাই উপস্থিত ও

অনুপস্থিত সকলের জন্যই ইহার উপকারিতা অনেক ও ব্যাপক। ইহাতে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসারীর সংখ্যা বেশি হওয়াই যুক্তিযুক্ত (ফাতহুল বারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬২৩)।

হাসান বসরী (র) আল্লাহ্র বাণী -

لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلُ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ.

-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদকে শয়তান হইতে সংরক্ষণ করিয়াছেন। ফলে শয়তান ইহাতে কোন বাতিল কথা সংযোজন করিতে এবং কোন হক কথা কমাইতে সক্ষম নয় (খাসাইস, ২খ., পৃ. ৩১৬; তাফসীর ইব্ন জারীর, ২৪খ., পৃ. ৭৯)।

(চৌদ্দ) ইস্রা ও মি'রাজ

রাসূলুল্লাহ (স) যেসব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য নবী-রাসূল হইতে স্বতন্ত্র, উহার মধ্যে মি'রাজের ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত (শিফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩; ফুসূল, পৃ. ২৮৭; খাসাইসুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫২)।

বস্তুত পবিত্র মক্কা শরীফের মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আকসা তথা বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই সফর রজনীযোগে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হইয়াছিল। ইহাকে বলা হয় ইস্রা। তারপর সেখান হইতে তাঁহাকে সিদরাতুল মুনতাহায় এবং তথা হইতে আল্লাহ্র ইচ্ছামত আরও উর্ধ্বলোকে আরোহণ করানো হয়। পরিভাষায় ইহাকে মি'রাজ বলা হয়। আর তিনি ঐ রাত্রেই সফর শেষ করিয়া পুনরায় মক্কা ফিরিয়া আসেন।

মি'রাজ গমনের এই মহান সফরে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন, তাঁহার উপর নামায ফরয হওয়া, আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষকরণ এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে নবী-রাসূলগণের নামাযে ইমামতি করা। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনিই হইলেন নবী-রাসূল সকলের ইমাম (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩)।

ইস্রার বিষয়টি যেমন কুরআন মজীদের স্পষ্ট বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মি'রাজের বিষয়টিও মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا . اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁহার বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন আল-মসজিদুল হারাম হইতে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যাহার পরিবেশ আমি করিয়াছিলাম বরকতময়, তাহাকে আমার নিদর্শন দেখাইবার জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (১৭ ঃ ১)।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى. عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى. ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى. وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى. فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى. اَفَتُمَارُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى. وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى. لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى.

"এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। ইহা তো ওহী যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন। সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল, তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে, অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাহাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম। তখন আল্লাহ তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা ওহী করিবার তাহা ওহী করিলেন। যাহা সে দেখিয়াছে, তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই। সে যাহা দেখিয়াছে তোমরা কি সেই বিষয়ে তাহার সংগে বিতর্ক করিবে? নিশ্চয় সে তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছিল প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট, যাহার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া। যখন বৃক্ষটি যদ্দারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্দারা ছিল আচ্ছাদিত; তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই। সে তো তাহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল" (৫৩ ঃ ৩-১৮)।"

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। মালিক ইব্ন সা'সা'আ (রা) তাঁহাকে বলিয়াছেন, নবী কারীম (স) তাহাদেরকে সেই রাতের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন যে রাতে তাহাকে ভ্রমণ করানো হইয়াছিল। তিনি বলেন, একদা আমি কা'বার হাতীমে ছিলাম, বা হিজরে শুইয়াছিলাম। হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার নিকট আসেন এবং আমার এই স্থান হইতে সেই স্থানের মধ্যবর্তী অংশটি চিরিয়া ফেলেন। রাবী বলেন, আমি আমার পার্শ্বে বসা জারূদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার দ্বারা কি বুঝিয়াছেন? তিনি বলেন, কণ্ঠনালীর নিম্নদেশ হইতে নাভী পর্যন্ত। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, বুকের উপরিভাগ হইতে নাভীর নীচ পর্যন্ত। তাহার পর নবী (স) বলেন, আগন্তুক আমার হৃদপিণ্ডটি বাহির করিলেন। তাহার পর আমার নিকট একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হয় যা ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাহার পর আমার হৃদপিণ্ডটি যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করা হয় এবং ঈমান দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহা যথাস্থানে পুনরায় রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর সাদা রং-এর একটি জন্তু আমার নিকট আনা হয় যাহা আকারে খচ্চর হইতে ছোট ও গাধা হইতে বড় ছিল। জারূদ (র) তাঁহাকে বলিলেন, হে আবূ হামযা! ইহাই কি বুরাক? জবাবে আনাস (রা) বলিলেন, হাঁ। সে প্রতি কদম রাখে দৃষ্টির শেষ প্রান্তে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাহার পর আমাকে সওয়ার করানো হয়। ইহার পর জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়া চলিলেন। প্রথম আসমানের নিকট আসিয়া দরজা খুলিয়া দিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হয়, কে? তিনি বলিলেন, জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনার সঙ্গে

কে? তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (স)। আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে? তিনি বলেন, হাঁ। তখন বলা হয়, তাঁহার জন্য খোশআমদেদ! উত্তম আগমনকারীর আগমন ঘটিয়াছে।

তাহারপর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। আমি যখন প্রথম আকাশে পৌঁছিলাম তখন তথায় হযরত আদম (আ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিবরাঈল (আ) আমাকে বলিলেন, ইনি আপনার আদি পিতা আদম (আ)। আপনি তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বলিলেন, নেককার পুত্র নেককার নবীকে খোশআমদেদ!

তাহারপর তিনি উপরের দিকে চলিয়া দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছিয়া দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, কে ? তিনি বলিলেন, জিবরাঈল। বলা হইল, সঙ্গে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মাদ (স)। বলা হইল, তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ! তাহারপর বলা হইল, তাহাকে খোশআমদেদ! উত্তম আগমনকারীর আগমন হইয়াছে। তাহারপর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল।

আমি যখন তথায় পৌঁছিলাম তখন ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। তাঁহারা দুইজন ছিলেন খালাত ভাই। তিনি বলিলেন, তাঁহারা হইলেন ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ)। তাঁহাদের প্রতি সালাম করুন। আমি সালাম করিলাম। তাঁহারা আমার সালামের জবাব দিলেন এবং বলিলেন, নেককার ভাই এবং নেককার নবীকে খোশআমদেদ।

তাহার পর তিনি আমাকে লইয়া তৃতীয় আসমানের দিকে চলিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া জিবরাঈল (আ) বলিলেন, দরজা খুলিয়া দাও। তাঁহাকে বলা হইল, আপনি কে ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মাদ (স)। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, হাঁ। বলা হইল, তাঁহাকে খোশআমদেদ! উত্তম আগমনকারীর আগমন ঘটিয়াছে। অতঃপর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। আমি তথায় পৌঁছিয়া ইউসুফ (আ)-কে দেখিতে পাইলাম। সালাম বিনিময়ের পর ইউসুফ বলিলেন, নেককার ভাই এবং নেককার নবীকে খোশআমদেদ।

অতঃপর জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়া উর্ধ্ব যাত্রা করিলেন এবং চতুর্থ আসমানে পৌঁছিলেন, আর (ফেরেশতাকে) দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মাদ (স)। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। তখন বলা হইল, তাঁহাকে খোশআমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হইয়াছে। তখন দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। আমি তথায় পৌঁছিলে ইদরীস (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জিবরাঈল (আ) বলিলেন, তিনি ইদরীস (আ), তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন এবং বলিলেন, নেককার ভাই এবং নেককার নবীকে খোশআমদেদ।

অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া ঊর্ধ্বযাত্রা করিয়া পঞ্চম আসমানে পৌঁছিয়া দরজা খুলিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি উত্তর দিলেন, মুহাম্মাদ (স)। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহার জন্য কি পাঠানো হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ। তখন বলা হইল, তাঁহার প্রতি খোশআমদেদ। উত্তম আগমনকারী আগমন করিয়াছেন। তখন দরজা খুলিয়া দেয়া হইল। আমি তথায় পৌঁছিয়া হারুন (আ)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। জিবরাঈল (আ) বলিলেন, ইনি হারুন (আ)। তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনিও জবাব দিলেন এবং বলিলেন, নেককার ভাই এবং নেককার নবীর প্রতি খোশআমদেদ।

তারপর তিনি আমাকে লইয়া যাত্রা করিয়া ষষ্ঠ আকাশে পৌঁছিয়া দরজা খুলিতে বলিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মাদ (স)। বলা হইল, তাঁহার জন্য কি পাঠানো হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ। ফেরেশতা বলিলেন, তাঁহার প্রতি খোশআমদেদ। উত্তম আগমনকারী আগমন করিয়াছেন। তথায় পৌঁছিয়া আমি মূসা (আ)-কে দেখিতে পাইলাম। জিবরাঈল (আ) বলিলেন, তিনি মূসা (আ)। তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বলিলেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি খোশআমদেদ।

তারপর আমি যখন সামনে অগ্রসর হইলাম, তখন তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কিসের জন্য কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি এজন্য কাঁদিতেছি যে, আমার পর একজন যুবককে নবী বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে; যাঁহার উম্মত আমার উম্মত হইতে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

তারপর জিবরাঈল (আ) আমাকে লইয়া সপ্তম আকাশের দিকে গেলেন এবং দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মাদ (স)। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহার জন্য পাঠানো হইয়াছিল কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। বলা হইল, তাঁহার প্রতি খোশআমদেদ। উত্তম আগমনকারী আগমন করিয়াছেন। আমি সেখানে পৌঁছিয়া ইবরাহীম (আ)-কে দেখিতে পাইলাম। জিবরাঈল (আ) বলিলেন, তিনি আপনার পিতা ইবরাহীম। তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বলিলেন, নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি খোশআমদেদ।

তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠানো হইল। দেখিতে পাইলাম, ইহার ফল হাজার অঞ্চলের মশকের ন্যায় বৃহৎ এবং পাতাগুলি হাতির কানের মত। আমাকে বলা হইল, ইহা সিদরাতুল মুনতাহা (জড় জগতের শেষ প্রান্ত)। সেখানে আমি চারটি নহর দেখিতে পাইলাম— যাহাদের দুইটি ছিল অপ্রকাশ্য এবং দুইটি ছিল প্রকাশ্য। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই নহরগুলি কি? তিনি বলিলেন, অপ্রকাশ্য দুইটি হইল জান্নাতের দুইটি নহর। আর প্রকাশ্য দুইটি হইল নীল ও ফুরাত নদী।

তারপর আমার সামনে বায়তুল মা'মূর প্রকাশ করা হইল। অতঃপর আমার সামনে একটি মদের পাত্র, একটি দুধের পাত্র ও একটি মধুর পাত্র পরিবেশন করা হইল। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করিলাম। তখন জিবরাঈল (আ) বলিলেন, ইহাই ফিতরাত (দীন ইসলাম)। আপনি এবং আপনার উম্মতগণ ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার পর আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হইল।

অতঃপর আমি ফিরিয়া আসিলাম। পথিমধ্যে মূসা (আ)-এর সামনে দিয়া যাওয়ার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে কি আদেশ করা হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন আমাকে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের আদেশ করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার আগে লোকদেরকে পরীক্ষা করিয়াছি এবং বনী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি। তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যান এবং আপনার উম্মতের বোঝা হালকা করার জন্য আবেদন করুন। অতএব আমি ফিরিয়া গেলাম। ফলে তিনি আমার উপর হইতে দশ ওয়াক্ত নামায হ্রাস করিয়া দিলেন।

আমি আবার মূসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলাম। তিনি আবার আগের মত বলিলেন। আমি আবার ফিরিয়া গেলাম। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা আরও দশ ওয়াক্ত নামায কমাইয়া দিলেন। ফেরার পথে মূসা (আ)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি আবার পূর্বোক্ত কথা বলিলেন। আমি পুনরায় ফিরিয়া গেলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আরও দশ ওয়াক্ত হ্রাস করিলেন।

আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলাম। তিনি আবার ঐ কথাই বলিলেন। আমি আবার ফিরিয়া গেলাম। তখন আমাকে প্রতি দিন দশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের আদেশ দেওয়া হইল। আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি আবার ঐ কথাই বলিলেন। আমি আবার ফিরিয়া গেলাম। তখন আমাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ দেওয়া হয়।

তারপর আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, আপনাকে কি আদেশ দেওয়া হইয়াছে? আমি বলিলাম : আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মূসা (আ) বলিলেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতেও সক্ষম হইবে না। আমি আপনার পূর্বে লোকদেরকে পরীক্ষা করিয়াছি এবং বনী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং আপনি আপনার রবের নিকট ফিরিয়া যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরও হালকা করার আবেদন করুন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি আমার রবের নিকট অনেকবার প্রার্থনা করিয়াছি। এখন আমি লজ্জাবোধ করিতেছি। আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তাহা মানিয়া লইয়াছি। তাহার পর তিনি বলিলেন, আমি যখন মূসা (আ)-কে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলাম তখন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিল, আমি আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি জারী করিয়া দিলাম (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৭খ., হাদীছ নং ৩৮৮৭; মুসলিম, হাদীছ নং ১৬৪)।

নবী-রাসূলগণের সালাতে ইমামতি করার প্রমাণ

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "আমি 'হিজর'-এ ছিলাম। তখন কুরায়শের লোকেরা আমাকে আমার মি'রাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিল। তাহারা আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের এমন সব বিষয়াদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল, যাহা আমার জানা ছিল না। ইহাতে আমার এমন পেরেশানী হয় যাহা আর কখনও হয় নাই। তখন আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে এমনভাবে তুলিয়া ধরেন যে, আমি তাহা চাক্ষুষ দেখিতেছিলাম। তাহারপর তাহারা আমাকে যে প্রশ্নই করিল আমি তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছি।

সেই রাত্রে আমি নবীগণের জামা'আতের মধ্যে ছিলাম এবং মূসা (আ)-কে দেখিয়াছি, তিনি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন। তিনি ছিলেন হালকা-পাতলা দেহবিশিষ্ট এবং তাঁহার মাথার চুলগুলি কোকড়ানো ছিল। মনে হইল তিনি যেন ইয়ামান দেশীয় শানুআ গোত্রের একজন লোক। সেই রাতে আমি ঈসা (আ)-কেও দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিতে দেখিয়াছি। তাঁহাকে দেখিতে উরওয়া ইব্ন মাসঊদ ছাকাফীর মত মনে হইল। ইবরাহীম (আ)-কেও দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিতে দেখিয়াছি। তাঁহাকে দেখিতে অনেকটা তোমাদের সাথী তথা আমার মতই। তাহারপর নামাযের ওয়াক্ত হইলে আমি তাহাদের সকলের ইমামতি করিলাম। নামাযান্তে কোন একজন বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! ইনি জাহান্নামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত দারোগা মালিক। তাহাকে সালাম করুন। আমি তাহার প্রতি তাকাইতেই তিনি আমাকে সালাম করিলেন (মুসলিম, হাদীছ নং ১৭২)।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ এমন বৈশিষ্ট্য, যাহা আখিরাতে কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যই প্রযোজ্য হইবে

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে আখিরাতে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা সম্মানিত করিবেন, যাহা কেবল তাঁহার জন্যই প্রযোজ্য হইবে। অন্য কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হইবে না। ইহাতে আল্লাহ্র নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ মর্যাদা প্রতীয়মান হয়। ইহার মধ্যে ওসীলা, ফাদীলা, হাওযে কাওছার, লিওয়াউল হামদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

(এক) ওসীলা ও ফাদীলা

ওসীলা জান্নাতের উচ্চতর একটি মাকাম যাহা কেবল আল্লাহ্র এক বান্দাকেই প্রদান করা হইবে। আর তিনি হইলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)। হাফিয ইব্ন কাছীর (রা) বলেন, ওসীলা হইল জান্নাতের একটি উচ্চতর মনযিলের নাম। ইহা হইল রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবাসস্থল। এই স্থানটি জান্নাতের মাকামসমূহের মধ্য হইতে আরশে আযীমের অধিকতর নিকটবর্তী (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৫৫)। হাফিয ইব্ন হাজার (র) বলেন, ফাদীলা অর্থ 'সমস্ত সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য বা মর্যাদা'; ইহা ওসীলা শব্দটিরও ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং উহা ব্যতীত অন্য মাকামও হইতে পারে (ফাতহুল বারী, ২খ., পৃ. ১১৩)।

মোটকথা, ওসীলা ও ফাদীল ও এমন এক বৈশিষ্ট্য যাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য খাস, অন্য কাহারও ইহাতে কোন অংশীদারিত্ব নাই। এই সম্বন্ধে হাদীছে বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আযান শ্রবণের পর যে ব্যক্তি নিম্নের দু'আ পড়িবে ঃ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اٰت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته.

তাহার জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আত করা আমার অবশ্য কর্তব্য হইবে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ২খ., নং ৬১৪)।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যখন তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শুনিতে পাইবে তখন অনুরূপ বলিবে। তাহারপর আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করিবে। কেহ আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন। তাহারপর আমার জন্য ওসীলার দু'আ করিবে। ইহা হইল জান্নাতের একটি মনযিল। ইহা আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ বান্দাকেই প্রদান করা হইবে। সেই বান্দা আমিই হইব আশা করি। যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলার দু'আ করিবে তাহার জন্য আমার শাফা'আত অবধারিত হইবে (মুসলিম নং ৩৮৪)।

আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ ওসীলা হইল আল্লাহ্র নির্ধারিত এমন একটি মাকাম যাহার উপর আর কোন মাকাম নাই। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র নিকট দু'আ কর যেন তিনি আমাকে ওসীলার মাকাম দান করেন (মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৮৩; আলবানীর মতে হাদীছটি সহীহ, সহীহ জামে সগীর, নং ৭০২৮)।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা আমার জন্য ওসীলার দু'আ কর। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলার দু'আ করিবে, কিয়ামতের দিন আমি তাহার পক্ষে সাক্ষী হইব এবং তাহার জন্য সুপারিশ করিব (তাবারানীর আওসাত, ইব্ন আবী শায়বা; হাফিয হায়ছামী (র) বলেন, হাদীছটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক হাররানী নামক একজন রাবী আছেন। ইব্ন হিব্বান বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। মাজমা'উয-যাওয়াইদ, ১খ., পৃ. ৩৩৩ দ্রষ্টব্য। নাসিরুদ্দীন আলবানীর মতে হাদীছটি সহীহ। সহীহ আল-জামে, নং ৩৫৩১)।

উবাদা ইব্নুস সামিত (রা) হইতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) বলেন ঃ আল্লাহ আমাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতুন নাঈম-এর এমন সুউচ্চ বালাখানায় স্থান দিবেন যে, আমার উপর কেবল আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণই থাকিবে, আর কেহ নয় (খাসাইস গ্রন্থে আল্লামা সুয়ূতী (হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন, ২খ., ৩৯০; উছমান ইব্ন সাঈদ কিতাবুর রদ্দ 'আলাল-জাহমিয়্যা গ্রন্থে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন)।

(দুই) মাকামে মাহমূদ

কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে নানাভাবে সম্মানিত করা হইবে। এসব মর্যাদার ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র। নবী-রাসূলগণের কেহ এই ক্ষেত্রে তাঁহার অংশীদার নাই এবং কেহ তাঁহার সমকক্ষও নহেন। ইহার মধ্যে একটি হইল মাকামে মাহমূদ। এই স্থানে রাসূলুল্লাহ (স) দণ্ডায়মান থাকিবেন। তাহারপর স্রষ্টা ও সৃষ্টি সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রশংসা ও স্তুতি করিবেন। যেমন মহান আল্লাহ্র মহান বাণী ঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

"এবং রাত্রির কিছু অংশে তুমি তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে" (১৭ ঃ ৭৯)।

মাকামে মাহমূদের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারদের একাধিক অভিমত রহিয়াছে। ইব্ন জারীর তাবারী (র) বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে, মাকামে মাহমূদ হইল সেই স্থান যেখানে রাসূলুল্লাহ (স) কিয়ামতের দিন শাফা'আত করার জন্য দণ্ডায়মান হইবেন। এই শাফা'আতের উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ তা'আলা যেন কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা হইতে লোকদেরকে নিষ্কৃতি দেন (তাফসীরে ইব্ন জারীর, ১৫খ., পৃ. ৯৭)।

ইব্ন বাত্তাল (র) বলেন, জমহূর উলামায়ে কিরামের মতে, মাকামে মাহমূদ দ্বারা "শাফা'আত" বুঝানো হইয়াছে। আল্লামা ওয়াহিদী (র) এই ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া বলেন, এই বিষয়ে আলিমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (ফাতহুল বারী, ১১খ., পৃ. ৪৩৪)।

ইব্ন হাজার আসকালানী (র) "মাকামে মাহমূদ"-এর উভয়বিধ ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়া বলেন, অগ্রগণ্য মতানুসারে "মাকামে মাহমূদ" অর্থ 'শাফা'আত' (ফাতহুল বারী, ১১খ., পৃ. ৪৩৫)।

হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান (রা) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا. -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একই ময়দানে একত্র করা হইবে এবং একজন আহ্বানকারী এমনভাবে আহ্বান করিবে যে, সকলে তাহা শুনিতে পাইবে। এমনকি চোখ তাহাদেরকে উলঙ্গ মাথা ও খালি পা দেখিতে পাইবে, যেমন জন্মলগ্নে তাহাদের অবস্থা ছিল। তখন তাহারা নীরব থাকিবে। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেহ কথা বলিতে সাহস করিবে না। এই অবস্থায় আহ্বানকারী বলিবে, হে মুহাম্মাদ! আমি বলিব, লাব্বায়ক, লাব্বায়ক। হে আল্লাহ! সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। কোন অকল্যাণের সংযোগ তোমার সহিত করা যায় না। তুমি যাহাকে হিদায়াত দান কর সে-ই হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। তোমার আশ্রয় ব্যতীত নাজাতের জায়গা নাই। তুমি বরকতময় ও মহান। হে কা'বা গৃহের মালিক! তুমি মহিমান্বিত। বস্তুত ইহাই হইল মাকামে মাহমূদ, যে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

عَسى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

"অচিরে আপনার রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন মাকামে মাহমূদে" [মুসতাদরাক হাকেম, ২খ., পৃ. ৩৬৩; তাহার মতে হাদীছটি শায়খায়নের শর্তে উত্তীর্ণ। তবে তাঁহারা তাঁহাদের কিতাবে ইহা বর্ণনা করেন নাই। আল্লামা যাহাবীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লামা তাবারী তৎপ্রণীত তাফসীর গ্রন্থে এই মতটি সমর্থন করিয়াছেন, ১৫খ., পৃ. ৯৮)। হাফিয ইব্ন হাজার (র) বলেন, ইমাম নাসাঈ (র) হাদীছটি সহীহ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন; ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ২৫১)। মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক মু'জামুত-তাবারানী, ইব্ন মান্দা প্রমুখ কিতাবুল ঈমানে বলেন, এই হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইমামগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য (ফাতহুল বারী, ১১খ., পৃ. ৪৪৫]।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "মাকামে মাহমূদ" হইল মাকামে শাফা'আত (শাফা'আতের স্থান)। এই হাদীছটি ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী বর্ণনা করিয়াছেন (তাফসীরে তাবারী, ১১খ., পৃ. ৯৭; ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৩খ., পৃ. ৫৮; মুজাহিদ (র) ও হাসান (র)-ও অনুরূপ মতামত বর্ণনা করিয়াছেন)।

হাদীছে মাকামে মাহমূদের কথা কোথাও স্পষ্টভাবে, আবার কোথাও ইঙ্গিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। জাবির (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি আযানের আওয়াজ শুনিয়া নিম্নের দু'আটি পড়ে, তবে তাহার জন্য শাফা'আত করা আমার উপর ওয়াজিব হইবে ঃ

اللهم رب هٰذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته.

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন সূর্য নিকটবর্তী হইবে। ফলে ঘাম মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। এই অবস্থায় লোকেরা ক্রমান্বয়ে আদম (আ), মূসা (আ), মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে। তখন তিনি শাফা'আত করিবেন যাহাতে বিচারকার্য শুরু করা হয়। তাহারপর রাসূলুল্লাহ (স) সামনে অগ্রসর হইয়া দরজার চৌকাঠ ধরিবেন। তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে মাকামে মাহমূদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং সমবেত সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিবেন (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৩খ., হাদীছ ১৪৭৫)।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হইতে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কিয়ামতের দিন লোকেরা দলে দলে উপস্থিত হইবে। প্রত্যেক উম্মত তাহাদের নিজ নিজ নবীর অনুগমন করিবে। তাহারা বলিবে, হে অমুক নবী! আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। অবশেষে বিষয়টি যাইতে যাইতে মহানবী (স) পর্যন্ত পৌঁছিবে। ইহা সেদিন হইবে যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে মাকামে মাহমূদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮খ., হাদীছ নং ৪৭১৮)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে ১৭ ঃ ৮৯ আয়াতে বর্ণিত "মাকামে মাহমূদ"-এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, ইহার মর্ম হইল শাফা'আত (তিরমিযী, হাদীছ নং ৩১৩৭; তাঁহার মতে হাদীছটি হাসান। মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ২খ., পৃ. ৪৪৪-৪৭৮; তাফসীরে তাবারী, ১৫খ., পৃ. ৯৮)।

কা'ব ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকদেরকে হাশরের ময়দানে উঠানো হইবে। তখন আমি এবং আমার উম্মত টিলার উপর থাকিব। এই অবস্থায় আমার রব আমাকে এক জোড়া সবুজ কাপড় পরিধান করিতে দিবেন। তাহারপর আমাকে শাফা'আতের জন্য অনুমতি প্রদান করা হইবে। এই পর্যায়ে আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করিবেন আমি তাহা বলিব। আর ইহাই হইল মাকামে মাহমূদ (মুসনাদে আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪৬৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাফিয হায়ছামী, ৭খ., পৃ. ৫১; ইমাম আহমাদ যাহাদের সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই নির্ভরযোগ্য। হাফিয হায়ছামী অন্যত্রও হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন, ১০খ., পৃ. ৩৭৭; তাবারানী, মু'জামুল আওসাত ও মুজামুল কাবীর, মুসতাদরাক হাকেম, ৩খ., পৃ. ৩৬৩; তাঁহার মতে হাদীছটি সহীহ, বুখারী- মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। তবে তাঁহারা ইহা বর্ণনা করেন নাই। আল্লামা যাহবীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন)।

(তিন) শাফা'আতে কুব্রা ও অন্যান্য শাফা'আত

কিয়ামতের দিন পৃথিবীর শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে একটি ময়দানে একত্র করা হইবে। সূর্য মাথার নিকটবর্তী হইয়া যাইবে, ইহার তাপমাত্রা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ হইবে। ঘাম এত বেশী হইবে যে, সত্তর গজ নীচ পর্যন্ত এই ঘাম ঢুকিয়া পড়িবে। আর মাটির উপরে কাহারও মুখ পর্যন্ত, কাহারও কান পর্যন্ত ঘাম পৌঁছিয়া যাইবে।

সেই দিনটি পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান হইবে। মানুষ পায়ের উপর দাঁড়াইয়া অপলক নেত্রে তাকাইয়া থাকিবে এবং হৃদয় ফাটিয়া পড়ার উপক্রম হইবে। কেহ কোন কথা বলিবে না এবং নিজের প্রতি কাহারও লক্ষ্য থাকিবে না। মানুষের দুঃখ-কষ্ট অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছিবে। তখন তাহারা পরস্পর আলোচনা করিবে যেন কেহ তাহাদের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু কোন নবীই তাহাদের জন্য সুপরিশ করিতে উদ্যোগী হইবেন না। সকলেই তাহাদেরকে ফেরত দিবেন এবং নিজেরা নাফসী নাফসী বলিতে থাকিবেন। তাঁহারা ইহাও বলিবেন, তোমরা অন্য কাহারও কাছে যাও।

এমনি করিয়া শাফা'আতের বিষয়টি তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া পৌঁছিবে। তখন তিনি এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিবেন এবং শাফা'আত করিবেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বিচারের ব্যবস্থা করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই শাফাআতে কুবরা একমাত্র নবী কারীম (স)-এর বৈশিষ্ট্য। ইহাকেই মাকামে মাহমূদ বলে। আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী (র) অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শাফা'আতের মাধ্যমেই হাশরের ময়দানে উপস্থিত মানুষ বিচারের বিভীষিকা ও হিসাবের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখিয়া পরিত্রাণ পাইবে (দ্র. ফাতহুল বারী, ৩খ., পৃ. ৩৯৮; হাদীছে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু গোশত হাদিয়া আসিল। ইহার বাহুর অংশটি তাঁহার সামনে পেশ করা হইল। বাহুর গোশত তাঁহার পছন্দনীয় ছিল। তিনি তাহা হইতে এক কামড় গ্রহণ করিলেন, অতঃপর বলিলেন ঃ কিয়ামত দিবসে আমিই হইব সকল মানুষের নেতা। তাহা কিভাবে তোমরা জান কি? কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে একটি মাঠে এমনভাবে জমায়েত করিবেন যে, একজনের আহ্বান সকলে শুনিতে পাইবে। একজনের দৃষ্টি সকলকে দেখিতে পাইবে।

সূর্য নিকটবর্তী হইবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীতে নিপতিত হইবে। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিবে, কি দুর্দশায় তোমরা আছ দেখিতেছ না? এমন কাহাকেও দেখিতেছ না যিনি তোমাদের রবের নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করিবেন?

তাহারপর একজন আরেকজনকে বলিবে, চল, আমরা আদম (আ)-এর কাছে যাই। তাহারপর তাহারা আদম (আ)-এর নিকট আসিবে এবং বলিবে, হে আদম! আপনি মানবকুলের পিতা। আল্লাহ্ স্বহস্তে আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনার দেহে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছেন। আপনাকে সিজদা করার জন্য তিনি ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহারা আপনাকে সিজদা করিয়াছেন। আপনি দেখিতেছেন না আমরা কি কষ্টে আছি? আপনি দেখিতেছেন না আমরা কষ্টের কোন সীমায় পৌঁছিয়াছি? সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করুন। আদম (আ) উত্তরে বলিবেন, আজ আমার রব এত বেশী ক্রোধান্বিত আছেন যাহা পূর্বে কখনও হন নাই এবং পরেও কখনও হইবেন না। আর তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমি সেই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিয়া ফেলিয়াছি। নাফসী-নাফসী, আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কাহারও নিকট গিয়া চেষ্টা কর। তোমরা নূহের নিকট যাও।

তখন তাহারা নূহ (আ)-এর নিকট আসিবে। বলিবে, হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রথম আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্ আপনাকে চির-কৃতজ্ঞ বান্দা বলিয়া উপাধি দিয়াছেন। আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখিতেছেন না আমরা কোন অবস্থায় আছি? আমাদের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌছিয়াছে? নূহ (আ) বলিবেন, আজ আমার রব এত ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যাহা পূর্বে কখনও হন নাই এবং পরেও কখনও হইবেন না। আমাকে তিনি একটি দু'আ কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাহা আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছি। নাফসী নাফসী, আজ আমি আমার চিন্তায় পেরেশান। তোমরা অন্য কাহারও নিকট যাও। তোমরা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে যাও।

তখন তাহারা ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাইবে এবং বলিবে, হে ইবরাহীম! আপনি আল্লাহ্র নবী এবং পৃথিবীবাসীদের মধ্যে আপনি আল্লাহ্র খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু)। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখিতেছেন না আমরা কোন অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে? ইবরাহীম (আ) তাহাদেরকে বলিবেন, আমার রব আজ এতই ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে, পূর্বে কখনও এমন হন নাই এবং পরেও কখন ও এমন হইবেন না। তিনি বলিবেন, আমি তিনটি (বাহ্যিক) অসত্য কথা

বলিয়াছি। (প্রকৃতপক্ষে এগুলি মিথ্যা কথা নয়) তিনি বলিবেন, নাফ্সী নাফ্সী। আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কাহারও নিকট যাও। তোমরা মূসার নিকট যাও।

তাহারা মূসা (আ)-এর নিকট যাইবে এবং বলিবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আপনাকে তিনি রিসালাত ও কালাম দিয়া মানুষের উপর মর্যাদা দিয়াছেন। আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখিতেছেন না আমরা কোন অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে? মূসা (আ) বলিবেন, আজ আল্লাহ এতই ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে, পূর্বে কখনও এমন হন নাই এবং পরেও কখনও এমন হইবেন না। আমি তাঁহার হুকুমের পূর্বেই এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলাম। নাফ্সী নাফ্সী, আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কাহারও নিকট যাও। তোমরা ঈসার নিকট যাও।

তাহারা ঈসা (আ)-এর নিকট যাইবে এবং বলিবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁহার কলেমা যাহা তিনি মারয়ামের গর্ভে ঢালিয়া দিয়াছেন। আপনি তাঁহার দেওয়া আত্মা এবং আপনি শিশু অবস্থায় দোলনায় অবস্থানকালে মানুষের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখিতেছেন না আমরা কোন অবস্থায় আছি? তখন ঈসা (আ) বলিবেন, আজ আমার রব এতই ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে, এরূপ না পূর্বে কখনও হইয়াছেন, না পরে কখনও হইবেন। তিনি তাঁহার কোন অপরাধের কথা উল্লেখ করিবেন না। তিনিও বলিবেন, নাফ্সী নাফ্সী; আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কাহারও নিকট যাও। তোমরা মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট যাও।

তখন তাহারা মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট আসিবে এবং বলিবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল, শেষ নবী এবং আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সব ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখিতেছেন না, আমরা কি অবস্থায় আছি?

তখন আমি সুপারিশের জন্য যাইব এবং আরশের নিচে আসিয়া আমার রবের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হইব। আল্লাহ্ আমার অন্তরকে সুপ্রশস্ত করিয়া দিবেন এবং সর্বোত্তম প্রশংসা ও হাম্দ জ্ঞাপনের ইলহাম করিবেন— যাহা ইতোপূর্বে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। অতঃপর আল্লাহ্ বলিবেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি মাথা উঠান এবং দু'আ করুন, কবুল করা হইবে। সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা হইবে। তাহারপর আমি মুখ তুলিব এবং বলিব ঃ হে আমার রব! উম্মাতী, উম্মাতী ।

রাসূলুল্লাহ (স) শাফা'আতে কুবরার পর তাঁহার উম্মতের জন্য সুপারিশ করিবেন। অর্থাৎ হাশরের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থা হইতে লোকদের মুক্তিদানের নিমিত্ত হিসাব শুরু করা, সিরাত স্থাপন করা ইত্যাদির পর এ শাফা'আত করা হইবে। প্রথমে তিনি সুপারিশ করিবেন এই উম্মতের যাহাদের কোন হিসাব নাই, তাহাদেরকে তড়িৎ জান্নাতে দাখিল করার জন্য। তাহারপর তিনি সুপারিশ করিবেন ঐসব লোকের জন্য যাহাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইবে। তাহারপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমা পাঠক মুসলমানদের জন্য তিনি সুপারিশ করিবেন (শিফা,

১খ., পৃ. ৪৩১; শারহুন নাবাবী, অথবা সহীহ মুসলিম, ৩খ., পৃ. ৫৭, ৫৮; ফাতহুল বারী, ১১খ., পৃ. ৪৪৬)।

বলা হইবে, হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মতের যাহাদের কোন হিসাব নাই তাহাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিন। অবশ্য তাহারা অন্য তোরণ দিয়া অন্যান্য লোকদের সঙ্গেও প্রবেশ করিতে পারিবে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ শপথ সেই সত্তার যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! জান্নাতের দুই চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হিময়ার -এর মধ্যকার দূরত্বের মত অথবা বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ও বসরার মত (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮খ., হাদীছ নং ৪৭১২; মুসলিম, নং ১৯৪)।

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মু'মিন লোকদেরকে হাশরের ময়দানে আটকাইয়া রাখা হইবে। তখন তাহারা সুপারিশের জন্য আবেদন করার কথা বলিবে, যদি আমাদের রবের নিকট আমরা সুপারিশের জন্য আবেদন করি, তবে তিনি তোমাদেরকে এই পরিস্থিতি হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। তাহারপর তাহারা আদম (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিবে, আপনি মানবকুলের পিতা আদম! আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, জান্নাতে আপনাকে আশ্রয় দিয়াছেন, ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করাইয়াছেন এবং তিনি আপনাকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়াছেন। আপনি আপনার রবের নিকট সুপারিশ করিয়া এই স্থান হইতে আমাদের মুক্তি দিন।

আদম (আ) বলিবেন, এই কাজের জন্য আমি উপযুক্ত নই। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার ভুল করার কথা বলিবেন। তিনি বলিবেন, তাঁহাকে এই জাতীয় ফল খাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। সুতরাং তোমরা নূহের নিকট যাও। তিনি পৃথিবীবাসীর নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত প্রথম নবী।

তাহারা নূহ (আ)-এর নিকট যাইবে। তিনি বলিবেন, আমি এই কাজের উপযুক্ত নই। তাহারপর তিনি তাঁহার ত্রুটি এবং অজ্ঞাতসারে আল্লাহ্র নিকট যে দু'আ করিয়াছিলেন সেই কথা বলিবেন। তাহারপর তিনি বলিবেন, তোমরা ইবরাহীমের নিকট যাও! তিনি দয়াময় আল্লাহ্র খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু)।

তাহারা ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাইবে। তিনি বলিবেন, আমি এই কাজের উপযোগী নই। এই পর্যায়ে তিনি তাঁহার তিনটি (বাহ্যিক) মিথ্যা কথনের কথা উল্লেখ করিবেন, তাহারপর বলিবেন, তোমরা মূসার নিকট যাও। তিনি আল্লাহ্র খাস বান্দা, তিনি তাঁহাকে তাওরাত দান করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সরাসরি কথা বলিয়াছেন এবং অন্তরঙ্গ আলাপে তাঁহাকে নিকটবর্তী করিয়াছেন।

তাহারা মূসা (আ)-এর নিকট যাইবে। তখন তিনি বলিবেন, আমি এই কাজের উপযুক্ত নই। এই পর্যায়ে তিনি কিবতী হত্যার ত্রুটির কথা তুলিয়া ধরিবেন। তাহারপর বলিবেন, তোমরা ঈসার নিকট যাও। তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ্র দেওয়া আত্মা এবং আল্লাহ্র বাণী।

তাহারা ঈসা (আ)-এর নিকট যাইবে। অবশেষে তিনিও বলিবেন, আমি এই কাজের যোগ্য নই। তোমরা মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহ্‌র এমন বান্দা যাঁহার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করা হইয়াছে।

তখন সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তখন আমি আল্লাহ্‌র নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিব এবং আমাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। তাহারপর তাঁহাকে দেখামাত্র আমি সিজদায় লুটাইয়া পড়িব। এই অবস্থায় যত দিন ইচ্ছা তিনি আমাকে সুযোগ দিয়া রাখিবেন, তাহারপর বলিবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উত্তোলন করুন, যাহা দু'আ করিবেন কবূল করা হইবে, যাহা সুপারিশ করিবেন গ্রহণ করা হইবে এবং যাহা বলিবেন, গৃহীত হইবে।

নবী কারীম (স) বলেন ঃ তাহারপর আমি আমার মাথা উত্তোলন করিব এবং আমার রবের এমন প্রশংসা করিব যাহা তিনি আমাকে তখন শিখাইয়া দিবেন। অতঃপর আমাকে একটি সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহারপর আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া তাহাদেরকে জান্নাতে দাখিল করিব। তাহারপর আমি বাহির হইয়া গিয়া তাহাদেরকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আনিব এবং জান্নাতে দাখিল করিব।

তাহারপর আবার আমি আমার রবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিব। আমাকে অনুমতি প্রদান করা হইবে। তখন আমি আমার রবকে দেখামাত্র সিজদায় লুটাইয়া পড়িব। তাহারপর তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা এই অবস্থায় আমাকে রাখিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন ঃ হে মুহাম্মাদ! মাথা উত্তোলন করুন। বলুন গৃহীত হইবে, সুপারিশ করুন, কবূল করা হইবে এবং প্রার্থনা করুন মনজুর করা হইবে।

নবী (স) বলেন ঃ তখন আমি মাথা উত্তোলন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার এমন প্রশংসা ও হাম্‌দ করিব যাহা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। তাহারপর আমি সুপারিশ করিব। এই ক্ষেত্রে আমাকে সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহারপর আমি বাহির হইয়া তাহাদেরকে জান্নাতে দাখিল করিব।

তাহারপর তৃতীয়বার আল্লাহ্‌র দরবারে পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করিব। আমাকে অনুমতিও দেওয়া হইবে। তাহারপর আমার রবকে দেখামাত্র আমি আবারও সিজদায় লুটাইয়া পড়িব। এই অবস্থায় তিনি আমাকে যতক্ষণ ইচ্ছা থাকিতে দিবেন, তাহারপর বলিবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উত্তোলন করুন। বলুন আপনার কথা গৃহীত হইবে, সুপারিশ করুন মঞ্জুর করা হইবে, প্রার্থনা করুন কবূল করা হইবে।

তখন আমি মাথা উত্তোলন করিয়া আমার প্রতিপালকের এমন প্রশংসা ও হাম্‌দ করিব যাহা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। তাহারপর আমি সুপারিশ করিব। এক্ষেত্রে আমাকে সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহারপর আমি বাহির হইয়া তাহাদেরকে জান্নাতে দাখিল করিব। কাতাদা (রা) বলেন আমি নবী কারীম (স)-কে একথাও বলতে শুনিয়াছি, তাহারপর আমি বাহির হইয়া তাহাদেরকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া জান্নাতে দাখিল করিব। অতঃপর কুরআন যাহাদেরকে আটকাইয়া রাখিবে তাহারা ব্যতীত আর কেহ জাহান্নামে থাকিবে না। অর্থাৎ যাহারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী তাহারাই কেবল জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকিবে। তাহারপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

عَسى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

"অচিরেই আপনার রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন মাকামে মাহমূদে" (১৭ ঃ ৮৯)।

ইহা সেই মাকাম (সম্মানিত ও প্রশংসিত স্থান) যেখানে তোমাদের রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে বলিয়া ওয়াদা করা হইয়াছে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১৩খ., হাদীছ নং ৭৪৪০; মুসলিম, নং ১৯৩)।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সূর্য নিকটবর্তী হইবে। ইহার ফলে শরীরের ঘাম অর্ধ কান পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় লোকেরা পর্যায়ক্রমে আদম, মূসা ও মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট ফরিয়াদ করিবে। অবশেষে তিনি সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুপারিশ করিবেন। তাহারপর তিনি সামনে গিয়া দরজার হলকা ধরিয়া সুপারিশের জন্য পদক্ষেপ নিবেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে মাকামে মাহমূদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। আর তখনই সমস্ত মানুষ তাঁহার প্রশংসা করিবে।

শাফা'আতে কুবরা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স) আরও শাফা'আত করিবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনিই কেবল শাফাআত করিবেন। অন্য কেহ তাঁহার সঙ্গে শরীক থাকিবে না। আর কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য নবী-রাসূল, ফেরেশতা, শহীদ, সিদ্দীক ও নেক বান্দাগণও শরীক থাকিবেন। এখানে প্রথমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শাফাআতের (দেখুন ফাতহুল বারী, ১১খ., পৃ. ৪৩৬; এবং আল্লামা সুয়ূতী রচিত খাসায়িসে কুবরা গ্রন্থ, ২খ., পৃ. ৩৭৮) পর্যায়গুলি বর্ণনা করা হইবে, তাহার পর ইহার দলীল পেশ করা হইবে (ফাতহুল বারী, ১১খ., পৃ. ৪৩৬; খাসাইস, ২খ., পৃ. ৩৭৮)।

১. জান্নাতের দরজা খোলার জন্য শাফা'আত।

২. যাহাদের কোন হিসাব-নিকাশ হইবে না, তাহাদেরকে প্রথমে জান্নাতে দাখিল করার জন্য শাফা'আত।

৩. তাওহীদে বিশ্বাসী লোক যাহাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত, তাহাদের জাহান্নামে দাখিল না করার জন্য শাফা'আত।

৪. তাওহীদে বিশ্বাসী পাপী লোকদেরকে জাহান্নাম হইতে মুক্তিদানের জন্য শাফা'আত।

৫. জান্নাতে নেককার লোকদের মর্যাদা উন্নীত করার জন্য শাফা'আত।

৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবূ তালিবের শাস্তি লঘু করার জন্য শাফা'আত।

এসব শাফা'আত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য খাস, ইহাতে তাঁহার সঙ্গে অন্য কেহ শরীক নাই।

(এক) জান্নাতের দরজা খোলার জন্য শাফা'আত

হাশরের ময়দানে মানুষ এক বিপদ হইতে আরেক বিপদে আক্রান্ত হইতে থাকিবে। বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ভয়াবহ অবস্থা হইবে; তাহারপর শাফা'আতে কুবরা, তাহারপর হিসাব-নিকাশ শুরু হইবে। তখনই মীযান (কৃতকর্মের ওজনদণ্ড) স্থাপন করা হইবে, আমলনামা

(কৃতকর্মের বিবরণী) পেশ করা হইবে এবং মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করা হইবে। তাহারপর পুলসিরাত স্থাপন করা হইবে এবং লোকজনকে তাহা অতিক্রম করিতে হইবে। এসব কিছু শেষ হইলে পর মু'মিন লোকেরা সকলেই দণ্ডায়মান হইবে। তখন জান্নাতকে তাহাদের নিকটবর্তী করা হইবে। এই অবস্থায় তাহারা এমন ব্যক্তির অনুসন্ধান করিবে যিনি তাহাদের রবের নিকট সুপারিশ করিবের জান্নাতের দরজা খুলিয়া দেওয়ার জন্য। এই লক্ষ্যে তাহারা পর্যায়ক্রমে আদম, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-এর নিকট যাইবে। তাঁহারা সকলেই এই গুরুদায়িত্ব আনজাম দিতে অপারগতা জ্ঞাপন করিবে। তখন তাহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিবে। তিনি তাহাদের জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করিবেন। হাদীছে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে।

আবূ হুরায়রা ও হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একত্র করিবেন। মু'মিনগণ দাঁড়াইয়া থাকিবে। জান্নাত তাহাদের নিকটবর্তী করা হইবে। অবশেষে সকলে আদম (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলিয়া দেওয়ার দু'আ করুন। আদম (আ) বলিবেন, তোমাদের পিতা আদমের ত্রুটির কারণেই তো তোমাদেরকে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং আমি ইহার যোগ্য নই। তোমরা আমার পুত্র ইবরাহীমের নিকট যাও। তিনি আল্লাহ্র বন্ধু।

তাহারা সবাই ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিলে তিনি বলিবেন, আমিও ইহার যোগ্য নই। আমি আল্লাহ্র বন্ধু ছিলাম, কিন্তু তাহা ছিল অন্তরাল হইতে। এই কথাটি তিনি বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন অথবা ইহার মর্ম হইল, সরাসরি আল্লাহ্র সঙ্গে আমার কথা হয় নাই যেমন মূসার হইয়াছিল (সহীহ মুসলিম, শরহে নববী, ৩খ., পৃ. ৭১)। সুতরাং তোমরা মূসার নিকট যাও। কারণ তিনি আল্লাহ্র সঙ্গে সরাসরি বাক্যালাপ করিতেন।

তখন তাহারা সবাই মূসা (আ)-এর নিকট আসিবে। তিনি বলিবেন, আমিও ইহার যোগ্য নই; বরং তোমরা ঈসার নিকট যাও। তিনি আল্লাহ্র দেওয়া কলেমা ও তাঁহার রূহ। তখন তিনিও বলিবেন, আমিও ইহার উপযুক্ত নই।

তখন সকলে মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট আসিবে। তিনি দাঁড়াইবেন এবং তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করা হইবে। তখন আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক পুলসিরাতের ডানে-বাঁয়ে আসিয়া দাঁড়াইবে। আর তোমাদের প্রথম দলটি এই সিরাত বিজলীর গতিতে পার হইয়া যাইবে। সাহাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হউক! আমাকে বলিয়া দিন, "বিজলীর গতির ন্যায়" কথাটির অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আকাশের বিদ্যুৎ চমক কি কখনও দেখ নাই? চোখের পলকে কিভাবে এখান হইতে সেখানে চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে? তাহারপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ ইহার পরবর্তী দলগুলি যথাক্রমে বায়ুর বেগে, পাখীর গতিতে, তাহারপর লম্বা দৌড়ের গতিতে পার হইয়া যাইবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল অনুপাতে তাহা অতিক্রম করিবে। আর তোমাদের নবী সেই অবস্থায় পুলসিরাতের উপর দাঁড়াইয়া এই দু'আ করিতে থাকিবেন, "আল্লাহ ইহাদেরকে

নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিন, ইহাদেরকে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিন"। এরূপে মানুষের আমল মানুষকে চলিতে অক্ষম করিয়া দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাহারা এই সিরাত অতিক্রম করিতে থাকিবে। শেষে এক ব্যক্তিকে দেখা যাইবে, সে নিতম্বের উপর ভর করিয়া উহা অতিক্রম করিতেছে।

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন, সীরাতের উভয় পাশে ঝুলানো থাকিবে কাঁটাযুক্ত লৌহ শলাকা। ইহারা আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে চিহ্নিত পাপীদেরকে পাকড়াও করিবে। তন্মধ্যে কাহাকেও তো ক্ষত-বিক্ষত করিয়াই ছাড়িবে; সে নাজাত পাইবে। আর কতক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া জাহান্নামের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, শপথ সেই সত্তার যাঁহার হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ! জানিয়া রাখ, জাহান্নামের গভীরতা সত্তর খারীফ অর্থাৎ সত্তর হাজার বৎসরের পথ (মুসলিম, নং ১৯৫)।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের নিকট ভিক্ষার হাত সম্প্রসারিত করে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে যে, তাহার মুখমণ্ডলে কোন গোশত থাকিবে না। সেদিন সূর্য নিকটবর্তী হইতে থাকিবে। ফলে ঘাম মানুষের অর্ধকান পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় লোকেরা পর্যায়ক্রমে আদম, মূসা ও পরে মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট ফরিয়াদ করিবে। তখন তিনি সৃষ্টি তথা মানুষের বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য সুপারিশ করিবেন এবং সেই নিমিত্ত সামনে অগ্রসর হইয়া দরজার হলকা ধরিয়া দাঁড়াইবেন। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে মাকামে মাহমূদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং সমস্ত সৃষ্টি তাঁহার প্রশংসা করিবে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৩খ., হাদীছ নং ১৪৭৪)।

উক্ত হাদীছে দুই ধরনের শাফা'আতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম শাফা'আত হইল, বিচারকার্য শুরু করার লক্ষ্যে, আর দ্বিতীয় শাফা'আত হইবে জান্নাতের দরজা খুলিয়া দেওয়ার জন্য। উক্ত উভয়বিধ শাফা'আতই হইবে মাকামে মাহমূদের অন্তর্ভুক্ত (মাআরিজুল কবুল, শায়খ হাফিয হিকামী, ২খ., পৃ. ৩১৪)।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজার নিকট পৌঁছিয়া তাহা খুলিয়া দেওয়ার জন্য বলিলে আমাকে জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা বলিবেন, আপনি কে? আমি বলিব ঃ মুহাম্মাদ। ফেরেশতা বলিবেন, আপনার নিমিত্তই দরজা খুলিয়া দিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। আপনার আগে কাহারও জন্য আমি তাহা খুলিব না (মুসলিম, নং ১৯৭)।

(দুই) যাহাদের কোন হিসাব-নিকাশ হইবে না তাহাদেরকে আগে জান্নাতে দাখিল করার সুপারিশ

শাফা'আতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লহ (স)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল, হাশরের ময়দানে তাঁহার যেসব উম্মতের কোন হিসাব-নিকাশ হইবে না, তিনি তাহাদেরকে সকলের আগে জান্নাতে দাখিল করার জন্য সুপারিশ করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁহার কত যে মর্যাদা ইহাতেও তাহা প্রতীয়মান হয়।

এই সম্বন্ধে হাদীছেও স্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে। শাফা'আত সম্পর্কিত এক দীর্ঘ হাদীছে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠান এবং আপনার উম্মতের মধ্যে যাঁহাদের কোন হিসাব নাই তাহাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিন। অবশ্য অন্য তোরণ দিয়াও অন্যান্য লোকদের সঙ্গে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮খ., নং ৪৭১২; মুসলিম, নং ১৯৪)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি আমার মহান রবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি এবং তিনি আমার সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি আমার উম্মতের সত্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করিবেন। তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হইবে। তারপর আমি আরও অধিক সংখ্যকের জন্য আবেদন করিলে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি হাজারের সঙ্গে আরও সত্তর হাজার বাড়াইয়া দেন। তখন আমি আরয করিলাম, হে আমার রব! আমার মুহাজির উম্মতের সংখ্যা যদি এই পরিমাণ না হয় তাহা হইলে? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, তাহা হইলে বেদুঈনদের দ্বারা আমি এই সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিব (মুসনাদে আহমাদ, ২খ., পৃ. ৩৫৯; হাফিয ইব্ন হাজার (র) বলেন, হাদীছটির সনদ খুবই উত্তম; ফাতহুল বারী, ১১খ., পৃ. ৪১৮; হাফিয হায়ছামী (র) বলেন, হাদীছটি ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার রাবী সকলেই সহীহ-এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ; মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০খ., পৃ. ৪০৪)।

আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তিনি আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষকে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করিবেন। রাবী ইয়াযীদ ইব্ন আখনাস আস-সুলামী (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তাহাদের অবস্থানটি হইবে অসংখ্য মধুমক্ষিকার মধ্যে একটি লালচে সাদা মাছির মত। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আমার রব ঐ সত্তর হাজারের প্রতি হাজারের সঙ্গে আরও সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করিবেন বলিয়া আমার সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন।

ইহা ছাড়াও মহান আল্লাহ্ তাঁহার কুদরতের অঞ্জলিতে আরও তিন অঞ্জলি মানুষকে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করিবেন (তিরমিযী, হাদীছ নং ২৪৩৭; ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীছটি হাসান ও গরীব; ইব্ন মাজা, হাদীছ নং ৪২৮৬; মুসনাদে আহমাদ, ৫খ., পৃ. ২৫০; হাফিয ইব্ন কাছীর (র) বলেন, হাদীছের সূত্রটি হাসান, তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৪০২)। হাফিয হায়ছামী (র) বলেন, হাদীছটি ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার রাবীগণ সকলেই সহীহয়ানের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ; ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজা হাদীছটিকে আংশিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; মাজমা'উয যাওয়াইদ, ১০খ., পৃ. ৩৬২, ৩৬৩)।

(তিন) চাচা আবূ তালিবের আযাব লঘু করার সুপারিশ

চাচা আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন, তাঁহার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিতেন, তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, মহব্বত করিতেন এবং বিপদে তাঁহাকে সহায়তা করিতেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি তাঁহার এই ভালবাসা স্বভাবজাত ও আত্মীয়সুলভ, দীনি ভালবাসা নয়।

তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) শেষবারের মত তাহাকে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস, তাহার ঈমান নসিব হয় নাই। আল্লাহ্র ভেদ-রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অবশ্য তিনি যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে সদাচার করিয়াছেন, এই উসীলায় তাহাকে হালকা ধরনের শাস্তি প্রদান করা হইবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের ব্যাপারে কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হইবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে এবং তাঁহার হৃদয়ে স্বস্তি প্রদানের নিমিত্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাহার শাস্তিকে লঘু করিয়া দিবেন। ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা প্রসঙ্গে তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী (র) বলেন, খাজা আবূ তালিবের জন্য সুপারিশ করা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম (ফাতহুল বারী, ১১খ., পৃ. ৪৩৯)।

হাদীছে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে। আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) হইতে বর্ণিত। একদা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আবূ তালিবের কোন উপকার করিতে পারিয়াছেন কি? তিনি তো আপনার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতেন এবং আপনার কারণে অন্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হাঁ, তাহার কেবল পায়ের গোছা পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন থাকিবে। আর যদি আমি না হইতাম, তবে জাহান্নামের অতলে তাহাকে অবস্থান করিতে হইত (মুসলিম, নং ২০৯)।

আব্বাস (রা) আরও বলেন, একদা আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ তালিব তো আপনাকে হিফাযত করিতেন এবং আপনাকে সাহায্য করিতেন। এই সমস্ত কাজ তাহার কোন উপকারে আসিবে কি? জবাবে তিনি বলেন ঃ হাঁ, আমি তাহাকে জাহান্নামের গভীরে পাইয়াছিলাম এবং সেখান হইতে (তাহার পায়ের) গোছা পর্যন্ত বাহির করিয়া আনিয়াছি (মুসলিম, নং ২১০, ৩৫৮)।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তাঁহার চাচা আবূ তালিবের কথা আলোচিত হইলে তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন তাহার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কাজে আসিবে বলিয়া আশা রহিয়াছে। তাহাকে জাহান্নামের উপরিভাগে এমনভাবে রাখা হইবে যে, আগুন তাহার পায়ের গিরা পর্যন্ত পৌঁছিবে। ইহাতেই তাহার মগজ টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১১খ., হাদীছ নং ৬৫৬৪; মুসলিম, নং ২১০)।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হইবে আবূ তালিবের। তাহাকে একজোড়া জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। এই জুতা জোড়ার কারণে তাহার মগজ টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে (মুসলিম, নং ২১২)।

(চার) উম্মতের জন্য নবী কারীম (স)-এর দু'আ ও তাহা কবূল হওয়া

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দু'আর অনুমতি প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে জানাইয়াও দিয়াছেন যে, তাঁহার এই দু'আ কবূল হইবে। বস্তুত নবী-রাসূলগণের সব দু'আই আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। আমাদের নবীজীর দু'আও আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য হইয়াছে এবং এসবের সংখ্যা অগণিত। এইসব দু'আ আশা ও নিরাশার মাঝে

আবর্তিত ছিল। কিন্তু আলোচ্য দু'আর বিষয়টি তদ্রূপ নয়, বরং এই দু'আর ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রত্যেক নবীকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইহা অবশ্যই কবূল করা হইবে। পূর্ববর্তী নবীগণ সকলেই সেই দু'আ দুনিয়াতেই করিয়াছেন এবং উহার ফলও পাইয়াছেন। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স) কিয়ামত দিবসের কঠিন বিপদকালে উম্মতের শাফা'আতের জন্য সেই দু'আ স্থগিত রাখিয়াছেন। নবী-রাসূলগণকে উম্মতের পক্ষ হইতে আল্লাহ তা'আলা যে বিনিময় প্রদান করিবেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে ঐসব বিনিময়ের তুলনায় সর্বোত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ (স) উম্মতের প্রতি চরম মমত্ববোধের ভিত্তিতেই এমনটি করিয়াছেন। কেননা সেদিন তাঁহার গুনাহগার উম্মতগণ এই জাতীয় দু'আর খুবই মুখাপেক্ষী থাকিবে। উল্লেখ্য যে, উম্মতের জন্য এই জাতীয় দু'আর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) হইবেন স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। এক্ষেত্রে তাঁহার দু'আয় কেহ শরীক থাকিবে না। আর ইহাই হইবে তাঁহার পক্ষ হইতে উম্মতের জন্য সুপারিশ। হাদীছেও এই সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দু'আর অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে এই সুযোগে তিনি যেই দু'আ করিবেন তাহা অবশ্যই কবূল হইবে। সকল নবী তাঁহাদের দু'আটি পৃথিবীতে করিয়াছেন। আর আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য মুলতবি রাখিয়া দিয়াছি। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি কোন প্রকার শিরক করে নাই, সে এই দু'আর বরকত লাভ করিবে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১১খ., হাদীছ নং ৬৩০৪; মুসলিম, নং ১৯৯)।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, তাবূক যুদ্ধের সময় এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য উঠিলেন। তখন বহু সাহাবী তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার পাহারাদারী করিয়াছিলেন। নামাযান্তে তিনি তাঁহাদের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন ঃ আজ রাত্রে আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে আর কাহাকেও দান করা হয় নাই। হাদীছ শরীফে ইহাও উল্লেখ রহিয়াছে, আমাকে বলা হইবে ঃ আপনি দু'আ করুন। কেননা প্রত্যেক নবীই একটি বিশেষ দু'আ করিয়াছেন। কিন্তু কিয়ামত দিবসের জন্য আমি আমার দু'আটি মুলতবি রাখিয়াছি। তাহা তোমাদের জন্য আমি প্রয়োগ করিব এবং ঐ সমস্ত লোকদের জন্যও যাহারা لا اله الا الله "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই" বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে (প্রাগুক্ত)।

তৃতীয় প্রকার ঃ যেসব বৈশিষ্ট্য দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট

আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতকে অন্যান্য সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং দুনিয়াতে তাহাদেরকে এমন সব সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন যাহা তিনি অন্য কোন উম্মতকে দেন নাই। বস্তুত এসব মর্যাদা সায়্যিদুল আওয়ালীন ওয়াল-আখিরীন মুহাম্মাদ (স)-এর সম্মানার্থেই মহান আল্লাহ তাহাদেরকে দান করিয়াছেন। এই উম্মত কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমেই ঐ দুর্লভ মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইবে, বিকল্প কোন পথে নয়।

এই উম্মতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল— তাহারা শ্রেষ্ঠতম উম্মত; তাহাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল, পৃথিবী মসজিদ ও পবিত্রকারী বস্তু এবং তাহাদের নামাযের কাতারকে ফেরেশতাদের কাতারতুল্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে ইত্যাদি।

(এক) শ্রেষ্ঠতম উম্মত

আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে বহু শরাফত ও মর্যাদা দান করিয়াছেন, তাহাদের আলোচনাকে সমুন্নত করিয়াছেন এবং অন্যান্য উম্মতের তুলনায় তাহাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী করিয়াছেন (আল-খাসাইস, ২খ., পৃ. ৩৬১)। আর কুরআন মজীদে তিনি তাহাদেরকে শ্রেষ্ঠতম উম্মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্র বাণী ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠই উম্মত, তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে মানবজাতির জন্য। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে ঈমান আন" (৩ ঃ ১১০)

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উসীলাতেই এই উম্মত মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তিনি আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি এবং রাসূলগণের মধ্যে তিনি হইলেন সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল। এক পরিপূর্ণ শারী'আতসহ আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইতোপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে তাহা প্রদান করা হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর তরীকায় অল্প আমলও অন্যের তরীকার অধিক আমল হইতে উত্তম। কুরআন-হাদীছ এবং সাহাবী ও তাবিঈনের বাণীতে অনুরূপ কথা বিবৃত হইয়াছে। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

"তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করিয়াছেন তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই" (২২ ঃ ৭৮)।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

"এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বারূপ হয়" (২ ঃ ১৪৩)।

বাহ্য ইব্ন হাকীম (রা) তাঁহার পিতা হইতে এবং তাঁহার পিতা তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ "তোমরাই

শ্রেষ্ঠ উম্মত; মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে" (৩ ঃ ১১০)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, " তোমরা হইলে সত্তরমত উম্মত; তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে অন্য সকল উম্মতের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন" (তিরমিযী, হাদীছ নং ৩০০১; তাঁহার মতে হাদীছটি হাসান; মুসনাদে আহমাদ, ৫খ., পৃ. ৩; ইব্ন মাজা, নং ৪২৮৮; মুসতাদরাক হাকেম, ৪খ., পৃ. ৮৪; তাঁহার মতে ইহার সনদ সহীহ্, তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেন নাই। আল্লামা যাহবীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। হাফিয ইব্ন কাছীর বলেন, হাদীছটি প্রসিদ্ধ, তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৩৯৯)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) বলেন, আমাকে ছয়টি বিষয়ের দ্বারা অন্যান্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে, আমার পূর্ববর্তী কাহাকেও তাহা প্রদান করা হয় নাই। ইহার মধ্যে একটি হইল, আমার উম্মতকে শ্রেষ্ঠতম উম্মত বানানো হইয়াছে (হাফিয হায়ছামী, মুসনাদে বাযযার; ইমাম বাযযার-এর মতে হাদীছটির সূত্র খুবই মজবুত; মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮খ., পৃ. ২৬৯; খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩৩৬)।

'আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমাকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্ববর্তী কোন নবী-রাসূলকে দান করা হয় নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা কি? তিনি বলিলেন ঃ আমাকে রু'ব দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে; পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি আমাকে দান করা হইয়াছে, আমাকে আহমাদ নামকরণ করা হইয়াছে, পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্রকারী বস্তু বানানো হইয়াছে এবং আমার উম্মতকে শ্রেষ্ঠতম উম্মত ঘোষণা করা হইয়াছে (মুসনাদে আহমাদ, ১খ.,পৃ. ৯৮; হাফিয ইব্ন কাছীর বলেন, এই সনদে হাদীছটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল নিঃসঙ্গ। তাঁহার সূত্রটি হাসান। তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৪০০; হাফিয ইব্ন হাজার বলেন, ইহার সনদ হাসান, ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ৫২২; অনুরূপভাবে হাফিয হায়ছামী ইহাকে হাসান বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন; মাজমাউয যাওয়াইদ, ১খ., পৃ. ২৬১)।

আবূ দারদা (রা) বলেন, আমি আবুল কাসিম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-কে বলিলেন, হে ঈসা! আমি তোমার পর এক উম্মত সৃষ্টি করিব যাহাদের অবস্থা হইবে— যদি কোন পসন্দনীয় জিনিস তাহাদের হস্তগত হয়, তবে তাহারা আল্লাহ্র হাম্দ-শোকর করিবে। আর যদি তাহারা কোন অপসছন্দনীয় অবস্থার শিকার হয় তবে তাহারা ধৈর্য ধারণ করিবে। অথচ তাহাদের কোন হিল্ম (ধৈর্য) নাই এবং ইল্মও নাই। একথা শুনিয়া ঈসা (আ) বলেন, হে আমার রব! ইল্ম ও হিল্ম ছাড়া কেমন করিয়া তাহারা এরূপ করিবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার ইল্ম ও হিল্ম হইতে তাহাদেরকে দান করিব (মুসনাদে আহমাদ, ৬খ., পৃ. ৪৫০; হাফিয হায়ছামী বলেন, ইমাম আহমাদ, বাযযার ও ইমাম তাবারানী হাদীছটি মু'জামুল কাবীর ও মু'জামুল আওসাতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত সূত্রের রাবীগণ সকলেই সহীহ-এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০খ., পৃ. ৬৭-৬৮; শু'আয়ব এবং আবদুল কাদির আরনাউত হাদীছের সূত্রটি হাসান বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৪৬)।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ.

"মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হইল তখন সে ফলকগুলি তুলিয়া নিল। যাহারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য উহাতে যাহা লেখা ছিল তাহাতে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত" (৭ ঃ ১৫৪)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন, তখন মূসা (আ) বলেন, হে আমার রব! এই ফলকগুলিতে আমি এমন এক উম্মতের সন্ধান পাইয়াছি যাহাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হইয়াছে, যাহাদের আবির্ভাব হইবে মানুষের কল্যাণের জন্য। তাহারা লোকজনকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে। হে আল্লাহ্! তাহাদেরকে আমার উম্মত বানাইয়া দিন। জবাবে মহান আল্লাহ্ বলেন, তাহারা আহমাদ (স)-এর উম্মত হইবে। তারপর মূসা (আ) বলেন, আমি ফলকগুলিতে এমন এক উম্মতের উল্লেখ পাইয়াছি যাহারা হইবে আখিরী উম্মত অর্থাৎ সৃষ্টির দিক হইতে আখিরী উম্মত হইবে, কিন্তু জান্নাতে যাইবে সর্বাগ্রে; তাহাদেরকে আমার উম্মত বানাইয়া দিন। জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাহারাও আহমাদ (স)-এর উম্মত হইবে।

মূসা (আ) পুনরায় বলেন, হে আমার রব! আমি তাওরাতের ফলকগুলিতে এমন এক উম্মতের উল্লেখও পাইয়াছি যাহাদের বক্ষে তাহাদের ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহা হইতে তাহারা পাঠ করিবে। অথচ তাহাদের পূর্ববর্তী উম্মতের অবস্থা এমন ছিল যে, তাহারা তাহাদের ধর্মগ্রন্থ দেখিয়া দেখিয়া পাঠ করিত। তারপর ঐ ধর্মগ্রন্থ তাহাদের হইতে উঠাইয়া নেওয়ার পর তাহারা আর তাহা হিফাযত করিয়া রাখিতে পারে নাই। পরবর্তী উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন স্মৃতিশক্তি দান করিবেন যাহা পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই। হে আমার রব! তাহাদেরকে আমার উম্মত বানাইয়া দিন। এবারও আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাহারা হইবে আহমাদ নবীর উম্মত।

মূসা (আ) আরও বলেন, হে আমার রব! আমি তাওরাতের ফলকসমূহে এমন উম্মতের উল্লেখও পাইয়াছি যাহারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব কিতাবের উপরই ঈমান রাখিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। এমনকি তাহারা কোন কোন মিথ্যাবাদীর (দাজ্জালের) বিরুদ্ধেও লড়াই করিবে। তাহাদেরকে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাহারাও আহমাদ নবীর উম্মত হইবে।

মূসা (আ) বলেন, হে আমার রব! ফলকসমূহে আমি এমন উম্মতেরও সন্ধান পাইয়াছি যাহাদের জন্য সাদাকা ভক্ষণ করাও জায়েয হইবে; অথচ পূর্ববর্তী উম্মতগণ সাদাকা করার পর তাহা কবূল হইলে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হইতে আগুন নাযিল করিতেন এবং সেই আগুন তাহা গ্রাস করিত। আর সাদাকা গ্রহণযোগ্য না হইলে তাহা অমনি রাখিয়া দেওয়া হইত। অবশেষে জীব-জন্তু ও পাখি আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিত। কিন্তু পরবর্তী উম্মতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। তিনি ধনীদের হইতে গরীবদের জন্য সাদাকা গ্রহণ

করেন। তখন মূসা (আ) বলেন, হে আমার রব! তাহাদেরকেও আমার উম্মত বানাইয়া দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাহারাও আহমাদ নবীর উম্মত হইবে।

মূসা (আ) আবারও বলেন, হে আমার রব! আমি তাওরাতের ফলকগুলিতে এমন এক উম্মতের উল্লেখও পাইয়াছি যাহারা কোন নেক আমলের ইচ্ছা করিয়া তাহা বাস্তবে রূপায়িত না করিলেও তাহাদেরকে একটি ছওয়াব দান করা হইবে। আর যদি তাহারা তাহা বাস্তবে রূপায়িত করে তবে দশ হইতে সাত শত পর্যন্ত ছওয়াব তাহাদেরকে দেওয়া হইবে। সুতরাং হে আমার রব! তাহাদেরকে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাহারাও আহমাদ নবীর উম্মত হইবে।

ইহার পর মূসা (আ) বলেন, হে আমার রব! আমি তাওরাতের ফলকগুলিতে এমন উম্মতেরও সন্ধান পাইয়াছি যাহাদের জন্য সুপারিশ করা হইবে এবং তাহাদের ব্যক্তিগত সুপারিশও গ্রহণযোগ্য হইবে। তাহাদেরকে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল করিয়া দিন। জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাহারাও আহমাদ নবীর উম্মত হইবে। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, তখন আল্লাহ্র নবী মূসা (আ) ফলকগুলি ছুড়িয়া মারেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! তাহা হইলে আমাকেও আহমাদ (স)-এর উম্মত হিসাবে কবূল করিয়া নিন (তাফসীর ইব্ন জারীর, ৯খ., পৃ. ৪৫; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ., ২৫৯)।

রবী' ইব্ন খাছ'আম (র) বলেন, ইসলাম ধর্মে মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতেরা তুলনায় আর কাহারও দু'আই অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হইবে না। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত; মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে" (৩ ঃ ১১০)।

(দুই) গনীমতের মাল হালাল করা

আমাদের পূর্বে যেসব নবী-রাসূল গত হইয়াছেন, তাহাদের উম্মতের অবস্থা দুই ধরনের ছিল। (এক) কোন কোন নবীর উম্মতের উপর জিহাদ ফরয ছিল না এবং গনীমতের মাল হস্তগত হওয়ারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। (দুই) কোন কোন উম্মতের উপর জিহাদ ফরয ছিল। তাহারা জিহাদ করিত এবং আল্লাহ্র দুশমন হইতে অর্থ-সম্পদ হস্তগত করিত। তবে এই মাল তাহারা নিজেরা ভোগ করিত না। সেই যুগের মানুষের জিহাদ কবূল হওয়ার নিদর্শন এই ছিল যে, মাল জমা করার পর আসমান হইতে আগুন আসিয়া তাহা ভস্মীভূত করিয়া দিত। আর কোন যুদ্ধ আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য না হইলে আসমান হইতে আগুন নাযিল হইত না। যুদ্ধের পর গনীমতের মাল আত্মসাত করিলে সেই যুদ্ধ আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হইত না। এই নিয়ম দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করিয়া দেন। এমনি করিয়া তিনি জিহাদ কবূল না

করার লজ্জাজনক অবস্থা হইতেও এই উম্মতকে মুক্তিদান করেন। এই অসংখ্য ও অগণিত নিয়ামত দানের কারণে আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"আল্লাহ্র পূর্ব-বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হইত। তোমরা যে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ মাল) লাভ করিয়াছ তাহা হালাল ও উত্তম বলিয়া ভোগ-ব্যবহার কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৮ ঃ ৬৮-৬৯)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় জমহূর মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন, لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ -এর মর্ম হইল, উম্মুল কিতাব তথা লাওহে মাহফূযে এই বিধান যদি লিখিত না থাকিত যে, গনীমতের মাল এই উম্মতের জন্য হালাল (তাফসীরে ইব্ন জারীর তাবারী, ১০খ., পৃ. ৩২-৩৮; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৯)।

নিম্নোক্ত হাদীছ হইতেও উক্ত বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। জাবির (রা) হইতে বর্ণিত, নবী কারীম (স) বলেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দান করা হইয়াছে যাহা পূর্ববর্তী আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। রু'ব দ্বারা আমাকে এক মাসের পথ পর্যন্ত সাহায্য করা হইয়াছে। আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রকারী বস্তু বানানো হইয়াছে। সুতরাং আমার উম্মতের যাহার যেখানে নামাযের ওয়াক্ত হইবে সে যেন সেখানেই নামায আদায় করিয়া নেয়। আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে, কিন্তু আমার পূর্ববর্তী কাহারও জন্য তাহা হালাল ছিল না। আমাকে শাফা'আতে কুবরার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আমার পূর্ববর্তী নবীগণকে প্রেরণ করা হইত বিশেষ গোত্রের প্রতি; আর আমি প্রেরিত হইয়াছি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি (বুখারী, ফাতহুল বারী, পৃ. ৩৩৫; মুসলিম, নং ৫১১)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কোন একজন নবী জিহাদ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে বলেন, এমন কোন ব্যক্তি আমার অনুসরণ করিবে না যে কোন নারীকে বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে এখনও মিলিত হয় নাই। আর এমন ব্যক্তিও না, যে ঘর তৈরি করিয়াছে; কিন্তু উহার ছাদ তোলে নাই। এমন ব্যক্তিও না, যে গর্ভবতী ছাগল কিম্বা উষ্ট্রী কিনিয়াছে এবং সে উহার প্রসবের অপেক্ষা করিতেছে।

তারপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং একটি জনপদের নিকটবর্তী হইলেন। তখন আসরের নামাযের ওয়াক্ত হইয়াছে কিংবা সময়টি ছিল ইহার কাছাকাছি। এই অবস্থায় তিনি সূর্যকে বলেন, তুমিও আদিষ্ট এবং আমিও আদিষ্ট। ইয়া আল্লাহ্! সূর্যকে কিছুক্ষণের জন্য থামাইয়া দিন। তখন উহাকে থামাইয়া দেওয়া হয়। অবশেষে তিনি বিজয় অর্জন করেন এবং গনীমতের মাল একত্র করেন। তখন সেগুলি জ্বালাইয়া দিতে আগুন আসে, কিন্তু আগুন তাহা জ্বালায় নাই।

ইহাতে সেই নবী বলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ গনীমত আত্মসাৎ করিয়াছে। প্রত্যেক গোত্র হইতে একজন আমার কাছে বায়‘আত গ্রহণ করুক। ইহাতে তাহারা সকলেই তাঁহার হাতে বায়‘আত গ্রহণ করিল। কিন্তু একজনের হাত নবীর হাতের সঙ্গে আটকাইয়া গেল। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রহিয়াছে। সুতরাং তোমার গোত্রের লোকেরা আমার কাছে বায়‘আত গ্রহণ করুক। তাহারা তাঁহার হাতে বায়‘আত গ্রহণ করিল। তখন দুই বা তিন ব্যক্তির হাত নবীর হাতের সঙ্গে আটকাইয়া গেল। নবী বলেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রহিয়াছে। তোমরাই গনীমতের মালে খিয়ানত করিয়াছ।

অবশেষে তাহারা একটি গাভীর মস্তক সমতুল্য স্বর্ণ উপস্থিত করিল এবং তাহা গনীমতের মালের সঙ্গে রাখিয়া দিল। বস্তুত এসব মাল মাটির উপরিভাগেই রাখা হইয়াছিল। তারপর আগুন আসিয়া সব জ্বালাইয়া দিল। আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের জন্য গনীমতের মাল হালাল ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া আমাদের জন্য তাহা হালাল করিয়াছেন (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৬খ., নং ৩১২৪; মুসলিম, নং ১৭৪৭)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী কোন আদম সন্তানের জন্য গনীমতের মাল হালাল ছিল না। পূর্ববর্তী যমানায় নিয়ম ছিল, আসমান হইতে আগুন আসিয়া তাহা জ্বালাইয়া দিত। রাবী সুলায়মান আল-আ‘মাশ বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন গনীমতের মাল হালাল হওয়া তথা বণ্টন করার পূর্বে সাহাবীগণ তাহা গ্রহণ করিলে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

لَوْلاَ كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

“আল্লাহ্‌র পূর্ব-বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ, ইহার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হইত” (৮ ঃ ৬৮)।

(তিন) পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রকারীরূপে গণ্য করা

আল্লাহ তা‘আলা এই উম্মতকে বহু বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন। উহার একটি হইল, আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রকারী বস্তুরূপে সাব্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর যদি পানি না পাওয়া যায় এবং মসজিদও না মিলে, তবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া মাটিতে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিবে। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতের বিষয়টি ইহার ব্যতিক্রম ছিল। তাহাদের জন্য ইবাদতখানা ও গীর্জা ছাড়া অন্য কোথায়ও নামায আদায় করা জায়েয ছিল না।

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্ববর্তী কাহাকেও দান করা হয় নাই। আমাকে রু‘ব (ব্যক্তিত্বের ভীতি) দ্বারা এক মাসের পথ পর্যন্ত সাহায্য করা হইয়াছে। আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রকারী বস্তু সাব্যস্ত করা হইয়াছে। সুতরাং আমার উম্মতের যাহার যেখানে নামাযের ওয়াক্ত হইবে, সে যেন সেখানে নামায আদায় করে। আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে, কিন্তু আমার পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য তাহা হালাল ছিল না। আমাকে শাফা‘আতে

কুবরার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইতেন আর আমি প্রেরিত হইয়াছি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি (প্রাগুক্ত)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) বলেন, তাবূক যুদ্ধের সময় রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার জন্য দাঁড়াইলেন। নামাযশেষে তিনি বলিলেন, আজ রাত্রে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দেওয়া হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। আমর জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রকারী বস্তু বানানো হইয়াছে। সুতরাং যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হইবে, তায়াম্মুম করিয়া আমি নামায আদায় করিতে পারিব। পক্ষান্তরে আমার পূর্ববর্তী উম্মতগণ এইরূপ করাকে গুনাহের কাজ মনে করিত। তাই তাহারা উপাসনালয় ও গীর্জায় নামায আদায় করিত (প্রাগুক্ত)।

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ আমাকে এমন কিছু বিষয় দেওয়া হইয়াছে যাহা কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয় নাই। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা কী? তিনি বলিলেন ঃ আমাকে রু'ব দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে, আমাকে পৃথিবীর তাবৎ ধনভাণ্ডারের চাবি প্রদান করা হইয়াছে, আমার নাম আহ্মাদ সাব্যস্ত করা হইয়াছে, আমার জন্য মাটিকে পবিত্রকারী বস্তু সাব্যস্ত করা হইয়াছে, আর আমার উম্মতকে শ্রেষ্ঠতম উম্মত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

(চার) এই উম্মত গুরুভার হইতে মুক্ত

উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার বড়ই অনুগ্রহ যে, তিনি তাহাদের উপর হইতে এমন গুরুভার অপসৃত করিয়াছেন- যাহা পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ছিল। অন্যান্য উম্মতের উপর যাহা হারাম ছিল এই উম্মতের জন্য তাহা হালাল করা হইয়াছে। দীন ইসলামে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কঠোর বিধান রাখেন নাই যাহা মানুষের জন্য অসাধ্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ .

"তিনিই তোমাদের মনোনীত করিয়াছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই" (২২ ঃ ৭৮)।

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ.

"আল্লাহ্ তোমাদের কষ্ট দিতে চাহেন না; তিনি তোমাদের পবিত্র করিতে চাহেন" (৫ ঃ ৬)।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তাহা চাহেন না" (২ ঃ ১৮৫)।

বস্তুত ইসলামী শরী'আত যেমনিভাবে পরিপূর্ণ তেমনি তাহা সহজও বটে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

انى ارسلت بحنيفية سمحة.

"আমি সহজ-সরল দীনে হানীফসহ প্রেরিত হইয়াছি" (মুসনাদে আহমাদ, ৬খ., পৃ. ১১৬-২৩৩; আলবানী বলেন, হাদীছের সূত্রটি বিশুদ্ধ, সিলসিলাতুল আহাদীছ আস-সাহীহা, নং ১৭৩৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) মু'আয এবং আবূ মূসা (রা)-কে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে নসীহত করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا.

"তোমরা উভয়ে মানুষের সঙ্গে সহজ আচরণ করিবে, কঠোর আচরণ করিবে না এবং লোকজনকে সুসংবাদ শুনাইবে, কিন্তু এমন কথা বলিবে না যাহাতে ঘৃণা সৃষ্টি হয়" (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৬খ., নং ৩০৩৮; মুসলিম, নং ১৭৩৩)।

উপরিউক্ত হাদীছসমূহ হইতে এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য তথা তাহাদের উপর হইতে গুরুভার লাঘব করার এবং শৃংখলমুক্ত হওয়ার কথাই প্রতীয়মান হয়।

হুযায়ফা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের হইতে এমনভাবে অদৃশ্য হইয়া যান যে, আর বাহিরে আসিলেন না। আমরা মনে করিলাম, হয়ত তিনি আর বাহির হইবেন না। ইহার পর তিনি বাহির হইয়া আসিয়া এমনভাবে সিজদাবনত হইলেন যে, আমরা মনে করিলাম, হয়ত এই সিজদায়ই তাঁহার জান কবয হইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি মাথা উত্তোলন করিয়া বলিলেন ঃ আমার রব আমার নিকট আমার উম্মতের ব্যাপারে এই বলিয়া পরামর্শ চাহিয়াছেন যে, আমি তাহাদের সঙ্গে কি আচরণ করিব ? আমি বলিলাম ঃ হে আমার রব! তাহারা আপনার সৃষ্টি এবং আপনারই বান্দা। তারপর দ্বিতীয়বার পরামর্শ চাহিলে আমি প্রথমবারের মতই বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মতের ব্যাপারে আমি আপনাকে অপদস্ত করিব না। ইহার পর তিনি আমাকে সুসংবাদ দিলেন, প্রথমে আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং প্রতি হাজারের সঙ্গে থাকিবে আরও সত্তর হাজার। তাহাদের কাহারও কোন হিসাব-নিকাশ হইবে না। অনন্তর আমার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠানো হইল। ফেরেশতা বলিলেন, আপনি দু'আ করুন, কবূল করা হইবে, আপনি প্রার্থনা করুন, দেওয়া হইবে। তখন আমি প্রেরিত ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ আমি যাহা চাহিব তাহা কি আমার রব আমাকে দান করিবেন ? তিনি বলিলেন, দান করার জন্যই তো আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। তারপর তিনি বলেন ঃ আমার রব আমাকে তাহা দান করিয়াছেন। ইহাতে আমার কোন গর্ব নাই। হাদীছে ইহাও উল্লেখ রহিয়াছে, আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপর যে কঠিন বিধান ছিল, আমাদের ধর্মাদর্শে কঠিন বিধান আল্লাহ্ তা'আলা রাখেন নাই; বরং তিনি অনেক কিছুই আমাদের জন্য হালাল করিয়া দিয়াছেন (মুসনাদে আহমাদ, ৫খ., পৃ. ৩৯৩; হাফিয হায়ছামী বলেন, হাদীছটি ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদ হাসান; মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০খ., পৃ. ৬৮, ৬৯)।

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। পথে তিনি পেশাব করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং পার্শ্ববর্তী একটি দেয়ালের আড়ালে নরম মাটির সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর বলিলেন ঃ বনী ইসরাঈলের অবস্থা এই ছিল যে, তাহাদের

কাহারও শরীরে পেশাবের সময় ইহার ছিটা লাগিলে তাহা কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলা হইত। কিন্তু তোমাদের জন্য এই বিধান নাই। তোমাদের কেহ পেশাব করিতে ইচ্ছা করিলে সে যেন নরম স্থানে গিয়া পেশাব করে (মুসনাদে আহমাদ, ৫খ., পৃ. ৪০২; হাকেম বলেন, হাদীছের সনদ্ সহীহ। ইমাম যাহাবী এই মত সমর্থন করিয়াছেন; ৩খ., পৃ. ৪৬৬)।

আনাস (রা) বলেন, ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের নিয়ম ছিল, তাহাদের কোন মহিলার হায়েয আরম্ভ হইলে তাহারা তাহার সঙ্গে একত্রে আহার করিত না এবং এক ঘরে বাস করিত না। এই ব্যাপারে সাহাবীগণ মহানবী (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ.

"লোকে আপনাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাহা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সংগ বর্জন করিবে" (২ ঃ ২২২)।

তারপর নবী কারীম (স) বলেন ঃ এই অবস্থায় তোমরা তাহাদের সঙ্গে সহবাস ব্যতীত সব কিছু করিবে। সংবাদটি ইয়াহূদীদের নিকট পৌঁছলে তাহারা বলিল, এই লোকটি আমাদের সব কাজে কেবল বিরোধিতাই করিতেছে। তখন উসায়দ ইব্ন হুদায়র এবং আব্বাদ ইব্ন বিশ্র (রা) আসিয়া বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহূদীরা এই এই কথা বলিয়াছে। আমরা কি তাহাদের সঙ্গে সহবাস করিতে পারিব না ? এই কথায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হইয়া যায়। আমরা মনে করিলাম, ইহাতে হয়ত তিনি ব্যথা পাইয়াছেন। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবার হইতে বাহির হইয়া যান। তখন তাহাদের সামনে দিয়া কিছু দুধ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে হাদিয়াস্বরূপ আসে। তিনি তাহাদেরকে ডাকিয়া পাঠান এবং সেই দুধ তাহাদেরকে পান করান। ইহাতে তাহারা বুঝিতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের কথায় কোন ব্যথা পান নাই (মুসলিম, নং ৩০২)।

'আইশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) খেলাধুলায় রত কতিপয় বালকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি বলেন ঃ হে বনী আরফিদা! তোমরা এগুলির অবলম্বন কর। ইহাতে ইয়াহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা বুঝিতে পারিল যে, আমাদের ধর্মাদর্শে কিছুটা সুযোগ রহিয়াছে (মুসনাদে আহমাদ, ৬খ., পৃ. ১১৬-২৩৩)।

উক্ত হাদীছের মর্ম হইলঃ আমি সহজ-সরল দীনে হানীফসহ প্রেরিত হইয়াছি। আলবানী বলেন, হাদীছের সূত্রটি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য; আবূ উবায়দ (র) গারীবুল হাদীছ গ্রন্থেও উল্লেখ করিয়াছেন। হারিছ ইব্ন আবূ উসামা তৎপ্রণীত মুসনাদেও তাহা বর্ণনা করিয়াছেন (পৃ. ২১-২; দায়লামী ২খ., পৃ. ১১০; হুমায়দী, পৃ. ২৫৯)। আলবানীর মতে হাদীছের সনদ সামগ্রিকভাবে সহীহ) ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সিলসিলাতুল আহাদীছ আস-সাহীহা, নং ১৮২৯; সহীহুল জামিইস সাগীর, নং ৩২১৪)।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, বনী ইসরাঈলের শারী'আতে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কিসাস প্রথা চালু ছিল। কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে তাহার বিনিময়ে হত্যকারীকে হত্যা করার বিধানকে

কিসাস বলে। কিন্তু দিয়াত তাহাদের মধ্যে চালু ছিল না। হত্যার শাস্তি ক্ষমা করিয়া দেওয়ার বিনিময়ে গৃহীত ক্ষতিপূরণের অর্থকে দিয়াত বলে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ.

"নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহার ভাইয়ের পক্ষ হইতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হইলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তাহার দেয় আদায় করা বিধেয়" (২ ঃ ১৭৮)।

আল-'আফও (العفو) অর্থ ইচ্ছাকৃত হত্যার বিনিময়ে দিয়াত গ্রহণ করিয়া কিসাস ক্ষমা করিয়া দেওয়া। তোমাদের উপর অবধারিতভাবে আরোপিত কিসাস-এর বিকল্প হিসাবে তোমাদের প্রতি দিয়াত ব্যবস্থা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ ও লঘু শাস্তির বিধান (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১২খ., নং ৬৮৮১; তাফসীরে ইব্ন জারীর তাবারী, ২খ., পৃ. ৬৫)।

এক দীর্ঘ হাদীছে মহান আল্লাহ্র বাণী وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا "আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করিয়াছি" (২০ ঃ ৪০)-এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। মূসা (আ) বলেন, হে আমার রব! আমি আমার কওমের জন্য তওবার আবেদন করিয়াছি। আমি বলিয়াছি, আমার রহমত ও করুণার বিষয়টি আমি সাব্যস্ত করিয়াছি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা আমার কওমের অন্তুর্ভুক্ত নয়। সুতরাং আপনি আমাকে ঐ করুণা বর্ষিত ব্যক্তির উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করুন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বলেন, তাহাদের তওবা হইবে ঃ তাহারা নিজের পিতা-পুত্র যাহাকেই সামনে পাইবে তাহাকেই তরবারি দ্বারা হত্যা করিবে, এই ব্যাপারে কোনরূপ পরওয়া করিবে না। অতঃপর যাহাদের পাপ মূসা ও হারূন (আ)-এর নিকট ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা প্রকাশ করেন এবং তাহারা এই পাপের কথা স্বীকার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তওবা করে এবং যেভাবে আদেশ করা হইয়াছে ঐভাবেই করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা হত্যাকারী এবং নিহত সকলকেই মাফ করিয়া দেন। তারপর মূসা (আ) তাহাদেরকে নিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন [হাফিয ইব্ন কাছীর হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। সুনানুল কুবরা, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্ন জারীর ও ইব্ন হাতিম তৎপ্রণীত তাফসীর গ্রন্থদ্বয় (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩খ., ১৬০-১৬১ দ্র.)]।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তি গুনাহ করিলে তাহার এই গুনাহর কাফ্ফারা কি হইবে, তাহা সকালে তাহাদের ঘরের দরজায় লিখিয়া দেওয়া হইত। আর শরীরে কোন নাপাকী লাগিলে তাহা কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলা হইত। এই কথা শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্য উত্তম বিধান দিয়াছেন। তখন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্য যে বিধান দিয়াছেন তাহার তুলনায় তোমাদের প্রতি দেওয়া বিধান উত্তম। তিনি তোমাদের জন্য পানিকে পবিত্রকারী বস্তুরূপে সাব্যস্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۔

"এবং যাহারা কোন অশ্লীল কার্য করিয়া ফেলিলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করিলে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে" (৩ ঃ ১৩৫)।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"কেহ কোন মন্দ কার্য করিয়া অথবা নিজের প্রতি যুলুম করিয়া পরে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাইবে" (৪ ঃ ১১০)।

কাযী আবূ বকর ইব্নুল আরাবী আল-মালিকী (র) বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী শরী'আতের রোযার বিধান ছিল এইরূপ ঃ লোকেরা রোযা অবস্থায় পানাহার বর্জন করার সাথে সাথে কথাবার্তাও বর্জন করিত। ইহাতে তাহাদের ভীষণ কষ্ট হইত। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর একান্ত দয়াপরবশ হইয়া রোযার সময় হইতে অর্ধেক সময় অর্থাৎ রাত্রকে রোযার হুকুম হইতে বাদ দেন এবং কথা বর্জন করার হুকুমটিও রহিত করেন [হাফিয ইব্ন কাছীর (র) আনাস (রা)-এর সূত্রে হযরত মারয়াম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا অর্থ صُمْتًا (চুপ থাকা); ইব্ন আব্বাস (রা) ও দাহহাক (র)-ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আনাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। কাতাদা (র)-ও একথা বলিয়াছেন। পূর্ববর্তী শারী'আতে রোযা রাখার ক্ষেত্রে এরূপ বিধান ছিল যে, তাহাদের জন্য পানাহার ও কথা বলা হারাম। সুদ্দী, কাতাদা ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ (র) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ১২৩; তাফসীরে তাবারী, ১৬খ., পৃ. ৫৬; তাফসীরে কুরতুবী, ১১খ., পৃ. ৯৮]।

(পাঁচ) জুমু'আর দিন

আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে বহু বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন যাহা অন্য কোন উম্মতকে দেন নাই। ইহার মধ্যে জুমু'আর দিনটি অন্যতম (খাসাইস, ২খ., পৃ. ৩৫৩)। এই দিনটি দিনসমূহের সর্দার বা সায়্যিদুল আয়্যাম। সূর্য উদিত হয় এমন দিনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন হইল এই জুমু'আর দিন। এই দিনেই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এই দিনেই তাঁহাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। এই দিনেই তাঁহাকে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করা হয়। আর এই জুমু'আর দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। এই দিনে এমন এক মুহূর্ত রহিয়াছে সেই মুহূর্তে দু'আ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহা কবূল করেন। এই দিনেই রহিয়াছে ঐ সালাতুল জুমু'আ যাহার জন্য দৌড়াইয়া যাওয়ার হুকুম করিয়াছেন আল্লাহ্ কুরআন মজীদে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর; ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর" (৬২ : ৯)।

এই মুবারক দিনটির ব্যাপারে পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে মতভেদ ছিল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে এই দিনটির সন্ধান দেন এবং অন্যান্যদেরকে ইহা হইতে বেখবর রাখেন। এই দিনটি আমাদের জন্য সুনির্দিষ্ট। ইয়াহূদীদের জন্য শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্য হইল রবিবার শ্রেষ্ঠ দিন। বহু হাদীছে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শোনেন, আমরা (সৃষ্টির দিক হইতে) আখিরী উম্মত; তবে কিয়ামতের দিন (জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে) সকলের অগ্রগামী হইব। কেননা পূর্ববর্তী লোকদেরকে কিতাব দেওয়া হয় এবং এক মুবারক দিনে ইবাদত করা তাহাদের উপর ফরয করা হয়। কিন্তু তাহারা ইহাতে মতভেদ করে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এই দিনটির ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন। এই ব্যাপারে সমস্ত উম্মত আমাদের অনুগামী। ইয়াহূদীরা পরের দিন তথা শনিবারকে এবং খৃষ্টানরা ইহারও পরের দিন তথা রবিবারকে তা'যীমের দিন হিসাবে সাব্যস্ত করে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ২খ., পৃ. ৮৭৬; মুসলিম, নং ৮৫৫)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন : সূর্য উদিত হয় এমন সব দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন হইল জুমুআর দিন। এই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এই দিনে তাঁহাকে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করা হয়। এই দিনে তাঁহার তওবা কবূল করা হয়। এই দিনে তাঁহার ইনতিকাল হয়। আর এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। মানুষ এবং জিন ছাড়া সমস্ত জীব-জানোয়ারই এই জুমু'আর দিন উষালগ্ন হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামতের অপেক্ষা করে এবং আশংকা করে। জুমু'আর দিন এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি কোন বান্দা নামায পড়িয়া এই সময়টিতে দু'আ করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাহার দু'আ কবূল করেন। কা'ব (র) জিজ্ঞাসা করেন, এই দিনটি কি সারা বৎসরই পাওয়া যায়? রাবী আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তাহার জবাবে আমি বলিলাম, বরং প্রতি জুমু'আয় পাওয়া যায়। তখন কা'ব (র) তাওরাত পড়িয়া করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) সত্যই বলিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তাহার পর 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি কা'ব-এর সাথে আমার বৈঠকের কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, তাহা কোন মুহূর্ত আমি জানি। একথা শুনিয়া আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, তাহা হইলে আপনি আমাকে সেই মুহূর্তের কথা জানাইয়া দিন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলিলেন, তাহা জুমুআর দিনের শেষ সময়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বলিলাম, তাহা জুমু'আর দিনের আখিরী সময় কেমন করিয়া হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (স) তো বলিয়াছেন : যদি কোন মুসলিম বান্দা সালাতরত অবস্থায় সেই সময়টি পায়, অথচ এই সময়ে কেহ সালাত আদায় করে না। তাহা হইলে ইহা জুমুআর দিনের আখিরী সময়ে কেমন করিয়া হইবে? জবাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) কি বলেন নাই, যে ব্যক্তি সালাতের অপেক্ষায় থাকে, সেও সালাতের মধ্যে থাকে বলিয়া গণ্য হয়? আবূ

হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, ঐ সালাত বলিয়া ইহাকেই বুঝানো হইয়াছে (আবূ দাঊদ, হাদীছ নং ১০৪৬; তিরমিযী, নং ৪৯১; ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ্; নাসাঈ, ৩খ., পৃ. ১১৪-১১৫; মুওয়াত্তা মালিক, ১খ., পৃ. ১০৮-১১০; আলবানীর মতে হাদীছটি সহীহ্; আল-জামিউস সাগীর, নং ৩৩২৯)।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ একদা জিব্রাঈল (আ) আমার নিকট আসেন এবং তখন তাঁহার হাতে ছিল একটি সাদা আয়না, তাহাতে ছিল একটি কাল দাগ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিব্রাঈল! ইহা কি? উত্তরে তিনি বলেন, ইহা হইল জুমুআর দিন। আপনার রব তাহা আপনার নিকট পেশ করিয়াছেন যাহাতে আপনি ও আপনার উম্মত এই দিনটিকে ঈদ হিসাবে উদযাপন করেন। এক্ষেত্রে আপনি থাকিবেন অগ্রগামী। ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের অবস্থান আপনার পরে। রাসূলুল্লাহ্ (স) ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইহাতে আমাদের জন্য কি রহিয়াছে? ফেরেশ্তা বলেন, ইহাতে আপনাদের জন্য কল্যাণ রহিয়াছে। ইহাতে এমন একটি মুহূর্ত রহিয়াছে, যে ব্যক্তি ঐ মুহূর্তে তাহার রবের নিকট কল্যাণের জন্য দু'আ করিবে, যাহা তাহার ভাগ্যে রহিয়াছে, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাহা দান করিবেন। আর যদি তাহা তাহার ভাগ্যে না থাকে তবে তাহা তাঁহার জন্য সঞ্চয় হিসাবে রাখিয়া দেওয়া থাকিবে। কেহ যদি এই মুহূর্তে কোন অকল্যাণ হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, যাহা তাহার জন্য অবধারিত, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ইহার চেয়েও বড় অকল্যাণ হইতে আশ্রয় দান করিবেন। নবী কারীম (স) বলেন, আমি বলিলাম, ইহাতে এ কাল দাগটি কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে এমন একটি ময়দান বানাইবেন যাহা শুভ্র মিশক হইতেও অধিক সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত করিবে। জুমু'আর দিন আল্লাহ্ তা'আলা এই ময়দানে 'ইল্লিয়্যুন' হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় কুরসীতে সমাসীন থাকিবেন। এই কুরসীকে নূরের মিম্বরসমূহ পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে। তখন নবী-রাসূলগণ ঐ মিম্বরসমূহের উপর আসিয়া বসিবেন আর এই মিম্বরসমূহের চারি দিকে থাকিবে কতিপয় স্বর্ণের কুরসী। সেই কুরসীতে সিদ্দীক ও শহীদগণ উপবিষ্ট থাকিবেন। তাহার পর জান্নাতী লোকেরা আসিয়া এক একটি টিলার উপর উপবেশন করিবেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় তাজাল্লীতে উদ্ভাসিত হইবেন এবং সকলেই তাঁহার দীদার লাভে ধন্য হইবেন। এই অবস্থায় তিনি ঘোষণা করিবেন, আমি তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছি এবং তোমাদের প্রতি আমার দেওয়া নি'আমতকে পরিপূর্ণ করিয়াছি। ইহা আমার অনুগ্রহ প্রদর্শনের স্থান। সুতরাং তোমরা আমার নিকট দু'আ কর।

তখন সকলেই তাঁহার নিকট তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের দু'আ করিবে। তিনি বলিবেন, এই স্থানে আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। তাহার পর তিনি বলিবেন, তোমাদের জন্য আমার আরও অনুগ্রহ রহিয়াছে। তোমরা আমার নিকট চাও। সকলেই তাঁহার নিকট চাহিতে থাকিবে। এভাবে দু'আ করিতে করিতে সকলের চাওয়া-পাওয়াই পূর্ণ হইয়া যাহাবে। তখন তাহাদের জন্য আল্লাহ্র সত্তাকে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। ফলে তাহারা

অবলোকন করিবে এমন জিনিস যাহা চোখ কোন দিন দেখে নাই, কান কোন দিন শুনে নাই এবং মানুষের হৃদয় কোন দিন কল্পনাও করে নাই।

জুমুআর দিন সালাত হইতে প্রত্যাবর্তনকালে যেই পরিমাণ সময় ব্যয় হয় সেই পরিমাণ সময় ধরিয়া এই অবস্থা অব্যাহিত থাকিবে। তাহার পর আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় স্বীয় কুরসীতে সমাসীন হইবেন। তাঁহার সাথে সাথে শহীদগণ এবং সিদ্দীকগণও নিজ নিজ কুরসীতে সমাসীন থাকিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, তখন প্রত্যেকেই শুভ্র মোতি, লাল ইয়াকূত কিংবা সবুজ যবরজদ পাথর দ্বারা নির্মিত নিজ নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিবেন। পাথরগুলিতে ফাটা, ভাংগা বা এই জাতীয় কোন খুঁত থাকিবে না। দরজাগুলি দূরে থাকিবে। ইহাতে নহর প্রবাহিত থাকিবে এবং প্রবাহিত নহরে বালতি থাকিবে। ইহাতে আরও থাকিবে রকমারি ফল-ফলাদি, স্ত্রী, খাদিম ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজেদের সম্মান ও আল্লাহ্‌র দীদারের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য জুমু'আর দিনের প্রতি যে পরিমাণ মুখাপেক্ষী, অন্য কিছুর প্রতি সেই পরিমাণ মুখাপেক্ষী থাকিবে না। তাই এই দিনকে 'বোনাস দিন' বলা যায় (হাফিয হায়ছামী বলেন, হাদীছটি ইমাম তাবারানী তৎপ্রণীত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। আবূ ইয়ালাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার রাবী সকলেই সহীহ্-এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। মাজমাউয যাওয়াইদ, ২খ., পৃ. ১৬৪)।

(ছয়) এই উম্মতের ভুল-ত্রুটি এবং পাপপ্রসূত কল্পনা ক্ষমাযোগ্য

আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে অসংখ্য ও অগণিত নি'য়ামত দান করিয়াছেন। ইহাতে রহিয়াছে আখিরী নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন। আল্লাহ্ প্রদত্ত নি'য়ামতসমূহের অন্যতম হইল, তিনি এই উম্মতের ভুল-ত্রুটি এবং মনের অবাস্তব জল্পনা-কল্পনা ইত্যাদি সব কিছু ক্ষমা করিবেন। মনের জল্পনা-কল্পনা যদি উচ্চারণ না করা হয় কিংবা তাহা বাস্তবে রূপায়িত না করা হয় তাহা হইলে এসব ক্ষমাযোগ্য। ইহা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। হাদীছে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের অহেতুক কল্পনা মাফ করিয়া দিয়াছেন যতক্ষণ না তাহারা তাহা উচ্চারণ করে কিংবা বাস্তবে রূপায়িত করে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১১খ., পৃ. ৫৬০; মুসলিম নং ১২৭)।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ
بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মনে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে খুশী শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (২ ঃ ২৮৪)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হইলে বিষয়টি সাহাবীগণের খুবই কঠোর মনে হয়। তাই সবাই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত, সিয়াম, জিহাদ, সাদাকা প্রভৃতি যে সমস্ত আমল আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী ছিল, এই যাবত আমাদেরকে সেগুলি করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে আপনার উপর এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। বিষয়টি তো আমাদের সমর্থ্যের বাহিরে। একথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, কিতাবী তথা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের ন্যায় তোমরাও কি এমন কথা বলিবে, "শুনিলাম, কিন্তু মানিলাম না"? বরং তোমরা বল, শুনিলাম ও মানিলাম। হে আমাদের রব! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর তুমিই আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এই নির্দেশ শুনিয়া সাহাবায়ে কিরাম বলেন, আমরা শুনিয়াছি ও মানিয়াছি, হে আমাদের রব! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি; তুমিই আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল। রাবী বলেন, সাহাবীদের সকলেই এই আয়াত পাঠ করেন এবং বিনয়াপ্লুত হইয়া মনে-প্রাণে তাহা গ্রহণ করেন। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

"রাসূল, তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছে এবং মু'মিনগণও। তাহাদের সকলে আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতাগণে, তাঁহার কিতাবসমূহে এবং তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করিয়াছে। তাহারা বলে, আমরা তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তাহারা আরও বলে, আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই এবং প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট" (২ ঃ ২৮৫)।

যখন তাহারা সর্বোতভাবে আনুগত্য জ্ঞাপন করিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতের হুকুম রহিত করিয়া নাযিল করিলেন ঃ

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا .

"আল্লাহ্ কাহারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাঁহার সাধ্যাতীত। সে ভাল যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহা তাহারই জন্য এবং মন্দ যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহাও তাহারই। হে আমাদেব রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করিয়া ফেলি, তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করিও না"। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "হাঁ, মানিয়া নিলাম।" আরও নাযিল হয় ঃ

رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا.

"হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অপর্ণ করিয়াছিলেন, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করিবেন না"। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, হাঁ, মানিয়া নিলাম। আরও নাযিল হয় ঃ

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ.

"হে আমাদের রব! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিবেন না যাহা বহনের ক্ষমতা আমাদের নাই"। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, হাঁ, মানিলাম। আরও নাযিল হইয়াছে ঃ

وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

"আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর" (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৮৬)। এবারও রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, হাঁ, মানিয়া নিলাম (মুসলিম, হাদীছ নং ১১৫)।

আবূ যার গিফারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের ভুল-ভ্রান্তি এবং জোরপূর্বক তাহাদের দ্বারা যাহা করানো হয়, এমন সব কাজ মাফ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে উম্মতে মুহাম্মাদীর মর্যাদা প্রতীয়মান হয় এবং ইহা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। এই উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি ভুলে কোন অপরাধ করিয়া বসে তবে তাহা না করার মধ্যেই গণ্য থাকিবে। পূর্ববর্তী উম্মতের বিষয়টি ইহার ব্যতিক্রম ছিল (ফাতহুল বারী, ১১খ., পৃ. ৫৬০; ইব্ন মাজা, হাদীছ নং ২০৫৩; মুসতাদরাক হাকেম, ২খ., পৃ. ১৯৮; তাঁহার মতে হাদীছটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। তবে তাঁহারা ইহা বর্ণনা করেন নাই। যাহাবীও অনুরূপ বলিয়াছেন; দারু কুতনী, পৃ. ৭৯৭; বায়হাকী, ৭খ., পৃ. ৩৫৬। আলবানীও হাদীছটিকে সহীহ বলিয়াছেন)।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আল্লাহ্ তা'আলা হইতে এই কথা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমুদয় সৎ ও অসৎ কর্মের হিসাব লিখেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) ইহাকে আরও বিস্তারিত করিয়া বলেন, যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করিয়াছে অথচ তাহা সম্পাদন করে নাই, আল্লাহ্ তা'আলা ইহার বিনিময়ে তাহার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ছওয়াব লিখিয়া দেন। আর ইচ্ছার পর তাহা কাজে পরিণত করিলে আল্লাহ্ তা'আলা ইহার বিনিময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ছওয়াব লিখিয়া দেন। পক্ষান্তরে কেহ যদি কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করিয়া তাহা কাজে পরিণত না করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ইহার বিনিময়ে তাহার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ছওয়াব লিখিয়া দেন। আর ইচ্ছার পর সম্পাদন করিলে তিনি একটি মাত্র গুনাহ লিখেন (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১১খ., হাদীছ নং ৬৪৯১; মুসলিম, হাদীছ নং ১৩১)।

(সাত) এই উম্মত সমূলে ধ্বংস হওয়া হইতে নিরাপদ

উম্মতে মুহাম্মাদী আল্লাহ্র হেফাজতাধীন ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত উম্মত। এই উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত অকল্যাণ হইতে হিফাযত করিয়া নিজ রহমতের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছেন। সুতরাং

তাহারা অনাহারে, দুর্ভিক্ষে এবং পানিতে ডুবিয়া সমূলে মারা যাইবে না। আর এমন শত্রুকেও তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে না যাহারা তাহাদেরকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিবে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একত্র হইলেও তাহা সম্ভব হইবে না। ইহা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন উম্মতের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ছিল না। এই সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে স্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে। ছাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করিয়া দিয়াছেন। ফলে আমি ইহার পূর্ব দিগন্ত হইতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখিতে পাইয়াছি। আমার উম্মতের রাজত্ব এই পূর্ণ এলাকাব্যাপী বিস্তৃত হইবে। আমাকে লাল ও সাদা [লাল বলিয়া সোনা ও সাদা বলিয়া রূপার ভাণ্ডারকে বুঝানো হইয়াছে, আর এই দুই ভাণ্ডার হইল রোম ও পারস্যের ধনভাণ্ডার, ভিন্নমতে ইরাক ও সিরিয়ার ধনভাণ্ডার] দুইটি ধনভাণ্ডার প্রদান করা হইয়াছে।

আমি আমার রবের নিকট আমার উম্মতের ব্যাপারে প্রার্থনা করিয়াছিলাম যেন তাহাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করা হয় এবং যেন তাহাদের উপর বহিরাগত এমন কোন শত্রুকে চাপাইয়া দেওয়া না হয় যাহারা তাহাদেরকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিবে। তখন আমার রব বলেন, হে মুহাম্মাদ! কোন বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তাহা আর রদ হয় না। আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, তাহাদেরকে আমি ব্যাপক দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করিব না এবং তাহাদের দুনিয়া হইতে খতম করিয়া দিবে এমন কোন বহিরাগত শত্রুকেও আমি তাহাদের উপর চাপাইয়া দিব না। তাহারা দুনিয়ার সমস্ত প্রান্ত হইতে একত্র হইয়াও মুসলমানদেরকে খতম করিতে পারিবে না। অবশ্য আপনার উম্মত পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিবে অথবা বন্দী করিবে (মুসলিম, হাদীছ নং ২৮৮৯)।

সা'দ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স) আলিয়া (উচ্চভূমি) অঞ্চল হইতে আসিতেছিলেন। এই সময় তিনি বনূ মুআবিয়ার মসজিদের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তথায় প্রবেশ করিয়া দুই রাক'আত নামায আদায় করেন এবং আমরাও তাঁহার সাথে নামায আদায় করি। নামাযান্তে তিনি দীর্ঘক্ষণ দু'আ করেন। তাহার পর তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া বলেন আমি আমার রবের নিকট তিনটি বিষয়ে দু'আ করিয়াছিলাম। তিনি দুইটি কবূল করিয়াছেন, আর একটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমি আমার রবের নিকট দু'আ করিয়াছিলাম যেন তিনি আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন। ইহা তিনি মঞ্জুর করিয়াছেন। আমি দু'আ করিয়াছিলাম যেন আমার উম্মতকে পানিতে ডুবাইয়া না মারা হয়। ইহাও তিনি মঞ্জুর করিয়াছেন। আমি দু'আ করিয়াছিলাম যেন তাহারা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়। ইহা তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন (মুসলিম, ফিতান, বাব ৫, হাদীছ নং ২৮৯০)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাবির ইব্ন আতীক (রা) বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বনী মুআবিয়া এলাকায় আমাদের নিকট আসেন। ইহা আনসার সাহাবীদের একটি গ্রাম। তখন তিনি বলেন, তোমাদের এই মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ (স) কোথায় নামায পড়িয়াছেন তাহা কি তোমরা জান? আমি বলিলাম, জানি। এই কথা বলিয়াই আমি কোণের দিকে তাঁহাকে ইশারা করিয়া দেখাইলাম। তিনি বলিলেন, এই মসজিদে রাসূলুল্লাহ (স) যে তিনটি দু'আ করিয়াছিলেন তাহা

তোমরা জান কি? আমি বলিলাম, হাঁ, জানি। তিনি বলিলেন, তাহা আমাকে বলিয়া দাও। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (স) দু'আ করেন যেন বহিরাগত কোন শত্রুকে মুসলমানদের উপর জয়ী না করা হয় এবং যেন তাহাদেরকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করা হয়। এ দুইটি দু'আ কবূল হইয়াছে। তিনি এই দু'আও করিয়াছিলেন যেন তাঁহার উম্মতেরা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়, ইহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ইবন উমার (রা) বলেন, হাঁ, তুমি সত্য বলিয়াছ। তিনি বলিলেন, এই কারণেই এই উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘর্ষ (বিবাদ ও অনৈক্য) চলিতে থাকিবে (মুওয়াত্তা লিল-মালিক, ১খ., পৃ. ২১৬; আবদুল কাদির আরনাউত বলেন, হাদীছের সনদ সহীহ, তা'লীক আলা জামিয়িল উসূল, ৯খ., পৃ. ১৯৯)।

আওফ ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের উপর দুই তরবারিকে কখনও একত্র করিবেন না। একটি তাহাদের নিজেদের তরবারি। অপরটি শত্রুদের তরবারি (আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৩০১; মুসনাদে আহমাদ, ৬খ., পৃ. ২৬; আলবানীর মতে হাদীছটি সহীহ, সহীহ আল-জামিউস সাগীর, হাদীছ ৫০৯৭)।

(আট) এই উম্মত পথভ্রষ্টতার উপর একমত হইবে না এবং তাহাদের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে

আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে দুনিয়াতে বহু মর্যাদা দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল, এই উম্মতের সকলকে একত্রে তিনি ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হওয়া হইতে হিফাযত করিবেন। ইহা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খাতিরেই করা হইবে। আর এই উম্মতের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, তাহাদের একটি দল সর্বদা, সর্বকালে ও সর্বযুগে সত্য ও হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং তাহারা বিজয়ী হিসাবে থাকিবে। যাহারা তাহাদের বিরোধিতা করিবে বা তাহাদেরকে অপদস্ত করার চেষ্টা করিবে, তাহারা তাহাদের কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তাহারা তাহাদের অবস্থার উপর অটল থাকিবে।

শায়খ ইয্যুদ্দীন ইব্ন আবদুস সালাম বলেন, এই জাতীয় হাদীছ দ্বারা নবী কারীম (স)-এর বৈশিষ্ট্য বা তাঁহার উম্মতের পবিত্রতা প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ দীনের মৌলিক ও আনুষঙ্গিক কোন বিষয়েই এই উম্মত পথভ্রষ্টতায় একমত হইবে না।

কা'ব ইব্ন আলিম আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ পথভ্রষ্টতার উপর একমত হওয়া হইতে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে রক্ষা করিয়াছেন (কিতাবুস সুন্নাহ ইব্ন আবূ আসিম, পৃ. ৭৯)। আনাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আলবানী হাদীছের দুইটি সূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছটি সামগ্রিকভাবে হাসান (সিলসিলাতুল আহাদীছ আস-সাহীহা, নং ১৩১১; সহীহ আল-জামিউস সগীর, হাদীছ নং ১৭৮২)।

ইব্ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মত অথবা তিনি বলিয়াছেন, উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপর একত্র করিবেন না। আল্লাহ্র সাহায্য জামাআতের সাথে। কেহ যদি মুসলিম জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ই সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে [তিরমিযী, হাদীছ নং ২১৬৭। ইমাম তিরমিযীর

মতে হাদীছটি গরীব। আল-মাকাসিদুল হাসানা, আল্লামা সাখাবী, হাদীছটি সামগ্রিকভাবে মশহুর। ইহার বহু সনদ ও সমর্থন রহিয়াছে। ইহার কোন কোন সূত্র মারফূ, পৃ. ৪৬০। সহীহ আল-জামিউস সাগীর গ্রন্থে আলবানী ইহাকে সহীহ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, নং ১৮৪৪। ইমাম তাবারীও হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণিত হাদীছটি নিম্নরূপ ঃ

عن ابن عمر لن تجتمع امتى على ضلالة فعليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة.

"ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আমার উম্মত কখনও ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হইবে না। অতএব তোমরা দলবদ্ধ থাকিবে। কেননা দলের উপরই রহিয়াছে আল্লাহর হাত"।

হাফিয হায়ছামী (র) তাবারানী হইতে হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাবারানীর সূত্র দুইটি। ইহার একটির সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য এবং সকলেই সহীহ-এর শর্তে উত্তীর্ণ। অবশ্য মারযূক-এর বিষয়টি ইহার ব্যতিক্রম। তিনিও নির্ভরযোগ্য, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৫খ., পৃ. ২১৮]।

ছাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ আমার উম্মতের একদল লোক সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যাহারা তাহাদেরকে অপদস্ত করার চেষ্টা করিবে তাহারা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এইভাবে কিয়ামত আসিয়া যাইবে। কিন্তু তাহারা তাহাদের অবস্থার উপর সুদৃঢ় থাকিবে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৬খ., নং ৩৬৪১; মুসলিম, হাদীছ নং ১৯২০)।

[ইমাম নববী বলেন, ইমাম বুখারীর মতে "আমার উম্মতের একদল লোক" বলিয়া উলামায়ে কিরামকে বুঝানো হইয়াছে। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল বলেন, তাহারা যদি মুহাদ্দিছ না হন, তবে তাহারা কাহারা আমি জানি না। কাযী ইয়ায বলেন, ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল-এর মতে তাহারা হইলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআত এবং যাহারা তাহাদের আকীদা ও ফিক্‌হের অনুসারী। ইমাম নববী বলেন, তাহারা হইলেন মু'মিনদের বিভিন্ন জামাআত। তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন মুজাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিছ, সূফী, মুবাল্লিগ ও দীনের অন্যান্য জামাআত। তাহাদের সকলের একই দলভুক্ত থাকা আবশ্যক নয়, বরং তাহারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন লোকও হইতে পারেন। শারহুন নাবাবী আলা সাহীহ মুসলিম, ১৩খ., পৃ. ৬৬-৬৭)।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর মুহাম্মাদ (স)-এর হৃদয়কে অন্যান্যদের তুলনায় সর্বোত্তম পাইলেন এবং তিনি তাঁহাকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেন এবং তাঁহাকে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়া রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি পুনরায় বান্দাদের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহাবায়ে কিরামের হৃদয়কে অন্যান্যদের তুলনায় সর্বোত্তম পাইলেন। তাই তিনি তাহাদেরকে নবী কারীম (স)-এর উযীর নির্বাচন করেন, যাহারা দীনের হেফাজতের জন্য লড়াই করেন। মুসলমানরা যে কাজকে

উত্তম মনে কর তাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটও উত্তম এবং যে কাজকে খারাপ মনে কর, তাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটও খারাপ (মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯)। হাফিয হায়ছামী বলেন, হাদীছটি ইমাম আহমাদ ও বাযযার বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তাবারানীও তৎপ্রণীত কাবীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছের সূত্রে বর্ণিত সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য (মাজমাউয যাওয়াইদ, ১খ., পৃ. ১৭৮)।

(নয়) এই উম্মত পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ

এই উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা বহু শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং তাহাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করিয়াছেন। তাহাদের কথা ও সাক্ষ্যকে গ্রহণ করিয়াছেন যাহার ঘোষণা কুরআন ও হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ইহাতে তাহাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় (বিদায়াতুস সুউল, পৃ. ৬৯)।

আনাস (রা) বলেন, একদা একটি লাশ বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার সময় তাহার প্রশংসা করা হইলে নবী কারীম (স) বলিলেন, তাহার জন্য ওয়াজিব হইয়াছে, ওয়াজিব হইয়াছে, তিনবার। পরে আর একটি লাশ বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার সময় তাহার দুর্নাম করা হইলে নবী কারীম (স) "তাহার জন্য ওয়াজিব হইয়াছে" কথাটি তিনবার বলিলেন। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গীত হউক, একটি জানাযা যাওয়ার সময় তাহার প্রশংসা করা হইলে আপনি "তাহার জন্য ওয়াজিব হইয়াছে" কথাটি তিনবার বলিলেন। কিছুক্ষণ পর অপর একটি জানাযা যাওয়ার সময় তাহার দুর্নাম করা হইলে আপনি পুনরায় "তাহার জন্য ওয়াজিব হইয়াছে" কথাটি তিনবার বলিলেন, ইহার কারণ কি? জবাবে তিনি বলিলেন, যে লোকটির তোমরা প্রশংসা করিয়াছ, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়াছে। আর যাহার তোমরা দুর্নাম করিয়াছ, তাহার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হইয়াছে। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সাক্ষী (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৩খ., নং ১৩৬৭; মুসলিম, নং ৯৪৯)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা সাহাবায়ে কিরাম একটি লাশ নিয়া নবী কারীম (স)-এর সামনে দিয়া গেলেন এবং তাহারা তাহার প্রশংসা করিলেন। নবী কারীম (স) বলিলেন, তাহার জন্য ওয়াজিব হইয়াছে। ইহার পর আরেকটি লাশ নিয়া যাওয়ার সময় তাহারা তাহার দুর্নাম করিলেন। তখনও নবী কারীম (স) বলিলেন, ওয়াজিব হইয়াছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উপরিউক্ত জানাযা দুইটির ব্যাপারে "ওয়াজিব হইয়াছে" কথাটি আপনি বলিলেন, ইহার মর্ম কী? তিনি বলিলেন, ফেরেশ্তাগণ আসমানে আল্লাহ্‌র সাক্ষী। আর তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সাক্ষী (নাসাঈ, ৪খ., পৃ. ৫০)। মূল হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। আলবানী হাদীছটি সহীহ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (সহীহ আল-জামে, নং ৬৬০৪)।

কা'ব (রা) বলেন, এই উম্মতকে এমন তিনটি জিনিস প্রদান করা হইয়াছে, যাহা নবী-রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। যেমন পূর্ববর্তী নবীকে বলা হইয়াছে,

প্রচার কর, ইহাতে কোন অসুবিধা নাই। তুমি তোমার কওমের ব্যাপারে সাক্ষী এবং তুমি দু'আ কর তাহা কবূল হইবে। ঠিক তেমন আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের ব্যাপারেও বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই" (২২ ঃ ৭৮)।

لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

"যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হইতে পার" (২ ঃ১৪৩)।

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

"তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব" (৪০ ঃ ৬০)।

(দশ) এই উম্মতের নামাযের কাতার ফেরেশ্তাদের কাতারতুল্য

আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে বহু মর্যাদা দান করিয়াছেন। তিনি তাহাদের নামাযের কাতারকে ফেরেশতাদের কাতারের তুল্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। হাদীছে এই সম্বন্ধে বিবরণ রহিয়াছে। হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ অন্যান্য লোকদের তুলনায় আমাদেরকে তিনটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে। আমাদের নামাযের কাতারকে ফেরেশতাদের কাতারের তুল্য সাব্যস্ত করা হইয়াছে। পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ বানানো হইয়াছে। আর মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী বস্তুরূপে গণ্য করা হইয়াছে— যদি আমরা পানি না পাই। এই ক্ষেত্রে তিনি আরেকটি বিষয়ের কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন (মুসলিম, নং ৫২২)।

জাবির ইব্ন সামুরা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স) ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, কি হইল, আমি তোমাদের উদ্ভ্রান্ত ঘোড়ার লেজের ন্যায় হস্ত উত্তোলনরত অবস্থায় দেখিতেছি? নামাযের অবস্থায় তোমরা নিজেদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্থির রাখিবে। পরে তিনি আরেক দিন আমাদের সামনে আসিয়া আমাদেরকে গোলাকার অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, কি হইল, আমি যে তোমাদেরকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখিতেছি? ইহার পর অপর একদিন নবী কারীম (স) আমাদের সামনে আসিয়া বলিলেন, ফেরেশতাগণ তাহাদের রবের সামনে যেভাবে কাতারবন্দী হইয়া থাকে তোমরা সেভাবে কাতারবন্দী হও না কেন? আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ফেরেশতারা তাহাদের রবের সামনে কিভাবে কাতারবন্দী হয়? তিনি বলিলেন, তাহারা প্রথমে সামনের কাতারগুলি পুরা করে এবং কাতারে পরস্পর মিলিয়া দাঁড়ায় (মুসলিম, নং ৪৩০)।

আমার উম্মতের নামাযের কাতারকে ফেরেশ্তাদের কাতারের তুল্য সাব্যস্ত করা হইয়াছে। প্রাক মাটিকে আমার জন্য উযূর স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে। মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রকারী

বস্তুরূপে গণ্য করা হইয়াছে। আর গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে (আল-কাবীর, ইমাম তাবারানী; আলবানীর মতে হাদীছটি সহীহ, সহীহ আল-জামে আস-সাগীর, নং ৪০৯৫)।

চতুর্থ প্রকার ঃ আখিরাতে এই উম্মতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতকে এমন কতিপয় বিষয় দান করিবেন, যাহা পূর্ববর্তী উম্মতের আর কাহাকেও দেওয়া হইবে না। ইহাতে রহিয়াছে এই উম্মতের শিক্ষাগুরু, মুরব্বী, সায়্যিদুল আওয়ালীন ওয়াল-আখিরীন মুহাম্মাদ (স)-এর বিশেষ মর্যাদা, যিনি এই উম্মতের হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন এবং নিজের গোটা জীবন তাহাদের পিছনে ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে তাহারা হইয়াছে শ্রেষ্ঠতম উম্মত। আখিরাতে এই উম্মত যেসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা মণ্ডিত থাকিবে, ইহার অন্যতম হইল ঃ নবীগণ তাহাদের উম্মতের নিকট যে দীনের পয়গাম যথাযথভাবে পৌঁছাইয়াছেন, এই ব্যপারে উম্মতে মুহাম্মাদী সাক্ষী হইবে। জান্নাতীদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা হইবে সর্বাধিক, তাহারাই প্রথমে পুলসিরাত পার হইবে এবং সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবশে করিবে। তাহারা আগমনের দিক হইতে সর্বশেষ, কিন্তু সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ইত্যাদি। আখিরাতে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান থাকিবে।

(এক) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল থাকিবে

কিয়ামতের দিন মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ উযূর কারণে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান থাকিবে। হাওযে কাওছারের নিকট রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় উম্মতের জন্য অপেক্ষমাণ থাকিবেন এবং উক্ত বিশেষ আলামত দ্বারাই তিনি তাঁহার উম্মতকে অন্যান্য উম্মতের মধ্য হইতে চিনিয়া নিবেন এবং পৃথক করিয়া নিবেন। আল্লামা ইব্ন হাজর আসকালানী (র) বলেন, উযূর প্রভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দীপ্তিমান ও উজ্জ্বল হওয়া কেবল এই উম্মতেরই বৈশিষ্ট্য। হাদীছে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

নু'আয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মুজমির (র) বলেন, আমি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-কে উযূ করিতে দেখিলাম। প্রথমে তিনি তাহার মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপে ধুইলেন, ইহার পর তিনি ডান হাত ধুইলেন, এমনকি বাহুর কিছু অংশও ধুইলেন। তাহার পর বাম হাতও বাহুর কিছু অংশসহ ধুইলেন। ইহার পর মাথা মাসেহ করিলেন। তাহার পর ডান পা ধুইলেন। এমনকি গোছার কিছু অংশও ধুইলেন। ইহার পর বাম পায়ের গোছার কিছু অংশসহ ধৌত করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এভাবেই উযূ করিতে দেখিয়াছি।" তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ উযু পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপে করার কারণে কিয়ামতের দিন তোমাদের মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং হাত-পা উজ্জ্বল থাকিবে। অতএব তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয়, সে যেন তাহার মুখমণ্ডলের নূর এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বৃদ্ধি করে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ১৩৬; মুসলিম, হাদীছ নং ৫৪৬/৩৪/২৪৬)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার হাউয হইবে আদান (এডেন)। হইতে আয়লা পর্যন্ত যে দূরত্ব উহা হইতেও বেশি দীর্ঘ। আর তাহা হইবে বরফ হইতেও সাদা এবং দুধ মিশ্রিত মধু হইতেও মিষ্ট। আর ইহার পাত্রের সংখ্যা হইবে তারকারাজির চেয়েও অধিক। আমি কিছু সংখ্যক লোককে তথা হইতে তাড়াইয়া দিতে থাকিব, যেমনিভাবে লোকে নিজের হাউয হইতে অন্যের উট তাড়াইয়া দেয়। সাহাবায়ে কিরাম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেদিন কি আপনি আমাদেরকে চিনিতে পারিবেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তোমাদের এমন চিহ্ন থাকিবে, যাহা অন্য কোন উম্মতের থাকিবে না। উযূর বদৌলতে তোমাদের মুখমণ্ডল নূরানী ও হাত-পা দীপ্তিমান অবস্থায় তোমরা আমার কাছে আসিবে (মুসলিম, হাদীছ নং ২৪৭)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) একটি কবরস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ.

"তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক হে মু'মিনদের ঘর বাসীরা। ইনশাআল্লাহ্ আমরাও তোমাদের সঙ্গে যোগদান করিব"।

আমার বড় ইচ্ছা হয়, আমাদের ভাইদেরকে দেখিবার। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বলিলেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আর যাহারা এখনও পৃথিবীতে আসে নাই তাহারা আমার ভাই। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উম্মতের মধ্যে যাহারা এখন পর্যন্ত দুনিয়াতে আসে নাই তাহাদেরকে আপনি কিভাবে চিনিবেন? তিনি বলিলেন, কেন, যদি কোন ব্যক্তির কপাল ও হাত-পা সাদাযুক্ত ঘোড়া কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশিয়া যায়, তবে সে কি তাহার ঘোড়াকে শনাক্ত করিতে পারিবে না? তাহারা বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, তাহারা (আমার উম্মত) সেদিন এমন অবস্থায় আসিবে যে, উযূর প্রভাবে তাহাদের মুখমণ্ডল থাকিবে নূরানী এবং হাত-পা থাকিবে দীপ্তিমান। আর হাউযের পাড়ে আমি হইব তাহাদের অগ্রনায়ক। জানিয়া রাখ, কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাউয হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে, যেমন পথহারা উটকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। আমি তাহাদেরকে ডাকিব ঃ আসো, আসো। তখন বলা হইবে, ইহারা আপনার পরে (আপনার দীনকে) পরিবর্তন করিয়াছিল। তখন আমি বলিব ঃ দূর হও, দূর হও (মুসলিম, হাদীছ নং ৫৮৪/৩৯/২৪৯)।

(দুই) এই উম্মত কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষী হইবে

সমস্ত উম্মতের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদীই হইল শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে পূর্ণাঙ্গ শরীআত ও জীবনব্যবস্থা প্রদান করিয়া বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছেন। তাহারা অন্যান্য উম্মতের মধ্যে মধ্যপন্থী উম্মত। তাহাদের মধ্যে ইয়াহূদী-খৃস্টানদের মত

বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা (ইফরাত-তাফরীত) নাই। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহাদেরকে অন্যান্য উম্মতের উপর সাক্ষী বানাইবেন। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের উম্মত কিয়ামতের ময়দানে তাহাদের দায়িত্ব পালনের বিষয়টিকে যখন অস্বীকার করিবে, তখন উম্মতে মুহাম্মাদীই কেবল তাহাদের দায়িত্ব পালনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে এবং তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে। ইহাতেও এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

"এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে" (২ ঃ ১৪৩)।

শায়খ 'ইয্যুদ্দীন ইব্ন আবদুস সালাম নবী কারীম (স)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত হাদীছের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উম্মতকে ন্যায়পরায়ণ বিচারকের মর্যাদা দান করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি যখন বান্দাদের বিচার করিবেন তখন পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাহাদের নিকট রিসালাতের বাণী পৌঁছাইবার বিষয়টি অস্বীকার করিবে। আর সেই মুহূর্তে তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীকে হাযির করিবেন। তাহারা ঐ সমস্ত লোকদের সামনে সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, নবী-রাসূলগণ সকলেই তাঁহাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করিয়াছেন। স্মর্তব্য যে, এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন নবী-রাসূলের উম্মতের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। হাদীছে এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন নূহ (আ)-কে ডাকা হইবে। তিনি উত্তর দিবেন, হে আমার রব! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কি তোমার কওমের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলে? তিনি বলিবেন, হাঁ। তখন তাঁহার উম্মতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, নূহ কি তোমাদের নিকট পয়গাম পৌঁছাইয়াছিল? তাহারা বলিবে, আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী আগমন করেন নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নূহকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার দাবির পক্ষে কে সাক্ষ্য দিবে? তিনি বলিবেন, মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার উম্মতগণ। তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, নূহ (আ) তাঁহার উম্মতের নিকট আল্লাহ্র পয়গাম প্রচার করিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) তোমাদেব পক্ষে সাক্ষী হইবেন। ইহাই মহান আল্লাহ্র বাণীতে বিধৃত হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا •

"এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে" (২ ঃ ১৪৩; বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮খ., হাদীছ নং ৪৪৮৭)।

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, কিয়ামতের ময়দানে নবী-রাসূলগণ উপস্থিত হইবেন। কোন নবী দুইজন, কোন নবী তিনজন উম্মতসহ উপস্থিত হইবেন, আবার কেহ ইহার চেয়ে কম বা বেশি উম্মতসহ উপস্থিত হইবেন। তখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রত্যেক নবীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি তোমার কওমের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছাইয়াছিলে? জবাবে নবীগণ প্রত্যেকেই বলিবেন, হাঁ, পৌঁছাইয়াছিলাম। তখন তাঁহার উম্মতকে ডাকা হইবে এবং জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের নিকট সে আমার পয়গাম পৌঁছাইয়াছিল কি? তাহারা বলিবে, না। আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার দাবির পক্ষে কে সাক্ষ্য দিবে? তিনি বলিবেন, মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত। তখন উম্মতে মুহাম্মাদীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, সে কি আমার পয়গাম পৌঁছাইয়াছিল? তাহারা বলিবে, হাঁ। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা তাহা জানিলে কিভাবে? তাহারা বলিবে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স) আমাদেরকে সংবাদ দিয়াছেন যে, নবী-রাসূলগণ সকলেই আল্লাহ্র পয়গাম যথাযথভাবে পৌঁছাইয়াছেন। আর আমরা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়াছি। তখন নবী কারীম (স) বলেন, মহান আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীতে ইহাই ঘোষিত হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا .

"এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে" (২ ঃ ১৪৩; মুসনাদে আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৫৮; ইব্ন মাজা, যুহদ, বাব ৩৪, নং ৪২৮৪; আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলিয়াছেন; সহীহ আল-জামেউস সাগীর, হাদীছ নং ৭৮৮৯)।

কা'ব আল-আহবার (র) বলেন, এই উম্মতকে এমন তিনটি বিষয় দান করা হইয়াছে, যাহা নবীগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও দান করা হয় নাই। নবীকে বলা হইত, প্রচার কর অসুবিধা নাই। তুমি তোমার কওমের ব্যাপারে সাক্ষী। আরও বলা হইত, দু'আ কর, কবূল করা হইবে। নবীগণের ন্যায় এই উম্মতের শানেও আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ .

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই" (২২ ঃ ৭৮)।

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۔

"যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হইতে পার" (২ ঃ১৪৩)।

أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۔

"তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব" (৪০ ঃ ৬০)।

(তিন) এই উম্মতই সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে

সিরাত জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দীর্ঘ সেতু। ইহা তরবারির ধার হইতে তীক্ষ্ণ এবং চুল হইতেও সূক্ষ্ম হইবে। যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম থাকিবে, তাহার জন্য আখিরাতে পুলসিরাত পার হওয়া সহজ হইবে এবং সে মুক্তি পাইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হইবে এবং নাফরমানিতে লিপ্ত হইবে, সে পুলসিরাত হইতে পদস্খলিত হইয়া জাহান্নামে পতিত হইবে।

আল্লাহ্ তা'আলা নবী (স) ও উম্মতে মুহাম্মাদীকে যে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন, ইহার অন্যতম হইল, তাহারাই প্রথমে পুলসিরাত পার হইবে এবং চিরশান্তির নিকেতন জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এই সম্বন্ধে হাদীছের বিবরণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের রবকে দেখিতে পাইব? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখিতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় কি? সাহাবাগণ বলিলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখিতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় কি? তাহারা বলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, অদ্রূপ তোমরাও আল্লাহ্কে দেখিবে। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ সকল মানুষকে জমায়েত করিয়া বলিবেন, পৃথিবীতে তোমরা যাহার ইবাদত করিয়াছিলে, আজ তাহাকেই অনুসরণ কর। সূর্যের উপাসক দল সূর্যের পিছনে, চন্দ্রের উপাসক দল চন্দ্রের পিছনে, মূর্তির উপাসক দল দেব-দেবীর পিছনে চলিবে। কেবল এই উম্মত অবশিষ্ট থাকিবে। তাহার মধ্যে মুনাফিকরাও থাকিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট এমন আকৃতিতে উপস্থিত হইবেন, যাহা তাহারা চিনে না। ইহার পর তিনি বলিবেন, আমিই তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা আমার পিছনে চল। তখন তাহারা বলিবে, আমরা আল্লাহর নিকট তোমার হইতে পানাহ্ চাই! আমাদের রব না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকিব। আর তিনি যখন আসিবেন, তখন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের নিকট তাহাদের পরিচিত আকৃতিতে আবির্ভূত হইয়া বলিবেন, আমিই তোমাদের রব। তাহারা বলিবে, হাঁ, আপনিই আমাদের রব। এই বলিয়া তাহারা তাঁহার অনুসরণ করিবে। ইত্যবসরে জাহান্নামের উপর দিয়া সিরাত (সেতু) স্থাপন করা হইবে এবং আমি ও আমার উম্মতই হইব প্রথম এই সীরাত অতিক্রমকারী (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১১ খ., হাদীছ নং ৬৫৭৩; মুসলিম, হাদীছ নং ১৮২)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মুক্তদাস ছাওবান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে ইয়াহূদীদের এক পণ্ডিত ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আসসালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ! তাহার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে এমন ধাক্কা দিলাম যে, ইহাতে সে প্রায় পড়িয়াই গিয়াছিল। সে বলিল, তুমি আমাকে ধাক্কা মারিলে কেন? আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্!' বলিতে পার না? ইয়াহূদী বলিল, আমরা তাঁহাকে তাঁহার পরিবার-পরিজন যেই নাম রাখিয়াছে, সেই নামেই ডাকি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, আমার নাম মুহাম্মাদ। আমার পরিবারের লোকই এই নাম রাখিয়াছে।

ইয়াহূদী বলিল, আমি আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার কি লাভ হইবে, যদি আমি তোমাকে কিছু বলি? সে বলিল, আমি কান পাতিয়া শুনিব। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কাছে যে লাঠিটি ছিল তাহার দ্বারা মাটি খুঁড়িলেন, তারপর বলিলেন, জিজ্ঞাসা কর। ইয়াহূদী বলিল, যেদিন এই পৃথিবী ও আসমান পাল্টাইয়া অন্য যমীন ও আসমানে পরিণত হইবে (অর্থাৎ কিয়ামত হইবে) সেদিন সর্বপ্রথম (তাহা পার হইবার) অনুমতিক লাভ করিবে? তিনি বলিলেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ। ইয়হূদী বলিল, জান্নাতে যখন তাহারা প্রবেশ করিবে তখন তাহাদের তোহফা কি হইবে? তিনি বলিলেন, মাছের কলিজা। সে বলিল, তাহাদের সকালের নাস্তা কি হইবে? তিনি বলিলেন, তাহাদের জন্য জান্নাতের ষাঁড় যবেহ করা হইবে, যাহা জান্নাতের আশেপাশে চড়িয়া বেড়ায়। সে বলিল, ইহার পর তাহাদের পানীয় কি হইবে? তিনি বলিলেন, সেখানকার একটি ঝর্ণার পানি যাহার নাম সালসাবীল। সে বলিল, আপনি ঠিক বলিয়াছেন।

সে আরও বলিল, আমি আপনার কাছে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসিয়াছি যাহা কোন নবী ছাড়া পৃথিবীর কোন অধিবাসী জানে না অথবা একজন কি দুইজন লোক ছাড়া। তিনি বলিলেন, আমি যদি তোমাকে তাহা বলিয়া দেই, তবে তোমার কি কোন উপকার হইবে? সে বলিল, আমি কান পাতিয়া শুনিব। সে বলিল, আমি আপনাকে সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, পুরুষের বীর্য সাদা এবং মহিলাদের বীর্য হলুদ। যখন উভয়টি একত্র হয় এবং পুরুষের বীর্য মহিলাদের ডিম্বের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে পুত্র সন্তান হয়। আর যখন মহিলাদের ডিম্ব পুরুষের বীর্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে কন্যা সন্তান হয়। ইয়াহূদী বলিল, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, এবং নিশ্চয় আপনি নবী। ইহার পর সে চলিয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন এই লোক আমার কাছে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ইতিপূর্বে আমার সেই সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা এক্ষণই আমাকে তাহা জানাইয়া দিলেন (মুসলিম, হাদীছ নং ৭১৬/৩৪/ ৩১৫)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ সৃষ্টিগত দিক হইতে আমরা সর্বশেষ কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা হইব অগ্রগামী। আমরাই প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিব। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, তাহাদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, আর আমাদেরকে

তাহাদের পরে কিতাব দেওয়া হইয়াছে। তাহারা (হকের ব্যাপারে) মতভেদ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা যে হকের ব্যাপারে মতভেদ লিপ্ত হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই (জুমুআর) দিনটির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দিনটি আমাদের জন্য (খাস)। ইহার পরের দিনটি ইয়াহূদীদের এবং ইহার পরের দিনটি খৃস্টানদের জন্য (বুখারী, ফাতহুল বারী, ২খ., হাদীছ নং ৮৭৬; মুসলিম, নং ৮৫৫; হাদীছের মূল পাঠ সহীহ মুসলিম হইতে গৃহীত)।

(চার) কাজ কম পারিশ্রমিক বেশি

আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে বহু নিয়ামত ও বহু বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটি হইল, তাহারা পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় কাজ কম করিবে, কিন্তু তাহাদেরকে পারিশ্রমিক বেশি দেওয়া হইবে। বস্তুত ইহা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ; তিনি তাহা যাহাকে ইচ্ছা দান করেন। তিনি তো মহাঅনুগ্রহশীল। শায়খ ইয্যুদ্দীন ইব্ন আবদুস সালাম ইহাকে এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছেও ইহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইব্ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ পূর্বেকার উম্মতের হায়াত তথা স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব হইল, আসর হইতে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের অনুরূপ। তোমাদের এবং ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের উদাহরণ হইল ঐ ব্যক্তির মত যে একদল লোককে কাজে নিয়োগ করিল এবং বলিল, আমার জন্য এক কীরাতের বিনিময়ে অর্ধদিন পর্যন্ত কাজ করিতে কে প্রস্তুত আছ? ইয়াহূদী সম্প্রদায় ইহাতে রাযী হইল এবং তাহারা এক কীরাতের বিনিময়ে অর্ধ দিবস পর্যন্ত কাজ করিল। তাহার পর সে আবার বলিল, আমার জন্য এক কীরাতের বিনিময়ে দুপুর হইতে আসর পর্যন্ত কাজ করিতে কে প্রস্তুত আছ? ইহাতে খৃস্টান সম্প্রদায় রাযী হইল এবং দুপুর হইতে আসর পর্যন্ত এক কীরাতের বিনিময়ে তাহারা কাজ করিল। ইহার পর সে পুনরায় বলিল, আমার জন্য দুই কীরাতের বিনিময়ে আসর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করিতে কে প্রস্তুত আছ? জানিয়া রাখ, তোমরাই সেই সম্প্রদায় যাহারা আসর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কীরাতের বিনিময়ে আমল করিয়াছ। জানিয়া রাখ, তোমাদের জন্য রহিয়াছে দ্বিগুণ পুরস্কার। ইহাতে ইয়াহূদী এবং খৃস্টান সম্প্রদায় ভীষণ ক্ষেপিয়া গেল এবং বলিল, আমাদের আমল বেশি কিন্তু পারিশ্রমিক কম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমাদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে আমি কি তোমাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম করিয়াছি? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, ইহা আমার অনুগ্রহ; আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহা দেই (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৬খ., হাদীছ নং ৩৪৫৯)।

উপরিউক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফিয ইব্ন কাছীর (র) বলেন, এই উদাহরণের উদ্দেশ্য হইল, মুসলামান এবং কিতাবী লোকদের পুরস্কারের মধ্যে পার্থক্য হইবে এই কথা বুঝানো। আর এই বিষয়টি আমল কম-বেশি হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং এক্ষেত্রে অন্য বিষয়

লক্ষণীয়। কখনও অল্প আমল দ্বারা এত বেশি সওয়াব হাসিল হয়, যাহা অধিক আমল দ্বারা হয় না। উদাহরণস্বরূপ লায়লাতুল কদরের কথা বলা যায়। এই এক রাতের আমল হাজার মাসের আমল হইতেও উত্তম। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম দীনের পথে বিভিন্ন সময় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের ব্যতীত অন্য কেহ যদি এই পথে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান করে, তবে তাঁহারা এক মুদ্দ বা অর্ধমুদ্দ খেজুর দান করিয়া যে সওয়াব হাসিল করিয়াছেন, সেই পরিমাণ সওয়াব লাভ করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনিভাবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ্ তা'আলা চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় নবূওয়াত দান করেন এবং প্রসিদ্ধ মতে ৬৩ বৎসর বয়সকালে তাঁহাকে এই পৃথিবী হইতে নিয়া যান। সর্বমোট নবূওয়াতকাল তেইশ বৎসর। এই তেইশ বৎসরের নবুওয়াতী জীবনে তাঁহার সত্তা হইতে যে ইলম ও আমলের বহিঃপ্রকাশ ও বাস্তবায়ন ঘটিয়াছে, তাহাতেও তিনি পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল হইতে অগ্রগামী প্রমাণিত হইয়াছেন, এমনকি নূহ (আ) হইতেও। অথচ তিনি সাড়ে নয় শত বৎসর তাঁহার কওমের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি আহবান করিয়াছেন এবং দিবানিশি, সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য করিয়াছেন। ঠিক তদ্রূপ নবী কারীম (স)-এর বরকতে এই উম্মতের সওয়াবকেও অন্য উম্মতের তুলনায় কয়েক গুণ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ। যেমন কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তিনি তাঁহার অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যাহার সাহায্যে তোমরা চলিবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করিবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ইহা এইজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানিতে পারে, আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাহাদের কোন অধিকার নাই। অনুগ্রহ আল্লাহ্রই এখতিয়ারে, যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাহা দান করেন। আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল" (৫৭ ঃ ২৮-২৯)।

আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) বলেন, মুসলিম এবং ইয়াহূদী-খৃস্টানদের উপমা হইল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একদল লোককে নিয়োগ করিয়াছে, যেন তাহারা তাহার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সকাল হইতে রাত পর্যন্ত কাজ করে। ইহার পর তাহারা অর্ধ দিবস পর্যন্ত কাজ করিয়া বলিল, তোমার পারিশ্রমিকের আমাদের কোন দরকার নাই। আমরা যাহা করিয়াছি তাহা বাতিল। নিয়োগকর্তা তাহাদেরকে বলিল, তোমরা এরূপ করিও না।

তোমরা তোমাদের অবশিষ্ট কাজ পূর্ণ কর এবং তোমাদের পূর্ণ পারিশ্রমিক তোমরা নিয়া যাও। কিন্তু তাহারা তাহা অস্বীকার করিল এবং কাজ ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর নিয়োগকর্তা অপর একদল লোককে কাজে নিয়োগ করিল এবং তাহাদেরকে বলিল, তোমরা এই দিনের অবশিষ্ট সময় কাজ কর, তাহাদের সঙ্গে পারিশ্রমিকের যেই শর্ত করিয়াছিলাম, তোমাদেরকে সেই পরিমাণই দিব। তাহারা কাজ শুরু করিয়া আসরের সময় হওয়ার পর বলিল, তোমার জন্য আমরা যে কাজ করিয়াছি তাহা বাতিল। আর যে পারিশ্রমিক আমাদের দেওয়ার কথা তাহা তোমার কাছেই থাকুক। সে বলিল, বাকী কাজ পুরা কর। এখন তো দিনের সামান্য সময়ই বাকী আছে। তাহারা ইহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল।

ইহার পর নিয়োগকর্তা দিনের অবশিষ্ট সময় কাজ করার জন্য একদল লোককে নিয়োগ করিল। তাহারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের অবশিষ্ট অংশ কাজ করিল এবং সেই দুই দলের পূর্ণ পারিশ্রমিক হাসিল করিল। ইহাই হইল তাহাদের এবং যাহারা এই নূর (ইসলাম) গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যকার উদাহারণ (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৪খ., হাদীছ নং ২২৭১)।

হাফিয ইব্‌ন হাজার (র) এই হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইহাতে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও আমল কম হওয়া সত্ত্বেও সওয়াব বেশি পাওয়ার কথাটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় (ফাতহুল বারী, ৪খ., পৃ. ৫২৫)।

(পাঁচ) জান্নাতীদের অধিকাংশই হইবে মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হইল, জান্নাতীদের অধিকাংশই হইবে মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত। ইহাতে রহিয়াছে রাসূলে কারীম (স) ও তাঁহার উম্মতের বিশেষ মর্যাদা। হাদীছেও এই বিষয়ে স্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে বলিলেন, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হইবে? (রাবী বলেন) এই কথা শুনিয়া আমরা খুশিতে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমরাই জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হইবে? সাহাবী বলেন, আমরা আবারও 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলাম। তিনি আবার বলিলেন, তবে আমি আশাবাদী যে, তোমরাই জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হইবে। এই সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আরও বলিতেছি যে, কাফিরদের তুলনায় তোমাদের অবস্থা (জাহান্নামে) এমন হইবে, যেমন কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশম অথবা সাদা ষাঁড়ের গায়ে একটি কালো পশম (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১১খ., হাদীছ নং ৬৫২৮, পৃ. ২২১)।

হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতীবাসীদের এক শত বিশটি কাতার হইবে। তন্মধ্যে আশিটি হইবে এই উম্মতের এবং বাকী চল্লিশটি হইবে অন্যান্য উম্মতের কাতার [তিরমিযী, হাদীছ নং ২৫৪৬; ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীছটি হাসান। হাফিয ইব্‌ন হাজার (র)-ও তাহার সূত্রে ফাতহুল বারীতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, ১১খ., পৃ. ৩৯৫; মুসনাদে

আহমাদ ইব্ন হাম্বল, ৫খ., পৃ. ৩৪৭, ৩৫৫, ৩৬১; ইব্ন মাজা, হাদীছ নং ৪২৮৯; মুসতাদরাক হাকেম, ১খ., পৃ. ৮২; ইমাম হাকেম (র)-এর মতে হাদীছটি মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাহাদের গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করেন নাই। আল্লামা যাহবী (র)-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আলবানীও ইহাকে সহীহ্ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সাহীহ আল-জামিউস সাগীর, হাদীছ নং ২৫২৩)।

(ছয়) মুসলমানগণ সর্বশেষ উম্মত, কিন্তু জান্নাতে প্রবেশে অগ্রগামী

এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ হইল, তিনি তাহাদেরকে আখিরী যুগে সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু মর্যাদার দিক হইতে অগ্রগামী করিয়াছেন। এই কারণেই তাহারা হাশরের ময়দানে প্রথমে উপস্থিত হইবে, তাহাদের হিসাব প্রথমে হইবে, তাহাদের বিচার প্রথমে হইবে এবং তাহারা জান্নাতে প্রথমে প্রবেশ করিবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, আমরা দুনিয়ায় আগমনের দিক হইতে সর্বশেষ, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা হইব অগ্রবর্তী। পার্থক্য শুধু এই যে, তাহাদের কিতাব দেওয়া হইয়াছে আমাদের আগে। তাহার পর হইল তাহাদের সেই দিন, যেদিন তাহাদের জন্য ইবাদত ফরয করা হইয়াছিল। পরে তাহারা এই বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু সেই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হিদায়াত দান করিয়াছেন। কাজেই এই ব্যাপারে লোকেরা আমাদের পশ্চাৎবর্তী। ইয়াহূদীদের সম্মানিত দিন হইল আগামী কাল (শনিবার) এবং খৃষ্টানদের আগামী পরশু (রববার) (বুখারী, ফাতহুল বারী, ২খ., হাদীছ নং ৮৭৬, পৃ. ৮৫৫)।

আবূ হুরায়রা ও হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে জুমু'আর ব্যাপারে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ইয়াহূদীদের সম্মানিত দিন হইল শনিবার। আর খৃষ্টানদের সম্মানিত দিন হইল রবিবার। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জুমু'আর দিনের ব্যাপারে সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুত জুমু'আর দিন, শনিবার ও রবিবার তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিন তাহারা সকলেই হইবে আমাদের পশ্চাদ্বর্তী। দুনিয়াতে আমরা সর্বশেষ উম্মত, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা হইব অগ্রবর্তী। সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে এই উম্মতের হিসাব গ্রহণ করা হইবে এবং তাহাদের বিচার হইবে সবার আগে (মুসলিম, হাদীছ নং ১৯৮২/২২/৮৫৬)।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) বলিয়াছেন ঃ আমরা সর্বশেষ উম্মত। তবে আমাদের হিসাব হইবে সর্বাগ্রে। বলা হইবে, কোথায় উম্মী নবী এবং কোথায় তাঁহার উম্মত? সুতরাং সৃষ্টির দিক হইতে আমরা সর্বশেষ; কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের দিক হইতে অগ্রবর্তী (ইব্ন মাজা, হাদীছ নং ৪২৯০; আল্লামা বূসীরী (র) যাওয়াইদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, হাদীছটির সনদ সহীহ এবং রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। আলবানীও হাদীছটি সহীহ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, সহীহ্ আল-জামিউস সাগীর, হাদীছ নং ৬৬২৫)।

দ্বিতীয় ভাগ

এমন সব বিষয়াদি যাহা একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বৈশিষ্ট্য; তাহাতে উম্মতের অংশীদারিত্ব নাই

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বহু মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, যাহা কেবল মাত্র তাঁহারই বৈশিষ্ট্য, ইহাতে উম্মতের কোন অংশীদারিত্ব নাই। অবশ্য অন্য কোন নবী-রাসূলের মধ্যে এই জাতীয় বিষয়াদি পাওয়া অসমীচীন নয়। উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি হইল কবিতা শিক্ষা করা ও যাকাতের মাল ভোগ করা। এইগুলি তাঁহার জন্য হারাম। নবী কারীম (স)-এর জন্য সওমে বিসাল জায়েয ছিল। এমনিভাবে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করাও তাঁহার জন্য জায়েয ছিল। তাঁহার স্ত্রীগণ উম্মতের জন্য মাতৃতুল্য। আর তাঁহার স্বপ্ন সত্য। আলিমগণ এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহকে চারভাগে বিন্যাস করিয়াছেন।

১. এমন কতিপয় বিষয়, যাহা একমাত্র তাঁহার জন্য হারাম, অন্য কাহারও জন্য হারাম নয়। বস্তুত নবী (স)-এর সম্মানার্থেই এই বিধান প্রদান করা হইয়াছে।

২. এমন কতিপয় বিষয়, যাহা কেবল তাঁহার জন্য জায়েয, অন্য কাহারও জন্য জায়েয নয়।

৩. এমন কতিপয় কাজ, যাহা কেবল তাঁহার উপর ওয়াজিব, অন্য কাহারও উপর নয়। ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য, তাঁহার মর্যাদা বাড়াইয়া দেওয়া।

৪. এমন ফযীলাত ও মর্যাদা, যাহা কেবল তাঁহারই বৈশিষ্ট্য, অন্য কাহারও নয়। নিম্নে অত্যন্ত সংক্ষেপে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

প্রথম প্রকার ঃ এমন কতিপয় বিষয়, যাহা কেবল নবী (স)-এর জন্য হারাম; অন্যের জন্য হারাম নয়

১. সাদাকা (যাকাত ও মানত) ঃ সাদাকা ভোগ ব্যবহার করা নবী কারীম (স)-এর জন্য হারাম। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هى اوساخ الناس.

"সাদাকা ভোগ-ব্যবহার করা মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য হালাল নয়। ইহা তো মানুষের সম্পদের ময়লা" (মুসলিম, হাদীছ নং ২৪৭৩/১৬১/১০৬৯-২৪৮১/১৬৭/১০৭২)। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হাদিয়া গ্রহণ করিতেন; কিন্তু সাদাকা গ্রহণ করিতেন না (মুসলিম, হাদীছ নং ২৪৯১/১৭৫/১০৭৭)।

উপরিউক্ত হাদীছসমূহ ব্যাপক অর্থে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ফরয ও নফল সাদাকার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়, উভয় প্রকার সাদাকাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য হারাম ছিল।

হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী (র) বলেন, একাধিক আলিম এই বিষয়ে ইজমা নকল করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আল্লামা খাত্তাবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ফাতহুল বারী, ৩খ., পৃ. ৪১৫)।

আল্লামা নববী (র) বলেন, নফল সাদাকা গ্রহণ করার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র) হইতে তিন ধরনের মত বর্ণিত হইয়াছে। বিশুদ্ধতম মতে, এই জাতীয় সাদাকাও নবী কারীম (স)-এর জন্য হারাম (শারহুন নাবাবী আলা সাহীহ মুসলিম, ৭খ., পৃ. ১৭৬)।

আলিমগণের মতে সাদাকা ভক্ষণ হারাম হওয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য সাদাকা হারাম হওয়ার পিছনে তাৎপর্য হইল, মানুষের মালের ময়লা হইতে নবী (স) ও তাঁহার পদমর্যাদাকে পাক-পবিত্র রাখা। আর পরিবারবর্গের নিসবত বা সম্পর্ক যেহেতু তাঁহারই দিকে হয়, তাই তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে তাঁহাদেরকেও তাঁহার অনুগামী হিসাবে এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে (ফুসূল, আল্লামা ইব্ন কাছীর, পৃ. ৩১৫; গায়াতুস সুউল, ইব্নুল মুলাক্কিন, পৃ. ১৮৭; ফাতহুল বারী, ৩খ., পৃ. ৪১৫; খাসাইসুল কুবরা, আল্লামা সুয়ূতী, ৩খ., ৪০৪ ইত্যাদি)।

(দুই) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে যে মহিলা আগ্রহী নয়, তাহাকে আটক রাখা সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল, কোন মহিলা যদি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করে এবং বিচ্ছেদ অবলম্বন করা পসন্দ করে, তবে তাহাকে আটক রাখা তাঁহার জন্য হারাম। কিন্তু উম্মতের বিষয়টি ইহার ব্যতিক্রম। অর্থাৎ কোন মহিলা যদি তাহার স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায় তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীছে ইহার সুস্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, জাওন কন্যাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পেশ করার পর তিনি তাহার নিকটবর্তী হইলে সে বলিল, আমি আপনার হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তখন তিনি তাঁহাকে বলেন, তুমি মহান সত্তার আশ্রয় চাহিয়াছ; কাজেই তুমি তোমার বাপের বাড়িতে চলিয়া যাও (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৯খ., কিতাবুত-তালাক বাব ৩, হাদীছ নং ৫২৫৪)।

ইব্নুল মুলাক্কিন এই হাদীছ উল্লেখ করার পর বলেন, ইহাতে বুঝা যায়, যে মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংসর্গ লাভের ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাহাকে বিবাহ করা তাঁহার জন্য হারাম। আর এমনটি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ ইহাতে নবীকে কষ্ট দেওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়।

(তিন) সামরিক পোশাক ত্যাগ না করা

নবী কারীম (স) এবং অপরাপর সমস্ত নবীগণের উপর হারাম ছিল—যুদ্ধের লেবাস পরিধান করার পর (যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত) তাহা খুলিয়া রাখা।

জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) উহুদ যুদ্ধের দিন বলিলেন, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি মযবুত লেবাস দ্বারা আবৃত আছি। আর আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, গরু যবেহ করা হইয়াছে। আমার মতে ইহার ব্যাখ্যা হইল, মযবুত লেবাস দ্বারা মদীনা এবং গরু যবেহ করা দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের শাহাদাতকে বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ্র শপথ! ইহার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। রাবী বলেন, তাহারপর নবী কারীম (স) তাঁহার সাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমাদের জন্য মদীনায় অবস্থান করাই উত্তম। যদি তাহারা মদীনায় প্রবেশ করে, তবে আমরা তাহাদের সাথে লড়াই করিব। তখন সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহিলী যুগেও তো কেহ মদীনায় প্রবেশ করিয়া আমাদের উপর হামলা করার সাহস করে নাই। কাজেই ইসলাম গ্রহণের পর এমনটি কেমন করিয়া হইতে পারে? তাঁহাদের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহা হইলে তোমাদের অবস্থা সম্বন্ধে তোমরাই ভাল বুঝ।

এই বলিয়া তিনি রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। তখন আনসার সাহাবীগণ বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর রায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছি (ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে)? এই বলিয়া তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার রায়ই যথাযথ। আমাদের রায় ঠিক নয়। তিনি বলিলেন, যুদ্ধের লেবাস পরিধান করার পর লড়াই না করিয়া তাহা খুলিয়া ফেলা কোন নবীর জন্য সমীচীন নয় (মুসনাদে আহ্মাদ, ৩খ., পৃ. ৩৫১; তাবাকাতুল কুবরা, ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৪৫; দারিমী, হাদীছ নং ২১৬৫; হাফিয ইব্ন হাজার-এর মতে হাদীছটি সহীহ, ফাতহুল বারী, ১১খ., পৃ. ৩৫৩; বুখারী, ফাতহুল বারী ১৩খ., পৃ. ৩৫১; মুসলিম, হাদীছ নং ৫৯৩৪/২০/২২৭২)।

হাফিয ইব্ন কাছীর বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে, যুদ্ধের লেবাস পরিধান করার পর নবীর জন্য যুদ্ধ করা ওয়াজিব, লড়াই না করিয়া লেবাস খুলিয়া ফেলা হারাম (ফুসূল, পৃ. ৩৩৮)।

(চার) চোখের খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা)

গোপন চাহনি অর্থাৎ মুখের কথা বা অবস্থার দ্বারা যাহা বুঝানো কিংবা প্রকাশ করা হয়, ইহার বিপরীতে চোখ দ্বারা কাহাকেও হত্যা বা প্রহার করার জন্য ইশারা করা। নাজায়েয কোন কাজ না হইলে রাসূলুল্লাহ (স) ছাড়া অন্য মানুষের জন্য তাহা হারাম নয়। রাফিঈ অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৪১৫)।

আল্লামা খাত্তাবীর মতে, চোখের খিয়ানত অর্থ মুখে যাহা মানুষের সামনে প্রকাশ করা হয়; হৃদয়ে ইহার বিপরীত ধারণা পোষণ করা এবং যবান সংযত রাখিয়া হৃদয়ের ঐ কাজের প্রতি ইশারা করাকে খিয়ানত বলে। আর এই খিয়ানত যেহেতু চোখের দ্বারা হয়, তাই ইহাকে চোখের খিয়ানত বলে (হাশিয়াতুস সিন্ধী আলা সুনানিন্ নাসাঈ, ৭খ., পৃ. ১০৬)।

মুখের কথার দ্বারা যাহা প্রকাশ করা হয়, চোখের দ্বারা ইহার বিপরীত কাজের প্রতি ইংগিত করা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য জায়েয নয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী সারহ (রা)-এর হাদীছে এই মতের সমর্থনে স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন

রাসূলুল্লাহ (স) যাহাদেরকে সাধারণ হত্যার ঘোষণা দেন, তিনিও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উছমান ইব্ন আফফান (রা) তাহার দুধ ভাই ছিলেন। তিনি তাহার নিকট গিয়া আত্মগোপন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) যখন লোকদেরকে বায়আতের জন্য ডাকেন, তখন উছমান (রা) তাহাকে সাথে নিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল্লাহ্র বায়'আত গ্রহণ করুন। তখন তিনি মাথা তুলিয়া তাহার প্রতি তিনবার তাকান এবং প্রত্যেকবারই তাহাকে বায়'আত করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। অবশেষে তিনবারের পর তাহাকে বায়'আত করেন। ইহার পর সাহাবায়ে কিরামের সামনে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এই লোকটিকে বায়'আত না করার জন্য আমি আমার হাতকে সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছি, তাহা দেখা সত্ত্বেও তোমাদের কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাকে হত্যা করিতে পারিলে না? সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মনে কি আছে তাহা তো আমরা জানি না। আপনি আমাদেরকে চোখের ইশারা করিলেন না কেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, চোখের খিয়ানত কোন নবীর জন্য সমীচীন নয় (আবূ দাউদ, হুদূদ, ১ম বাব, নং ৪৩৫৯; নাসাঈ, ৭খ., পৃ. ১০৫-১০৬; মুসতাদরাক হাকেম, ৩খ., পৃ. ৪৫)। ইমাম হাকেম-এর মতে হাদীছটি ইমাম মুসলিম (র)-এর শর্তে উত্তীর্ণ। তবে বুখারী ও মুসলিম ইহা নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃতকরেন নাই। আল্লামা যাহাবীও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন (সুনানুল কুবরা, বায়হাকী, ৭খ., পৃ. ৪০)। হাফিয ইব্ন হাজার (র) তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে বলিয়াছেন, ইহার সনদ সহীহ্ (৩খ., পৃ. ১৩০)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পড়ালেখা সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ.

"তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিবে" (২৯ ঃ ৪৮)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি কুরআন নাযিলের পূর্বে এক দীর্ঘকাল তিনি এমন অবস্থায় অতিক্রম করেন যে, তিনি কিতাব পাঠ করিতে পারিতেন না এবং উত্তমরূপে কোন কিছু লিখিতেও পারিতেন না অর্থাৎ তিনি লেখাপড়া জানিতেন না। বরং আপন-পর সকলেই তাঁহাকে এমন উম্মী হিসাবে জানিতেন, যিনি পাঠ করিতে পারিতেন না এবং লিখিতেও পারিতেন না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই অবস্থার কথা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও বিবৃত হইয়াছে। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ .

"যাহারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তাওরাত ও ইন্জীল, যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাহাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়" (৭ ঃ ১৫৭)।

জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবস্থা এইরূপ ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত এইরূপ থাকিবে। তিনি উত্তমরূপে লিখিতে পারিতেন না এবং লেখা শিক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছাও পোষণ করেন নাই। জীবনে কখনও কিছু নিজ হাতে লিখেন নাই, বরং তাঁহার সামনে সর্বদা লেখকবৃন্দ হাযির থাকিতেন, তাহারা ওহী লিপিবদ্ধ করিতেন এবং বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রেরিতব্য পত্রসমূহ লিখিতেন। উল্লেখ্য যে, এই লিখিতে না পারাটা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষেত্রে কোন দোষের বিষয় নয়, বরং ইহা নবূওয়াতের বিশেষ আলামত। যাহাতে মূর্খ-অজ্ঞ লোকেরা এই বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিতে না পারে যে, তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের উপর নাযিলকৃত কিতাবের ভিত্তিতেই এই কুরআন রচনা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে উম্মী রাখিয়াছেন।

(ছয়) কবিতা শিখা

কবিতা প্রসংঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ.

"আমি তাহাকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার জন্য শোভনীয়ও নয়" (৩৬ ঃ ৬৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) কাব্য ও ছন্দজ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন না। এই বিষয়ে আলিমগণ সকলেই একমত। ইহাও নবূওয়াতের আলামতের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাব্যজ্ঞান শিক্ষা না দেওয়ার পিছনে তাৎপর্য হইল, যাহাতে লোকেরা এই বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ না করে যে, তিনি যেহেতু কাব্যজ্ঞানে পাণ্ডিত্য রাখেন, তাই এই কুরআন রচনা করিয়াছেন।

এ দাবির সমর্থনে একাধিক প্রমাণ রহিয়াছে। ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে যে, হজ্জের মৌসুমে (জাহিলী যুগেও হজ্জের বিধান ছিল) আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা যখন হজ্জ পালনের জন্য মক্কা শরীফ আগমন করিত, তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যাপারে তাহাদেরকে কি বলা হইবে—এই বিষয়ে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা হইল। তাহাদের কেহ বলিল, তখন বিচক্ষণ লোকদের কেহ বলিল, একথা আরবের লোকেরা বিশ্বাস করিবে না। কারণ তাহারা কাব্য ও কবিতা সমস্ত প্রকার ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক অবগত। আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মাদের কোন কথা কবিতার নয় এবং কবিতার সাথে ইহার কোন মিলও নাই।

এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স) কখনও কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন বলিয়াও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন হুনায়ন-এর যুদ্ধের দিন তিনি স্বীয় খচ্চরের পিঠে আরোহিত অবস্থায় শত্রুদের সামনে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

انا النبى لا كذب - انا ابن عبد المطلب

"আমি নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর" (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৭খ., হাদীছ নং ৪৩১৬; মুসলিম, জিহাদ, বাব ২৮, নং ৪৬১৫/৭৮/১৭৭৬)।

একদা পথ চলাকালে পাথরের সাথে আঘাত লাগিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হইয়া যায়। তখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

هل انت الا اصبع دميت – وفى سبيل الله ما لقيت

"তুমি তো কেবল একটি আঙ্গুল, রক্তাক্ত হইয়াছ এবং এসব কিছু একমাত্র আল্লাহ্‌র পথে চলিতে গিয়া হইয়াছ"।

এগুলি কবিতা আবৃত্তির উদ্দেশ্যে তিনি বলেন নাই, বরং অনিচ্ছাকৃতভাবেই এইগুলি তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১০খ., হাদীছ নং ৬১৪৬; মুসলিম, জিহাদ, বাব ৩৯, হাদীছ নং ৪৬৫৪/১১২/১৭৯৬)।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ যে সকল বিষয় কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যই বৈধ, অন্য কাহারও জন্য নয়

সাওমে বিসাল ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মাদ (স)-কে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অন্তরে জ্ঞান ও সহনশীলতা, আকর্ষণীয় চরিত্র শক্তি ও সত্যবাদিতা, স্বভাবে সারল্য ও কোমলতা দান করিয়াছেন, সর্বোপরি বদান্য ও দানশীল ব্যক্তিত্ব করিয়া অভিষিক্ত করিয়াছেন তাঁহাকে। ফলে এই সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাঝে অতিশয় দানশীল, অনুগ্রহপরায়ণ ও মহান প্রশস্ত চিত্তের অধিকারী হিসাবে পরিচিত করিয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"আমি তো আপনাকে কেবল বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি" (২১ ঃ ১০৭)।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ.

"তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে একজন রাসূল আগমন করিয়াছেন। তোমাদেরকে যাহা পীড়া দেয় তাহার কাছে তাহা দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়" (১০ ঃ ১২৮)।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনীত শরীয়াত সকল প্রকার সংকীর্ণতা, জটিলতা ও কাঠিন্যমুক্ত হইয়া এমন সহজ, সরল ও সাবলীল বিষয়ের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, যাহা স্থান-কাল ও বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য ও উপযোগী।

আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ হইতে স্বীয় উম্মতের প্রতি পানাহার বর্জন করিয়া লাগাতারভাবে দুই দিন বা ততোধিক দিন পর্যন্ত রোযা পালন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছে। কেননা ইহাতে একদিকে যেমন রোযাদারের অসহ্যকর কষ্ট হয়, অপরদিকে সাওমে বিসালের কারণে অন্যান্য অসুবিধাও দেখা দেয়। তাহা হইল ইবাদতের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হওয়া এবং কোন দীনী দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা দেয়।

কাজেই সাওমে বিসাল কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যই জায়েয ছিল এবং সেটি ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্যস্বরূপ। তাহার উম্মতের জন্য তাহা জায়েয নয় (সাওমে বিসাল ঃ ইফতারের সময় যৎসামান্য পানাহার গ্রহণ করিয়া, অতঃপর দিবা-রাত্রে পানাহার বর্জনপূর্বক একাধারে দুই হইতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত রোযা রাখাকে পরিভাষায় সাওমে বিসাল বা লাগাতার রোযা বলে। এরূপ রোযা পালন করা উম্মতের জন্য নিষিদ্ধ)।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমারা সাওমে বিসাল পালন করিও না। লোকেরা বলিল, আপনি যে সাওমে বিসাল পালন করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাহারও মত নই। আমাকে পানাহার করানো হয় (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৪ খ., হাদীছ নং ১৯৬১; মুসলিম, নং ১১০২; এই মর্মে হযরত ইব্ন উমার (রা)-এর বর্ণিত হাদীছ।

হযরত আইশা (রা) বলেন, লোকদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সাওমে বিসালের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করিয়াছেন। লোকেরা বলিল, আপনি তো সাওমে বিসাল পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়, আমাকে তো আমার রব আহার্য দেন এবং পান করান, (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৪খ., নং ১৯৬৪; মুসলিম, নং ১১০৫)।

আল্লামা নববী (র) বলেন, 'আহার্য দেন এবং পান করান'-এর অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মাঝে পানাহার গ্রহণকারীর শক্তি ও ক্ষমতা সৃষ্টি করিয়া দেন। কাহারও মতে, শব্দটি আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মানার্থে জান্নাত হইতে তাঁহার জন্য খাবার পরিবেশন করিতেন। এই দুইটি ব্যাখ্যার মাঝে প্রথমটিই সঠিক। কেননা তিনি যদি বাস্তবেই কিছু আহার করিয়া থাকেন তাহা হইল তাঁহাকে সাওমে বিসাল পালনকারী বলা যায় না (শারহুন নাবাবী, ৭ খ., পৃ. ২১২-২১৩)। আল্লামা ইব্ন হাজার (র) বলেন, উল্লিখিত হাদীছসমূহ দ্বারা এই বিষয়ে দলীল পেশ করা হইয়াছে যে, সাওমে বিসাল রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি বৈশিষ্ট্য এবং সাওমে বিসাল ব্যতীত এভাবে পানাহার পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য রোযা পালন করাও নিষিদ্ধ। তবে যে সকল বর্ণনায় অনুমতির কথা বলা হইয়াছে সেই সকল বর্ণনার মর্ম হইল, পরবর্তী সাহরী পর্যন্ত বিসাল বা রোযাকে প্রলম্বিত করার অনুমতি আছে (ফাতহুল বারী, ৪/২৪০)।

আল্লামা নববী (র) বলেন, খাত্তাবী এবং আমাদের অন্যান্য ফাকীহগণ বলিয়াছেন, সাওমে বিসাল এমন একটি বৈশিষ্ট্য যাহা কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যই বৈধ করা হইয়াছে এবং উম্মতের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (শারহুন নাবাবী, ৭খ., ২১২)।

(দুই) অভিভাবক ও সাক্ষী ব্যতিরেকে বিবাহ বন্ধন

ইসলামে পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই পারিবারিক ব্যবস্থা ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তি। পরিবারের সমন্বয়েই সৃষ্টি হয় সমাজ এবং এই পারিবারিক

ব্যবস্থার উপরই সমাজের স্থিতি ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। পরিবার ভাল হইলে সমাজও ভাল হইবে। পক্ষান্তরে পারিবারিক অশান্তি সামাজিক ধ্বংসকে অনিবার্য করিয়া তোলে। আর পরিবার গঠন ও মানুষের বংশধারা সংরক্ষণের একমাত্র বৈধ উপায় হইল এই বিবাহ প্রথা। তাই ইসলাম বিবাহ প্রথার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে এবং ইহার প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করিয়াছে। এই সকল বিধানের একটি হইল, বরের সঙ্গে কনের অভিভাবকের মতৈক্যে উপনীত হওয়া। বিবাহ বন্ধন সঠিক হওয়ার জন্য এইরূপ মতৈক্যে উপনীত হওয়া শর্ত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহই শুদ্ধ হইবে না (আবূ দাউদ, নং ২০৮৫; তিরমিযী; ইব্ন মাজা, নং ১৮৮১; মুসনাদে আহমাদ, ৪/৪১৩-৪১৮; হাকেম, ২/১৬৯; বায়হাকী, ৭/১০৭; সহীহ জামে সাগীর, নং ৭৪৩১; জামি' উসূল, ১১/৪৫৭)।

বস্তুত বিবাহ বন্ধন কেবল মেয়েকেই নয়, বরং তাহার পরিবার এবং অভিভাবককেও চিন্তাযুক্ত করে এবং তাহার ভুল নির্বাচনের জন্য যে ক্ষতি হয় পরিণামে তাহা তাহার পরিবারকেও স্পর্শ করে। আর পরিবারের প্রধান হইল, তাহার অভিভাবক। যেমন পিতা ও ভাই। কাজেই মেয়ের স্বামীর ব্যাপারে অভিভাবকের স্পষ্ট মতামত থাকিতে হইব।

বিবাহ সঠিক হওয়ার জন্য যেমন মেয়ের অভিভাবকের সম্মতি আবশ্যক, তদ্রূপ বিবাহবন্ধনের সময় সাক্ষীর উপস্থিতিও অপরিহার্য শর্ত যাহাতে বিবাহ বন্ধন সম্পর্কে জানা যায় ও তাহা প্রচার পায় এবং মেয়ের অধিকার সংরক্ষিত হয় ও বিবাদ হইতে নিরাপদ থাকা যায়। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ "অভিভাবক এবং দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া কোন বিবাহ শুদ্ধ হইবে না" (সুনানুল কুবরা, ৭/১২৫, তাবারানী কৃত আল-কাবীর, ১৮/১৪২, নং ২৯৯; দারা কুতনী, ৩/২২৫; ইরওয়াউল গালীলা, ৬/২৫৮-২৬০; সহীহ জামে সাগীর, নং ৭৪৩৩-৭৪৩৪)।

কিন্তু এই দুইটি বিধানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় উম্মত হইতে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের কারণে অভিভাবক ও সাক্ষী ছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাঁহার জন্য বিবাহ বন্ধনকে বৈধ করিয়াছিলেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োজন ছিল না।

আলিমগণ বলিয়াছেন, উম্মাহ্র সদস্যগণের বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের শর্ত আরোপ করার কারণ ছিল পারিবারিক সমতা সংরক্ষণ। আর রাসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রকার কৌলীন্যের উর্ধ্বে। অনুরূপ সাক্ষীর শর্ত আরোপ করার কারণ ছিল বিবাদ হইতে নিরাপদ থাকা। আর রাসূলুল্লাহ (স) এমন এক সত্তা যাঁহার ব্যাপারে বিবাদের কোন আশংকা ছিল না। উল্লিখিত এই স্বতন্ত্র বিধানের দলীল হইল হযরত যয়নাব বিনতে জাহ্শ (রা) বর্ণিত হাদীছ। হযরত যয়নাব বিনতে জাহ্শ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যান্য সহধর্মিণীগণের সামনে গর্ব করিয়া বলিতেন, তোমাদের বিবাহ তোমাদের পরিবারের লোকেরা সম্পন্ন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমার বিবাহ

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশের উপরে সম্পন্ন করিয়াছেন (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১৩ খ., নং ৭৪৩০)।

ইমাম নববী (র) মুসলিম শরীফের হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কোন স্ত্রীর ব্যাপারে অধিক উত্তমভাবে ওলীমা (বিবাহ উত্তর আপ্যায়ন) করেন নাই, যতখানি হযরত যয়নাব (রা)-এর ব্যাপারে করিয়াছেন।

ইমাম নববী বলেন, সম্ভবত ইহার কারণ এই যে, কোন অভিভাবক ও সাক্ষী-সাবুদ ব্যতীত ওহীর মাধ্যমে হযরত যয়নাব (রা)-এর সঙ্গে তাঁহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া আল্লাহ তাঁহার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন ইহা ছিল তাহারই শুকরিয়াস্বরূপ। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীদের অবস্থা ছিল ইহার ব্যতিক্রম। বস্তুত এই ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ ও সঠিক অভিমত হইল, কোন সাক্ষী ও অভিভাবক ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সংগত ছিল। কেননা তাঁহার বেলায় ইহার কোন প্রয়োজন নাই (শারহুল নাবাবী, ৯/২২৯-২৩০)।

(তিন) একই সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের জন্য বিবাহ প্রথাকে বৈধ করিয়াছেন। এই বিবাহ প্রথায় বিরাট উপকারিতা ও গূঢ় তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে। যেমন মানুষের বংশধারা অব্যাহত রাখা, শয়তানের প্ররোচনা হইতে নিরাপদ থাকা, কাম-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রতিহত করা, দৃষ্টি সংযত রাখা ও লজ্জাস্থানের হিফাজত করা, আল্লাহর অনুমোদিত পন্থায় মানসিক তৃপ্তি ও সুখ ভোগ করা যাহাতে ইবাদতের শক্তি ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা মনের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা যায়, পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা, হালাল জীবিকা অর্জনে ব্রতী হওয়া, সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষার ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া ইত্যাদি উপকারিতা ও তাৎপর্য ইহাতে নিহিত আছে।

কিন্তু বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে শরী'আতের দলীলসমূহ সাধারণ মুসলমানদের জন্য একই সঙ্গে কেবল চারজন স্ত্রী রাখাকে বৈধ করিয়াছে। চারের অধিককে নিষিদ্ধ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ.

"তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার। আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করিতে পারিবে না তবে একজনকে অথবা তোমার অধিকারভুক্ত দাসীকে" (৪ ঃ ৩)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও জমহূর আলিমগণ বলেন, উল্লিখিত আয়াত যে স্থলে নাযিল হইয়াছে সেই স্থলটি হইল দয়া প্রদর্শন ও বৈধতাদানের স্থল। সুতরাং একই সঙ্গে চারের

অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ হইলে তাহা অবশ্যই এখানে উল্লেখ করা হইত (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ১/৪৬০)।

হযরত গায়লান ইব্‌ন সালামা আস-ছাকাফী যে সময় ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁহার অধীনে দশজন স্ত্রী ছিল, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তাহাদের মধ্যে চারজনকে গ্রহণ কর (আবূ দাঊদ, নং ২২৪১; তিরমিযী, নং ১১২৮; ইব্‌ন মাজা, নং ১৯৫৩; মুসনাদে আহমাদ, ২/১৪; ইব্‌ন কাছীর বলেন, আহমাদের সনদটি শায়খায়নের শর্ত অনুযায়ী হইয়াছে; তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ১/৪৬১; মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪খ., নং ২২৩)।

ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ (যাহা আল্লাহ্‌র বাণীর ব্যাখ্যাস্বরূপ) হইতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য একত্রে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ নয়।

হাফেজ ইব্‌ন কাছীর বলেন, "শাফি'ঈ (র)-এর কথিত উক্তির প্রতি আলিমগণের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে" (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ১/৪৬০)। সুতরাং উল্লিখিত বিধানটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি বৈশিষ্ট্য যাহা দ্বারা তিনি উম্মাহর অন্যান্য লোকদের তুলনায় স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন। আলিমগণ এই ব্যাপারে একমত যে, ইন্তিকালের সময় রাসূলুল্লাহ (স) নয়জন স্ত্রী রাখিয়া যান। তাঁহারা হইলন (১) সাওদা বিনতে যাম'আহ কুরাশিয়া, (২) আইশা বিনতে আবূ বকর কুরাশিয়া, (৩) উম্মু সালামা হিন্দ বিনতে আবী উমায়্যা কুরাশিয়া, (৪) হাফসা বিনতে উমার কুরাশিয়া, (৫) যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ আসাদিয়া, (৬) জুওয়ায়রিয়া বিনতুল হারিছ মুসতালিকিয়া, (৭) উম্মু হাবীবা রামলা বিনতে আবূ সুফ্‌য়ান কুরাশিয়া, (৮) সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই নাদীরিয়া এবং (৯) মায়মূনা বিনতুল হারিছ হিলালিয়া (রা)।

রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক অধিক স্ত্রী গ্রহণের তাৎপর্য

হাফেজ ইব্‌ন হাজার বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বহু বিবাহের তাৎপর্য সম্পর্কে মনীষিগণ যে সকল মতামত পেশ করিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পরিস্ফুটিত হইয়া উঠে।

(এক) রাসূলুল্লাহ (স)-এর একান্ত গোপনীয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থা প্রত্যক্ষকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। তিনি যাদুকর বা এই ধরনের কিছু বলিয়া মুশরিকরা অহেতুক ধারণা করিত, ইহার যেন অবসান ঘটে।

(দুই) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের সুবাদে আরব গোত্রসমূহের সম্মান বৃদ্ধি পাওয়া।

(তিন) ইহার মাধ্যমে তাহাদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করা।

(চার) দায়িত্ব পালনে কষ্টক্লেশ বৃদ্ধি করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর এইরূপ কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল যে, স্ত্রীদের কাহারও প্রতি তাঁহার ভালবাসা যেন উত্তমরূপে দীনের প্রচারকার্য হইতে তাঁহাকে বিরত না রাখে।

(পাঁচ) স্ত্রীদের হইতে অধিক পরিমাণে তাঁহার বংশের বিস্তার লাভ করা, যাহাতে শত্রুর মুকাবিলায় তাঁহার সাহায্যকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(ছয়) পুরুষদের পক্ষে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয় শরী'আতের এরূপ বিধান প্রকাশ করা। কেননা স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণত এমন ঘটনা ঘটিয়া থাকে যাহা গোপন থাকাই বাঞ্ছনীয়।

(সাত) প্রশংসনীয় অপ্রকাশ্য চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া। হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) এমন এক সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন, স্বয়ং তাঁহার পিতা যখন তাঁহাকে জানী দুশমন হিসাবে ভাবিয়াছিল। অনুরূপ হযরত সাফিয়্যা (রা)-কে বিবাহ করেন তাঁহার পিতা, চাচা ও স্বামী নিহত হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যদি চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা না থাকিত, তাহা হইল অবশ্যই তাঁহারা তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন; বরং বাস্তব সত্য হইল, তিনি তাঁহাদের কাছে তাহাদের পরিবার-পরিজনের চাইতেও অতিশয় প্রিয় ছিলেন।

(আট) নারীদের পবিত্রতা সংরক্ষণ ও তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

(চার) নিরাপত্তার নগরী মক্কায় যুদ্ধ অনুষ্ঠান

আল্লাহ তা'আলা উম্মুল কু'রা তথা সম্মানিত নগর মক্কাকে বিশেষ মর্যাদায় মহিমান্বিত করিয়াছেন। তিনি এই নগরীর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্ব দানের মাধ্যমে ইহাকে নির্বাচিত করিয়াছেন। পৃথিবীর অন্য কোন শহর এতখানি গুরুত্ব পায় নাই যতখানি গুরুত্ব পাইয়াছে এই মক্কা নগরী। এই গুরুত্বের নিদর্শন এই যে, তাহাতে পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘর কা'বা অবস্থিত।

এই কা'বা পৃথিবীর প্রথম ঘর যাহা মানুষের ইবাদত ও কুরবানীর জন্য নির্মিত হইয়াছে। লোকেরা তাহা তাওয়াফ করে এবং সেদিকে ফিরিয়া নামায আদায় করে ও তাহার নিকট অবস্থান করে। তাহাতে প্রবেশকারীরা নিরাপদ থাকে। তিনি ইহাকে মানুষের নিরাপদ ঠিকানারূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বৎসর পরিক্রমায় পৃথিবীর নানা অঞ্চল হইতে লোকের তাহাতে ছুটিয়া আসে। তাহার যিয়ারতে আকাঙ্ক্ষা কখনও ফুরায় না; বরং যতবার তাহার যিয়ারত নসীব হয় ততই তাহার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

তাহাকে দেখিয়া ফিরেনা তো চোখ
বারে বারে অতৃপ্ত দৃষ্টি শুধু সুখ।

কত কা'বা প্রেমিক কা'বাপ্রেমে তাহাদের জানমাল বিসর্জন দিয়াছে, কত প্রেমিক নিজ পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও স্বদেশভূমি ত্যাগ করিয়াছে। আল্লাহ কা'বা অঙ্গনকে তাঁহার প্রিয় বান্দাদের ইবাদতগাহে পরিণত করিয়াছেন। কা'বার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করাকে বাধ্যতামূলক করিয়া দিয়াছেন এবং ইহাকে ইসলামের একটি আবশ্যক কাজ হিসাবে সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি ইহাকে সকল জনপদের মূল বা জননীরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। সুতরাং পৃথিবীর বাকী জনপদগুলি ইহার অধীন ও শাখা। ইহার সমকক্ষ অন্য কোন জনপদ নাই। এই জনপদ একটি

সম্মানিত জনপদ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির সূচনালগ্নেই আল্লাহ ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। কাজেই ইত্যাকার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের কারণে তাহাতে কোনরূপ হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করা অবৈধ ও নিষিদ্ধ (যাদুল মা'আদ, ১ খ., পৃ. ৪৬-৫১, সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত)।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবী (স)-এর ব্যাপারে বিজয়ের বৎসর মক্কা মুকাররামাকে এক দিনের জন্য হালাল করিয়া দেন। সেদিন তিনি ইহ্রামবিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন এবং মক্কার প্রায় বিশজন অধিবাসীকে হত্যা করেন। এই ঘটনা ছিল তাঁহার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যস্বরূপ এবং একাধিক বিশুদ্ধ হাদীছও এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। এগুলির মধ্যে সেদিন প্রথম প্রহরে তিনি যে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও শামিল রহিয়াছে। উক্ত ভাষণে তাঁহার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহ মক্কাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, লোকেরা নয়। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহাতে রক্তপাত সংঘটিত করা এবং তাহার বৃক্ষরাজি কর্তন করা বৈধ নয়। এখন কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক রক্ত প্রবাহিত করার অজুহাতে ইহার সুযোগ নিতে চাহিলে তোমরা তাহাকে বলিয়া দিও, আল্লাহ তা'আলা কেবল তাঁহার রাসূল মুহাম্মাদ (স)-কেই ইহার অনুমতি দিয়াছিলেন, তোমাদেরকে নয়। বস্তুত আমাকে কেবল এক দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। তাহার পর তাহার নিষিদ্ধাবস্থাটি পূর্ববর্তী দিনের ন্যায় পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। যাহারা উপস্থিত তাহারা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছাইয়া দেয় (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৪ খ., নং ১৮৩২; মুসলিম, নং ১৩৫৪)।

তৃতীয় প্রকার ঃ যে সকল বিষয় কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর আবশ্যকীয় ছিল, অন্য কাহারও উপর নয়।

এতদ্বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষত্ব লাভের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্র নৈকট্যের গভীরতা ও তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি। আলোচ্য বিষয়ে আলিমগণ বহু উদাহরণ পেশ করিয়াছেন। যেমন, দিনের প্রথম প্রহরে নামায পড়া, রাত্রি জাগরণ, মিসওয়াক, কুরবানী ও সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করার আবশ্যকতা ইত্যাদি। কিন্তু এই বিষয়ে যতগুলি উদাহরণ পেশ করা হইয়া থাকে অথবা তাহার অধিকাংশ সম্পর্কেই প্রমাণাদির বৈপরীত্বের কারণে মনীষিগণ ঐকমত্যে উপনীত হইতে পারেন নাই।

এই কারণে আমরা উক্ত বিষয়ের আলোচনায় বিরত থাকিয়াছি এবং মনীষীদের উল্লেখকৃত কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়াই বিষয়টি পরিত্যাগ করিয়াছি (ইব্ন কাছীর কৃত "আল-ফুসূল" পৃ. ৩০৭-৩১১; ইব্নুল মুলুক্কিনকৃত" যামায়িদু আফদালুল মাখলূকীন, পৃ.১০২-১০৮; রিসালাত মাজিস্তার ও সুয়ূতীকৃত খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ.৩৯৬-৪০৪)।

চতুর্থ প্রকার ঃ মর্যাদা ও মহত্ত্বে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বৈশিষ্ট্য

(এক) কথা ও কাজে নিষ্পাপ

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কথা ও কাজে নিষ্পাপ ছিলেন। রিসালাত সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে তাঁহার দ্বারা কোন প্রকার বিচ্যুতি ঘটা ছিল অসম্ভব। ইজতিহাদগত কোন ত্রুটি হওয়ামাত্র তাহা শোধরানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াহী নাযিল হইত। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى.

"শপথ নক্ষত্রের, যখন উহা হয় অস্তমিত, তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়, এবং সে মনগড়া কথাও বলে না" (৫৩ ঃ ১-৪)।

এই নিষ্পাপ ও নির্ভুল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সকল নবী-রাসূলই শরীক। ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত উম্মতের অবস্থা ইহার ব্যতিক্রম (অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে তাহাদের ত্রুটি হইতে পারে)। তবে সমষ্টিগতভাবে কোন বিষয়ে সকলে ঐকমত্যে উপনীত হইলে সেখানে ভুল হইতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর ঐকমত্য হওয়া হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছেন। কা'ব ইব্ন মালিক আল-আশ'আরী এবং আরেকটি স্বতন্ত্র বর্ণনায় আনাস ইব্ন মালিক (রা) ইব্ন আবূ আসিম "আস-সুন্নাহ" গ্রন্থে হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়াছেন (১খৃ., ২১, নং ৭৯) । একাধিক সনদ উল্লেখ করার পর আলবানী এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলেন, সমষ্টিগতভাবে এই সমস্ত সনদগুলি হাসান পর্যায়ের আল আহাদীছিস-সিলসিলাতুস সাহীহ, নং ১৩৩১; জামে সাগীর, নং ১৭৮২)।

(দুই) রাসূলুল্লাহ (স)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা অথবা তাঁহাকে গালি দেয়া কুফরী

উম্মতের উপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে সকল অধিকার অবধারিত এবং তিনি যে মর্যাদা, সম্ভ্রম ও গৌরবের অধিকারী—কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা ইত্যাকার শরঈ দলীল দ্বারা তাহা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে তাঁহাকে কষ্ট দেয়াকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং উম্মত তাঁহার ছিদ্রান্বেষণকারী ও তাঁহার প্রতি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণকারীর মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করিয়াছে। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

"যাহারা আল্লাহ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ তো তাহাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি" (৩৩ ঃ ৫৭)।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"যাহারা আল্লাহ্র রাসূলকে ক্লেশ দেয় তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি" (৯ ঃ ৬১)।

সুতরাং যে কেহ রাসূলুল্লাহ (স)-কে হেয় প্রতিপন্ন করে, তাঁহাকে গালি দেয়, তাঁহার দোষ চর্চা করে অথবা তাঁহার সত্তা, তাঁহার বংশধারা, তাঁহার দীন ও তাঁহার চরিত্রে কালিমা লেপন করে অথবা তিরস্কৃত ও নিন্দনীয় করিয়া তাঁহার মর্যাদা খাটো করে, তাঁহার প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তাঁহার দোষ সাব্যস্ত করার জন্য কোন কিছুর সঙ্গে তাঁহাকে উপমা দেয়, এই ধরনের কুফরীর কারণে তাহাকে হত্যা করা হইবে। এই বিষয়ে একাধিক দলীল বিদ্যমান। নিম্নে ইহার কয়েকটি পেশ করা হইল।

আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক অন্ধ লোকের একটি উম্মু-ওয়ালাদ (সন্তানদায়িনী বাঁদী) ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে গালমন্দ করিত। অন্ধ লোকটি তাহাকে নিষেধ করিত এবং শাসাইত। এতদসত্ত্বেও সে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইত না এবং তাহার শাসন মানিত না। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এক রাত্রে বাঁদীটি রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার ও তাঁহার শানে গাল-মন্দ করে। অন্ধ লোকটি একটি ছুরি দিয়া বাঁদীর পেটে চাপ দেয় এবং তাহাকে হত্যা করে। নিহত হওয়ার পর তাহার পায়ের কাছে একটি শিশু পতিত হইয়া সে রক্তাপ্লুত হয়। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ঘটনার কথা আলোচিত হইলে সেখানে লোকেরা সমবেত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র শপথ দিতেছি যে, সে যাহা করিয়াছে তাহার উপর আমার অধিকার রহিয়াছে। সে আমার সম্মুখে আসুক। অন্ধ লোকটি দণ্ডায়মান হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে লোকদেরকে পিছনে ফেলিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়ে এবং সে আরয করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহার সঙ্গী ছিলাম। সে আপনাকে গালমন্দ করিত এবং আপনার সম্পর্কে অশ্লীল কথা বলিত। এজন্য আমি তাহাকে বারণ করিতাম এবং শাসাইতাম। কিন্তু সে আমার শাসন মানিত না এবং গালমন্দ করা হইতে নিবৃত্তও হইত না। তাহার গর্ভে আমার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে যেন দুইটি মোতির টুকরা। সে ছিল আমার অনুরক্তা। যাহা হউক, সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেই সে আপনাকে গালমন্দ ও অশ্লীল কথা বলা শুরু করে। তখন আমি একটি ছুরি লইয়া তাহার পেটে স্থাপন করিয়া চাপ দেই। এভাবে আমি তাহাকে হত্যা করি। লোকটির বক্তব্য শোনার পর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, লোকসকল! তোমরা সাক্ষী থাক, নিহতের রক্ত মূল্যহীন (আবূ দাঊদ, হুদূদ, বাব ২, নং ৪৩৬১; নাসাঈ, ৭খ., পৃ. ১০৭-৮; আলবানী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন; সহীহ, নং ৩৬৬৬)।

ইমাম আবূ দাঊদ ও নাসাঈ আবূ বারযা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি জনৈক ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাহা চরম আকার ধারণ করে। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা ! আপনি অনুমতি দিন, তাহার ঘাড় উড়াইয়া দেই। আবূ বারযা (রা) বলেন, আমার কথায় তাঁহার রাগ তিরোহিত হইয়া যায়। ইহার পর গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান করিয়া তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠান এবং

জিজ্ঞাসা করেন, একটু আগে কি যেন বলিয়াছিলে ? আমি বলিলাম, " অনুমতি দিন তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই"। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অনুমতি দিলে তুমি কি তাহা করিতে পারিবে ? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, না। আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মাদ (স)-এর পর অন্য কোন মানুষের জন্য তাহা বৈধ নয় (আবূ দাউদ, নং ৪৩৬৩; নাসাঈ, ৭খ., পৃ. ১০৯)।

ইমাম ইবন তায়মিয়া (র) বলেন, আবূ দাউদ (র) স্বীয় সুনানে বিশুদ্ধ সনদে হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন (আস্-সারিমুল মাসলূল 'আলা শাতিমির রাসূল, পৃ. ৯২)।

ইজমা ঃ আল্লামা আবূ বক্র ইব্নুল মুনযির বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর গালমন্দকারীর মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে সমস্ত ফকীহ্ ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন (কাযী ইয়ায কৃত আশ-শিফা, ২ খৃ., পৃ. ৪৭৪)।

মুহাম্মাদ ইবন সাহনূন বলেন, আলিমগণ এই ব্যাপারে একমত হইয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর গালমন্দকারী ও তাঁহার ছিদ্রান্বেষণকারী কাফির। তাহার জন্য আল্লাহ্র শাস্তিবিধানের সতর্কবাণী অবধারিত এবং উম্মাতের নিকট তাহার শাস্তি হইল মৃত্যুদণ্ড (কাযী ইয়ায কৃত আশ্-শিফা ২ খৃ., পৃ. ৪৭৬)। ইহা ছাড়া আরও অনেক মনীষী প্রসঙ্গটি আলোচনা প্রসঙ্গে ইজমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(তিন) রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ অন্যের প্রতি মিথ্যা আরোপতুল্য নয়

মিথ্যাচার একটি নিকৃষ্ট আচরণ ও মন্দ অভ্যাস। ইহা একটি নিকৃষ্ট পাপ, গর্হিত দোষ ও ঘৃণিত চরিত্র। মিথ্যা যেখানেই প্রভাব বিস্তার করে সেখানেই উহা বস্তুর মাপকাঠি ওলট-পালট করিয়া সত্যকে মুছিয়া ফেলে এবং সুন্দরকে কুৎসিত করে। মিথ্যাচার ব্যক্তির মনে অনিষ্টের প্ররোচনা দেয় এবং মিথ্যাচারের ফলেই ব্যক্তি পাপ ও কপটতার দিকে ধাবিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মিথ্যাচার পাপের পথ দেখায়, আর পাপ জাহান্নামে নিয়া যায় (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১০ খ., নং ৬০৯৪; মুসলিম, বির/আদাব, বাব ২৯, নং ৬৬৩৭/১০৩/২৬০৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলিয়াছেন, যাহার মাঝে চারটি বিষয় পাওয়া যায় সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যাহার মাঝে এইগুলির যে কোন একটি পাওয়া যায় তাহার মাঝে মুনাফিকের একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যতক্ষণ না সে তাহা পরিহার করে। বিষয়গুলি হইল, তাহার নিকট আমানত রাখা হইলে খিয়ানত করে, কথা বলিলে মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করিলে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং বিবাদ করিলে অশ্রাব্য কথা বলে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১/৩৪; মুসলিম, ৫৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা অন্য কাহারও প্রতি মিথ্যা আরপ করার মত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তাহার ঠিকানা প্রস্তুত করিল (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৩ খ., নং ১২৯১; মুসলিম, নং ৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন, একটি মাত্র বাণী হইলেও আমার পক্ষ হইতে তোমরা তাহা পৌঁছাইয়া দিবে। তোমরা ইসরাঈলীদের হইতে বর্ণনা করিতে পার, ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

আর যে লোক আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তাহার ঠিকানা প্রস্তুত করিল (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৭ খ., নং ৩৭৬৮, নং মুসলিম, ৯১/২৪৪৭)।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি মিথ্যারোপকারীর প্রতি জাহান্নামের সাবধান বাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে একাধিক ও অকাট্য সূত্রে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই জঘণ্য অপরাধের নির্মম পরিণতি সম্পর্কে অনেকে, যেমন ইমাম আহমাদ (র), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন ও আবূ বকর, হুমায়দী প্রমুখ মনীষী ফাতওয়া দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপকারীর তওবা গ্রহণযোগ্য নয় এবং একই কারণে তাহার রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হইব না। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি মিথ্যা আরোপ করা পাপ ও অপরাধ হইলেও সর্বসম্মতিক্রমে তাহার আন্তরিক তাওবা গ্রহণযোগ্য।

(চার) রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ ধরনের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি

হযরত আইশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে আইশা! তিনি জিবরাঈল। তিনি তোমাকে সালাম বলিয়াছেন। উত্তরে আমি বলিলাম, তাহার প্রতিও শান্তি, আল্লাহ্র রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হউক। আমি যাহা দেখি না আপনি তাহা দেখিতে পান (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৭ খ., নং ৩৭৬৮; মুসলিম, নং ৯১/২৪৪৭)।

হযরত আবূ যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমি এমন কিছু দেখিতে পাই, যাহা তোমরা দেখিতে পাও না। আমি এমন কিছু শুনিয়া থাকি যাহা তোমরা শুনিতে পাও না। আকাশ চিৎকার করিতেছে এবং তাহার জন্য তাহা করাই বাঞ্ছনীয়। আকাশের কোথাও চার আঙ্গুলের মত জায়গাও খালি নাই যেখানে ফেরেশতাগণ অবনত মস্তকে আল্লাহ্কে সিজদা করিতেছে না। আল্লাহ্র শপথ! আমি যাহা জানি তোমরা যদি তাহা জানিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমরা স্বল্পই হাসিতে এবং অধিক পরিমাণে কাঁদিতে; গৃহকোণে নারীদের সঙ্গে উপভোগে লিপ্ত হইতে না এবং সরবে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করিতে করিতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতে (তিরমিযী, যুহ্দ, বাব ৯, নং ২৩১২; এবং তাঁহার মতে হাদীছটি হাসান ও গরীব; ইবন মাজা, যুহ্দ, বাব ১৯, নং ৪১৯০; আহমাদ, ৫/১৭;,হাকেম, ২/৫১০, তিনি হাদীছটির সনদ সহীহ বলিয়াছেন। আলবানী ইহাকে হাসান বলিয়াছেন; সহীহ জামে সাগীর, নং ২৪৪৫)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সঙ্গে নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি পিছনের দিকে ফিরিয়া বলেন, হে অমুক! তোমার কী হইয়াছে, ঠিকমত নামায পড় না কেন? মুসল্লীর কী হইল যে, কিভাবে নামায পড়ে সেদিকে লক্ষ্য করে না? সে তো নিজের উপকারের জন্যই নামায পড়ে। আল্লাহ্র শপথ! আমি পশ্চাতে এমনভাবে দেখিতে

পাই যেভাবে আমার সম্মুখভাবে দেখিতে পাই (মুসলিম, সালাত, বাব ২৪, নং ৯৫৭/১০৮/৪২৩)।

"আমি আমার পশ্চাতে দেখিতে পাই" এই মর্মে আল্লামা নববী (র) আলিমদের উক্তি নকল করিয়া বলেন, ইহার অর্থ হইল ঃ আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ (স)-এর পশ্চাৎদেশে এমন এক ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়াছেন যদ্দ্বারা তিনি দেখিতে পাইতেন। অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রমও হইত। ইহা শরী'আতও বুদ্ধি-বিবেকের পরিপন্থী নয়, বরং বাহ্যত শরী'আত ইহার পক্ষে হওয়ায় তাহা স্বীকার করা আবশ্যক। কাযী ইয়ায বলেন, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল এবং জমহূর উলামার মতে এই দর্শন বাস্তব চোখেই সংঘটিত হইত (শারহুন নাবাবী, ৪ খ., ১৪৯-১৫০)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা কি এখানে আমার সম্মুখে দেখিতে পাও ? আল্লাহ্র শপথ! আমার কাছে তোমাদের রুকূ, তোমাদের সিজদা গোপন থাকে না। আমার পশ্চাত হইতেও আমি তোমাদেরকে অবশ্যই দেখিতে পাই (বুখারী, ফাতহুল বারী, ২ খ., নং ৭৪১; মুসলিম, সালাত, বাব ২৪, নং ৯৫৮/১০৯/ ৪২৪)।

(পাঁচ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর বসিয়া বা দাঁড়াইয়া ইবাদত করার ছওয়াব একই সমান ছিল।

নফল নামায বিধিবদ্ধ করার পিছনে বিরাট তাৎপর্য নিহিত আছে। ইহার একটি হইল, নেক আমল বৃদ্ধি করা এবং মর্যাদা উন্নত করা। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খাদিম রাবী'আ ইবন কা'ব আল-আসলামী (রা) বর্ণিত হাদীছ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে রাত্রি যাপন করিতাম এবং তাঁহার উযূর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস পরিবেশন করিতাম। একদিন তিনি বলিলেন, "আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করি"। আমি বলিলাম, আমি জান্নাতে আপনার সান্নিধ্য চাই। তিনি বলিলেন, অন্য কিছু? আমি বলিলাম, না, ইহাই চাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহা হইলে অধিক সিজদার মাধ্যমে তোমার বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর (মুসলিম, সালাত, বাব ৪৩, নং ১০৯৪/২২৬/৪৮৯)।

নফল নামাযের আরেকটি উপকারিতা এই যে, ফরযের অপূর্ণতা ও ত্রুটির প্রতিকার। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হইবে। এই হিসাব ঠিক হইলে সে কামিয়াব হইবে। পক্ষান্তরে এই হিসাব ঠিক না হইলে সে ব্যর্থ ও ধ্বংস হইবে। আর যদি ইহার সঙ্গে ফরযে কোন প্রকার অপূর্ণতা থাকে তবে আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কিনা? অতঃপর তদ্দ্বারা ফরযের ত্রুটি পূর্ণ করিয়া দেয়া হইবে। তাহার পর একইভাবে অন্যান্য ইবাদতের হিসাব নেওয়া হইবে (আবূ দাঊদ, নং ৮৬৪, তিরমিযী, নং ৪১৩, তিনি হাদীছটিকে হাসান বলিয়াছেন। নাসাঈ, ১ খ., ২৩২; ইব্ন মাজা, নং ১৪২৫; হাকেম, নং ১/২৬২, তিনি ইহার সনদকে বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করিয়াছেন, যদিও বুখারী ও মুসলিমে তাহা

উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু ইহার সনদ মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ। যাহাবীও ইহার সঙ্গে একমত। শাওকানী বলেন, নাসাঈ উত্তম সনদে হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। এই বর্ণনাকারিগণের সকলেই ত্রুটিমুক্ত। ইরাকীর অভিমতও তাহাই। অনুরূপ ইব্‌নুল কাত্তানও ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। নায়লুল আওতার, ১ খ., ৩৪৫; ইব্‌ন আওন বলেন, ইব্‌ন হাজারও হাদীছটিকে সঠিক বলিয়াছেন। দালীলুল ফালিহীন, ৩ খ., ৫৮১)।

নফল নামাযের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে

দাঁড়াইয়া আদায় করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসিয়া আদায় করা জায়েয। তবে ফরয নামাযের ব্যাপারটি ইহা হইতে আলাদা। সুতরাং কোন লোক এভাবে নফল নামায আদায় করিলে তাহার নামায সঠিক হইবে বটে, কিন্তু সে দাঁড়াইয়া আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক ছওয়াবের অধিকারী হইবে। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ উপবিষ্ট অবস্থায় নামায আদায়ের ছওয়াব দণ্ডায়মান অবস্থায় আদায় করার অর্ধেক (আবূ দাউদ, নং ৯৫১; তিরমিযী, নং ৩৭১; তিনি হাদীছটিকে হাসান ও সহীহ বলিয়াছেন। নাসায়ী, ৩ খ., ২২৩-২২৪; ইব্‌ন মাজা, নং ১২৩০; যাওয়াইদ গ্রন্থে বুসীরী-এর সনদকে সহীহ বলিয়াছেন। বুখারী, ফাতহুল বারী, ২খ., নং ১১১৬)।

উক্ত বিধানটি উম্মতের সকলের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) এক্ষেত্রে স্বীয় উম্মত হইতে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। কেননা বিশেষ মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের কারণে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার নফল নামাযকে দণ্ডায়মান অবস্থার সমপর্যায়ের বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। এই মর্মে সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে বলা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ উপবিষ্ট অবস্থায় আদায়কারী ব্যক্তির নামায হল অর্ধ নামায। তিনি বলেন, কথাটি শুনিয়া আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া দেখিতে পাই যে, তিনি বসিয়া নফল নামায আদায় করিতেছেন। আমি তাঁহার মাথায় হাত রাখিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর! তোমার কী হইয়াছে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বলা হইয়াছে, আপনি বলিয়াছেন ঃ বসিয়া নামায আদায়কারী ব্যক্তি অর্ধ-পরিমাণ নামাযের ছওয়াব পাইবে, অথচ আপনি বসিয়া নফল নামায আদায় করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ বলিলেন, হাঁ, তাহা সত্য। তবে আমি তোমাদের কাহারও মত নই (মুসলিম, সালাত, বাব ১৬, নং ১৭১৫/১২০/৭৩৫)।

আল্লামা নববী ও অন্যান্য আলিমের মতে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উপবিষ্ট অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নফল নামায আদায় করার ছওয়াব দণ্ডায়মান অবস্থায় আদায় করার ছওয়াবের সমান। আর ইহা হইল তাঁহার বৈশিষ্ট্যস্বরূপ।

(ছয়) নবীগণের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টিত হয় না

নবীগণ হইলেন মানুষের প্রতি আল্লাহর দূতস্বরূপ। তাঁহারা ওহী বাহক। তাঁহাদের মিশন হইল মানুষের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাইয়া দেয়া, আল্লাহর দিকে ডাকা, মানবাত্মাকে

পরিশোধিত ও নির্মল করা, বিভ্রান্তি ও আকীদার দুর্বলতা দূর করা এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা ও উম্মতকে সৎ পথে পরিচালিত করা। সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং উত্তরাধিকার বণ্টন তাঁহাদের কাজ নয়। তবে তাঁহারা যে উত্তরাধিকার রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইল আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, শরী'আত এবং মানুষের প্রতি দাওয়াত। তাঁহাদের রাখিয়া যাওয়া উত্তরাধিকার অতীব উত্তম ও অনুপম।

এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার উত্তরাধিকার রাখিয়া যান না, বরং তাঁহারা রাখিয়া যান আল্লাহ প্রদত্ত ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিয়াছে, সে একটি মহাসম্পদ লাভ করিয়াছে (আবূ দাউদ, নং ৩৬৫; তিরমিযী, নং ২৬৫২; ইব্ন মাজা, নং ২২৩; আহমাদ, ৫খ., ১৯৬; আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলিয়াছেন, জামে সগীর, নং ৬১৭৩)।

ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু উম্মতের অবস্থা ইহার বিপরীত। কাজেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাখিয়া যাওয়া সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব বর্তাইবে না, বরং তাহা সাদাকারূপে গণ্য হইব। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমাদের (নবীদের) উত্তরাধিকারী হয় না, বরং আমরা যাহা রাখিয়া যাই তাহা সাদাকারূপে গণ্য হয় (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১২খ., নং ৬৭৩০; মুসলিম, জিহাদ, বাব ১৬, নং ৪৫৭৯/৫১/১৭৫৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলিয়াছেন ঃ আমাদের নবীদের জামা'আতে ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী কেহ হয় না (আহমাদ, ২/৪৬৩; বুখারী, ফাতহুল বারী, ১২খ., নং ৬৭৩০; মুসলিম, নং ১৭৫৮)।

তিনি আরও বলেন ঃ দীনারের মত আমার উত্তরাধিকার বণ্টিত হইবে না, বরং আমার রাখিয়া যাওয়া সম্পদ আমার স্ত্রীদের খোরপোষ এবং আমার কর্মচারীদের খরচ মিটানোর পর সাদাকা হিসাবে গণ্য হইবে (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১২খ., নং ৬৭২৯; মুসলিম, নং ১৭৬০)।

আল্লামা ইব্ন কাছীর বলেন, এই ব্যাপারে সকল চিন্তাশীল একমত। আর শী'আ ও রাফিযিয়া সম্প্রদায় যে প্রলাপ বকে তাহা ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়। কারণ তাহাদের অজ্ঞতা তো সীমাহীন (ইব্ন কাছীরকৃত আল-ফুসূল, পৃ. ৩২৫)।

আলিমগণ বলেন, আম্বিয়া (আ)-এর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, উত্তরাধিকারীদের মাঝে এমন লোকও থাকিতে পারে যে সম্পদের মোহে নবীর মৃত্যু কামনা করিয়া বসিবে। ইহার ফলে সেই ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য হইয়া উঠিতে পারে। অনুরূপভাবে কোন লোক এই রকমও ভাবিতে পারে যে, নবীরা বিষয়-সম্পদের প্রতি অনুরক্ত এবং তাঁহারা নিজ নিজ উত্তরাধিকারীদের জন্য তাহা সঞ্চয় করিয়াছেন। এভাবে ধারণাকারী যেমন নিজের ধ্বংস অনিবার্য করিয়া তোলে তদ্রূপ লোকেরাও আম্বিয়া (আ) হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারে। বস্তুত নিজ নিজ উম্মতের জন্য আম্বিয়া (আ) হইলন পিতৃতুল্য। কাজেই তাঁহাদের উত্তরাধিকার সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

(সাত) রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণ মু'মিনদের মাতা

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (স)-এর সম্মানার্থে পৃথিবীর সমস্ত নারীদের হইতে নবী কারীম (স)-এর স্ত্রীগণকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের একটি হইল, তিনি তাহাদেরকে মু'মিনদের মাতৃতুল্য ঘোষণা করিয়াছেন। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ.

"নবী মু'মিনদের নিকট তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাহার স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা" (৩৩ ঃ ৬)।

এই মাতৃত্বের অর্থ হইল, তাঁহাদেরকে সম্মান করা, মর্যাদা দেয়া, তাঁহাদের সম্ভ্রম রক্ষা করা, তাঁহাদের মাহাত্ম্য ও মহিমা স্বীকার করা, তাঁহাদের প্রতি অনুগত থাকা এবং তাঁহাদের অবাধ্য না হওয়া। তবে তাঁহাদের সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করা বৈধ নয় এবং অন্য যে কোন পুরুষের জন্য তাহাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। কিন্তু তাহাদের মেয়ে এবং বোনদের বিবাহ করা হারাম নয়। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا.

"তোমাদের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সংগত নহে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনও বৈধ নহে। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ইহা ঘোরতর অপরাধ" (৩৩ ঃ ৫৩)।

আলিমগণের সকলেই এই ব্যাপারে একমত যে, যে স্ত্রীগণকে রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ইনতিকাল করেন তাঁহার পর সেই স্ত্রীগণকে অন্য কাহার ও বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা তাঁহারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই তাঁহার স্ত্রী এবং মু'মিনদের মাতা।

(আট) স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দর্শন লাভ সত্য

ইহাও রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি বৈশিষ্ট্য যে, যে লোক স্বপ্নযোগে তাঁহার দর্শন লাভ করিল সে যেন চর্মচোখেই তাঁহাকে দেখিতে পাইল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আকৃতি ধারণ শয়তানের শক্তির অতীত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সে ঘুমন্ত অবস্থায় ধোঁকা দিতে না পারে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মানার্থে জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁহার আকৃতি ধারণের ব্যাপারে শয়তানের শক্তি রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই মর্মে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ যে লোক ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে দেখিল, সে আমাকেই দেখিল। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করিতে পারে না (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১২খ., নং ৬৯৯৪; মুসলিম, রু'য়া, বাব ২, নং ৫৯১৯/১০/২২৬৬)।

উল্লিখিত হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একাধিক উক্তি উদ্ধৃত করার পর আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, হাদীছটির সঠিক ব্যাখ্যা হইল, কোন অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ (স)-এর দর্শন মিথ্যা ও অমূলক নয়; বরং তাহা যথার্থ ও সত্য। কাযী আবূ বকর ইবনুত তায়্যিবসহ আরও অনেকে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন (ফাতহুল বারী, ১২খ., পৃ. ৪০১)।

আলিমগণ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) দুনিয়াতে যে আকৃতিতে ছিলেন এবং হাদীছ শরীফে যেভাবে তাঁহাকে চিত্রায়িত করা হইয়াছে দর্শন লাভকারীর দর্শনটি হুবহু সেভাবে হইতে হইবে।

হাফেজ ইব্ন কাছীর বলেন, আলিমগণ এই ব্যাপারে একমত হইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) হইতে কোন হাদীছ বর্ণনা করে তাহার (দর্শন লাভকারীর) স্মৃতির দুর্বলতার কারণে সেই হাদীছটি গ্রহণযোগ্য হইব না। কেননা নিদ্রা এমন একটি বিষয় যাহা রূহ ও স্মৃতিকে দুর্বল করিয়া দেয় (ইব্ন কাছীরকৃত আল-ফুসূল ফী সীরাতির রাসূল, পৃ. ২৯৮-২৯৯)।

(নয়) বাহ্যিকভাবে নিরস শব্দমালার আড়ালে করুণার বারিধারা

রাসূলুল্লাহ (স) কখনও অশ্লীলভাষী, অভিসম্পাৎকারী এবং নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণকারী ছিলেন না। তবে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তাঁহার সন্তুষ্টি বিধানে প্রতিশোধ নিতে তিনি কখনও ভুল করিতেন না। স্বভাবত তিনি ছিলেন একজন ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল, উম্মতের প্রতি অতিশয় দয়ার্দ্র, তাহাদের কল্যাণকামী, উপকার সাধনে আগ্রহী ও তাহাদেরকে সতর্ককারী। তুফায়ল আদ-দাওসী ও তাঁহার সাথীরা আসিয়া যখন বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাওস গোত্রের লোকেরা কাফির এবং অবাধ্য হইয়া গিয়াছে। আপনি তাহাদেরকে বদদু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন এবং তাহাদের প্রতি দয়া করুন।" অনুরূপ ঘটনার বহু উদাহরণ বিদ্যমান।

তবে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে কোথাও কোথাও বাহ্যত তিরস্কারমূলক যে দুই-একটি শব্দ পাওয়া যায়, সেই সম্পর্কে আল্লামা নববী (র) বলেন, সেগুলি উহার আক্ষরিক ও প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই এবং সেগুলি ইচ্ছাকৃতভাবেও ব্যবহৃত হয় নাই, বরং আরবদের বাকরীতি অনুযায়ী অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাহা প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ تربت يمينك 'তোমার দক্ষিণ হস্ত মাটিযুক্ত হউক" عقرى حلقى "সে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করুক"। অনুরূপভাবে জনৈক মহিলার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উক্তি ঃ لاكبر سنك "তোমার বয়স দীর্ঘ না হউক"। মু'আবিয়া (রা)-কে বলিয়াছেন ঃ لا اشبع الله بطنه আল্লাহ তাহার উদর পূর্তি না করুন" ইত্যাদি।

অথবা ইহার তাৎপর্য হইল, যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ উক্তি করিয়াছেন, শরী'আতগত কারণে বাহ্যিকভাবে সে তাহারই উপযুক্ত ছিল, যদিও অন্তর্নিহিত দৃষ্টিতে তাহার জন্য তাহা প্রযোজ্য ছিল না। কেননা বাহ্য বিষয়ে বিধান প্রবর্তনের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) আদিষ্ট

ছিলেন এবং অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি আল্লাহ নিজ হাতে রাখিয়া দিয়াছেন (শারহুন নাবাবী 'আলা সাহীহ মুসলিম, ১৬খ., ১৫২)।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) নিজ মহানুভবতা ও মমত্ববোধের কারণে আশংকা করিতেন, না জানি এই কথাগুলি আল্লাহ্র নিকট কবূল হইয়া যায়। তাই পরক্ষণেই তিনি আল্লাহর নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাইতেন যেন এই শব্দগুলিকে তাহার জন্য রহমত, গুনাহের কাফফারা, নৈকট্য, পবিত্রতা ও প্রতিদান লাভের উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়। যাহার জন্য এই ধরনের শব্দ প্রযোজ্য ছিল না এবং সে মুসলমান ছিল, সাধারণত তাহার ব্যাপারেই তিনি এমনটি করিতেন। অন্যথা কাফির এবং মুনাফিকদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) বদদু'আ করিয়াছেন এবং তাহা তাহাদের জন্য আদৌ রহমতস্বরূপ ছিল না। সুতরাং বদদু'আর উপযুক্ত নয় এমন কাহাকেও বাহ্যত বদদু'আ করা হইলে তাহার জন্য তাহা গুনাহের কাফফারা, রহমত ও নৈকট্য লাভের উপায়ে পরিণত হইবে। উম্মত হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বহুবিধ স্বাতন্ত্র্যের মাঝে ইহাও একটি। স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য এই মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছখানি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হইতে এমন অঙ্গীকার চাই, যাহাতে কখনও তুমি আমার খেলাফ করিবে না। আমি তো একজন মানুষ! যে কোন মু'মিনকে আমি কষ্ট দিয়াছি, গালি দিয়াছি, ভর্ৎসনা করিয়াছি এবং বেত্রাঘাত করিয়াছি—সেগুলিকে তাহার জন্য রহমত, উত্তম প্রতিদান ও নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে প্রতিপন্ন কর। এইগুলির বদৌলতে কিয়ামতের দিন তাহাকে তোমার নৈকট্য লাভকারী করিও (বুখারী, ফাতহুল বারী, ১১খ., হাদীছ নং ৬৩৬১; মুসলিম, বির, বাব ২৫, হাদীছ নং ৬৬২৯/৯০/ ২৬০১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধটি 'নাদরাতুন নাঈম' (আরবী) শীর্ষক কিতাবের ১ম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় সংশোধনীশেষে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। বিস্তারিত বরাতের জন্য মূল কিতাব দেখা যাইতে পারে।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দু'আসমূহ

আরবী ভাষায় দু'আ শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ (১) আল্লাহ্র যিকির, প্রশংসা যাহা তাসবীহ-তাহ্লীলের সহিত সংযুক্ত এবং (২) নিজের অভিষ্ট বিষয় প্রার্থনা, যাহা বিপদাপদ হইতে মুক্তি এবং সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا আয়াতে فادعوه بها শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব আয়াতের সারমর্ম হইল, হামদ, ছানা, গুণ ও প্রশংসা, তাসবীহ ও তাহলীলের যোগ্য শুধু তিনিই। বিপদাপদে মুক্তিদান, প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য হাসিল কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকিতে হইলে, সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইলে শুধু তাঁহাকেই ডাকিবে। তাঁহার কাছেই সাহায্য চাহিবে (মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত সং., পৃ. ৫০৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) নিজে দু'আ করিতেন এবং অপরকেও উৎসাহিত করিয়া বলিতেন, আল্লাহ্র নিকট দু'আ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত আর কোন বিষয় নাই (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাবু মা জা'আ ফী ফাদলিদ্ দু'আ, হাদীছ নং ৩৩৭০, ৫খ., পৃ. ৪৫৫)। তিনি আরও বলেন, الدعاء مخ العبادة "দু'আ ইবাদতের সার" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৩৩৭১, ৫খ., পৃ. ৫৪৬)। অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহার প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি রুষ্ট হন (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৩৩৭৩, ৫খ., পৃ. ৪৫৬)। রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দু'আ করিতেন, হাদীছের কিতাবসমূহে উহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

সকাল-সন্ধ্যার দু'আসমূহ

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) সকাল বেলা এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحى وبك نموت واليك النشور ·

"হে আল্লাহ! আমরা তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হইয়াছি এবং তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় পদার্পণ করিব, তোমারই মর্জিতে আমরা জীবিত রহিয়াছি এবং তোমারই ইচ্ছায় আমরা ইনতিকাল করিব। আর তোমারই দিকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত হইয়া সমবেত হইব"। আর সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ (স) এই দু'আ করিতেন ঃ اللهم بك امسينا وبك نحى وبك نموت واليك النشور "হে আল্লাহ! তোমারই অনুগ্রহে আমরা সন্ধ্যায় পদার্পণ করিয়াছি, তোমারই মর্জিতে জীবিত রহিয়াছি, তোমারই ইচ্ছায় ইনতিকাল করিব আর তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন

করিব" (আবূ দাঊদ, কিতাবুল আদাব, আবওয়াবুন নাওম, বাব মা ইয়াকূলু ইযা আসবাহা, হাদীছ নং ৫০৬৮, ৪খ., পৃ. ৩১৯)।

امسينا وامسينا الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير رب اسالك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة وشر ما بعدها واعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر رب اعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر.

"আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহ্র জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হইয়াছি, সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, রাজত্ব তাঁহারই, সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই, তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! এই রাত্রিতে এবং ইহার পরে যে কল্যাণ রহিয়াছে আমি তাহা আপনার কাছে প্রার্থনা করি। আর এই রাত্রিতে এবং ইহার পরে যে অনিষ্ট রহিয়াছে, আমি তাহা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি অলসতা ও বার্ধক্যের অকল্যাণ হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের শাস্তি এবং কবরের আযাব হইতে আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করি" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৭১, ৪খ., পৃ. ৩১৯-৩২০)।

একদা রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বলিয়ালেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করিবে ঃ

اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة رب كل شئ ومليكه اشهد أن لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه.

"হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সব কিছুর রব ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। আমি আমার নফসের ক্ষতি হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, শয়তান ও তাহার সাথীদের ক্ষতি হইতে আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৬৭ , ৪খ., পৃ. ৩১৮-৩১৯)।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নের দু'আটি একবার পাঠ করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জাহান্নামের এক-চতুর্থাংশ আযাব হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। আর যে ব্যক্তি দুইবার পাঠ করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে জাহান্নামের অর্ধেক শাস্তি হইতে নাজাত দিবেন। আর যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জাহান্নামের তিন-চতুর্থাংশ আযাব হইতে মুক্তি দান করিবেন। আর যে ব্যক্তি চারবার পাঠ করিবে, মহান আল্লাহ্ তাহাকে জাহান্নামের পূর্ণ আযাব হইতে মুক্তিদান করিবেন ঃ

اللهم انى اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملئكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك.

"হে আল্লাহ! আমি প্রত্যুষে উপনীত হইয়াছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি তোমার 'আরশ বহনকারীদের এবং তোমার সকল ফেরেশতার ও তোমার সকল সৃষ্টির—নিশ্চয় তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তুমি এক, তোমার কোন শরীক নাই। আর মুহাম্মাদ (স) তোমার বান্দা এবং রাসূল" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৬৯, ৪খ., পৃ.৩১৯)।

ইব্‌ন বুরায়দা (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করিবে, সে যদি ঐ দিবসে বা ঐ রাত্রিতে মারা যায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء بذنبى فاغفرلى فانه لا يغفر الذنوب الا انت.

"হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি আপনার বান্দা, আমি আমার সাধ্যমত আপনার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গিকারাবদ্ধ রহিয়াছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হইতে আপনার আশ্রয় কামনা করিতেছি। আমার প্রতি আপনার নি'আমতের স্বীকৃতি প্রদান করিতেছি। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করিতেছি। অতএব আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন। নিশ্চয় আপনি ব্যতীত গুনাহসমূহের মার্জনাকারী আর কেহই নাই" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৭২, ৪খ., পৃ. ৩১৯)।

আবূ সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করিবে, মহান আল্লাহ্ তাহার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন।

رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا.

"আমি আল্লাহ্‌কে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল হিসাবে লাভ করিয়া পরিতুষ্ট" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৭২, ৪খ., পৃ. ৩২০)।

ইব্‌ন 'উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ কখনও ত্যাগ করিতেন না ঃ

اللهم انى اسئلك العافية فى الدنيا والأخرة اللهم انى اسألك العفو والعافية فى دينى وفى دنياى واهلى ومالى اللهم استر عوراتى وأمن روعاتى اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتى.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি এবং স্বীয় দীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা কামনা করিতেছি। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট মার্জনা কামনা করিতেছি। আর দীন ও দুনিয়ায় আমার পরিবার-পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন দোষত্রুটিসমূহ ঢাকিয়া রাখুন, চিন্তা ও উদ্বেগকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করিয়া দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার সম্মুখ ও পশ্চাতের বিপদ হইতে, আমার ডানে-বাঁয়ের ও উর্ধ্বদেশের গযব হইতে হেফাজত করুন এবং আপনার মহত্ত্বের দোহাই দিয়া আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি আমার নিম্নদেশ হইতে আগত বিপদ হইতে তথা মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হইতে" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৭৪, ৪খ., ৩২১)।

আবূ 'আয়্যাশ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করিবে, সে ইসমা'ঈল (আ)-এর বংশের একটা গোলাম আযাদ করিবার সমতুল্য ছওয়াব পাইবে। আর তাহার জন্য দশটি নেকী লিখা হইবে, তাহার দশটি গুনাহ মাফ করা হইবে এবং তাহার মর্যাদা দশ গুণ বৃদ্ধি করা হইবে, সে শয়তানের ক্ষতি হইতে নিরাপদ থাকিবে ঃ

لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই, রাজত্ব তাঁহারই, সকল প্রশংসা তাঁহারই। তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৭৭, ৪খ., পৃ. ৩২২)।

একদা রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক সাহাবীকে বলিলেন, যখন তুমি মাগরিবের সালাত শেষ করিবে তখন সাতবার নিম্নের দু'আ পাঠ করিবে। কেননা তুমি যদি এই দু'আ পাঠ কর এবং সেই রাত্রিতে মৃত্যুবরণ কর তবে তুমি জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে। আর যদি ফজরের সালাত আদায়ের পর এইরূপ বল এবং সেই দিন মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে। দু'আটি এই ঃ اللهم اجرنى من النار "হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দিন" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৭৯, ৪খ., পৃ. ৩২২)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিবে, সে সব ধরনের বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাইবে (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৮২, ৪খ., পৃ. ৩২৪)।

উছমান (রা) বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দু'আ তিনবার পাঠ করিবে, সকাল পর্যন্ত তাহার উপর আকস্মিক কোন বিপদ পতিত হইবে না। আর যে ব্যক্তি সকালে এই দু'আ তিনবার পাঠ করিবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হইবে না ঃ

بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم.

"আমি আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি যাঁহার নাম লইলে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৮৮, ৪খ., পৃ. ৩২৫)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আটি এক শতবার পাঠ করিবে, সকল মাখলূকের মধ্যে তাহার সমমর্যাদার অধিকারী আর কেহ হইতে পারিবে না। দু'আটি এই : سبحان الله العظيم وبحمده "আমি মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা এবং প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৯১, ৪খ., পৃ. ৩২৬)।

শয্যা গ্রহণের সময়ে দু'আ

হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) শয্যা গ্রহণের সময় এই দু'আ পাঠ করিতেন : اللهم باسمك اموت واحى "হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মৃত্যুবরণ করি ও জীবিত থাকি" (বুখারী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাব ওয়াদ'ইল ইয়াদায়ন 'আলাল-খাদ্দায়ন, হাদীছ নং ৬৩১৪, পৃ. ১৩৩৬)।

হাফসা (রা)-এর উক্তি অনুসারে তিনি নিম্নোক্ত দু'আও তিনবার পাঠ করিতেন : اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك. "হে আল্লাহ্! যেই দিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরায় জীবিত করিয়া উঠাইবেন, সেই দিন আপনার আযাব হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন" (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, আবওয়াবুন নাওম, বাব মা ইউকালু 'ইনদান নাওম, হাদীছ নং ৫০৪৫, ৪খ., পৃ. ৩১২)।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, শয্যায় আশ্রয় গ্রহণের সময় যদি কেহ নিম্নের দু'আটি তিনবার পাঠ করে, তবে গুনাহর সংখ্যা যদিও হয় সমুদ্রের ফেনার মত, গাছের পাতার মত, মরুভূমির ঘন বালুকারাশির মত, দুনিয়ার দিবসগুলোর মত, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সেই গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন : استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم واتوب اليه "আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি আল্লাহ্র নিকট যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, যিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী, আর আমি তাঁহার নিকট তওবা করিতেছি (তিরমিযী, দা'ওয়াত, বাব, ১৭, হাদীছ নং ৩৩৯৭, ৫খ., পৃ. ৪৭০)।

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার দু'আ

রাসূলুল্লাহ (স) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া এই দু'আ পাঠ করিতেন : الحمد الله الذى احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাকে (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর জীবিত করিয়াছেন আর তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে" (বুখারী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাবু মা ইয়াকূলু ইযা নামা, হাদীছ নং ৬৩১২, পৃ. ১৩৩৬)।

'আইশা (রা)-এর উক্তি অনুসারে রাসূলুল্লাহ (স) দশবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার), দশবার তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ), দশবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), দশবার তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং দশবার ইস্তিগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) পাঠ করিতেন। অতঃপর এই দু'আ পড়িতেন ঃ اللهم اغفرلي واهدني وارزقني وعافني "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং সুস্থতা দান করুন" (আবূ দাঊদ, কিতাবুস সালাত, বাব মা ইয়াসতাফতিহু বিহিস-সালাত, হাদীছ নং ৭৬৬, ১খ., পৃ. ২০২)।

কাহারও যদি হঠাৎ করিয়া রাত্রে নিদ্রার সময়ে চক্ষু খুলিয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে এই দু'আ পাঠের উপদেশ দিতেন ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله.

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। বাদশাহী তাঁহারই, সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই, তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান। পবিত্র মহান আল্লাহ্, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া সৎ কাজ করার ও মন্দ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার কাহারও ক্ষমতা নাই"।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "ইহার পর যদি কোন দু'আ করা হয় তবে উহা অবশ্যই কবূল হইবে" (আবূ দাঊদ, কিতাবুল আদাব, আবওয়াবুন নাওম, বাব মা ইয়াকূলু ইযা তা'আররা মিনাল লায়ল, হাদীছ নং ৫০৬০, ৪খ., পৃ. ৩১৬)।

বিছানায় শোয়াবস্থায় জাগ্রত হইবার পর দু'আ ঃ 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন ঘুম হইতে জাগ্রহ হইতেন তখন এই দু'আ পড়িতেন ঃ

لا اله الا انت سبحانك اللهم استغفرك لذنبى واسألك رحمتك اللهم زدنى علما ولا تزغ قلبى بعد اذ هديتنى وهب لى من لدنك رحمة انك انت الوهاب.

"হে আল্লাহ! আপনি মহান, পবিত্র। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আমার গুনাহর জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার রহমত কামনা করিতেছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে অধিক জ্ঞান দান করুন। আর হিদায়াতের পর আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করিবেন না। আপনার বিশেষ রহমত আমাকে দান করুন। কেননা আপনিই একমাত্র দানকারী" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৬১, ৪খ., পৃ. ৩১৬)।

কেহ স্বপ্নে অপসন্দনীয় কিছু দেখিলে যাহা বলিবে

আবূ কাতাদা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, ভালো স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে, আর দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হইতে। কেহ যদি স্বপ্নে অপসন্দনীয় কিছু দেখে, তবে সে যেন তাহার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলিয়া বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয়

প্রার্থনা করে (তিরমিযী, কিতাবুর রু'ইয়া, বাব ইযা রা'আ ফিল-মানামে মা ইউকরাহু মা ইউসনাউ, হাদীছ নং ২২৭৭, ৪খ., পৃ. ৫৩৫-৫৩৬)।

তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম হইতে উঠিবার পর যে দু'আ পড়িবে

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন মধ্যরাত্রিতে সালাতের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেন তখন বলিতেন ঃ

اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض ولك الحمد انت قيام السموات والارض ولك الحمد انت رب السموات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفرلى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انك الهى لا اله الا انت.

"হে আল্লাহ! তোমারই সকল প্রশংসা। তুমিই আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর নূর। সকল প্রশংসা তোমারই, তুমিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নিয়ন্তা, সকল প্রশংসা তোমারই। তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব এবং ইহাতে যাহা কিছু আছে সকলই তোমার। তুমিই সত্য। তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার সাক্ষাত সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই আত্মসমর্পিত, তোমার উপরই ঈমান রাখি, তোমার উপরই ভরসা করি, তোমার দিকে মনোযোগী হই, তোমার বিষয়ে বিবাদ করি, তোমাকেই বিচারক মানিয়াছি। অতএব আমার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দাও, যাহা গোপনে করিয়াছি আর যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি। তুমিই তো আমার ইলাহ, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই" (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাব মা ইয়াকূলু ইযা কামা মিনাল লায়লে ইলাস-সালাত, হাদীছ নং ৩৪১৮, ৫খ., পৃ. ৪৮১-৪৮২)।

নূতন কাপড় পরিধানের দু'আ

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন কোন নূতন কাপড় পরিধান করিতেন, তাহা জামা হউক কিংবা পাগড়ী হউক, তিনি তাহার নাম লইয়া এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اللهم لك الحمد انت كسوتنيه اسالك من خيره وخير ما صنع له واعوذبك من شره وشر ما صنع له.

"হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই এই কাপড় আমাকে পরাইয়াছ। আমি তোমার কাছে ইহার মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও ইহা যেই উদ্দেশ্যে তৈয়ার করা হইয়াছে সেই সব কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি ইহার অনিষ্ট এবং ইহা তৈয়ারের অনিষ্ট হইতে তোমার আশ্রয় কামনা করি" (আবূ দাউদ, কিতাবুল লিবাস, হাদীছ নং ৪০২০, ৪খ., পৃ. ৪০-৪১)।

মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নূতন কাপড় পরিধান করিয়া এই দু'আ পড়িবে তাহার জীবনের আগে-পরের সব গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে ঃ

الحمد لله الذى كسانى هذا الثوب ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة.

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাকে ইহা পরিধান করাইয়াছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই তিনি আমাকে ইহা দান করিয়াছেন" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৪০২৩, ৪খ., পৃ. ৪১)।

নূতন পোশাক পরিধানকারীর জন্য দু'আ

সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস ছিল, যখন কেহ নূতন কাপড় পরিধান করিত তখন তাঁহারা তাঁহাকে বলিতেন ঃ تبلى ويخلف الله تعالى "যথাসময়ে পুরাতন হইয়া বিনষ্ট হইবে এবং আল্লাহ ইহার স্থলাভিষিক্ত করুন" (আবূ দাউদ, কিতাবুল লিবাস, হাদীছ নং ৪০২০, ৪খ., পৃ. ৪০-৪১)।

পায়খানায় প্রবেশকালে দু'আ

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) পায়খানায় প্রবেশকালে এই দু'আ পড়িতেন ঃ اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث. "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপবিত্র জিন নর ও নারীর অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি" (বুখারী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাবুদ দু'আ ইনদাল খালা, হাদীছ নং ৬৩২২, পৃ. ১৩৩৯)।

পায়খানা হইতে বাহির হইবার সময়ের দু'আ

আইশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) পায়খানা হইতে বাহির হওয়ার সময় বলিতেন ঃ غفرانك "তোমার কাছে ক্ষমা চাই" (তিরমিযী, আল-জামিউস সুনান, আবওয়াবুত তাহারাত, বাবু মা ইয়াকূলু ইযা খারাজা মিনাল খালা, হাদীছ নং ৭, ১খ., পৃ. ১২; আবূ দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, বাব মা ইয়াকূলুর-রাজুলু ইযা খারাজা মিনাল খালা, হাদীছ নং ৩০, ১খ., পৃ. ৯)।

উযূর পূর্বের দু'আ

জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) উযূর পূর্বে بسم الله (বিসমিল্লাহ) পড়িবার নির্দেশ দিতেন (তিরমিযী, আবওয়াবুত তাহারাত, বাব মা জাআ ফিত-তাসমিয়াতি 'ইনদাল উযূ, হাদীছ নং ২৫, ১খ., পৃ. ৩৭-৩৮)।

উযূর শেষে দু'আ

'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি খুব ভাল করিয়া উযূ করিয়া এই দু'আ পড়ে, তবে তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা

খুলিয়া যাইবে এবং যে দরজা দিয়া ইচ্ছা করিবে সে উহা দিয়াই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে ঃ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين.

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ (স) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর" (তিরমিযী, আবওয়াবুত তাহারাত, বাব ফী মা ইয়ালূলু বা'দাল উযূ, হাদীছ নং ৫৫, ১খ., পৃ. ৭৭-৭৮)।

ঘর-বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়ে দু'আ

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইবার সময় এই দু'আটি পাঠ করে, তাহাকে বলা হয়, তুমি যথেষ্ট করিয়া নিলে, বাঁচিয়া গেলে, তোমা হইতে শয়তান দূর হইয়া গেল ঃ

بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله .

"আল্লাহ্র নাম লইয়া তাঁহার উপর ভরসা করিয়া বাহির হইলাম। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোন শক্তি সামর্থ নাই" (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব মা ইয়াকূলু ইযা খারাজা মিন বায়তিহী, হাদীছ নং ৩৪২৬, ৫খ., পৃ. ৪৯০)।

উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইতেন তখন তিনি বলিতেন ঃ

بسم الله توكلت على الله اللهم انا نعوذ بك من ان نزل او نضل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا .

"আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়াছি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই পানাহ চাহিতেছি পদস্খলন হইতে বা পথভ্রষ্টতা হইতে বা অত্যাচার করা হইতে বা অত্যাচারিত হওয়া হইতে বা মূর্খতা প্রদর্শন হইতে বা আমাদের প্রতি মূর্খ আচরণ করা হইতে" (আবূ দাঊদ, কিতাবুল আদাব, আবওয়াবুন নাওম, বাব মা ইয়াকূলু ইযা খারাজা মিন বায়তিহী, হাদীছ নং ৫০৯৪, ৪খ., পৃ. ৩২৭)।

গৃহে প্রবেশকালে দু'আ

আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করে তখন সে যেন এই দু'আ পাঠ করে ঃ

اللهم انى اسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا .

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ঘরে প্রবেশ ও ঘর হইতে বাহির হইবার সময় কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। আমি আল্লাহর নামে ঘরে প্রবেশ করিয়াছি, আল্লাহ্র নামে ঘর হইতে বাহির হইতেছি, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করিতেছি। অতঃপর সে যেন তাহার পরিবার-পরিজনকে সালাম করে" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫০৯৬, ৪খ., পৃ. ৩২৮)।

মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হইবার দু'আ

রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন আমার উপর সালাম পেশ করে এই দু'আ পড়েঃ اللهم افتح لى ابواب رحمتك "হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দাও"। আর বাহির হওয়ার সময় যেন এই দু'আ পড়েঃ اللهم انى اسألك من فضلك "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি" (আবূ দাঊদ, কিতাবুস সালাত, বাবুন ফী মা ইয়াকূলুর রাজুলু ইনদা দুখূলিহিল মাসজিদ, হাদীছ নং ৪৬৫, ১খ., পৃ. ১২৫)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে প্রবেশের সময় এই দু'আ পাঠ করিতেনঃ

اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.

"আমি মহান আল্লাহ্র নিকট তাঁহার দয়ালু সত্তার উসীলায় এবং তাঁহার অনন্ত ক্ষমতার উসীলায় বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৪৬৬, ১খ., পৃ. ১২৫)।

আযানের দু'আ

জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছে, যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া নিম্নের দু'আটি পড়িবে, কিয়ামতের দিন তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হইয়া যাইবেঃ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدان الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته (انك لا تخلف الميعاد) .

"হে আল্লাহ! এই সার্বিক আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মাদ (স)-কে ওসীলা এবং ফযীলাত তথা উচ্চতম মর্যাদা দান কর। আর তাঁহাকে মাকামে মাহমূদ দাও, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছ। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির বেতিক্রম কর না" (তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত, আযান, হাদীছ নং ২১১, ১খ., পৃ. ৪১৩)।

তাকবীরে তাহরীমার পর দু'আ

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাকবীরে তাহরীমার পর এই দু'আ পড়িতেন ঃ

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك.

"হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমার জন্য। তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার সত্তা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই" (তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত, বাব মা ইয়াকূলু ইনদা ইফতিতাহিস সালাত, হাদীছ নং ২৪২, ২খ., পৃ. ৯-১০)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাকবীরে তাহরীমার পর এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد.

"হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার গুনাহের মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দাও, যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করিয়াছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পাপমুক্ত করিয়া এমনভাবে পরিষ্কার করিয়া দাও যেমন সাদা কাপড় ধৌত করিলে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপসমূহ পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করিয়া দাও" (বুখারী, কিতাবুল আযান, বাব মা ইয়াকূলু বা'দাত তাকবীর, হাদীছ নং ৭৪৩, পৃ. ১৪৮)।

রুকূ ও সিজদার দু'আ

ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) রূকূতে তিনবার سبحان ربى العظيم "আমার মহান প্রতিপালক পবিত্র" এবং সিজদায় তিনবার سبحان ربى الاعلى "আমার মহান রব পবিত্র" পাঠ করিবার জন্য বলিতেন (তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত, বাবু মা জাআ ফিত-তাসবীহ ফির-রুকূ' ওয়াস-সুজূদ, হাদীছ নং ২৬১, ২খ., পৃ. ৪৬-৪৭)।

'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রুকূ ও সিজদায় এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى .

"হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি তোমার প্রশংসাসহ। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি মাফ করিয়া দাও" (বুখারী, কিতাবুল আযান, বাবুদ-দু'আ ফির-রুকূ', হাদীছ নং ৭৯৪, পৃ. ১৫৮)।

রুকূ হইতে উঠিবার দু'আ

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রুকূ হইতে উঠিবার সময় سمع الله لمن حمده (যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তিনি তাহা শুনেন) বলিবার পর اللهم ربنا ولك الحمد! " হে

আল্লাহ আমাদের প্রভু! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা" বলিতেন (বুখারী, কিতাবুল আযান, বাব মা ইয়াকূলুল - ইমাম ওয়ামান খালফাহু ইযা রাফা'আ রাসাহু মিনার-রুকূ', হাদীছ নং ৭৯৫, পৃ. ১৫৮)।

দুই সিজদার মধ্যখানে দু'আ ঃ হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দুই সিজদার মাঝে এই দু'আ পড়িতেন ঃ رب اغفر لى رب اغفر لى "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও" (ইব্‌ন মাজা, কিতাবুস সালাত, বাবু মা ইয়াকূলু বায়নাস-সাজদাতায়ন, হাদীছ নং ৭৩৯, ১খ., পৃ. ২৭০)।

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রাত্রিবেলা সালাতে দুই সিজদার মাঝে বলিতেন ঃ

رب اغفر لى وارحمنى واجبرنى وارزقنى وارفعنى ·

"হে আল্লাহ! তুমি আমকে মাফ করিয়া দাও, আমার উপর অনুগ্রহ কর, আমার জীবনের সকল ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিয়া দাও, আমাকে রিযিক দান কর এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি কর" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৭৪০)।

তিলাওয়াতে সিজদার দু'আ

'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন তিলাওয়াতের সিজদায় বলিতেন ঃ

سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ·

"আমার মুখমণ্ডল সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার কর্ণ ও উহার চক্ষু উদ্ভিন্ন করিয়াছেন স্বীয় ইচ্ছায় ও শক্তিতে" (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব মা ইয়াকূলু ফী সুজূদিল কুরআন, হাদীছ নং ৩৪২৫, ৫খ., পৃ. ৪৮৯)।

দু'আ মাছুরা

আবূ বাকর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বলিলেন, আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিখাইয়া দিন যাহা দ্বারা আমি সালাতে দু'আ করিব। তিনি বলিলেন, তুমি সালাতে এই দু'আ পড়িবে ঃ

اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم.

"হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশী অত্যাচার করিয়াছি। আর তুমি ছাড়া গুনাহ কেহই মাফ করিতে পারে না। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করিয়া দাও এবং আমার প্রতি রহম কর; তুমি তো মার্জনাকারী দয়ালু" (বুখারী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাবুদ-দু'আ ফিস-সালাত, হাদীছ নং ৬৩২৬, পৃ. ১৩৩৯)।

সালাম ফিরানোর পর দু'আ

ছাওবান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) সালাম ফিরাইবার পর ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, ইহার পর বলিতেন ঃ

اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام.

"হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, আর তোমার নিকট হইতেই শান্তির আগমন। তুমি বরকতময় মর্যাদা এবং মহত্ত্বের অধিকারী" (ইব্‌ন মাজা, কিতাবুস সালাত, বাব মা ইউকালু বা'দাত-তাসলীম, হাদীছ নং ৭৬১, ১খ., পৃ. ২৭৭)।

উম্মু সালামা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের সালাত আদায় করিয়া এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اللهم انى اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী 'ইলম, উত্তম রিযিক এবং কবূল হওয়ার মত আমল চাহিতেছি" (ইব্‌ন মাজা, কিতাবুস সালাত, বাব মা ইউকালু বা'দাত-তাসলীম, হাদীছ নং ৭৬২, ১খ., পৃ. ২৭৭)।

শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির মুকাবিলার সময় দু'আ

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন যুদ্ধ আরম্ভ করিতেন তখন এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اللهم انت عضدى ونصرى بك احول وبك اصول وبك اقاتل.

"হে আল্লাহ! তুমিই আমার শক্তি ও সাহায্যদাতা, তোমার শক্তিতেই আমি আক্রমণ প্রতিহত করিবার কৌশল অবলম্বন করি, আর তোমার সাহায্যেই বিজয়ী হই এবং তোমার শক্তিতেই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকি" (আবূ দাঊদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব মা ইউদ'আ ইনদাল-লিকা, হাদীছ নং ২৬৩২, ৩খ., পৃ. ৪৩)।

শত্রুর ভয়ে ভীত অবস্থায় পাঠ করিবার দু'আ

আবূ বুরদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বণিত। তাঁহার পিতা রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন তিনি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কোনরূপ বিপদের আশংকা করিতেন তখন এইরূপ বলিতেন ঃ

اللهم انا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.

"হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে তাহাদের মুকাবিলার জন্য যথেষ্ট মনে করি এবং তাহাদের অনিষ্ট হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি" (আবূ দাঊদ, কিতাবুস সালাত, বাব মা ইয়াকূলু ইযা খাফা কাওমান, হাদীছ নং ১৫৩৭, ২খ., পৃ. ৯১)।

ঈমান সম্পর্কে কুমন্ত্রণা ও ওয়াসওয়াসায় পতিত ব্যক্তির জন্য দু'আ

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, শয়তান তোমাদের কাহারও নিকট আসে এবং বলে, ইহা কে সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা কে সৃষ্টি করিয়াছে? পরিশেষে এই প্রশ্নও করে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? এই পর্যন্ত পৌঁছিলে তোমরা অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিবে তথা বলিবে ঃ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم এবং এই ধরনের ভাবনা হইতে বিরত থাকিবে (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ানিল-ওয়াসওয়াসাতি ফিল-ঈমান ওয়ামা ইয়াকূলু মান ওয়াজাদাহা, হাদীছ নং ২৪১, ১খ., পৃ. ৪৩১)।

অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যাহার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয় সে যেন বলে ঃ امنت بالله ورسوله "আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২১২-২১৩, ১খ., পৃ. ৪৩১)।

ঋণ পরিশোধের দু'আ

'আলী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ঋণ পরিশোধের জন্য এই দু'আ পাঠের নির্দেশ দিতেন ঃ

اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك.

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার হারামকৃত বস্তু হইতে মুক্ত রাখিয়া তোমার হালাল বস্তুকে আমার জন্য যথেষ্ট করিয়া দাও। তোমার অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্য সব কিছু হইতে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানাইয়া দাও" (তিরমিযী, কিতাবুদ-দা'ওয়াত, বাব নং ১১১, হাদীছ নং ৩৫৬৩ ৫খ., পৃ. ৫৬০)।

বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ

জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টির জন্য এই দু'আ করিতেনঃ

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل.

"হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান কর যাহা সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, ক্ষতিকর নয় শীঘ্রই আগমনকারী, বিলম্বকারী নহে" (আবূ দাঊদ, কিতাবুস-সালাত, বাবু রাফ'ইল য়াদায়ন ফিল ইসতিসকা, হাদীছ নং ১১৬৯, ১খ., পৃ. ৫৬০)।

আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) হইতে পর্যায়ক্রমে তাঁহার পিতা তাঁহার দাদার সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বৃষ্টির জন্য এইভাবে দু'আ করিতেন ঃ

اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحى بلدك الميت.

"হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাগণকে এবং চতুষ্পদ জন্তসমূহকে পানি পান করাও, তোমার রহমত পরিচালনা কর, আর তোমার মৃত শহরকে সজীব কর" (আবূ দাঊদ, কিতাবুস সালাত, বাব রাফ'ইল ইয়াদায়ন ফিল ইসতিসকা, হাদীছ নং ১১৭৬, ১খ., পৃ. ৩০৫)।

বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ

আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বৃষ্টি হইতে দেখিলে বলিতেন ঃ اللهم صيبا نافعا "হে আল্লাহ! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও" (বুখারী, কিতাবুল ইসতিসকা, বাব মা ইউকালু ইযা মুতিরাত, হাদীছ নং ১০৩২, পৃ. ২০৪)।

বৃষ্টি বন্ধের দু'আ

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) অতিবৃষ্টি বন্ধের জন্য এই দু'আ করিতেন ঃ

اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب والاودية ومنابت الشجر.

"হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ কর, আমাদের উপর নহে। হে আল্লাহ! উঁচু ভূমিতে ও পাহাড়-পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর" (বুখারী, কিতাবুল ইসতিসকা, বাবুল ইসতিসকা ফিল মাসজিদিল জামে, হাদীছ নং ১০১৩, পৃ. ২০০)।

নূতন চাঁদ দেখার দু'আ

তালহা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নূতন চাঁদ দেখিলে এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اللهم اهله علينا بالأمن والايمان والسلامة الاسلام ربى وربك الله.

"হে আল্লাহ! এই নূতন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের কারণ বানাও। আল্লাহ আমার এবং তোমার প্রভু" (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাব মা ইয়াকূলু ইনদা রু'য়াতিল হিলাল, হাদীছ নং ৩৪৫১, ৫খ., পৃ. ৫০৫)।

ঝড়-তুফানের সময় দু'আ

'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ঝড়-তুফানের সময় এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اللهم انى اسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উহার কল্যাণ চাই এবং উহার ভিতরে নিহিত কল্যাণ চাই, আর সেই কল্যাণ চাই যাহা উহার সহিত প্রেরিত হইয়াছে। আমি তোমার আশ্রয় চাই উহার অনিষ্ট হইতে, উহার ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হইতে এবং যে ক্ষতি উহার সহিত প্রেরিত হইয়াছে তাহার অনিষ্ট হইতে" (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাবু মা ইয়াকূলু ইযা হাজাতির-রীহ, হাদীছ নং ৩৪৪৯, ৫খ., পৃ. ৫০৩)।

আহারের পূর্বে দু'আ

'উমার ইব্‌ন আবী সালামা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের কেহ আহার করে, সে যেন بسم الله (বিসমিল্লাহ) বলিয়া ডান দিক হইতে আহার করে (বুখারী, কিতাবুল আত'ইমা, বাবুত-তাসমিয়াতি 'আলাত-তা'আম ওয়াল-আকলি বিল-ইয়ামীন, হাদীছ নং ৫৩৭৬, পৃ. ১১৬৬)।

আহারের পর দু'আ

আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দস্তরখান তুলিয়া লওয়ার পর (অর্থাৎ আহারশেষে এই দু'আ পড়িতেন ঃ

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.

"পবিত্র বরকতময় অনেক প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। ইয়া আল্লাহ! ইহা হইতে কখনও বিমুখ হইতে পারিব না, বিদায় নিতে পারিব না এবং ইহা হইতে অমুখাপেক্ষীও হইতে পারিব না" (বুখারী, কিতাবুল আতইমা, বাব মা ইয়াকূলু ইযা ফারাগা মিনাত-তা'আমি, হাদীছ নং ৫৪৫৮, পৃ. ১১৮০)।

তিনি কখনও দস্তরখান তুলিয়া এই দু'আও পড়িতেন ঃ

الحمد لله الذى كفانا وأروانا غير مكفى ولا مكفور

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি যথেষ্ট খাওয়াইয়াছেন এবং পরিতৃপ্ত করাইয়াছেন, ইহা হইতে বিমুখ হওয়া যায় না এবং তাহার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫৪৫৯, পৃ. ১১৮১)।

যে আহার করাইল তাহার জন্য দু'আ

যে ব্যক্তি আহার এবং পান করাইতেন, তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) এই দু'আ করিতেন ঃ

اللهم اطعم من اطعمنى واسق من سقانى

"হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাইয়াছে, তুমি তাহাকে আহার করাও। যে আমাকে পান করাইয়াছে, তুমি তাহাকে পান করাও" (মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, বাব ইকরামিদ-দায়ফি, হাদীছ নং ১৭৪, ৭খ., পৃ. ২৬১)।

রাসূলুল্লাহ (স) খাদ্য দানকারীর জন্য এইভাবে দু'আ করিতেন ঃ

اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم

"হে আল্লাহ! তুমি তাহাদেরকে যে রিযিক প্রদান করিয়াছ উহাতে তাহাদের জন্য বরকত প্রদান কর, তাহাদের গুনাহ মাফ কর এবং তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ কর" (মুসলিম, কিতাবুল

আশরিবা, বাবু ইসতিহবাবি দু'আইদ দায়ফি লি-আহলিত তা'আমি, হাদীছ নং ১৪৭, ৭খ., পৃ. ২৪৪)।

ফলের কলি দেখিবার পর দু'আ

আবূ হুরায়য়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ফলের কলি দেখিয়া এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

اللهم بارك لنا فى ثمارنا وبارك لنا فى قريتنا وبارك لنا فى صاعنا

"হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফসলসমূহে বরকত দাও। তুমি আমাদের জনবসতিতে, আমাদের মাপ সামগ্রী সা' এবং মুদ্দে বরকত দাও" (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু মা ইয়াকূলু ইযা রাআল-বাকুরাতা মিনাছ-ছামারি, হাদীছ নং ৩৪৫৪, ৫খ., পৃ. ৫০৬)।

নব-দম্পতির জন্য দু'আ

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নব-দম্পতির জন্য এই দু'আ করিতেন ঃ

بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما فى خير.

"আল্লাহ বরকত দান করুন এবং তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুন। তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে কল্যাণমূলক কর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত ও মিল-মহব্বতের সহিত জীবন যাপনের সামর্থ্য দান করুন" (আবূ দাঊদ, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মা ইয়াকূলু লিল-মুতাযাব্বিজ, হাদীছ নং ২১৩০, ২খ.,পৃ. ২৪৮)।

বিবাহিত ব্যক্তির নিজের জন্য দু'আ

আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তাঁহার পিতা হইতে, তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের কেহ কোন নারীকে বিবাহ করে, তখন সে যেন এই দু'আ পাঠ করে ঃ

اللهم انى اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشرما جبلتها عليه.

"হে আল্লাহ! তোমার নিকট উহার কল্যাণের প্রার্থনা জানাই এবং প্রার্থনা জানাই তাহার সেই কল্যাণময় স্বভাবের যাহার উপর তুমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আর আমি তোমার আশ্রয় চাহিতেছি তাহার অনিষ্ট হইতে এবং তাহার আদীম প্রবৃত্তির অকল্যাণ হইতে যাহার উপর তুমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছ" (আবূ দাঊদ, কিতাবুন নিকাহ, বাবুন ফী জামি'ইন নিকাহ, হাদীছ নং ২১৬০, ২খ., পৃ. ২৫৫)।

সহবাসের পূর্বের দু'আ

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমাদের কেহ সহবাস করিতে ইচ্ছা করিলে সে যেন এই দু'আ পাঠ করেঃ

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان على ما رزقتنا.

"আল্লাহ্র নামে (আমরা মিলন করিতেছি), হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট হইতে শয়তানকে দূরে রাখ, আর আমাদেরকে তুমি (এই মিলনের ফলে) যে সন্তান দান করিবে তাহার হইতেও শয়তানকে দূরে রাখ" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২১৬১, ২খ., পৃ. ২৫৫)।

মজলিসশেষে দু'আ

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন কোন মজলিসের সমাপ্তি ঘোষণা করিতেন তখন এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

"হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার নিকট তাওবা করিতেছি" (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাব মা ইয়াকূলু ইযা কামা মিনাল মাজলিস, হাদীছ নং ৩৪৩৩, ৫খ., পৃ. ৪৯৪)।

সফরের দু'আ

ইব্ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন সফরের উদ্দেশ্যে বাহনে সাওয়ার হইতনে তখন তিনবার الله اكبر (আল্লাহু আকবার) বলিয়া এই দু'আ পাঠ করিতনে ঃ

سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك فى سفرنا هذا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا السير (السفر) واطو عنا بعد الأرض اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل.

"পাক-পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের জন্য উহাকে বশীভূত করিয়া দিয়াছেন, আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব আমাদের প্রতিপালকের নিকট। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই পুণ্য ও তাকওয়ার জন্য এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ্য তোমার কাছে চাহিতেছি যাহা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরকে সহজসাধ্য করিয়া দাও। হে আল্লাহ! তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী, আর পরিবার-পরিজনের তুমিই খলীফা" (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাব মা ইয়াকূলু ইযা রাকিবান-নাকাতা, হাদীছ নং ৩৪৪৭, ৫খ., পৃ. ৫০১-৫০২)।

মুসাফিরকে বিদায় দেওয়ার সময়ের দু'আ

ইব্ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কোন মুসলমানকে বিদায় দেওয়ার সময় দু'আ করিতেন ঃ

استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك.

"আমি তোমার দীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তিকে (পরিনামফল) পর্যায়কে আল্লাহ্‌র উপর ছাড়িয়া দিতেছি" (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাব মা ইয়াকূলু ইযা ওয়াদ্দা'আ ইনসানান, হাদীছ নং ৩৪৪৩, ৫খ., পৃ. ৪৯৯)।

বাজারে প্রবেশের দু'আ

ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বাজারের প্রবেশের সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠের নির্দেশ দিয়াছেন ঃ

لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير.

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁহারই। প্রশংসা তাঁহারই। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সকল প্রকার কল্যাণ তাঁহার হাতে। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান" (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাবু মা ইয়াকূলু ইযা দাখালাস-সূক, হাদীছ নং ২৪২৮, ৫খ., পৃ. ৪৯১)।

রোগী দেখার সময়ে দু'আ

'আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কোন রোগী দেখিতে গেলে এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافى لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.

"হে আল্লাহ! এই অসুবিধা দূর করিয়া দাও। তোমার সুস্থতা দান ছাড়া কাহারও সুস্থতা নাই। এমন সুস্থতা দাও যে, কোন রোগ-বালাই যেন ইহার বহির্ভূত না থাকে" (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাব ফী দু'আইল মারীদ, হাদীছ নং ৩৫৬৫, ৫খ., পৃ. ৫৬১)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) কখনও কখনও এই দু'আও পাঠ করিতেন ঃ لا بأس طهور انشاء الله "কোন ক্ষতি হইবে না, ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করিবে" (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাব 'আলামাতিন নুবূওয়াত ফিল–ইসলাম, হাদীছ নং ৩৬১৬, পৃ. ৭৪১)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, কেহ কোন রোগীকে দেখিতে গেলে রুগ্ন ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন না হইলে নিম্নের দু'আটি সাতবার পাঠ করিলে আল্লাহ তাহাকে নিরাময় দান করিবেন ঃ

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك.

"আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য আরশে আযীমের মহান প্রভু আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি" (তিরমিযী, কিতাবুত তিব্ব, বাব নং ৩২, হাদীছ নং ২০৮৩, ৪খ., পৃ. ৪১০)।

মুমূর্ষু রোগীর দু'আ

আইশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে মুমূর্ষু অবস্থায় এই দু'আ পাঠ করিতে শুনিয়াছি ঃ

اللهم اغفر لى وارحمنى والحقنى بالرفيق الاعلى.

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান বন্ধুর সহিত মিলাইয়া দাও" (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাব নং ৭৭, হাদীছ নং ৩৪৯৬, ৫খ., পৃ. ৫২৫)।

অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, 'আইশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) মুমূর্ষু অবস্থায় পানিতে দুই হাত প্রবেশ করাইয়াছেন, অতঃপর ভিজা হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ করেন এবং বলেন ঃ لا الـه الا الـلـه ان لـلـمـوت سـكـرات "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। নিশ্চয় মৃত্যুর যন্ত্রণা ভয়াবহ" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু সাকারাতিল মাওত, হাদীছ নং ৬৫১০, পৃ. ১৩৭৪)।

জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জানাযার সালাতে এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثأنا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده.

"হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, ছোট ও বড়, নর ও নারী এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিতদের ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাহাদেরকে তুমি জীবিত রাখিয়াছ, তাহাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখিও আর যাহাদেরকে মৃত্যু দান কর, তাহাদেরকে ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করিও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাহার ছওয়াব হইতে বঞ্চিত করিও না এবং তাহার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করিও না" (আবূ দাঊদ, কিতাবুল জানাইয, বাবুদ-দু'আ লিল-মায়্যিত, হাদীছ নং ৩২০১, ৩খ., পৃ. ২০৮)।

কবরে লাশ রখিবার দু'আ

ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কবরে লাশ রাখিবার সময় বলিতেন ঃ

بسم الله وعلى ملة رسول الله.

"(আমরা এই লাশ) আল্লাহ্র নামে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিল্লাতের (ধর্মের) উপর রাখিতেছি" (আবূ দাউদ, কিতাবুল জানাইয, বাব ফিদ-দু'আ লিল-মায়্যিত ইযা উদি'আ ফী কাবরিহী, হাদীছ নং ৩২১৩, ৩খ., পৃ. ২১১)।

কবর যিয়ারতের দু'আ

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কবরস্থানে গমন করিয়া এই দু'আ পড়িতেন ঃ

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون.

"হে কবরের অধিবাসী মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সহিত মিলিত হইব" (আবূ দাউদ, কিতাবুল জানাইয, বাবু মা ইয়াকূলু ইযা যারাল কুবূর হাদীছ নং ৩২৩৭, ৩খ., পৃ. ২১৬)।

মৃত্যু এবং জীবনের জন্য দু'আ

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন তোমাদের কেহ কোন বিপদের কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। আর কেহ যদি এমন অবস্থাতে পতিত হয় যে, তাহাকে মৃত্যু কামনা করিতেই হয়, তবে সে মৃত্যু কামনা না করিয়া এই দু'আ করিবে ঃ

اللهم احينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى.

"ইয়া আল্লাহ! যত দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় ততদিন তুমি আমাকে জীবিত রাখ এবং যখন আমার জন্য মৃত্যুই মঙ্গলজনক হয় তখন আমাকে মৃত্যু দাও" (বুখারী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাবুদ-দু'আ বিল-মাওতি ওয়াল-হায়াতি, হাদীছ নং ৬৫৫১, পৃ. ১৩৪৪)।

ইস্তিখারার দু'আ

জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে যাবতীয় কাজের জন্য ইস্তিখারা (আল্লাহর নিকট কাজের কল্যাণ কামনামূলক দু'আ) এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেমনিভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন, যখন তোমাদের কাহারও কোন বিশেষ কাজ করিবার ইচ্ছা হয় তখন সে যেন দুই রাক'আত নামায পড়িয়া এইরূপ দু'আ করে ঃ

اللهم انى استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا أعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر - ويسمى حاجته - خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدره لى الخير حيث كان ثم ارضنى به.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করিতেছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করিতেছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করিতেছি। কেননা তুমি শক্তিধর; আমি শক্তিহীন; তুমি জ্ঞানী, আমি জ্ঞানহীন। তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করিবে) তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়া ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্যাণকর হয় তবে উহা আমার জন্য নির্ধারিত কর এবং উহাকে আমার জন্য সহজলভ্য করিয়া দাও, অতঃপর উহাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে এই কাজটি তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দীন, আমার জীবিকা, আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়া ইহকালের ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে তুমি উহা আমার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দাও এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক, আমার জন্য সেই কল্যাণ নির্ধারিত করিয়া দাও, অতঃপর উহাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখ" (বুখারী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাবুদ-দু'আ ইনদাল ইস্তিখারা, হাদীছ নং ৬৩৮২, পৃ. ১৩৪৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র), তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, মদীনা সংস্করণ; (২) ইমাম বুখারী, আল-জামিউস সাহীহ, রিয়াদ ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.; (৩) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, কায়রো ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ.; (৪) ইমাম আবূ দাঊদ, আস-সুনান, কায়রো, তা. বি.; (৫) ইমাম তিরমিযী, আল-জামিউস সুনান, কায়রো, তা. বি.; (৬) ইমাম ইব্ন মাজা, সুনান, তাহ্কীক ঃ নাসিরুদ্দীন আলবানী, রিয়াদ ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.; (৭) ইমাম বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, বৈরূত ১৪১০ হি./১৯৯৯ খৃ.; (৮) ইমাম আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (ইবনুস সিন্নী নামে প্রসিদ্ধ), আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াল-লায়লাহ, জিদ্দা-বৈরূত, তা. বি.; (৯) খতীব তাবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, বৈরূত ১৩৯৯ হি/১৯৯৭ খৃ., ২য় সংস্ককরণ; (১০) ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ ফী হুদা খায়রিল 'ইবাদ, বৈরূত ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ., ২য় সংস্করণ; (১১) ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুসতাফা, তা. বি.।

মুহাম্মাদ জাবির হোসাইন

সংযোজন

দু'আর গুরুত্ব ও ফযীলাত

মহান আল্লাহ্ তাঁহার নিকট দু'আ করার জন্য তাঁহার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়াছেন এবং সেই দু'আ কবুলেরও আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব" (৪০ ঃ ৬০)।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ. اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাতে ঈমান আনয়ন করে যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে" (২ ঃ ১৮৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) দু'আকে সকল ইবাদতের মগয তথা সারনির্যাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

الدعاء مخ العبادة.

"দু'আ সকল ইবাদতের মগয" (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'আওয়াত, হাদীছ নং ৩৩৭১)।

অন্য এক রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (স) দু'আকেই ইবাদত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ঃ الدعاء هو العبادة "দু'আই ইবাদত" (তিরমিযী, কিতাবুত-তাফসীর, সূরা বাকারা, হাদীছ নং ২৯৬৯)।

দু'আ মানুষের তাকদীর পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد فى العمر الا البر.

"দু'আ ছাড়া অন্য কোন কিছুই তাকদীর রদ করিতে পারে না। আর সৎকর্ম ব্যতীত অপর কিছুই হায়াত বাড়াইতে পারে না" (তিরমিযী, কিতাবুদ কাদর, হাদীছ নং ২১৪২)।

দু'আই আল্লাহ্র নিকট বান্দার সর্বাধিক প্রিয় আবেদন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

ليس شيئ اكرم على الله تعالى بالدعاء.

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাপূর্ণ আর কিছু নাই" (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, হাদীছ নং ৩৩৭০)।

অপরপক্ষে আল্লাহ্র নিকট দু'আ না করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

من لم يدع الله سبحانه غضب عليه.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করে না, আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন" (ইব্ন মাজা, কিতাবুদ-দু'আ, হাদীছ নং ৩৮২৭)।

দু'আর দ্বারা মানুষের বালা-মসীবত ও বিপদাপদ দূর হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.

"যে সমস্ত বালা-মসীবত আসিয়াছে এবং যাহা এখনও আসে নাই সব ক্ষেত্রেই দু'আ উপকারী" (হিসনে হাসীন, পৃ. ১৫, হাকেম ও তাবারানীর বরাতে)।

মুসলমানের দু'আ আল্লাহ কবূল করেন, যেমন পূর্বোল্লিখিত আয়াতে ও হাদীছে আল্লাহ্‌র ওয়াদা উক্ত হইয়াছে। তবে কখনও বান্দা যাহা চায়, হুবহু তাহাই তাহাকে দেওয়া হয় অথবা তাহাকে প্রার্থিত জিনিস না দিয়া তাহার উপর আপতিত কোনও বিপদ হটাইয়া দেওয়া হয় অথবা কিয়ামতের জন্য তাহা জমা করিয়া রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سأل اوكف عنه من السوء مثله مالم يدع باثم او قطيعة رحم.

"কেহ যদি কোনও দু'আ করে আর তাহা যদি কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বদু'আ না হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সে যাহা প্রার্থনা করে তাহা তাহাকে দান করেন অথবা তাহার উপর আসন্ন সেই পরিমাণ অনিষ্ট রোধ করেন" (তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৩৮২)।

ইমাম আহমাদ (র)-এর বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে ঃ

ما من مسلم ينصب وجهه لله تعالى فى مسألة الا اعطاها اياه اما ان يعجلها له واما ان يدخرها له.

"যে কোনও মুসলমান আল্লাহ্‌র নিকট কিছু চাহিবার জন্য মুখ তোলে আল্লাহ অবশ্যই তাহার প্রার্থিত জিনিস তাহাকে দান করেন। প্রার্থিত জিনিসই তাহাকে প্রদান করেন অথবা তাহার জন্য তাহা জমা করিয়া রাখেন" (মুসনাদে আহমাদ, রাবী আবূ হুরায়রা (রা), হিসনু হাসীন হইতে এখানে উদ্ধৃত পৃ. ১৯)।

দু'আর আদব

দু'আ করার জন্য বেশ কিছু আদব (নিয়ম-কানুন) রহিয়াছে। উহার কিছু প্রসিদ্ধ আদব হইল ঃ ১. খানা-পিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও রোযগারের ক্ষেত্রে হারাম পরিহার করা; ২. ইখলাস তথা নিষ্ঠার সহিত দু'আ করা; ৩. দু'আর পূর্বে কিছু সৎকর্ম সম্পাদন করা, যথা সালাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত বা খতম করা অথবা কিছু দান-খয়রাত করা ইত্যাদি; ৪. পাক-পবিত্র হওয়া; ৫. উযূ করা, ৬. কিবলামুখী হওয়া; ৭. দু'আর পূর্বে সালাত আদায় করা; ৮. উভয় হাঁটু জোড় করিয়া আত্তাহিয়্যাতুর অবস্থায় বসা; ৯. দু'আর শুরু ও শেষে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা; ১০. প্রথমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করা; ১১. উভয় হাত প্রসারিত করিয়া উভয় কাঁধ পর্যন্ত অথবা বক্ষ বরাবর উত্তোলন করা; ১২. উভয় হাতের মধ্যে কিছুটা ফাঁক রাখা; ১৩. অত্যন্ত বিনয়-নম্রতা ও কাকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করা; ১৪. দু'আর সময় আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত না করা; ১৫. আল্লাহ তা'আলার সত্তাবাচক (ذاتى) ও গুণবাচক (صفاتى) নাম লইয়া

দু'আ করা; ১৬. নবী-রাসূলগণের ও আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উসীলা দিয়া দু'আ করা; ১৭ নিম্নস্বরে দু'আ করা, একেবারে আস্তেও না, খুব বেশী জোরেও না; ১৮. গুনাহের কথা স্বীকার করিয়া দু'আ করা; ১৯. সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত দু'আসমূহ বলা। তবে মাতৃভাষায় দু'আ করিতেও কোন বাধা নাই; ২০. নিজের জন্য প্রথমে দু'আ করা; অতঃপর পিতা-মাতা ও মুমিন ভাইদের জন্য দু'আ করা; ২১. ইমাম হইলে নিজের জন্য এবং অন্য সকলের জন্য দু'আ করা; ২২. দু'আ কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে দু'আ করা; ২৩. একাগ্রতা সহকারে দু'আ করা এবং আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা; ২৪. একই দু'আ বারবার বলা, অন্তত পক্ষে তিনবার বলা; ২৫. গুনাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ না করা; ২৬. দু'আর মধ্যে নিজের সমস্যাবলীর কথা উল্লেখ করা; ২৭. দু'আকারী ও শ্রোতা সকলের আমীন বলা; ২৮. দু'আ শেষ করার পর উভয় হাত মুখমণ্ডলে মোছা (হিসনে হাসীন, পৃ. ৩৯-৪২; কিতাবুল আযকার, পৃ. ৩৭০-৭২)।

দু'আ কবুল হওয়ার সময়

মহানবী (স) তাঁহার হাদীছে বেশ কিছু সময়ের উল্লেখ রহিয়াছেন, যখন দু'আ করিলে তাহা কবুল হয়। উহা নিম্নরূপ ঃ

প্রতিদিন রাত্রের শেষ প্রহরে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁহার নিকট দু'আ করিতে ও কিছু চাহিতে আহ্বান জানান। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الاخر كل ليلة فيقول من يسألنى فاعطيه من يدعنى فاستجيب له من يستغفرنى فاغفرله حتى تطلع الفجر.

"প্রতি রাত্রেই উহার শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে আল্লাহ তা'আলা (প্রথম আকাশে) অবতরণ করিয়া বলিতে থাকেন, আমার নিকট কে চাহিবে ? আমি তাহাকে দান করিব, আমার নিকট কে দু'আ করিবে ? আমি তাহার দু'আ কবুল করিব, আমার নিকট কে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ? আমি তাহাকে ক্ষমা করিব। এভাবে ভোর হওয়া পর্যন্ত তিনি বলিতে থাকেন" (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ; ইবুন মাজা, কিতাবুস-সালাত, হাদীছ নং ১৩৬৬)।

১. কদর রজনীতে; ২. আরাফাত দিবসে; ৩. রমযানুল মুবারকে; ৪. জুমু'আর রাত্রে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে; ৫. জুমু'আর দিনে। এই ব্যাপারে কয়েক ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা হইল ঃ আসরের পর হইতে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত। এতদ্ব্যতীত ইমাম মিম্বরে আরোহণ করা হইতে নামায শেষ করা পর্যন্ত সময়ের কথা হাদীছে উল্লিখিত আছে; ৬. অর্ধরাত্র অতিবাহিত হইবার পর; ৭. রাত্রের প্রথম তৃতীয়াংশে; ৮. রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে; ৯. প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশের মধ্যভাগে; ১০. সাহরীর সময়।

যেসব অবস্থায় দু'আ কবুল হয় ঃ দু'আকারী নিম্নলিখিত অবস্থায় দু'আ করিলে তাহা কবুল হওয়ার আশা করা যায় ঃ ১. নামাযের আযান হওয়ার সময় আযানের উত্তরদান ও আযানের দু'আ পড়ার পর; ২. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে; ৩. বিপদাপদে নিপতিত ব্যক্তি মুআয্যিনের حى على الصلوة (হায়্যা 'আলাস-সালাহ) ও حى على الفلاح (হায়্যা আলাল-ফালাহ) বলার পর দু'আ করিলে; ৪. যুদ্ধের ময়দানে কাতার সোজা করার সময়; ৫. যুদ্ধের ময়দানে আক্রমনোদ্যত অবস্থায়; ৬. ফরয নামাযের পরে; ৭. সিজদারত অবস্থায়; ৮. কুরআন কারীম তিলাওয়াত শেষে; ৯. কুরআন কারীম খতম করার পর; ১০. যমযমের পানি পানরত অবস্থায়; ১১. কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে; মৃত্যুপথযাত্রী এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই দু'আ করিবে। ১২. মোরগের আওয়ায শুনিবার সময়; ১৩. মুসলমানদের সমাবেশে একাকী বা সম্মিলিতভাবে দু'আ করিলে। অনুরূপভাবে যিকিরের মজলিসে ও কুরআন হাদীছ-এর মজলিসে। ১৪. ইমাম ولا الضالين (ওয়ালাদ্দুয়াল্লীন) বলার পরপর সকলে আমীন বলিলে; ১৫. মৃত ব্যক্তির চক্ষু বন্ধ করা অবস্থায়; ১৬ নামাযের ইকামত দেওয়ার সময়; ১৭. বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার সময়। ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁহার কিতাবুল উম্ম গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ কবুল হয় ইহা আমি বহু আলিমের মুখে শ্রবণ করিয়া মুখস্থ করিয়াছি এবং ১৮. কা'বা শরীফ দর্শনের সময়। উপরিউক্ত মুহূর্তগুলিতে দু'আ করিলে তাহা কবুল হওয়ার আশা করা যায় (আল-জাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২)।

দু'আ কবুল হওয়ার স্থান ঃ পবিত্র স্থানসমূহে দু'আ করিলে তাহা কবুল হয়। উক্ত পবিত্র স্থানসমূহের বর্ণনা প্রদান করত হযরত হাসান বাসরী (র) মক্কাবাসীদের নিকট একখানি পত্র লিখেন যাহা আল-জাযারী (র) তাঁহার হিসনে হাসীন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত পত্রে হাসান বাসরী পবিত্র মক্কার পনেরটি স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যেখানে দু'আ কবুল হয়। তবে দু'আ কবুল হওয়ার জন্য উক্ত স্থানগুলিই সীমাবদ্ধ নহে। হাসান বসরী (র) কর্তৃক উল্লিখিত স্থানগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. মাতাফ অর্থাৎ কা'বা শরীফের চতুষ্পার্শ্ব যাহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকে তাওয়াফ করে; ২. মুলতাযাম, কা'বা শরীফের দরজা ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী জায়গা যেখানে লোকজন দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে; ৩. মীযাব-এর নিচে অর্থাৎ কা'বা শরীফের ছাদের পানি পতিত হওয়ার নলের নিচে; ৪. কা'বা শরীফের ভিতরে; ৫. যমযম কূপের নিকট; ৬-৭. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপর; ৮. সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করার সময়; ৯. মাকামে ইবরাহীম-এর পিছনে; ১০. 'আরাফাতের ময়দানে; ১১. মুযদালিফায়; ১২. মিনায়; ১৩-১৪-১৫. মিনার তিনটি স্তম্ভের নিকট, যেখানে হাজ্জীগণ কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। আল-জাযারীর মতে মদীনায় নবী কারীম (স)-এর রওযা মুবারকের কাছেও দু'আ কবুল হয় (হিসনে হাসীন, পৃ. ৬৪-৬৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, স্থা.; (২) আত-তিরমিযী, আল-জামে' আস-সাহীহ, কুতুবখানা রাহীমিয়্যা, দেওবান্দ, ইউ. পি., তা. বি., বাংলা অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ.; (৩) ইব্ন মাজা, আস-সুনান, কুতুবখানা রাহীমিয়্যা, দেওবান্দ, ইউ. পি., তা. বি., বাংলা অনু. ইসলামিক ফাউন্ডশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০২ খৃ.; (৪) আন-নাওয়াবী, কিতাবুল-আযকার, দারুল-ফিকর আল-আরাবী, ১ম সং, বৈরূত ১৯৯২ খৃ.; (৫) মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জাযারী, হিসনে হাসীন মিন কালামি সায়্যিদিল মুরসালীন, দেওবান্দ, ইউ. পি. ১৯৭৪ খৃ., ৪র্থ সং.।

ডঃ আবদুল জলীল

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৈহিক গঠন

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁহার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দৈহিক অবয়ব এমন সুন্দরভাবে গঠন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্বে বা পরে কাহাকেও এমনভাবে গঠন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। কুরতুবী (র) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর অপরূপ সৌন্দর্যের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ আমাদের কাছে হয় নাই। যদি হইত তাহা হইলে আমাদের আঁখি যুগল তাঁহাকে পুরাপুরি অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িত (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ২খ., ১২৮)। নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলীর দ্বারা প্রমাণিত তাঁহার শারীরিক আকৃতির বর্ণনা নিম্নরূপ।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৈহিক সৌন্দর্য

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৈহিক সৌন্দর্যের আলোচনা করিয়া শেষ করা সত্যই দুষ্কর। তাঁহার সর্বাঙ্গ ছিল অতুলনীয় সুন্দর। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁহাকে এক অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী করিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

كان النبى أحسن الناس.

"মহানবী (স) ছিলেন সৌন্দর্যের সুন্দরের অধিকারী" (বুখারী, পৃ. ১২৮২, হা. ৬০৩৩)।

হযরত বারা'আ ইব্‌ন 'আযিব (রা) বলেন ঃ

ما رأيت شيئا قط أحسن منه.

"আমি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে অধিক সুন্দর কখনও কোন কিছু দেখি নাই" (বুখারী, পৃ.৭২৯, হা. ৩৫৫১)।

হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) বলেন ঃ

رأيت رسول الله ﷺ فى ليلة اضحيان فجعلت انظر الى رسول الله ﷺ والى القمر وعليه حلة حمراء فاذا هو عندى أحسن من القمر.

"আমি এক চাঁদনী রজনীতে লাল ডোরাকাটা লুঙ্গি ও চাদর পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিতে পাইলাম। আমি কখনও চাঁদের দিকে, আবার কখনও তাঁহার দিকে তাকাইতেছিলাম। পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম যে, তিনি চাঁদের চেয়েও অধিক উজ্জ্বল এবং সুন্দর" (তিরমিযী, ১০খ., পৃ. ২৫৩, হা. ২৮১৬)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

ما رأيت شيئا احسن من رسول الله ﷺ كانما الشمس تجرى فى وجهه.

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে বেশী সুন্দর কোন কিছু দেখি নাই। তাঁহার ললাটে যেন সূর্য প্রবাহিত ছিল" (মাওয়ারিদুয যাম'আন ইলা যাওয়াইদে ইব্‌ন হিব্বান, ২খ., পৃ. ৯৪৫, হা. ২১১৮)।

হযরত 'আলী (রা) বলেন ঃ

لم أر قبله ولا بعده مثله.

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বে ও পরে তাঁহার ন্যায় সুন্দর কোন লোক দেখি নাই" (শামাইল তিরমিযী, বাংলা অনু. আবদুল জলীল, পৃ. ৬, হা. ৫)।

তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্যের বর্ণনায় সাহাবায়ে কিরাম (রা) হইতে এইভাবে আরও বহু হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

মুখমণ্ডলের বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমণ্ডল এতই সুন্দর ছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাঁহার মুখমণ্ডলের সাথে চন্দ্র-সূর্যকে তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার চেহারা মুবারক চন্দ্র-সূর্যের চেয়েও ছিল উজ্জ্বল ও দীপ্তিময়।

হযরত বারা'আ (রা) বলেন ঃ

كان رسول الله ﷺ احسن الناس وجها.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমণ্ডল ছিল সর্বাধিক সুন্দর" (বুখারী, পৃ.৭২৯, নং ৩৫৪৯)।

হযরত বারা'আ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ

أكان وجه رسول الله ﷺ مثل السيف فقال لا بد مثل القمر.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমণ্ডল কি তরবারির ন্যায় চকচকে ছিল? তিনি বলিলেন, না, বরং চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল" (বুখারী, পৃ. ৭২৯, হা. ৩৫৫২)।

এইখানে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, তাঁহার চেহারা মুবারককে তরবারির সহিত তুলনা করা যায় না। কারণ তরবারি হইতেছে লম্বা আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা ছিল কিছুটা গোলাকার। দ্বিতীয়ত, উজ্জ্বলতার দিক হইতেও তরবারির সহিত তাঁহার চেহারা মুবারকের তুলনা হয় না। কারণ তাঁহার চেহারা ছিল তরবারির চেয়েও উজ্জ্বল। ইহা ছাড়া চন্দ্রের মধ্যে দুইটি গুণই বিদ্যমান। অর্থাৎ গোলাকৃতি ও উজ্জ্বলতা। সুতরাং বারা'আ (রা) তাঁহার চেহারা মুবারককে চন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ২২০)।

হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মুবারক কি তরবারির ন্যায় ছিল ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ

لا بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرا.

"না; বরং চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং গোলাকার" (মুসলিম, ৮খ., পৃ. ১০৬, হা. ২৩৪৪)।

এই গোলাকার বলিতে একেবারেই গোল ছিল তাহা নয়, বরং পরিমিত গোল ছিল। যেমন হযরত আলী (রা) বলেন, ولا بالمكلثم وكان فى وجهه تدوير "তাঁহার চেহারা মুবারক একেবারে গোলাকৃতির ছিল না, বরং কিছুটা গোল ছিল" (মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ১৬; শামায়েল ইমাম তিরমিযী, পৃ. ৭)।

হযরত আবূত তুফাইল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ

أرايت رسول الله ﷺ قال نعم كان ابيض مليح الوجه.

"আপনি কি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ, তিনি ছিলেন গৌর বর্ণের, সুন্দর কমনীয় চেহারাবিশিষ্ট" (মুসলিম, ৮খ., পৃ. ১০৩, হা. ২৩৪০)।

হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

كان إذا سرّ استنار وجهه كانه قطعة قمر.

"রাসূলুল্লাহ (স) যখন কোন কারণে উৎফুল্ল হইতেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডল ঔজ্জ্বল্যের কারণে চমকাইতে থাকিত। মনে হইত যেন চন্দ্রের একটি টুকরা" (সাহীহ আল-জামে আস-সাগীর ওয়া-যিয়াদাতুহু, ৪খ., পৃ. ২২২, হা. ৪৬১৫)।

একবার তিনি হযরত 'আইশা (রা)-এর কাছে অবস্থান করিতেছিলেন। ঘর্মাক্ত হওয়ায় তাঁহার চেহারা আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। এই অবস্থা অবলোকন করিয়া হযরত 'আইশা (রা) আবূ কুবায়র হাজলীর এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ

واذا نظرت الى أسرة وجهه - برقت كبرق العارض المتهلل.

"তাঁহার চেহারায় তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম দ্যুতিময় মেঘ যেন চমকায় অবিরাম" (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৯৭)।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহাকে দেখিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন ঃ

أمين مصطفى بالخير يدعى-كضوء البدر زايله الظلام.

"মুসতাফা ছিলেন বিশ্বস্ত, ভালোর পথে দেন দাওয়াত, পূরণ করেন অঙ্গীকার, চতুর্দশীর চাঁদের ন্যায় অন্ধকারকে উহা দূরীভূত করেন" (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৯৭)।

হযরত উমার (রা) তাঁহাকে দেখিয়া কা'ব ইব্ন যুহায়র-এর এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন ঃ

لو كنت من شيئ سوى بشر - كنت المنور ليلة البدر.

"মানুষ যদি না হইতেন এই আল্লাহ্র প্রিয়জন, চতুর্দশীর রাত তিনি করিতেন তবে রওশন" (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ২২৪)।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই সমস্ত বস্তুর সহিত তুলনা করা শুধু তাঁহার একটি উপমা পেশ করিবার জন্য। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার সত্তা তুলনাহীন। কেননা উপমার তো খুঁত আছে। কিন্তু তিনি এমন এক সত্তা যাঁহার কোন খুঁত নাই। কবি আবূ নুওয়াস বলেন ঃ

وتتيه الشمس والقمر المنير - إذا قلنا كانهما الامير
وان الدر ينقصه المسير - لان الشمس تغرب حين تمسى

"দীপ্তিময় চন্দ্র-সূর্যকে আমরা আমীর হিসাবেই গণ্য করি। অথচ সন্ধ্যাবেলায়ই তো সূর্য অস্তমিত হইয়া যায়। আর চন্দ্র তো উহার কক্ষপথে চলিতে চলিতে ক্ষয় হইয়া যায়" (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ২১৮)।

মস্তক মুবারকের বর্ণনা

মহানবী (স)-এর মস্তক মুবারকের আকার ছিল কিছুটা বড়। হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মস্তক ছিল ضخم الرأس (কিছুটা বড়) (শামাইল, ইমাম তিরমিযী, অনু. আবদুল জলীল, পৃ. ৬)।

হযরত হিন্দ ইব্ন আবূ হালা (রা) বলেন, كان عظيم الهامة "রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র মস্তক একটু বড় ছিল" (মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্য, পৃ. ১৮; ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, পৃ. ৮)।

চুল মুবারকের বর্ণনা

মহানবী (স)-এর চুল মুবারক ছিল খুবই সুন্দর। তাঁহার চুল অত্যধিক কুঞ্চিতও ছিল না আবার একেবারে সোজাও ছিল না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চুল ছিল সামান্য কুঞ্চিত (সিলসিলাতুল আহাদীছ আস-সাহীহাহ্, ৫খ., পৃ. ৮২, হা. ২০৫৩; ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, পৃ. ১২)।

কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ

كيف كان شعر رسول الله ﷺ قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين اذنيه وعاتقه.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর চুল মুবারক কেমন ছিল? তিনি বলিলেন, তাঁহার কেশ মুবারক না খুব বক্র ছিল আর না খুব সরল। তাঁহার মাথার চুল দুই কানের মধ্য পর্যন্ত লম্বা ছিল" (মুসলিম, ফাদাইল, ৮খ., পৃ. ১০১, হা. ৬০৬৭/৯৪/২৩৩৮)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূল (স)-এর চুলের বর্ণনা বলেন ঃ

شديد سواد الشعر.

"তাঁহার চুল ছিল খুবই কালো" (সাহীহ আল-জামে আস-সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, ৪খ., পৃ. ১৯৯, হা. ৪৫০৯)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর তিন ধরনের চুল রাখার বর্ণনা হাদীছ শরীফে পাওয়া যায়। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

كان شعر رسول الله الى نصف اذنيه.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর কেশগুচ্ছ কানের অর্ধেক পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল" (ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, পৃ. ২৮)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাথার চুল তাঁহার দুই কানের মাঝখান পর্যন্ত লম্বা ছিল" (মুসলিম, ৮ খ., পৃ. ১০১, হা. ৬০৬৭/৯৪/২৩৩৮)।

হযরত বারাআ (রা) বলেন ঃ

له شعر يبلغ شحمة اذنيه.

"তাঁহার চুল তাঁহার দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌছিত" (বুখারী, পৃ. ৭২-৯ হা. ৩৫৫১)।

হযরত বারা'আ (রা) আরও বলেন ঃ

ما رأيت من ذى لمة احسن فى حلة حمراء من رسول الله له شعريضرب منكبيه.

"লাল ডোরাবিশিষ্ট লুঙ্গি পরিহিত 'লিম্মাহ' তথা ঘাড় পর্যন্ত প্রলম্বিত চুলওয়ালা কোন ব্যক্তিকেই আমি রাসূলুল্লাহ (স) অপেক্ষা সুন্দর দেখি নাই" (আবূ দাউদ, কিতাবুত-তারাজ্জুল, ৪খ., পৃ. ৭৯, হা. ৪১৮৩)।

আল-বারা'আ (রা) বলেন ঃ

إن جمته لتضرب قريبا من منكبه.

"তাঁহার মাথার চুল প্রায় তাঁহার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছিত" (বুখারী, লিবাস, বাব আল-জা'দ, পৃ. ১২৬১, বা. ৫৯০১)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন ঃ

كان شعر رسول الله ﷺ فوق الوفرة ودون الجمة.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর চুল মুবারক ছিল ওয়াফরাহ হইতে কম এবং জুম্মাহ হইতে বেশী" (আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ.৭৯, হা. ৪১৮৭)।

হযরত উম্মে হানী (রা) বলেন ঃ

قدم النبى ﷺ مكة وله أربع غدائر تعتى عقائص.

"রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের কাছে মক্কায় আগমন করিলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁহার মাথার চুল চার গুচ্ছে বিভক্ত ছিল" (আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ৮০, হা. ৪১৯১)।

উল্লিখিত হাদীছসমূহের আলোকে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর তিন ধরনের চুল ছিল। জুম্মাহ, লিম্মাহ ও ওয়াফরাহ। মাথার চুল লম্বা হইয়া কাঁধ পর্যন্ত পৌছাইলে ইহাকে 'জুম্মাহ' বলা হয়; আর ঘাড়ের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌছাইলে ইহাকে 'লিম্মাহ' বলা হয় এবং কর্ণমূল বা কর্ণের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌছাইলে ইহাকে 'ওয়াফরাহ' বলা হয়।

চুল আঁচড়ানো

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মাথার চুল সুন্দর করিয়া আঁচড়াইয়া রাখিতেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

إن رسول الله ﷺ كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رءوسهم فكان اهل الكتاب يسدلون رءوسهم وكان رسول الله ﷺ يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمى فيه بشيئ ثم فرق رسول الله ﷺ رأسه.

"যেই সমস্ত ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল হয় নাই সেইসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স) আহলে কিতাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখাকে পছন্দ করিতেন। তৎকালে আহলে কিতাবগণ তাহাদের মাথার চুল সোজা ছাড়িয়া রাখিত। আর মুশরিকরা সিঁথি কাটিয়া চুলগুলিকে দুই ভাগ করিত। মহানবী (স) সিঁথি না কাটিয়া শুধু পিছনের দিকে ঝুলাইয়া রাখিতেন। অবশ্য পরে তিনি সিঁথি কাটিয়াছেন" (বুখারী, মানাকিব, বাব ২৩, পৃ. ৭৩০, হা. ৩৫৫৮)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন ঃ

كنت اذا اردت ان افرق رأس رسول الله ﷺ صدعت الفرق من يافوخه وارسل ناصيته بين عينيه.

"আমি যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাথায় সিঁথি কাটিতে ইচ্ছা করিতাম, তখন আমি উহার মধ্যস্থল হইতে সিঁথি কাটিয়া সম্মুখের চুল উভয় চক্ষুর মাঝামাঝি স্থান বরাবর হইতে ছাড়িয়া দিতাম" (আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ৮০, হা. ৪১৮৯)।

তিনি আরও বলেন ঃ

كنت ارجل رأس رسول الله ﷺ وانا حائض.

"আমি ঋতুবতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাথা আঁচড়াইয়া দিতাম" (ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, অনু. পৃ. ৩১)।

দাড়ি মুবারক

তাঁহার দাড়ি মুবারক ছিল অত্যন্ত কালো ও ঘন। হিন্দ ইব্ন আবূ হালাহ-এর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাড়ি মুবারক ছিল كث اللحية বা ঘন এবং পরিপূর্ণ (আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ১৯)।

চুল ও দাড়ির শুভ্রতা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর চুল ও দাড়ি খুব অল্প সংখ্যকই পাকিয়াছিল। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

وليس فى رأسه ولحيته شرون شعرة بيضاء.

"রাসূলুল্লাহ (স) যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁহার মাথায় ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা ছিল না" (বুখারী, মানাকিব, পৃ. ৭২৮, হা. ৩৫৪৭)।

হযরত আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন ঃ

رايت النبى ﷺ ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة.

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিয়াছি এবং তাঁহার নিচের ঠোঁটের নিম্নভাগে দাড়ির উপরিভাগে কিছুটা শুভ্রতার ছাপ দেখিয়াছি" (বুখারী, পৃ. ৭২৮, হা. ৩৫৪৫)।

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চুলের শুভ্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ

كان إذا دهن راسه لم ير منه شيئ واذا لم يدهن رائى منه.

"যখন তিনি মাথায় তৈল ব্যবহার করিতেন তখন কিছু দেখা যাইত না, আর যখন তৈল ব্যবহার করিতেন না তখন কিছু দেখা যাইত" (বুখারী, পৃ. ৭২৮, হা. ৩৫৪৫)।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

ما عددت فى رأس رسول الله ﷺ ولحيته الا اربع عشرة شعرة بيضاء.

" আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাথায় ও দাড়ি মুবারকে চৌদ্দটির বেশী সাদা চুল গণনা করি নাই" (ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, অনু. ৩৪)।

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ

اما كان فى رأس رسول الله ﷺ شيب قال لم يكن فى رأسً رسول الله ﷺ شيب الاشعرات فى مفرق راسه اذا ادهن واراهن الدهن.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাথায় কি পাকা চুল ছিল? তিনি বলিলেন, সিঁথিতে কয়েকটি পাকা চুল ছিল। কিন্তু তৈল ব্যবহার করিলে উহা দেখা যাইত না" (ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, অনু. পৃ. ৩৮)।

মোটকথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাদা চুল খুবই কম ছিল। কিন্তু উহার সংখ্যায় মতানৈক্য রহিয়াছে। কোন বর্ণনামতে চৌদ্দ, আবার অন্য বর্ণনায় সতের, আঠার এবং বিশ পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই মতভেদ তেমন কিছু নয়। কারণ ইহা বয়সের পার্থক্যের দরুনও হইতে পারে।

চুল ও দাড়িতে খেযাব লাগানো

মহানবী (স) চুল ও দাড়িতে খেযাব লাগাইয়াছেন কিনা তাহাতে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন বর্ণনামতে তিনি চুল ও দাড়িতে মেহেদীর খেযাব ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া

প্রমাণিত হয়, আবার অন্য বর্ণনায় তাহা করেন নাই বলিয়াও প্রমাণিত হয়। হযরত উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাওহাব (র) বলেন ঃ

دخلت على ام سلمة فاخرجت الينا شعرا من شعر النبى ﷺ مخضوبا.

"আমি হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গমন করিলে তিনি আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিযাবকৃত কিছু চুল বাহির করিলেন" (বুখারী, পৃ. ১২৪১, হা. ৫৮৯৭)।

হযরত কাতাদা (র) বলেন ঃ

قلت لانس بن مالك هل خضب رسول الله ﷺ قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا فى صدغيه.

"আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ (স) কি খেযাব লাগাইতেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চুল এই পর্যায়ে পৌঁছায় নাই যে, খেযাব লাগানোর প্রয়োজন হইত; বরং তাঁহার দুই কানপট্টির পার্শ্বে জুলফীর সামান্য কয়েকটি চুল সাদা হইয়াছিল মাত্র" (ইমাম তিরমিযীর শামায়েল, অনু. পৃ. ৩৪)।

হযরত ইব্‌ন উমার (রা) বলেন ঃ

كان يصفر لحيته بالورس والزعفران.

"তিনি তাঁহার দাড়ি ওয়ারস ঘাস এবং জাফরান দ্বারা হলুদ বর্ণের করিয়া ফেলিতেন" (আবূ দাঊদ, কিতাবুত তারাজ্জুল, বাব ১৯, ৪খ., পৃ. ৮৪, হা. ৪২১০)।

হযরত আবূ রিমছা (রা) বলেন ঃ

انطلقت مع أبى نحـو النبى ﷺ فـاذا هو ذو وفـرة بهـا ردع حنّا ء وعليـه بردان اخضران.

"আমি আমার পিতার সহিত মহানবী (স)-এর নিকট আগমন করিলাম। তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি ওয়াফরা চুলবিশিষ্ট ও তাহাতে মেহেদীর আলামত। আর তাঁহার গায়ে ছিল একজোড়া সবুজ রংগের চাদর" (আবূ দাঊদ, ৪খ., পৃ. ৮৩, হা. ৪২০৬)।

উভয় ধরনের হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) মাঝে মাঝে খিযাব ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই করিতেন না।

গোঁফ

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার গোঁফ কাটিয়া ছোট করিতেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

كان النبى ﷺ يقصب أو يأخذ من شاربه

"মহানবী (স) তাহার গোঁফ ছোট করিয়া রাখিতেন" (তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, বাব ১৬, ৫খ., পৃ. ৯৩, হা. ২৭৬০)।

কপালের বর্ণনা

মহানবী (স)-এর কপাল মুবারক ছিল প্রশস্ত। হযরত হিনদ ইব্ন আবূ হালাহ (রা) বলেন ঃ كان واسع الجبين. "রাসূলুল্লাহ (স)-এর কপাল ছিল প্রশস্ত" (আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ১৯; ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, অনু. পৃ. ৯)।

হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ

كان إذا نزل الوحى عليه ثقل لذالك وتحدر جبينه عرقا كانه الجمان وان كان فى البرد.

"যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ওহী নাযিল হইত, তখন তিনি গম্ভীর হইয়া যাইতেন এবং তাঁহার কপাল হইতে মুক্তার ন্যায় ঘাম ঝরিয়া পড়িত, এমনকি শীতকালেও" (সিলসিলাতুল আহাদীছ আস-সাহীহা, ৫খ., পৃ. ১২৪, হা. ২০৮৮)।

ভ্রূদ্বয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভ্রূদ্বয় ছিল সরু, ঘন এবং পৃথক পৃথক। হিনদ ইব্ন আবূ হালাহ বর্ণনা করেনা ঃ

أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب.

"তাঁহার ভ্রূদ্বয় ছিল সরু, ঘন এবং পৃথক পৃথক; একত্রে মিলিত ছিল না। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে একটি রগছিল যাহা ক্রোধের সময় স্পষ্ট হইয়া উঠিত" (ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, অনু. ৯; হা. ৭; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়া, পৃ. ১৯)।

চক্ষুদ্বয়

তাঁহার চক্ষু মুবারকের মনি অত্যন্ত কালো ছিল। হযরত আলী (রা)-এর বর্ণনামতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় ছিল اسود الحدقة "চক্ষুর মনি অত্যন্ত কালো" (আলবানী, সাহীহ আল-জামে আস-সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, ৪খ., পৃ. ১৯৭, হা. ৪৪৯৭)।

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-এর বর্ণনামতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় ছিল اشكل العين "লাল ডোরাযুক্ত" অর্থাৎ চক্ষুদ্বয়ের সাদা অংশ আভা মিশ্রিত ছিল (মুসলিম, ৮খ., পৃ. ১০২; হা. ২৩৩৯)।

হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর বর্ণনামতে তাঁহার চক্ষুর পাতা ছিল أهدب الشفار "দীর্ঘ ও কোমল" (আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ১৬)।

নাসিকা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাক অতি সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ ছিল। হিনদ ইব্ন আবূ হালা-এর বর্ণনামতে তাঁহার নাক ছিল اقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم تأمله اشم. "তাঁহার নাক সামান্য উঁচু ও দীর্ঘ ছিল এবং উহাতে জ্যোতি ঝলমল করিত। কেহ গভীরভাবে না দেখিলে উহাকে উঁচু

নাকবিশিষ্ট মনে হইত, কিন্তু ভালভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত নূরের আতিশয্যে উহা উঁচু মনে হইতেছে" (ইমাম তিরমিযী শামায়েল, অনু. পৃ. ৯; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ১৯)।

গণ্ডদ্বয়

হিন্‌দ ইব্‌ন আবূ হালাহ-এর বর্ণনামতে তাঁহার গণ্ডদ্বয় ছিল سهل الخدين "সমতল এবং হালকা মাংসল" (ইমাম তিরমিযীর শামায়েল, অনু. পৃ. ৯; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইল, পৃ. ১৯)।

মুখগহ্বর

হিন্‌দ ইব্‌ন আবূ হালাহ-এর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখ গহব্বর ضليع الفم "যথোপযুক্ত প্রশস্ত ও বৃহৎ ছিল" যাহা সুস্পষ্ট আলোচনার প্রতীক হিসাবে আরবে প্রশংসিত ছিল (ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, অনু. পৃ. ৯; আলবানী, পৃ. ১৯)। হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) বলেন ঃ

كان رسول الله ﷺ ضليع الفم.

"রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন যথোপযুক্ত প্রশস্ত মুখ গহ্বরের অধিকারী" (মুসলিম, ৮খ., পৃ. ১০২, হা. ২৩৩৯)।

দন্ত মুবারক

তাঁহার দন্ত মুবারক ছিল উজ্জ্বল চকচকে এবং সম্মুখের দাঁতে সামান্য ফাঁক ছিল।

كان رسول الله افلج الثنيتين اذا تكلم رؤى كالنور يخرج من بين ثناياه.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখের দাঁতে সামান্য পরিমাণ ফাঁক ছিল। যখন তিনি কথা বলিতেন তখন মনে হইত, ফাঁক দিয়া যেন নূর বা আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে" (আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ২৯)।

উভয় কাঁধ

হযরত বারাআ (রা) বলেন ঃ

كان النبى ﷺ مربوعا بعيد ما بين المنكبين.

"রাসূলুল্লাহ (স) মাঝারী গড়নের ছিলেন। তাঁহার উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত ছিল" (বুখারী, মানাকিব, বাব ২৩, পৃ. ৭২৯, হা. ৩৫৫১)।

হযরত আলী (রা)-এর বর্ণনামতে جليل المشاش والكتد "তাঁহার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান মোটা ও মাংসল ছিল" (ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, অনু. পৃ. ৭; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ১৬)।

ঘার মুবারক

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘাড় ছিল খুবই সুন্দর। হিনদ ইব্‌ন আবূ হালাহ্ বলেন ঃ

كان عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة .

"তাঁহার ঘাড় এমন সৌন্দর্যময় এবং হালকা ছিল, যেমন মূর্তির ঘাড় পরিষ্কারভাবে খোদাই করা হইয়া থাকে এবং উহা রৌপ্যবর্ণ, উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময় ছিল" (ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, অনু. পৃ. ৯)।

বক্ষ মুবারক

তাঁহার বক্ষ মুবারক ছিল সমতল এবং চওড়া। হিনদ ইব্‌ন আবূ হালাহ (রা) বলেন ঃ

سواء البطن والصدر عريض الصدر.

"তাঁহার পেট ও বক্ষ সমতল ছিল কিন্তু বক্ষদেশ প্রশস্ত ছিল" (ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, অনু. পৃ. ৯; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ১৯)।

পেট মুবারক

হযরত হিন্‌দ ইব্‌ন আবূ হালাহ-এর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পেট ছিল سواء الطف 'সমতল' (ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, অনু. পৃ. ৯)।

মাসরুবা মুবারক

বক্ষদেশ হইতে নাভি পর্যন্ত কেশের সরু রেখাকে মাসরুবা বলা হয়। হযরত আলী (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) طويل المسربة বক্ষ হইতে নাভি পর্যন্ত সরু কেশের দীর্ঘ রেখাসম্পন্ন ছিলেন" (তিরমিযী, মানাকিব, হা. ৩৬৪৭)।

হযরত হিন্‌দ ইব্‌ন আবূ হালাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর دقيق المسربة বা বক্ষদেশ হইতে নাভী পর্যন্ত পশমের একটি সূক্ষ্ম রেখা ছিল (ইমাম তিরমিযী, শামায়েল, অনু. পৃ. ৯; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ১৯)।

পিঠ মুবারক

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

كان إذا وضع رداءه عن منكبيه فكانه سبيكة فضة.

"রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁহার উভয় কাঁধ হইতে চাদর সরাইতেন তখন তাঁহার পিঠ মনে হইত যেন রৌপ্য দ্বারা তৈরী" (আলবানী, সাহীহ আল-জামে আস-সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, ৪খ., ১৯৯, হা. ৪৫০৯)।

হস্তদ্বয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উভয় হাত ছিল মাংসল ও লম্বা। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

كـان الـنـبـي ﷺ ضـخـم الـيـديـن .

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর উভয় হাত ছিল মাংসল ও লম্বা" (বুখারী, পৃ. ১২৬২, হা. ৫৯০৭)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

كـان شـيـم الـذراعـيـن .

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর উভয় হাত লম্বা ও মাংসল ছিল" (আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আস-সাহীহাহ, ৫খ., পৃ. ১৩০, হা. ২০৯৫)।

দুই হাতের তালু

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

وكـان بسـط الـكـفـيـن .

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুই হাতের তালু ছিল চওড়া" (বুখারী, পৃ. ১২৬২, হা. ৫৯০৭)।

তিনি আরও বলেন ঃ

كـان الـنـبـى ﷺ شـثـن الـقـدمـيـن والـكـفـيـن .

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুই পা এবং হাতের তালুদ্বয় মাংসল ছিল" (বুখারী, লিবাস, পৃ. ১২৬২, হা. ৫৯১০)।

দুই হাতের কব্জি

হিন্দ ইব্ন আবূ হালাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) طويل الزندين "প্রলম্বিত কব্জির অধিকারী ছিলেন" (আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ২০)।

হাতের কোমলতা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুবারক হস্তদ্বয় খুবই কোমল ছিল। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبى ﷺ .

"কোন রেশম কিংবা কোন গরদকেও আমি মহানবী (স)-এর হাতের তালু অপেক্ষা অধিকতর কোমল পাই নাই" (বুখারী, পৃ. ১৭৩০ হা. ৩৫৬১)।

শীতলতা ও সুগন্ধি

হযরত আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন, একদা আমি মহানবী (স)-এর হাত ধরিয়া উহা আমার চেহারায় বুলাইতে লাগিলাম। তখন আমার মনে হইল ঃ

فـاذا هى أجرد مـن الـثـلـب وأطـيـب رائـحـة مـن الـمـسـك .

"তাঁহার হাত মুবারক বরফ অপেক্ষা অধিক শীতল এবং মেশক অপেক্ষা অধিক সুগন্ধিযুক্ত" (বুখারী, পৃ. ৭২৯, হা. ৩৫৫৩)।

হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার গণ্ডদ্বয় হাত দ্বারা মুছিয়া দিলেন। আমি তাঁহার হাতের শীতলতা অনুভব করিলাম এবং সুগন্ধি পাইলাম। মনে হইল. তিনি যেন তাহা আতর বিক্রেতার ভাণ্ডার হইতে এইমাত্র বাহির করিলেন (মুসলিম, ৮খ., পৃ. ৯৩, হা. ২৩২৯)।

বগলদ্বয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বগলদ্বয় খুবই শুভ্র ছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বুহায়না (রা) বলেন ঃ

إن النبى ﷺ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.

"মহানবী (স) যখন সিজদা করিতেন। তখন উভয় হাতকে পার্শ্বদেশ হইতে ফাঁকা রাখিতেন। ফলে তাঁহার উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যাইত" (বুখারী, সালাত, বাব ২৭, হা. ৩৯০)।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

ان رسول الله ﷺ كان لا يرفع يديه فى شيئ من دعائه الا فى الاستقاء فانه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.

"ইসতিসকার সালাতের দু'আয় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার উভয় হাত এতটা উর্ধ্বে উঠাইতেন যে, তাঁহার বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হইত" (বুখারী, ইসতিসকা, বাব ২২, নং ১০৩১; মানাকিব, বাব ২৩, হা. ৩৫৬৫)।

পদদ্বয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পদদ্বয় ছিল মাংসল। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

كان النبى ﷺ ضخم اليدين والقدمين لم ار قبله ولا بعده مثله.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় মাংসল ছিল। আমি তাঁহার পূর্বে বা পরে কাহাকেও তাঁহার অনুরূপ দেখি নাই" (বুখারী, পৃ. ১২৬২, হা. ৫৯০৭)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

كان النبى ﷺ ضخم القدمين حسن الوجه لم ار بعده مثله.

"মহানবী (স)-এর দুই পা ছিল মাংসল, চেহারা মুবারক ছিল সুন্দর। আমি তাঁহার পরে তাঁহার অনুরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই" (বুখারী, পৃ. ১২৬২, হা. ৫৯০৯)।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

جاء النبى ﷺ الينا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبت لاقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه علي صدرى.

"রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট আসিলেন, তখন আমরা বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমি উঠিয়া বসিতে চাহিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাক এবং তিনি আমাদের মাঝখানে এমনভাবে বসিয়া পড়িলেন যে, আমি তাঁহার পদদ্বয়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করিলাম" (বুখারী, পৃ. ৭৬২, হা. ৩৭০৭)।

হিন্দ ইব্‌ন আবূ হালাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পায়ের তালু خمصان الاخمصين "কিছুটা গভীর ছিল" (আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ২০; ইমাম তিরমিযী, অনু. শামাইল, পৃ. ৯)।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

كان النبى ﷺ شثن القدمين والكفين.

"মহানবী (স)-এর দুই পায়ের পাতা ও দুই হাতের তালু মাংসল ছিল" (বুখারী, পৃ. ১২৬২, হা. ৫৯১০)।

হযরত মায়মূনা বিন্‌ত কারদাম (রা) বলেন ঃ

رأيت رسول الله ﷺ فما نسيت طوول اصبع قدميه السبابة على سائر أصابعه.

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিয়াছি। তাঁহার পদদ্বয়ের দ্বিতীয় আঙ্গুল সকল আঙ্গুলের মধ্যে লম্বা ছিল, আমি ইহা ভুলি নাই" (আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ২৯২)।

তাঁহার পায়ের উপরিভাগ সমতল ছিল। হিন্দ ইব্‌ন আবূ হালাহ (রা) বলেন ঃ

مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلعا.

"তাঁহার পায়ের উপরিভাগ ছিল সমতল। পদদ্বয়ের উপর পানি পড়িতেই গড়াইয়া পড়িয়া যাইত, স্থির থাকিত না" (ইমাম তিরমিযী, অনু. শামায়েল, পৃ. ৯; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ২০)।

হিন্দ ইব্‌ন আবূ হালা বলেন, شائل الاطراف "তাঁহার হাত-পায়ের আঙ্গুল পরিমিত দীর্ঘ ছিল" (ইমাম তিরমিযী, অনু. পৃ. ৯; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ২০)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পায়ের নলা ছিল খুবই উজ্জ্বল। হযরত আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন ঃ

خرج رسول الله ﷺ كانى أنظر الى وبيص ساقيه.

"রাসূলুল্লাহ (স) তাঁবু হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আমার মনে হইতেছে যেন আমি এখনও তাঁহার দুই পায়ের নলার ঔজ্জ্বল্য দেখিতে পাইতেছি" (বুখারী, পৃ. ৭৩১, হা. ৩৫৬৬)।

হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-এর বর্ণনামতে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পায়ের গোছা منهوس العقبين "হালকা মাংসল ছিল" (মুসলিম, ৮খ., পৃ. ১০২, হা. ২৩৩৯)।

শরীরের রং

হযরত সাঈদ জুরায়রী (র) বলেন, আমি আবুত তুফায়ল (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

رايت رسول الله ﷺ وما بقى على وجه الارض احد راه غيرى قلت صفه لى قال كان ابيض مليحا مقصدا.

"রাসূলুল্লাহ (স)-কে দর্শনকারীদের মধ্যে এই পৃথিবীতে আমি ব্যতীত আর কেহই জীবিত নাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম, মহানবী (স)-এর আকৃতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলিলেন, তাঁহার দেহের বর্ণ লাবণ্যময় ও কমনীয় ছিল" (তিরমিযী, অনু. শামায়েল, পৃ. ১৪)।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন ঃ

أزهر اللون ليس بابيض أمهق ولا ادم.

"গোলাপী রংয়ের, তাঁহার শরীরের রং না ছিল ধবধবে সাদা, আবার না একেবারে কড়া বাদামী" (বুখারী, ৭২৮, হা. ৩৬৪৯)।

শরীরের ঘাম

হযরত আনাস (রা) বলেন, كان عرقه اللؤلؤ "রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেহের ঘাম মুক্তার দানার মত মনে হইত" (আলবানী, মুখতাসার সাহীহ মুসলিম,-পৃ. ৪১২, হা. ১৫৬৯)।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

ما شممت عنبرا قط ولا مسقا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله ﷺ.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেহের ঘাম হইতে অধিক সুগন্ধময় কোন সুগন্ধি আমি কখনও শুঁকি নাই" (মুসলিম, ফাদাইল, ৮খ., পৃ. ৯৪, হা. ২৩৩০)।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

دخل علينا النبى ﷺ فقال عندنا فعرق وجاءت امى بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبى ﷺ فقال يا ام سليم ما هذا الذى تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب.

"রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের ঘরে আসিলেন এবং দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাঁহার শরীর হইতে ঘাম নির্গত হইতে লাগিল। আমার মা একটি শিশিতে নির্গত ঘাম জমা করিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উম্মে সুলায়ম! তুমি ইহা কি করিতেছ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এইগুলি হইল আপনার ঘাম। এইগুলি আমি আমাদের সুগন্ধির সাথে মিশাইব, আর আপনার ঘাম হইল সেরা সুগন্ধি" (মুসলিম, ৮খ., পৃ. ৯৪, হা. ২৩৩১)।

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) বলেন ঃ

ان النبى ﷺ لم يسلك طريقا أو لا يسلك طريقا فيتبعه احد الا عرف انه قد سلكه من طيب عرقه او قال من ريح عرقه.

"রাসূলুল্লাহ (স) কোন রাস্তা দিয়া গেলে এবং কেহ তাঁহার পিছনে বাহির হইলে সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘামের সুগন্ধির কারণে বুঝিতে পারিত যে, তিনি এই রাস্তা দিয়া গিয়াছেন" (ইমাম দারিমী, আস-সাহীহ্, ১খ., পৃ. ৯৪)।

শারীরিক উচ্চতা

হযরত বারাআ (রা) বলেন ঃ كان النبى ﷺ مربوعا. "নবী (স) মাঝারী গড়নের ছিলেন" (বুখারী, পৃ. ৭২৯, হা. ৩৫৫১)।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير.

"মহানবী (স) ছিলেন মাঝারী গড়নের, বেমানান লম্বাও ছিলেন না বা বেঁটেও ছিলেন না" (বুখারী, পৃ. ৭২৮, হা. ৩৫৪৭)।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

لم يكن النبى ﷺ بالطويل ولا بالقصير.

"মহানবী (স) না দীর্ঘ ছিলেন আর না বেঁটে ছিলেন" (তিরমিযী, অনু. শামায়েল, পৃ. ৬)। এক কথায় তিনি ছিলেন মাঝারী গড়নের লোক।

শরীরের চামড়া

হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বলেন ঃ

أردفنى رسول الله ﷺ خلفه فى سفر فما مسست شيئا قط ألين من جلده.

"এক সফরে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বাহনের উপর তাঁহার পশ্চাতে বসাইলেন। তখন আমার মনে হইল, তাঁহার চামড়া অপেক্ষা অধিক মোলায়েম কোন কিছু আমি কখনও স্পর্শ করি নাই" (আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ২খ., ২৮২)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়ার হাড়

হযরত আলী (রা)-এর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়ার হাড় মোটা ছিল (তিরমিযী, অনু. শামায়েল, পৃ. ৬)।

মাহ্‌রে নবুওয়াত

হযরত আবূ যায়দ (রা) বলেন ঃ

قال لى رسول الله ﷺ يا ابا زيد ادن منى فامسح ظهرى فمسحت ظهره فوقعت أصابعى على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات.

"রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, হে আবূ যায়দ! আমার নিকট আস এবং আমার পিঠে হাত বুলাও। তখন আমি তাঁহার পিঠে হাত বুলাইলাম। আমার আঙ্গুলগুলি খাতাম (মাহ্‌রে

নবূওয়াত)-এর উপর পড়িল। রাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, খাতাম কি ? তিনি বলিলেন, এক স্থানে এক গুচ্ছ চুল" (আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ৩১)।

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) বলেন ঃ

رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده.

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুই কাঁধের মধ্যখানে মাহরে নবূওয়াত দেখিয়াছি। তাহা ছিল কবুতরের ডিমের মত লাল বর্ণের একটি মাংসপিণ্ড" (মুসলিম, ফাদাইল, ৮খ., পৃ. ১০৬, হা. ২৩৪৪)।

হযরত সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বলেন ঃ

ذهبت بى خالتى الى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله ان ابن اختى وجع فمسح رسول الله ﷺ رأسى ودعا لى بالبركة وتوضأ فشربت فقمت الى ظهره فنظرت الى الخاتم الذى بين كتفيه فاذا هو مثل زر الحجلة.

"আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার বোনের ছেলেটি অসুস্থ, তাহার জন্য দু'আ করুন। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইলেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করিলেন। তারপর তিনি উযূ করিলেন। আমি তাঁহার উযূর অবশিষ্ট পানি পান করিলাম। অতঃপর আমি তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার দুই কাঁধের মধ্যখানে তাঁবুর (প্রবেশ দ্বারের) পর্দার বোতামের ন্যায় মাহরে নবূওয়াত চকচক করিতে দেখিলাম" (তিরমিযী, অনু. শামায়েল, পৃ. ১৫)।

হযরত আবূ নাদরা আল-আওফী (রা) বলেন ঃ

سألت أبا سعيد الخدرى عن خاتم رسول الله ﷺ يعنى خاتم النبوة فقال كان فى ظهره بضعة ناشزة.

"আমি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাহরে নবূওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, তাহা ছিল তাঁহার পিঠে একটি উদগত মাংস খণ্ডবিশেষ" (আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ৩৩)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস (রা) বলেন ঃ

أتيت رسول الله ﷺ وهو فى ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذى اريد فالقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كانهاقاليل فرجعت حتى استقبلته.

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসিলাম, তখন তিনি তাঁহার কতিপয় সাহাবীর সহিত বসা ছিলেন। আমি মহানবী (স)-এর পিছনে এমনভাবে ঘুরিতে লাগিলাম যে, তিনি আমার

মনোভাব বুঝিতে পারিয়া নিজ পৃষ্ঠ হইতে চাদরটি সরাইয়া দিলেন। তখন আমি তাঁহার দুই কাঁধের উপরে খাতম (মাহরে নবূওয়াত) দেখিতে পাই। ইহার আকৃতি ছিল মুষ্টিবদ্ধ আঙ্গুলগুলির অনুরূপ এবং চতুষ্পার্শ্বে ছিল কতকগুলি এমন তিল যাহা আঁচিলের মত মনে হইত" (তিরমিযী, অনু. শামায়েল, পৃ. ২৬)।

মাহরে নবূওয়াত সম্পর্কে রাবীদের বর্ণনায় পার্থক্য রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, যে রাবী যেইভাবে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়াছেন তিনি সেইভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কবুতরের ডিমের মত, কেহ পর্দার বোতামের ন্যায়, আবার কেহ মুষ্টিবদ্ধ আঙ্গুলের মত বলিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, পৃষ্ঠে একটি উদগত মাংসখণ্ডের ন্যায়। কিন্তু সবগুলির অর্থ একই অর্থাৎ উদগত মাংসপিণ্ড। আর যে বর্ণনাকারী চুলের সমষ্টি বলিয়াছেন তাহা এই কারণে যে, মাহরে নবূওয়াতের চারিপার্শ্বে সমান সমান চুল ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, দারুস সালাম, ১ম সংস্করণ, রিয়াদ ১৯৯৭; (২) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, দারুল হাদীছ, কায়রো, ১ম সংস্কারণ ১৯৯৪; (৩) ইমাম তিরমিযী, দারু ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা. বি.; (৪) ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, দারুল হাদীছ, কায়রো তা. বি.; (৫) ইমাম আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আদ-দারিমী, আস-সুনান, দারু ইহ্য়া আস-সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যা, তা. বি.; (৬) নূরুদ্দীন আলী ইব্ন আবূ বকর আল-হায়ছামী, মাওয়ারিদুজ জামান ইলা জাওয়াইদ ইব্ন হিব্বান, মুওয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত, ১ম সংস্করণ ১৯৯৩; (৭) আল্লামা আলবানী, সাহীহুল জামে' আস-সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরূত, ২য় সংস্করণ ১৯৭৯; (৮) ইমাম তিরমিযী, শামাইল, অনু. আঃ জলীল, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ, ১ম সংস্করণ ১৯৯৪; (৯) আল্লামা কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, বৈরূত ১৯৯১; (১০) আল্লামা আলবানী, মুখতাসার সাহীহ মুসলিম, মাকতাবাতুর রিয়াদ, ২য় সংস্করণ ১৯৯৬; (১১) ঐ লেখক, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৩ হি.; (১২) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, দারুল খায়র, ১ম সংস্করণ, বৈরূত ১৯৯৭; (১৩) আল্লামা আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আস-সাহীহা, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, নতুন সংস্করণ, রিয়াদ ১৯৯৫; (১৪) শামায়েলে তিরমিযী, অনু. মুহাম্মদ মূসা, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৩ খৃ.।।

মোঃ ফজলুর রহমান চৌধুরী

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ/১০/নসাজীবি/মুদ্রণ/১/৯৬ (উ)/৩২৫০